

হাজারো প্রশ্নের জবাব

১ ॥ মেডিটেশন

মহাজাতক

কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম হাজারো প্রশ্নের জবাব

১ ॥ মেডিটেশন



মহাজাতক



যোগ ফাউন্ডেশন

www.quantummethood.org.bd

কোয়ান্টাম ॥ হাজারো প্রশ্নের জবাব

পর্ব ১ ॥ মেডিটেশন

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ৮৩৯৬৮১৫, ৮৩৯১৩৯১

০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭৪০-৬৩০৮৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

E-mail : info@quantummethord.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

শোকরান! শোকরান!! ৩৫০

১৫ জুন, ২০১২

প্রচ্ছদ

আবদুল্লাহ জুবাইর

মুদ্রাকর

উইডোজ প্রিন্টিং সেন্টার

ইসলাম ভবন (২য় তলা)

৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড,

ঢাকা-১০০০

মূল্য

৪৪৪ টাকা

Quantum

Hajaro Proshner Jobab

(Quantum : The Answer to a Thousand Questions)

By : Mahajataq

Published by

Yoga Foundation

www.quantummethord.org.bd

Price : 75 \$

উৎসর্গ

জানার আত্মহ নিয়ে
যারা প্রশ্ন করেছেন,
যাদের প্রশ্নের জবাব থেকে
আলোকিত হয়েছেন
লাখো মানুষ,
সেই সত্যানুসন্ধানীদের
উদ্দেশ্যে নিবেদিত ।

ভূমিকা	৭
কোয়ান্টাম	৯
কোয়ান্টাম কী	১১
কোয়ান্টাম মেথড	১৭
কোর্স করতে চাচ্ছি করতে পারছি না	৩৪
অন্যকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করা	৩৬
কোর্স করার পর বিরূপ পরিস্থিতি	৩৯
কোয়ান্টাম, মেডিটেশন ও ইসলাম	৪৮
কোর্স ফি	৫৮
কোর্স করার পরে পরিবারের কোনো	
সদস্য যখন ফাউন্ডেশনে অনাথ্রহী	৬২
কোয়ান্টাম চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যতা	৬৩
মেডিটেশন	৬৭
সাফল্যের শক্তি রহস্য	৬৯
মেডিটেশনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া	৮২
মনের বাড়ি	৮৫
অবলোকন	৯১
শিখিলায়ন	৯৩
অটোসাজেশন	৯৯
অটোসাজেশন চর্চা	১০৪
অটোসাজেশন কী হবে	১১২
মেডিটেশন অনুশীলন	১১৪
কোন মেডিটেশন করবো	১২১
কীভাবে লেভেল ভালো করবো	১২৫
ক্যাসেট/ সিডি-তে না নিজে নিজে	১২৬
ফল পাচ্ছি না	১২৯
মেডিটেশনে ঘুম পায়	১৩০
মেডিটেশনে চোখে পানি	১৩২
মেডিটেশনে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়া	১৩৩
মেডিটেশনে শারীরিক মানসিক অস্বস্তি	১৩৪
চর্চা : বিভিন্ন	১৪৮
মেডিটেশনের অপব্যবহার	১৫০
অন্যকে মেডিটেশন শেখানো	১৫৩
বিরতকর প্রশ্ন	১৫৩
মেডিটেশন কোর্স পরবর্তী করণীয়	১৫৬
কোয়ান্টা ধ্রনি ও ভঙ্গি	১৫৮
কমান্ড সেন্টার ও অন্তর্গুরু	১৬৬
কমান্ড সেন্টারে অন্যকে হিলিং	১৮৮
প্রজ্ঞা	২১২
প্রকৃতির সাথে একাত্মতা	২২৩
ধ্যানের গভীর স্তর ৥ কোয়ান্টায়ন	২২৬

সূচিপত্র

দৃষ্টিভঙ্গি	২৪৫
দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব	২৪৭
বিশ্বাস	২৫৫
মনছবি ৥ জীবনের লক্ষ্য	২৬২
ব্যর্থতার পরে দৃষ্টিভঙ্গি	২৬৭
নিয়তি ৥	
ভাঙতে হবে নেতিবাচকতার বৃত্ত	২৭১
তাবিজ/ জাদু/ বান-টোনা/	
গণক/ রত্নপাথর	২৭৪
এস্ট্রলজি	২৮১
পোশাক	২৮২
অবিদ্যা	২৮৩
পাশ্চাত্য ও অবিদ্যা	২৮৬
মিডিয়া ও অবিদ্যা	২৯১
কুসংস্কার	২৯৮
কোয়ান্টাম দৃষ্টিভঙ্গি ৥	
দি সায়েন্স অফ লিভিং	৩০০
প্রশান্তি	৩০৩
কেন টেনশন	৩০৫
তথাকথিত বিনোদন এবং প্রশান্তি	৩১৪
শুকরিয়া-টেনশনের সমাধান	৩২১
রাগ-ক্ষোভ-অভিমান	৩৩১
ভয়	৩৫০
নেতিচিন্তা	৩৬৩
দুঃখ ও হতাশা	৩৬৮
হীনমন্যতা	৩৭৫
আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা	৩৮১
মোবাইল/ গেমস/ ইন্টারনেট	৩৮৬
ঈর্ষা/ হিংসা/ ঘৃণা	৩৯৬
প্রশংসার লোভ/ অহংকার	৪০৫
অনুশোচনা/ উত্তরণ	৪০৯
জানাকে মানায় রূপান্তর	৪১৬
অনন্য মানুষ	৪১৭
গুরুজী/ মহাজাতক/ এস্ট্রলজি	৪২৩

হাজারো
প্রশ্নের
জবাব

১ ॥ মেডিটেশন

কোয়ান্টাম

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন ...

অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তাই অজানা আশঙ্কা চেপে বসে তার মনে। ভোরের আলোয় আঁধার কাটতে শুরু করলে অজানা আশঙ্কাও কেটে যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নেমে পড়ে কাজে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সকল অন্ধকারের নিকৃষ্ট অন্ধকার অবিদ্যা। অবিদ্যা জন্ম দেয় নেতিবাচকতা অশান্তি লোভ লাম্পট্য শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা ব্যর্থতা রোগ শোক হতাশা। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি পরিণত হয় প্রতারক শোষণক লাম্পট শোষিত বা দাসে।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় বিদ্যার আলোয়। বিদ্যার সূচনা হয় মুক্ত বিশ্বাস থেকে। আর মুক্ত বিশ্বাসের পথে অন্তরায় হচ্ছে অহেতুক প্রশ্ন। শয়তানের কৌশল হচ্ছে বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে না পারলে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। আর অহেতুক প্রশ্ন ঢুকে পড়ে মানুষের স্বভাবজাত কৌতূহল বা জানার আগ্রহের সদর দরজা দিয়ে। সৃষ্টি হয় সংশয়।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর করার জন্যেই কোয়ান্টাম ডাক দিয়েছে মুক্ত বিশ্বাসের। বলেছে, হে তরুণ! শক্তি তোমার মধ্যেই রয়েছে। অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত কর। কোনো অভাব থাকবে না। যা দেখে তুমি বিস্মিত হও, সে বিস্ময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমার মধ্যেই আছে।

হাজার হাজার মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি এসেছে হাজারো প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতেও তাদের সময় লাগে নি। দ্বিধা সংশয় ভেসে গেছে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। তারা পৌঁছে গেছেন সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে।

কোয়ান্টাম মেথড চর্চার গত ২০ বছরের এমনি অসংখ্য প্রশ্নের জবাবের সংকলনই হচ্ছে ‘কোয়ান্টাম ৯ হাজারো প্রশ্নের জবাব’। আপনার মধ্যে সন্দেহ সংশয় বলে যদি কিছু থাকে তা দূর হবে অনায়াসে। কৌতূহল ও জানার আগ্রহ পাবে পূর্ণ তৃপ্তি। আপনি উপলব্ধি করবেন জীবনের আসল সত্য। লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—আমিও বিশ্বাস করি! আমিও পারি!

কোয়ান্টাম



কোয়ান্টাম কী?

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মানে কী? কোয়ান্টাম বলে আপনি কী বোঝাতে চান? যা বোঝাতে চান তার কি কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে?

উত্তর : এক কথায় কোয়ান্টাম হচ্ছে ভালো থাকার বিজ্ঞান। সবসময় ‘ভালো আছি’ বলতে পারা, ইচ্ছেমতো নিজেকে বদলাতে পারা, নিজের চাওয়াকে পাওয়ায় পরিণত করার সহজ-সরল বিজ্ঞান। আর এর সবটাই সার্বজনীনভাবে সম্ভব, সবটাই যে কারো পক্ষে প্রয়োগ করা বাস্তব। কোয়ান্টামের দুই দশকের ইতিহাসই তার প্রমাণ।

আসলে জীবনটা খুব সহজ। জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। দরকার হলো শুধু সঠিক জীবনদৃষ্টি।

জীবন বার্নার মতো গতিময় ও আনন্দোচ্ছল হয়ে উঠতে পারে যদি জীবনদৃষ্টি সঠিক হয়। জীবনদৃষ্টি সঠিক হলে সুপরিকল্পিতভাবে মনের অফুরন্ত শক্তিভান্ডারকে কাজে লাগিয়েই নতুন বাস্তবতা, নতুন সাফল্য নির্মাণ করা যায়।

আসলে আমাদের সকল সমস্যা শুরু হয় মন থেকে। মনের শক্তি জট পাকিয়ে গেলেই সৃষ্টি হয় নানারকম রোগব্যাদি। সম্ভাবনা পরিণত হয় ব্যর্থতায়। আশা রূপ নেয় হতাশায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, শতকরা ৭৫ ভাগ রোগ মনোদৈহিক। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বলেছিলাম, মেডিটেশনে আসুন, মনের জট খুলে যাবে। আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তারা এসেছেন, মনের জট খুলে গেছে। জটিল জটিল রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থতা আর প্রাণবন্ততার আনন্দ নিয়ে বাসায় গেছেন।

জীবনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। নেতিবাচকতার কারণে মনে জট লেগে যায়। জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়।

একমাত্র সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই মনের জটকে সুন্দরভাবে খুলে ফেলে। জীবন পায় গতি। শূন্য থেকে এই পথেই লাখে মানুষের জীবনে এসেছে সাফল্য।

পারিবারিক সামাজিক যত সমস্যা—এর মূল কারণও কিন্তু মনের জট। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি, ভাই-বোনের খারাপ সম্পর্ক, আত্মীয় বন্ধুদের সাথে দূরত্ব। সমস্যাটা কিন্তু মনে। মনের জট খুলে ফেললেই ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। সম্পর্ক হবে সুন্দর আনন্দময়।

প্রশ্ন করতে পারেন, মনে জট পাকায় কেন? সুতো একত্রে রাখলে জট পাকায় কেন? কারণ কোনো লাইন থাকে না। কিন্তু সুতো কয়েল করে পেঁচিয়ে রাখুন। তখন কিন্তু কোনো জট পাকায় না। কারণ তখন সুতো একটি লাইনে থাকে।

মনের জটও পাকায় মনকে লাইন ছাড়া অর্থাৎ লাগামহীন ছেড়ে দেয়ার ফলে। যখন আপনি কোয়ান্টাম মেডিটেশনে আসেন, আত্মনিমগ্ন হন, তখন মন ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খল হয়। মন তখন ঠিক লাইনে আসে। জটটা খুলে যায়। রোগ শোক নেতিবাচকতা ব্যর্থতা হতাশা অশান্তির বদলে আসে প্রশান্তি, সুস্থতা আর সুখের জোয়ার। তাই আধুনিক জীবনে আত্মজাগরণের অনুঘটক এখন কোয়ান্টাম। কোয়ান্টাম একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যা একজন মানুষকে বদলে দেয় ভেতর থেকে। এটাই নতুন সহস্রাব্দের বাস্তবতা। নতুন সত্য।

প্রশ্ন : যে কেউই কি কোয়ান্টাম বা মেডিটেশন করে উপকৃত হতে পারে? এ ব্যাপারে কি বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো গবেষণা আছে? হয়ে থাকলে জানানবেন।

উত্তর : আসলে ১৯৯৩ সাল থেকেই আমরা বলে আসছি, মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান। এটা অলৌকিক কিছু নয় বা নয় কোনো আশ্রম, খানকা বা শ্রেণী সম্প্রদায়ের বিষয়। বরং মেডিটেশন হলো এক সার্বজনীন কল্যাণ প্রক্রিয়া। মেডিটেশন চর্চা করে নারী-পুরুষ, কিশোর-বৃদ্ধ পাপী-পুণ্যাত্মা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আত্মিক কল্যাণ লাভ করতে পারেন। গত ৬০ বছরের অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্য দিয়ে এটা এখন এক প্রমাণিত সত্য।

নিউসায়েন্টিস্ট ম্যাগাজিনে ৮ জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায় মেডিটেশনের ওপর একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘এভরিবডি সে ওম’ শিরোনামের এ প্রচ্ছদ নিবন্ধে মেডিটেশন নিয়ে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ব্যাপক গবেষণার ফল তুলে ধরা হয়। নিবন্ধে বলা হয়—মেডিটেশন শুধু সাধকদের জন্যে নয় বা এ থেকে উপকার লাভের জন্যে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যে কেউ মেডিটেশন করে উপকৃত হতে পারে। মেডিটেশনে সময় ব্যয় করা হচ্ছে ফলপ্রসূ সময় ব্যয়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সেন্টার ফর মাইন্ড এন্ড ব্রেন’-এর বিজ্ঞানী ক্লিফোর্ড স্যারনের নেতৃত্বে একদল গবেষক অনেকদিন ধরে মেডিটেশন করছেন এমন ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবীর ওপর তিন মাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

প্রথম পরীক্ষাটি ছিলো মনোযোগ নিয়ে। কম্পিউটার স্ক্রিনে অনেকগুলো খাড়া খাড়া দাগ দেখিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের বলা হয়, এগুলোর মধ্যে যখনই বাকিগুলোর চেয়ে ছোট কোনো দাগ তাদের চোখে পড়বে তৎক্ষণাৎ মাউস ক্লিক করে তারা যাতে সেটাকে চিহ্নিত করে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন—যত বেশি সময় গড়াচ্ছিলো ধ্যানীরা তত নির্ভুলভাবে ছোট দাগগুলোকে শনাক্ত করতে পারছিলেন।

মেডিটেশন যে মনোযোগ বাড়ায় তা অবশ্য আগের আরো বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকেও প্রমাণিত। উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের পরীক্ষায় দেখা গেছে, নিয়মিত মেডিটেশন করে স্বেচ্ছাসেবীরা বিভিন্ন স্বরের পার্থক্যকে খুব সহজে বুঝতে পারছে। জার্নাল অফ নিউরোসায়েন্সে এ গবেষণার ফলাফলটি প্রকাশিত হয়।

এটা তো গেল মনোযোগ। সামান্য প্রকল্পের দ্বিতীয় গবেষণাটি ছিলো আবেগ-অনুভূতির ওপর মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে। যে প্রক্রিয়ায় গবেষণাটি চালানো হয় তা—ও খুব মজার। এর আগে স্বেচ্ছাসেবীদের যেরকম ছোট দাগ দেখলে মাউসে ক্লিক করতে বলা হয়েছিলো, এবার তাদের বলা হয় লম্বা দাগগুলোকে ক্লিক করতে। কাজটা একাধারে একঘেয়ে, বিরক্তিকর এবং বেশ ধৈর্যসাপেক্ষও। কারণ অনেকক্ষণ ধরে আসা লম্বা দাগগুলোর পরে হঠাৎ হঠাৎ আসতো ছোট দাগগুলো। একদিকে দীর্ঘ সময় ধরে লম্বা দাগে ক্লিক করা এবং ছোট দাগগুলোকে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে চাচ্ছিলেন বিরক্তি বা একঘেয়েমিজনিত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা তাদের কতটা বেড়েছে।

গবেষকদলের নেতা বালজিন্ডার সাহাদ্রা বলেন, আমরা দেখলাম, মেডিটেশন চর্চার ফলে স্বেচ্ছাসেবীদের টেনশন করার প্রবণতা কমেছে, বেড়েছে নেতিবাচক আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার ক্ষমতা। মেডিটেশন একজন মানুষের রি-একটিভিটি বা মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতাকে কমায়।

ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি গবেষণায়ও দেখা গেছে, মেডিটেশন ব্রেনের এমিগডালা অংশের তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির আবেগকে সংহত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এটিও প্রকাশিত হয় ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সের জার্নালে।

বিজ্ঞানীরা বলেন—আর এর ফলে সবচেয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে মানুষের শারীরিক-মানসিক সুস্থতায়। কিছু অসুস্থতা যেমন—ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, মাদকাসক্তি, চর্মরোগ সোরিয়াসিস, ডিপ্রেসন এবং ক্রনিক ব্যথা সারাতে

মেডিটেশনের কার্যকর ভূমিকা দেখা গেছে।

মেডিটেশন বার্ষিক্যকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সামাথা প্রকল্পের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশনের ফলে দেহে টেলোমেরেজ নামে একটি এনজাইমের উৎপাদন বেড়ে যায় যা কোষের বুড়িয়ে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সংক্রান্ত লেখাটি এসেছে জার্নাল ‘সাইকোনিউরোএনডোক্রাইনোলজিতে’।

সামাথা প্রকল্পের সবচেয়ে আলোচিত গবেষণাটি হচ্ছে—মেডিটেশন অন্যের প্রতি আবেগ-অনুভূতিকে বাড়ায় কি না সে পরীক্ষাটি। দীর্ঘদিন মেডিটেশন করেছেন এমন ব্যক্তিদের ব্রেনের ফাংকশনাল এমআরআই করে গবেষক লাজ এবং তার সহযোগীরা দেখেন ইনসুলা বা এন্টেরিওর সিংগুলেট করটেক্স এর মতো মস্তিষ্কের যে অংশগুলো মমতা, অন্যদের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি অনুভূতিকে জাগ্রত করে, তাদের মস্তিষ্কে তা অনেক বেশি সক্রিয়। নিউরোইমেজ জার্নালে এটিও প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৯ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে খোলা হয় সেন্টার ফর কমপ্যাশন এন্ড আলট্রুয়িজম রিসার্চ এন্ড এডুকেশন। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন এই ইনস্টিটিউটের কাজ হলো মমতা, সহানুভূতি, সমমর্মিতা ইত্যাদি মানবিক আবেগগুলোর নিউরোবায়োলজিকেল যোগসূত্র বোঝা, গবেষণা করা। এই ইনস্টিটিউটের সাথে নিউরোসায়েন্টিস্টরা যেমন আছেন, আছেন সিলিকন ভ্যালির বড় বড় বিনিয়োগকারীরা এবং আছেন তিব্বতীয় ধর্মগুরু দালাই লামা। তাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হলো মেডিটেশন চর্চা করে কীভাবে একজন মানুষ অন্যের প্রতি তার নিঃস্বার্থ মমতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা সৃষ্টি করতে পারে।

আর এসব উদ্যোগের ফলেই বোধ হয় মেন্টাল ট্রেনিং জিমনেসিয়ামের মতো ধারণার উদ্ভব ঘটেছে, যেখানে গিয়ে একজন মানুষ তার আবেগকে জাগ্রত করার অনুশীলন করবে, বাড়াবে তার সহমর্মিতার অনুভূতি। যেরকম সে জিমে গিয়ে বাড়াতে পারে তার পেশির কার্যকারিতা।

তবে এসব গবেষণার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তাহলো আপনি যে-ই হোন বা যেখানেই থাকুন, মেডিটেশন থেকে আপনি উপকৃত হবেনই। আপনাকে এজন্যে মেডিটেশনে বিশেষজ্ঞ হতে হবে না, দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে অনুশীলন করতে হবে না, ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলেও যেতে হবে না।

মেডিটেশনের ব্যথানিরোধক ক্ষমতার ওপর মনোবিজ্ঞানী ফিদেল জাইদানের গবেষণায় দেখা গেছে মাত্র তিন দিন প্রতিদিন ২০ মিনিট করে

অনুশীলন করেই উপকার পেতে শুরু করেছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। তার দ্বিতীয় গবেষণায়ও দেখা গেছে অল্পসময়ের জন্যে একটুখানি মেডিটেশন করেই বেড়ে গেছে তাদের মনোযোগের ক্ষমতা, বেড়েছে বড় বড় সংখ্যা মনে রাখা ও বলতে পারার দক্ষতা। তার এই গবেষণালব্ধ তথ্য বেরিয়েছে কনশাসেন্স এন্ড কগনিশন জার্নালে।

প্রখ্যাত মেডিটেশন গবেষক রিচার্ড ডেভিডসন এজন্যেই বলেন, দেহ-মনের ওপর মেডিটেশনের প্রভাব এত তাড়াতাড়ি পড়ে যে, আমরা আমাদের গবেষণায় দেখেছি একদল নতুন মানুষ মেডিটেশন শেখার পর মাত্র দুই সপ্তাহ প্রতিদিন ৩০ মিনিট অনুশীলন করেই তার মস্তিষ্কের কর্মকাঠামোয় ঘটাতে পেরেছে দৃশ্যমান পরিবর্তন।

তাই বলা যায়, মন ও মস্তিষ্কের বিশাল কর্মক্ষমতা নিয়ে এখন যে লাগাতার গবেষণা চলছে, তা থেকে প্রতিনিয়তই বেরিয়ে আসছে মেডিটেশনের ইতিবাচক ফলাফলের নতুন নতুন তথ্য।

প্রশ্ন : ‘কোয়ান্টাম’ শব্দের অর্থ কী? কেন এই নামকরণ করা হলো?

উত্তর : কোয়ান্টাম শব্দটি নেয়া হয়েছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স থেকে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আগে বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হতো নিউটনিয়ান মেকানিক্স দিয়ে।

আমরা জানি, বিজ্ঞানী নিউটন এবং ম্যাক্সওয়েলের সূত্র অনুসরণ করে পদার্থবিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে এক সুশৃঙ্খল বিশ্বদৃষ্টি উপস্থাপন করে। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সবকিছুই ছিলো এক নিয়মের অধীন, সবকিছুই হিসেব করে বলে দেয়া যেত। সেখানে বিজ্ঞানীর কোনো ভূমিকা থাকলো না। বিজ্ঞানী ছিলেন একজন দর্শকমাত্র। আর পুরো প্রক্রিয়া হচ্ছে দর্শক-মন নিরপেক্ষ। অর্থাৎ মনের কোনো ভূমিকা আর থাকলো না। বিজ্ঞান থেকে মন নির্বাসিত হলো এবং বস্তুবাদের বিকাশ ঘটলো।

পরমাণু পর্যন্ত নিউটনিয়ান মেকানিক্স ভালোভাবেই সবকিছুর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হচ্ছিলো। কিন্তু বিজ্ঞান যখন পরমাণুর গভীরে বা সাবএটমিক লেভেলে ঢুকলো, তখন দেখা গেল একটা সাবএটমিক পার্টিকেল-পার্টিকেল ফর্মে আছে, না এনার্জি ফর্মে আছে তা হিসেব করে বলা যাচ্ছে না, দেখে বলতে হচ্ছে। যেকোনো সময় এটা পার্টিকেল ফর্মে থাকতে পারে, যেকোনো সময় এটা এনার্জি ফর্মে থাকতে পারে। এটাই হলো ওয়ার্নার হেইজেনবার্গের

আনসারটেইনিটি প্রিন্সিপল। বিজ্ঞানে তখন আবার দর্শকের আগমন ঘটলো।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিংশ শতাব্দিতে এসে বিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত মনকে আবার বিজ্ঞানে পুনর্বাসিত করে। বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় এই আমূল পরিবর্তন কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীদের বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে এবং তারা মানব মন ও দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নে নিমগ্ন হন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনো যুগেই নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা এত বিপুল সংখ্যায় তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-ফলাফলের দার্শনিক ও মানবিক মূল্যায়ন করে নিবন্ধ বা পুস্তক রচনা করেন নি।

যেহেতু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত মনকে বিজ্ঞানে পুনর্বাসিত করে, তাই চেতনার শক্তিকে, মনের বিশাল ক্ষমতাকে নিজের ও মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের সহজ ও পরীক্ষিত এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটির নামকরণ করা হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড।

তাছাড়া কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে, পরমাণুর ভেতরে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে একটি ইলেকট্রন যখন তার কক্ষপথে ঘোরে, তখন ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে কেন্দ্রের দিকে নামতে শুরু করে। এরই একপর্যায়ে সে একটা উচ্চতর কক্ষপথে লাফ দেয়। খুব দ্রুত ঘটা এ উচ্চস্তরে উত্তরণ বা উত্থানকে বলা হয় কোয়ান্টাম লিপ বা কোয়ান্টাম উল্লম্বন।

তেমনি একজন মানুষ যখন ধ্যান করে, আত্মনিমগ্নতার গভীরে চলে যায়, তখন তার মধ্যেও একটা উপলব্ধির স্ফূরণ ঘটে, যা তাকে আগের চেয়ে উন্নততর মানসিক ও আত্মিক স্তরে নিয়ে যায়। কোয়ান্টাম লিপের মতো তার চেতনার জগতেও একটা উল্লম্বন হয়। কোয়ান্টাম মেথড নামকরণের এটাও একটা কারণ।

আবার ‘কোয়ান্টাম’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিমিতি। কারণ সুস্থ, সুন্দর ও সার্থক জীবনের জন্যে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি এবং সবকিছুর মধ্যে একটা পরিমিতি। আমাদের কাছে বর্তমানে কোয়ান্টামের অর্থ হচ্ছে সায়েন্স অফ লিভিং বা জীবন যাপনের বিজ্ঞান-যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়, আর ভালো বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়।

তাই আমরা কোয়ান্টামকে বলি জীবন যাপনের বিজ্ঞান, সফল জীবনের বিজ্ঞান। জীবন যাপনের বিজ্ঞানের আলোয় আমরা আলোকিত হচ্ছি এবং আলোকিত করছি সাধারণ মানুষকে। পরিবর্তিত করছি নিজেদের এবং পরিচিতজনদের জীবনকে।

প্রশ্ন : এক কথায় কোয়ান্টামের মূল উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : কোয়ান্টামের মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন যাপনের বিজ্ঞানের আলোয় নিজেকে বদলানো, চারপাশের মানুষকে বদলানো। অশান্তিকে প্রশান্তিতে রোগকে সুস্থতায় আর ব্যর্থতাকে সাফল্যে বদলে দেয়া। কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অমিত সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে। প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটিয়ে একজন সফল মানুষে পরিণত হতে পারে। সেই সাথে সম্ভাবনাক্রম প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার একক কল্যাণশক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে।

কারণ একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় বড় কোনো কল্যাণমূলক কাজ করা না গেলেও অনেকে যখন সমবেত হন, তখনই সম্ভব দূরপ্রসারী কিছু করা। অবশ্য এর জন্যে আগে প্রয়োজন ব্যক্তির সাফল্য, ব্যক্তির আত্মনির্মাণ। কারণ ব্যক্তি যদি সফল না হয়, তাহলে সমাজ সফল হবে না, রাষ্ট্র সফল হবে না। তাই ব্যক্তির নৈতিক আত্মিক বৈষয়িক পারিবারিক স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে আমাদের জাতিকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে পরিণত করাই হলো কোয়ান্টামের স্বপ্ন।

কোয়ান্টাম মেথড

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে আমার কী উপকার হবে?

উত্তর : আমরা কোয়ান্টাম মেথডকে বলি জীবন যাপনের বিজ্ঞান। জীবনকে সুন্দর করা যায় কীভাবে, জীবনে ভুল কত কম করা যায়-জীবনের কাজগুলো কত সহজে করা যায়-জীবনের অঙ্ক কীভাবে মেলানো যায়-জীবনকে কীভাবে শান্তিময়, আনন্দ ও সাফল্যময় করা যায়, এসবই হলো জীবন যাপনের বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়। আসলে জীবনের পাঁচটি মৌল প্রয়োজন- ১. মানসিক প্রশান্তি ২. শারীরিক সুস্থতা ৩. আর্থিক সচ্ছলতা ৪. পারিবারিক সমৃদ্ধি ৫. আত্মিক পূর্ণতা-এই উপকরণগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে কোয়ান্টাম মেথডে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে একজন মানুষ সাধারণভাবে যে উপকারগুলো লাভ করতে পারেন তা হলো :

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব : অস্থিরতা টেনশন নার্ভাসনেস ভয়-ভীতি হতাশা বিষণ্ণতা রাগ-ক্ষোভ ও বদমেজাজ থেকে মুক্তি। নিজের ওপর পূর্ণ আস্থা, মানসিক প্রশান্তি ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

সুস্বাস্থ্য : রোগ নিরাময়ে মনের ক্ষমতা বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক স্বীকৃত সত্য। মনের শক্তি দিয়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ক্ষমতা বাড়িয়ে পেতে পারেন রোগ-ব্যাধিমুক্ত সুস্থ সুন্দর দীর্ঘজীবন।

লেখাপড়ায় সাফল্য : জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, অখণ্ড মনোযোগ সৃষ্টি ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় লেখাপড়ার মাধ্যমে অল্প সময়ে পড়া তৈরি, পরীক্ষাভীতি দূর ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষা দিয়ে অসাধারণ ফল।

অর্থ বিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি : মস্তিষ্কের ডান ও বাম বলয়কে সমন্বিত এবং মস্তিষ্ককে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে পেশাগত সাফল্য, পদোন্নতি, ব্যবসা, অভিনয়, ক্রীড়া ও জনপেশায় জনপ্রিয়তা ও অর্থ বিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ।

সম্পর্ক উন্নয়ন : ব্যক্তিগত দাম্পত্য পারিবারিক পেশাগত ও সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন, অন্যকে বোঝা ও তার উপকার করার ক্ষমতা।

বদভ্যাস দূর : ধূমপান এলকোহল ড্রাগ নেশা ও মাদকদ্রব্য বর্জন এবং যেকোনো বদভ্যাস থেকে মুক্তি।

অতিচেতনা : অতিচেতনা, প্রজ্ঞা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, মুক্ত বিশ্বাস ও প্রশান্ত প্রত্যয়।

ইবাদতে একাগ্রতা : একাগ্রচিন্তে ইবাদত বা প্রার্থনা দোয়া জিকির আরাধনা বা নামজপের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য।

প্রশ্ন : পেশাগত সাফল্যের জন্যে কোয়ান্টাম মেথড কি কার্যকর?

উত্তর : পেশাগত সাফল্যের জন্যে মেডিটেশনের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। মেডিটেশনকে কাজে লাগিয়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে বিশ্বব্যাপী অসংখ্য কোম্পানি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। যাদের মধ্যে রয়েছে তেঁশিবা, সনি, টয়োটা, সুমিতমো, ভলভো, জেনারেল মটরস বা আইবিএম-এর মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানি। জেনারেল মটরস ঘোষণা করেছে, তাদের যেসব কর্মী মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিতে আগ্রহী, তাদের ব্যয়ভার কোম্পানি বহন করবে। কর্মীদের মেডিটেশন শেখানোর জন্যে কোরিয়ার স্যামসাং শিল্পগোষ্ঠী রাজধানী সিউলের দক্ষিণে ১৭ একর জায়গা জুড়ে গড়ে তুলেছে এক বিশাল প্রশিক্ষণকেন্দ্র।

পেশাগত ক্ষেত্রে মেডিটেশনের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা গেছে, কোম্পানিতে মেডিটেশন চালু করার ফলে কর্মীদের টেনশন, অস্থিরতা, অবসাদ ও অনিদ্রা কমেছে; ধূমপান ও নেশার

আসক্তি কমেছে এবং দক্ষতা, কর্মসম্প্রতি ও পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন বেড়েছে লক্ষণীয় মাত্রায়। যে কর্মীরা সৃজনশীল, বুদ্ধিমান, সুস্থ এবং প্রাণবন্ত-স্বাভাবিকভাবে তারাই বেশি কাজ করতে পারে। তখন উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে, অনুপস্থিতির হার কমে এবং দলগতভাবে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

জবস্ট্রেস আধুনিক ব্যবসাজগতের প্রধান চ্যালেঞ্জ। ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা বা আইএলও-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী জবস্ট্রেসের কারণে আমেরিকায় প্রতিবছর ২০০ বিলিয়ন ডলার অপচয় হয়। অলটারনেটিভ থেরাপি জার্নালের ১৯৯৬-এর একটি সংখ্যায় বলা হয়, শতকরা ৫৪ ভাগ ক্ষেত্রে কাজে অনুপস্থিতির কারণ হলো ক্রনিক ব্যথা, হাইপারটেনশন এবং মাথাব্যথা। আর এ সবকটি সমস্যাই তৈরি হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ-উৎকর্ষা থেকে।

আর এখানেই মেডিটেশনের ভূমিকা। বিজনেস উইকের ‘কোম্পানিজ আর ব্যাটলিং এমপ্লয়িজ স্ট্রেস উইথ মেডিটেশন’ শীর্ষক এক রিপোর্টে বলা হয়, আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ, ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইউনিভার্সিটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একাধিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মেডিটেশন মানুষের ব্রেনের তৎপরতা বাড়ায়, তার বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মনোযোগের ক্ষমতাকে বাড়ায়।

অন্যদিকে কর্মীরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়-এরকম নানা ধরনের ব্যথা-বেদনা দূর করতে সাহায্য করে মেডিটেশন। এসব কারণে পৃথিবীর বড় বড় করপোরেশনগুলো এখন তাদের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করছে মেডিটেশনে। ব্যবস্থা করছে ফ্রি মেডিটেশন ক্লাসের। কারণ এতে যে খরচ হচ্ছে সে তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ছে অনেক বেশি। বলা যেতে পারে, পেশাগত উদ্বেগ নিরসনের সবচেয়ে কার্যকরী ও সাশ্রয়ী একটি উপায় হচ্ছে মেডিটেশন। শুধু পাশ্চাত্যই নয়, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও নিয়মিত আয়োজিত হচ্ছে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।

বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। গত ২০ বছর ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সাড়ে তিনশ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন শত শত পেশাজীবী ও শিল্প-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী ও ব্যাংকারসহ রয়েছেন বড় শিল্পগোষ্ঠীর চেয়ারম্যান, বহুজাতিক কোম্পানির সিইও থেকে শুরু করে অসংখ্য পাবলিক ও প্রাইভেট কোম্পানির এক্সিকিউটিভ এবং ব্যবসায়ী। মেডিটেশন চর্চা করে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি তারা পেয়েছেন পেশাগত উপকারও। এ নিয়ে এক গবেষণাধর্মী

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে ‘ইনস্টিটিউট অফ কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ’-এর জার্নাল ‘দি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট’-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায়। ‘দি ইনফ্লুয়েন্স অফ এ মেডিটেশন-রিলাক্সেশন টেকনিক অন এক্সিকিউটিভ পারফরমেন্স’ শিরোনামের এ প্রবন্ধে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণকারী ২০ জন শিল্পমালিক ও ব্যবস্থাপকের মেডিটেশন পরবর্তী অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়।

এতে দেখা যায়, মেডিটেশনের ফলে মালিক ব্যবস্থাপকদের কাজে উৎসাহ এবং তৎপরতা বেড়ে গেছে। বস, সহকর্মী ও অধীনস্থদের সাথে সম্পর্কেও ঘটেছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। নেতিবাচক আবেগ অর্থাৎ রাগ-ক্ষোভ-ঈর্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা এখন আগের চেয়ে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। শারীরিক-মানসিকভাবেও তারা আগের চেয়ে সুস্থ ও প্রশান্ত।

প্রশ্ন : বদভ্যাস বা আসক্তি দূর করতে কি মেডিটেশন কাজ করে?

উত্তর : প্রচলিত অন্য যেকোনো চিকিৎসাব্যবস্থার চেয়ে সিগারেট, মাদক ও অন্য কোনো ড্রাগের আসক্তি থেকে নিরাময়ে মেডিটেশনই এখন বেশি কার্যকর বলে প্রমাণিত হচ্ছে নানা গবেষণায়।

৭০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত সবগুলো গবেষণায়ই ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে। এ গবেষণাগুলোর একটা মেটা এনালিসিস করেছেন মহাশ্বষি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানেজমেন্টের চার্লস আলেক্সান্ডার ও তার সহযোগীরা। তারা দেখেছেন, সবগুলো ফলাফলেই আসক্তি থেকে রোগীরা অন্য যেকোনো প্রক্রিয়ার চেয়ে মেডিটেশনে কার্যকরীভাবে নিরাময় হয়েছেন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। তাদের পুনরায় মাদকাসক্ত বা ধূমপানে আসক্ত হওয়ার হারও অনেক কম।

২০০৬ সালে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনের ড. সারা বাওয়েন ও তার সহযোগীরা জেলখানার মাদকাসক্ত বন্দিদের ওপর মেডিটেশনের প্রভাব বিষয়ে এক গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, জেলে থাকার সময় যারা মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিয়েছে, জেল থেকে বেরিয়ে তাদের মাদকাসক্তির পরিমাণ কমেছে। এসব মাদকের মধ্যে এলকোহল যেমন আছে, তেমনি আছে কোকেন, মারিজুয়ানা ইত্যাদিও। মেডিটেশনকারী গ্রুপের মধ্যে মাদকের প্রভাবজনিত মানসিক সমস্যাও কম। সামাজিক পরিবেশের সাথে তারা আরো ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারছে।

ক্যালিফোর্নিয়া স্কুল অফ প্রফেশনাল সাইকোলজি, বার্কলের গবেষক ক্যারোল বলেন, মেডিটেশন জীবনে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণতা তৈরি করে যা মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির প্রধান কারণ।

মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনদৃষ্টির এ অনন্য নির্দেশনার আলোকে গত ২০ বছরে কোয়ান্টাম কোর্সে অংশগ্রহণকারী শত শত মানুষ ধূমপান, মাদকের মতো নেশা থেকে যেমন নিজেদেরকে মুক্ত করেছেন তেমনি সফট ও এনার্জি ড্রিংকস, দুধ-চায়ের মতো ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাসকেও ছেড়েছেন অবলীলায়।

প্রশ্ন : রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম মেথড কতটা কার্যকর?

উত্তর : রোগ নিরাময়ে বিশ্বাস, মনছবি ও প্রার্থনার সমন্বিত প্রয়োগের এক সফল প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম হিলিং। এ প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করে বাংলাদেশেও হাজার হাজার মানুষ অনিদ্রা, মাইগ্রেন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, আলসার, টিউমার, চর্মরোগ, বাত ব্যথা, আইবিএস, মাদকাসক্তি, এমনকি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিরাময় লাভ করেছেন।

কোয়ান্টাম নিরাময়ের কার্যকারিতার নেপথ্যে রয়েছে মেডিটেশন। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করে দেখেছেন ৭৫% রোগের মূল কারণ মানসিক। তাই মন-দেহ নিয়ন্ত্রণকারী তথ্যভাভারের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একদিকে দেহ যেমন নিজেই নিজেকে রোগমুক্ত করতে পারে; তেমনি সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে পারে পরিপূর্ণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে। আর এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হলো মেডিটেশন।

বিশ শতকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মনছবি প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন টেক্সাসের ডা. কার্ল সিমন্টন। তার বিখ্যাত ‘ইমেজ থেরাপি’ প্রয়োগ করে অস্তিত্ব অবস্থা থেকেও বহু ক্যান্সার রোগী নিরাময় লাভ করেছেন। ইয়েল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ডা. বার্নি সীজেল মনছবির প্রয়োগ করে অসংখ্য দুরারোগ্য রোগীকে নিরাময় ও কর্মক্ষম করে তুলেছেন।

আমেরিকার মেনিঙ্গার ফাউন্ডেশনে ক্যান্সার, এইডস ও মাদকাসক্তদের নিরাময়ের জন্যে মেডিটেশনই প্রধান মাধ্যম। আর ডা. ডীন অরনিশের মেডিটেশন ভিত্তিক ‘প্রোগ্রাম ফর রিভার্সিং হার্ট ডিজিস’-এর মাধ্যমে ওষুধ এবং সার্জারি ছাড়াই নিরাময় লাভ করেছেন হাজার হাজার হৃদরোগী।

আল্লাহ বলেছেন, আমি এমন কোনো রোগ পাঠাই নি, যার নিরাময় পাঠাই নি। অর্থাৎ প্রতিটি রোগের নিরাময় রয়েছে। এ নিরাময় ওষুধ হতে পারে,

মেডিটেশন হতে পারে, সদকা বা দান হতে পারে, দোয়া বা প্রার্থনা হতে পারে। কেউ যদি আত্মনিমগ্ন অবস্থায় চায় যে, আমার মাথাব্যথা ভালো হয়ে যাক, ব্যাকপেইন ভালো হয়ে যাক-নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে নিরাময় করতে পারেন। কারণ নিরাময়কারী একমাত্র আল্লাহ। আর এ বিশ্বাসের শক্তির পাশাপাশি মেডিটেশনের মাধ্যমে নিজের নিরাময়শক্তিকে উজ্জীবিত করে সুস্থ হয়েছেন এমন উদাহরণ এখন আপনার চারপাশেই রয়েছে। তাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্স নিঃসন্দেহে রোগ নিরাময়ে সহায়ক হবে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের কথা। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে ‘টেনশনমুক্তির জন্যে শিথিলায়ন’ শীর্ষক সেমিনার ও শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনি কোয়ান্টাম মেথডকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক আখ্যায়িত করেছিলেন। সেটাই ছিলো কোয়ান্টামের আনুষ্ঠানিক যাত্রাশুরুর দিন।

এর ১৮ বছর পর ২০১১-এর জুলাইতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩১ তম ব্যাচে চার দিন পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি পুনরাবৃত্তি করেন সেই একই কথার। তিনি বলেন, ‘আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথড চর্চার মাধ্যমে রোগমুক্তি ও প্রশান্তি অর্জন সহজ হবে। এখানে এসে আমি দেখলাম, বহু মানুষ এ কোর্সের মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতি আমার অনুরোধ-রোগমুক্তি ও নিরাময়ের এ অনুভূতিগুলো সংকলিত করে বই হিসেবে প্রকাশ করুন। প্রয়োজনে আমাদেরকে দিন। আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করবো। কারণ চারপাশের মানুষকে এ সংবাদ জানানো অত্যন্ত জরুরি।...কোয়ান্টামের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ক্রমাগত এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকবে, অসংখ্য মানুষ উপকৃত হবে। একজন চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি যে, কোয়ান্টামের কার্যকারিতা এখন একটি প্রমাণিত সত্য যা সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে।’

প্রশ্ন : আমি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় ভুগি। দুই বছর যাবৎ স্নায়বিক রোগের ওষুধ সেবন করছি। সমস্যাটি আমার বংশগত। আমার বাবারও এ সমস্যা রয়েছে। তিনিও দীর্ঘদিন স্নায়বিক রোগে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি কোন মেডিটেশন করলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবো? যেহেতু, আমার এ অসুখটি জেনেটিক, এটি কি মেডিটেশনের মাধ্যমে নিরাময় হবে? জানালে অত্যন্ত উপকৃত হবো।

উত্তর : সাধারণভাবে মনে করা হয়, একজন মানুষ দেখতে কেমন হবে, তার চুল বা চোখের রঙ কেমন হবে, সে রাগী হবে না শান্ত হবে, চঞ্চল হবে না ধীরস্থির হবে-এ সবকিছু নির্ধারিত হয় জিন দ্বারা, বাবা-মায়ের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় যা সে পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সে কী কী রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেটাও ঠিক হয় বংশধারা দ্বারা। বাবার বা দাদার ডায়াবেটিস থাকলে সে-ও ধরে নেয় তার ডায়াবেটিস হবে, নিজের স্কিন এলার্জি হলে সে মনে করে মায়ের ছিলো, তাই হয়েছে। ব্যাপারটা যেন নিয়তির মতো, কিছুই আর করার নেই।

কিন্তু এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অবশ্যই কিছু করার আছে, আর তা হলো মেডিটেশন এবং সেটার প্রমাণও তারা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, একজন মানুষ ক্যান্সারাক্রান্ত হওয়ার পেছনে যেমন জিনের ভূমিকা আছে, তেমনি তার দেহে আছে ক্যান্সার প্রতিরোধক জিনেরও অস্তিত্ব। তার ক্যান্সার হবে কি না তা নির্ভর করছে কোন জিনটা সুইচ অন করা আর কোনটা সুইচ অফ করা। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, এই সুইচ অন/ অফ ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, সুস্থ জীবনদৃষ্টি এবং অবশ্যই মেডিটেশনের মতো নিয়ামকগুলো দিয়ে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বেনসন-হেনরি ইনস্টিটিউট ফর মাইন্ড-বডি মেডিসিন এক গবেষণায় ১৯ জন স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়ে দেখেছে, তাদের দেহের ১০০০ এর বেশি স্ট্রেস জিন সুইচ অফ হয়ে গেছে নিয়মিত মেডিটেশন করে। এরা দীর্ঘদিন ধরে মেডিটেশন করছিলেন। অন্যদিকে যারা মেডিটেশন করে না, তাদের দেহে দেখা গেছে এর দ্বিগুণেরও বেশি স্ট্রেস জিনের উপস্থিতি। আর স্ট্রেস জিনের উপস্থিতি মানেই ব্যথা-বেদনা, উচ্চ রক্তচাপসহ অন্যান্য শারীরিক সমস্যা।

মজার ব্যাপার হলো-যারা মেডিটেশন করে না, তাদের মেডিটেশন শেখানো এবং আট সপ্তাহ ধরে মেডিটেশন করানোর পর দেখা গেছে, তাদের দেহের ৪৩৩টি স্ট্রেস জিন সুইচ অফ হয়ে গেছে।

ডা. ডীন অরনিশ পরিচালিত আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে-মেডিটেশন ক্যান্সার অনুঘটক জিনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় আছে এমন পুরুষদের নিয়মিত মেডিটেশন করিয়ে দেখা গেছে, তাদের দেহের প্রায় ৫০০ জিনের আচরণ বদলে গেছে। ক্ষতিকর জিনগুলো দমে গেছে, উপকারী জিনগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কাজেই আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের ক্ষেত্রেও যেখানে জেনেটিক প্রভাবকে মেডিটেশন নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে

সেখানে স্নায়বিক সমস্যায়ও এটি কার্যকরী হবে। আপনি নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করুন। শিথিল প্রক্রিয়ায় মেডিটেশন করুন। ছয় মাস পর আপনি নিজেই বুঝবেন আপনার পরিবর্তন।

প্রশ্ন : রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশন কীভাবে কাজ করে? এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত কি না?

উত্তর : নিরাময় ও সুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের যে সরাসরি ভূমিকা রয়েছে তা এখন সারা বিশ্বেই স্বীকৃত। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, শতকরা ৭৫ ভাগ রোগের কারণই মনোদৈহিক। অর্থাৎ রোগের লক্ষণ দেহে প্রকাশ পেলেও এর উৎস হচ্ছে মন। আর বাকি ২৫ ভাগ রোগের কারণ জীবাণু সংক্রমণ, ভুল খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম না করা এবং দৈহিক আঘাত, ওষুধ ও অপারেশনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

তাই শতকরা ৭৫ ভাগ রোগ নিরাময় হতে পারে শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মধ্য দিয়েই। আর সুস্থতার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনচেতনা পরিবর্তনের সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে মেডিটেশন।

১৯৮৭ সালে গবেষক ডা. ডেভিড ওরমে জনসন এক ব্যাপক নিরীক্ষা চালান। তার পরিসংখ্যানে দেখা যায়, যারা মেডিটেশন করেন, তাদের ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বয়স অনুপাতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে যাওয়ার পরিমাণ হচ্ছে শিশু-কিশোর (০-১৯ বছর) ৪৬.৮ ভাগ কম। যুবক (১৯-৩৯) ৫৪.৭ ভাগ কম। বয়স্ক (৪০-এর ওপরে) ৭৩.৭ ভাগ কম।

এ পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, মেডিটেশনে মনোদৈহিক স্বাস্থ্যের কী পরিমাণ উন্নতি হয়। একজন মধ্যবয়সী মেডিটেশনকারী যে সময়ে একবার ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন, ঠিক একই সময়ে যিনি মেডিটেশন করেন না, তিনি শরণাপন্ন হবেন ৪ বার।

ড. জন কাবাত জিন এবং ডা. রিচার্ড ডেভিডসন এক পরীক্ষায় দেখেছেন, যারা মেডিটেশন করেন তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে বেশি। মেডিটেশন করেন না এবং নতুন মেডিটেশন শিখেছেন এমন দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ফ্লু'র জীবাণু সংক্রমিত করে দেখা গেছে, যারা মেডিটেশন করেছেন তাদের রক্তে এ সংক্রমণের চার সপ্তাহ এমনকি আট সপ্তাহ পরেও এন্টিবডি'র মাত্রা ছিলো বেশি।

আমেরিকায় জীবন সংহারক মারাত্মক দুটি ব্যাধি হচ্ছে হৃদরোগ এবং ক্যান্সার। ড. জনসনের সমীক্ষায় দেখা যায়, যারা মেডিটেশন করেন তাদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক অনেক কম। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির পরিমাণ হচ্ছে ৮৭.৩ শতাংশ কম। ক্যান্সার বা টিউমারের ক্ষেত্রেও এ পরিমাণ ৫৫.৪ শতাংশ কম।

ডাক্তারি ওষুধ বা প্রচলিত রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত কেউ এ সাফল্য দেখে নি। কোনো কোলেস্টেরল হ্রাসকারী ওষুধ যদি হার্ট এটাকের আশঙ্কা ৫০ শতাংশ হ্রাস করতে সক্ষম হতো, তাহলে তা সারা বিশ্বব্যাপী সংবাদ শিরোনামে পরিণত হতো।

পঞ্চাশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে গবেষণা চালানোর পরও সেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর হার অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে। কিন্তু খোদ যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত পরিসংখ্যান থেকেই আমরা দেখতে পাই—মেডিটেশনের মাধ্যমে মেডিটেশনকারীদের হৃদরোগ বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কতটা কমানো যায়। শুধু তা-ই নয়, ডা. কার্ল সিমন্টন এবং ডা. বার্নি সীজেল প্রচলিত চিকিৎসার সাথে মেডিটেশনের টেকনিক প্রয়োগ করে শত শত ক্যান্সার রোগীকে নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৯৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সকল ক্রনিক ব্যথা নিরাময়ে শিথিলায়নকে চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দিন দিন সেখানে মেডিটেশনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

১৯৭৫ সালে সাত শতাংশ আমেরিকান শিথিলায়ন চর্চা করতো। এখন ভালো থাকার জন্যে শিথিলায়ন চর্চা করে ৩৩ শতাংশ মানুষ।’ ... ‘যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ শতাংশ ডাক্তার এখন রোগীদের শিথিলায়ন ও মনোদৈহিক নিরাময় প্রক্রিয়ার পরামর্শ দেন।’

প্রফেসর ডা. হার্বার্ট বেনসন। হার্ভার্ডের মাইন্ড-বডি মেডিকেল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। মেডিটেশনের নিরাময় ক্ষমতা নিয়ে যিনি গত ৫০ বছর ধরে গবেষণা করেছেন। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী The Relaxation Response.

এই বইয়ের ২৫ বছরপূর্তি সংস্করণের ভূমিকায় ২০০০ সালে ডা. বেনসন বলেন, আমরা বিগত বছরগুলোয় হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছি। দেখেছি—মেডিটেশন, ব্যায়াম ও বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে মনোদৈহিক ব্যাধিগুলোর উপশম বা পূর্ণ নিরাময় হতে পারে।

ডা. বেনসন দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আলসার, স্কিন এলার্জি, ব্রঙ্কিয়াল এজমা, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, সাইনুসাইটিস, আর্থ্রাইটিস, ব্যাকপেইন, স্পন্ডিলাইটিসসহ সব ধরনের ব্যথা এবং ক্যান্সার ও এইডসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্তিতে মনোদৈহিক নিরাময় প্রক্রিয়া অত্যন্ত কার্যকর। সেইসাথে দুশ্চিন্তা, অবসাদ, অনিদ্রা, হাইপারটেনশন ও নার্ভাসনেস থেকে মুক্তি পাবার পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক পন্থা হলো মেডিটেশন।

২০০৩ সালের এপ্রিলে আমেরিকান ইউরোলজিকেল সমিতির সম্মেলনে ডা. ডীন অরনিশ তার সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করেন, মেডিটেশন প্রোস্টেট ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আরেকটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে মহিলারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন এবং রোগ নিরাময়ে মনছবির প্রয়োগ করেন তাদের স্তন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম। হেলথ ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে সমস্যায় ভুগতেন এমন মহিলাদের ওপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, পাঁচ মাস নিয়মিত মেডিটেশন করার পর তাদের সমস্যা কমে গেছে শতকরা পাঁচ ভাগ।

শারীরিক রোগের পাশাপাশি মানসিক রোগেও মেডিটেশনের ভূমিকা খুবই কার্যকরী। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির জন টিসডেল ক্রনিক বিষণ্ণতায় ভোগা রোগীদের ওপর মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন, এদের মধ্যে পুনরায় বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার হার অর্ধেক কমেছে। মানসিক চাপ কমাতে ওষুধ খেতেন—এমন এক রোগী বলেন ‘এ এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। কারণ দুবছর আগে মেডিটেশন শেখার আগ পর্যন্ত জীবনে আমি কখনো ওষুধ ছাড়া থাকি নি। আমি মনে করি বিষণ্ণতা বা টেনশনের জন্যে কোনো ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই।’

২০ বছর আগে এ বিশ্বাস নিয়েই কোয়ান্টাম ডাক দিয়েছিলো—আসুন, দৃষ্টিভঙ্গি বদলান। মেডিটেশন করুন—মনের অফুরন্ত শক্তিকে, মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলুন। শোক বলে কিছু থাকবে না। অশান্তি বলে কিছু থাকবে না। ৭৫ ভাগ রোগ ভালো হয়ে যাবে কোনোরকম ওষুধ ছাড়াই।

দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হতে সময় লাগে নি। প্রথম ব্যাচ থেকেই একের পর এক সাফল্য। মাইগ্রেন নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু মাইগ্রেনকে আর বাসায় ফেরত নিতে পারেন নি। মাইগ্রেন উধাও হয়ে গেছে ক্লাসরুম থেকেই। দুটি ক্রাচ নিয়ে কোনোরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিলেন, ক্রাচ ছাড়াই হেঁটে গিয়েছেন। হুইল চেয়ারে করে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, কোনোদিন আর

হাঁটতে পারবেন না। ক্লাসের দ্বিতীয় দিন কারো সাহায্য ছাড়াই হেঁটেছেন। ডাক্তার বারণ করে দিয়েছেন—কোনোদিন রুঁকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন না, চলাফেরা করবেন না, এমনকি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন না—ক্লাস শেষে তিনি এখন রুঁকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, পাহাড়ে উঠছেন অবলীলায়, যেন তার কোনোদিন কোনো অসুবিধাই ছিলো না। কোয়ান্টাম চর্চা করে দীর্ঘদিন পর রুঁকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছেন, এমন নারী-পুরুষের সংখ্যা অগুনতি।

বছরের পর বছর ঘুমান নি, এমনকি ওষুধ খেয়েও ঘুমাতে পারতেন না, ক্লাস থেকে বাসায় গিয়েই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। কিশোরী মেয়ে—যে পোকা দেখলেই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো—তিন মাস না যেতেই সে যেকোনো পোকা ধরে মজা করতে শুরু করেছে।

মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে ঘরের বাইরে বেরতে যিনি চাইতেন না, তিনি দিব্যি বিদেশও ঘুরে এসেছেন একা একা। ডাক্তার বলেছিলেন, এসি রুঁমে চার দিন থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত—ইনহেলারেও কাজ হবে না, সেই মানুষটি ক্লাসরুম থেকে বেরলেন এজমামুক্ত হয়ে। আর কখনো ইনহেলার ব্যবহার করতে হয় নি। ফ্রোজেন শোল্ডার। হাত ওঠাতে পারেন না, বিদেশে চিকিৎসা করিয়েও কোনো কাজ হয় নি। ক্লাসের মধ্যেই পুরো হাত ওপরে উঠিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। ১৫/২০/৩০ বছরের ব্যাকপেইন ক্লাসেই উধাও হয়ে গেল। ডাক্তার বলেছিলেন, ইমিডিয়েট বাইপাস সার্জারি করতে হবে। কোর্সে অংশ নিলেন। তারপর কেটে গেছে বহু বছর। এখনো বাইপাস ছাড়াই দিব্যি স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করছেন।

কোয়ান্টামের শুরুতে যা ছিলো আমাদের বিশ্বাস, কোর্সের রোগমুক্তির হাজার হাজার উদাহরণে তা পরিণত হয়েছে বাস্তবতায়। আর আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার স্বর্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের ডা. বেনসন, ডা. কাবাত জিন, ডা. কার্ল সিমন্টন, ডা. রিচার্ড ডেভিডসন, ডা. ডেভিড ওরমে জনসন, ডা. জন রবিন্স, ডা. বার্নি সীজেল, ডা. ডীন অরনিশ প্রমুখের গবেষণায় আমাদের বিশ্বাসই পরিণত হয়েছে পরীক্ষিত বিজ্ঞানে।

এসব কারণেই বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মেডিকেল টেক্সটবই Merck Manual of Diagnosis and Therapy, Hurst's The Heart বা Braunwald's Heart Disease : A Textbook of Cardiovascular Medicine ইত্যাদিতে এখন মেডিটেশনকে প্রেসক্রাইব করার কথা শেখানো হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের।

পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করে আমরা বলতে পারি, বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে যারা কোর্সে এসেছেন এবং নিয়মিত অনুশীলন করেছেন তারা প্রত্যেকে আগের চেয়ে সুস্থ আছেন।

প্রশ্ন : হৃদরোগ নিরাময়ে কি মেডিটেশনের ভূমিকা আছে?

উত্তর : ডাক্তারদের একসময় ধারণা ছিলো, একবার যদি আর্টারি ব্লকড হওয়া শুরু করে তাহলে এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস ছাড়া কোনো উপায় নাই। প্রথম এই ধারণা ভেঙে দেন ডা. ডীন অরনিশ। তিনি সানফ্রান্সিসকোর কার্ডিওলজিস্ট। ১৯৮৬ সালে ৪০ জন হৃদরোগী নিয়ে তিনি গবেষণা করলেন। কোনো ওষুধ নয়, এনজিওপ্লাস্টি নয়, বাইপাস নয়-মেডিটেশন, যোগব্যায়াম, লো-কোলেস্টেরল ডায়েট এবং কাউন্সেলিং।

এক বছর পরে ভালো হয়ে গেলেন সবাই। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠার খবর ছিলো এটি। ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো ২০০ রোগীকে উদ্ধৃত্ত করলো ডীন অরনিশের প্রোগ্রামে যেতে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে হৃদরোগ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান কিলার ডিজিস। এত হাইটেক/ উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা, তারপরও শতকরা ৫০ জন মারা যায় হৃদরোগে।

এদিকে এনজিওপ্লাস্টি/ বাইপাস করলে যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আবারো আর্টারি ব্লকড হতে পারে। এবং যুক্তরাষ্ট্রে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল চিকিৎসা। ১৯৯৩ সালেই ছিলো ১৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার ডলার। তারা উদ্ধৃত্ত করলো-ডীন অরনিশের প্রোগ্রামে যাও। রোগীরা বললো, যদি ভালো না হই? তারা বললো, যদি ভালো না হও অপারেশন করাবো, পয়সা আমরা দেবো।

২০০ জনের মধ্যে ১৯০ জন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখলেন। আর ১৯০ জনের মধ্যে ১৮৯ জন ভালো হয়ে গেলেন। একজনকে শুধু অপারেশন করার প্রয়োজন হয়েছিলো। এটি নিউজউইক জুলাই ২৪, ১৯৯৫ সংখ্যার রিপোর্ট। হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনকে আর বিকল্প চিকিৎসা বলা হয় না। এটি চিকিৎসার মূলধারায় প্রবেশ করেছে।

সে কারণেই বিশ্বজুড়ে কার্ডিওলজির মেডিকেল টেক্সটবুকগুলোতে মিলছে তারই স্বীকৃতি। 'Heart Disease : A Textbook of Cardiovascular Medicine'- Eugene MD-Braunwald's-এর লেখা এ বইটি বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ হৃদরোগ চিকিৎসা শিক্ষার্থীর নিত্যদিনের পাঠ্যবই। এই বইয়ের ৮ম

সংস্করণের পৃষ্ঠা ১১৫৭-তে বলা হয়েছে, ‘মেডিটেশন, যোগব্যায়াম এবং দমচর্চার এক সমন্বিত পদ্ধতিতে স্ট্রেসমুক্তি বা ব্যথা নিরাময়ের উপকরণ আছে মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন পদ্ধতিতে।

অনেকগুলো গবেষণার ফলাফলের একটা মেটা এনালিসিসে দেখা গেছে মেডিটেশন চর্চা করে বহু মানুষ স্ট্রেস থেকে, অনেক ধরনের রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছেন.... শুধু ব্লাডপ্রেশার কমানো নয়, দেহে ইনসুলিনের মাত্রাকে স্বাভাবিক করা এবং হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে মেডিটেশনের চমৎকার ফলাফল দেখা গেছে।’

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত গবেষক এবং বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সংকলিত আরেকটি টেক্সট বই হলো Hurst’s The Heart. এ বইয়ের ১২ তম সংস্করণে বলা হয়েছে, ‘মেডিটেশন চর্চা করে অনেকেই তাদের জীবনে প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য এবং ভালো থাকার অনুভূতি লাভ করেছেন। এমনকি এনজাইনা নামক যে ভীতিকর বুকে ব্যথা বহু হৃদরোগীর দৈনন্দিন আতঙ্কের বিষয়, তা থেকেও মুক্তি মিলেছে মেডিটেশন চর্চা করে। শুধু তা-ই নয়, এথেরোরিথ্রেশনের মতো অসাধারণ ফলও পাওয়া গেছে এর মাধ্যমে। ফলে এখন শুধু হৃদরোগ প্রতিরোধই নয়, হৃদরোগ নিরাময়ের জন্যেও মেডিটেশন একটি পরীক্ষিত এবং স্বীকৃত পদ্ধতি।’

কাজেই সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন কার্ডিওলজির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমেরই একটি অংশ হবে-কীভাবে মেডিটেশন করতে হয়, তা নিজে শেখা ও রোগীদেরকে শেখানো।

কোয়ান্টামে এসেও গত ২০ বছরে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও তা থেকে নিরাময় লাভ করেছেন শত শত মানুষ। বাইপাস অপারেশন না করিয়েও দিব্যি ভালো আছেন ১৮ বছর ধরে। আর অপারেশন করার পর এলেও তারা ফিরে পেয়েছেন কর্মোদ্দীপনাময় স্বচ্ছন্দ জীবন। গড়ে উঠেছে এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়া হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় প্রকল্প ‘কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব’। দুদিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশনের পর এ ক্লাবের নিয়মিত ফলোআপ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়ে শত শত মানুষ এখন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত দীর্ঘজীবনের মন্ত্রে উজ্জীবিত।

প্রশ্ন : আমি একজন ছাত্র। অনেক পড়াশোনা করেও পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হয় না। আমার ক্ষেত্রে কি মেডিটেশন বা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স কোনোভাবে সহায়ক হবে?

উত্তর : আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মনোযোগকে সুচাখ্র করে নিজের মস্তিষ্কে ঠান্ডা রেখে একে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহার করে জীবনকে বদলানোর প্রক্রিয়াই কোয়ান্টাম। কোয়ান্টাম মেথডকে কাজে লাগিয়ে একজন গৃহিণী যেমন উপকৃত হতে পারেন, তেমনি উপকৃত হতে পারেন একজন চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী; একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যেমন ইবাদত-উপাসনায় একাত্ম হতে পারেন, একজন শিক্ষার্থীও পারেন তার শিক্ষাজীবনে প্রথম হতে, সফল হতে। আসলে ভালো রেজাল্ট করার জন্যে প্রথম প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস যে, আমিও পারবো।

সাধারণভাবে আমরা মনে করি-ক্লাসে ১ম হওয়ার জন্যে জিনিয়াস হতে হবে বা অসাধারণ মেধাবী হতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ভালো রেজাল্টের জন্যে জিনিয়াসনেস বা অতি মেধা নয়, দরকার হলো বিশেষ কিছু নিয়মে লেখাপড়া, কিছু কৌশল অনুসরণ, ধারাবাহিকতা এবং পরিশ্রমনির্ভরতা। যেমন, খরগোশ-কচ্ছপের গল্পে আমরা দেখি-খরগোশ কিন্তু তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কচ্ছপের কাছে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিলো।

কারণ সে কৌশল প্রয়োগ করে নি, লেগে থাকে নি, বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয় নি এবং পরিশ্রম করতে চায় নি। তেমনি জিনিয়াস বা মেধাবীরা তাদের জিনিয়াসনেসের গর্বে অনেক সময়ই ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। তারা মনে করে পরীক্ষার আগের রাতে পড়লেই হবে। এভাবে হয়তো একবার/দুবার ভালো করা যেতে পারে কিন্তু সবসময় নয়। অন্যদিকে একজন সাধারণ মেধার শিক্ষার্থী জানে যে, শুধু পরীক্ষার আগের রাত পড়ে সে পারবে না, তাকে পরিশ্রম করতে হবে ক্লাসের প্রথম দিন থেকেই। ফলে দেখা যায়, জিনিয়াসদের তুলনায় ভালো রেজাল্ট করছে সাধারণ মেধার শিক্ষার্থীরাই।

কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে আর সব অংশগ্রহণকারীর মতো একজন শিক্ষার্থীও প্রথম অর্জন এই আত্মবিশ্বাস যে, সে যে মেধারই হোক না কেন, ক্লাসে প্রথম তার পক্ষেও হওয়া সম্ভব। আর সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন তার মস্তিষ্কের ক্ষমতাকে করে আরো শাণিত। সৃষ্টি করে সুচাখ্র মনোযোগ, বাড়ায় স্মৃতিশক্তি।

শিক্ষায় সাফল্যের জন্যে আরেকটি প্রয়োজন হলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। যিনি যত সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন, তিনি তত এগিয়ে যেতে পারবেন লক্ষ্যের পথে। আর মেডিটেশনের গভীর আত্মনিমগ্নতার মধ্যেই একজন মানুষ বুঝতে পারে তার সঠিক মেধা ও সম্ভাবনা কী। ফলে কোর্সে অংশ নিয়ে একজন শিক্ষার্থী যেমন তার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন, তেমনি

শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন, কাউন্সেলিং ইত্যাদির মাধ্যমে পাচ্ছেন সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। ফলে গত ২০ বছরে কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করে সাধারণ মেধার হাজার হাজার শিক্ষার্থী অস্থিরতা, জড়তা, পরীক্ষাভীতি ও হীনম্মন্যতা দূর করে দেশে-বিদেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথডের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : কোয়ান্টাম মেথড বাংলাভাষায় আধুনিক মানুষের উপযোগী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের বিজ্ঞান। কোয়ান্টাম মেথড যেহেতু পুরোপুরি বাংলাভাষায় এজন্যে বোঝা খুব সহজ।

কোয়ান্টাম মেথডের প্রতিটি টেকনিক খুব সহজ। যে কারণে ১২ বছরের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে ৮২ বছরের তরুণ-তরুণী যে কেউ এ কার্যক্রম থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারেন।

এজন্যে বিশেষ কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার নেই, বাংলা বুঝলে হলো আর চেয়ারে বসতে পারলে হলো। ব্যস, আর কিছু দরকার নেই। এই মেডিটেশন কোর্সে কোনো ধরনের ব্যায়াম করার প্রয়োজন হয় না। ক্লাসরুমের চেয়ারে বসেই আপনি আলোচনা শুনবেন এবং মেডিটেশন করতে পারবেন।

আপনি যেকোনো ধর্ম দর্শন বা মতবাদ অনুসারী হোন, কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে যেভাবে উপকৃত হতে চান, হতে পারবেন। আপনার ধর্মবিশ্বাস বা দর্শনবিশ্বাস এটা থেকে উপকারের পথে কোনো অন্তরায় নয়। কোয়ান্টাম সব ধর্মের, সব মানুষের।

চর্চার সুবিধার জন্যে সারাদেশে কোয়ান্টাম মেথডের সেন্টার-শাখা-সেল রয়েছে। রয়েছে ক্যাসেট-সিডি-বই, নিয়মিত ওয়ার্কশপ, আলোচনার ব্যবস্থা। প্রতি সপ্তাহে আলোকায়ন, সাদাকায়ন কার্যক্রম রয়েছে। অর্থাৎ মেডিটেশন শেখার পরে চর্চার যতরকম সুযোগ প্রয়োজন সারাদেশে তা রয়েছে।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড কোর্স চার দিনের। চার দিনে কি শেখা সম্ভব?

উত্তর : অবশ্যই সম্ভব। অসংখ্য মানুষ ইতোমধ্যেই তা সম্ভব করেছেন। সহজ ও কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পরেই

হয় মেডিটেশন। মেডিটেশন চলাকালে প্রশিক্ষকের ধ্যানশক্তি-তরঙ্গের প্রভাবে অংশগ্রহণকারীরা সহজে মেডিটেটিভ লেভেলে পৌঁছে যান। তৈরি হয় কোয়ান্টাম চেতনা বলয়। জ্ঞান তখন শুধু শব্দ দ্বারা বাহিত হয় না, জ্ঞান ও অনুভব তখন সঙ্গরিত হয় মন থেকে মনে। কোয়ান্টাম কোর্সে মন থেকে মনে অনুভব সঙ্গরণ ও মনের গভীরে নিমগ্ন হওয়ার পরিমাণ এত ব্যাপক যে, প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেরাই বিস্মিত হন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড দেশজ কোর্স। বিদেশি কোর্সের তুলনায় এর অবস্থান কোথায়।

উত্তর : আসলে বিদেশি শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আমাদের একটি ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা যেহেতু ২০০ বছর ইংরেজদের গোলাম ছিলাম, আমরা এখনো কাপড় কাচার সাবানকে বলি বাংলা সাবান, গায়ে মাখার সাবানকে বলি বিলাতি সাবান। অর্থাৎ কোয়ালিটি ভালো হলে বিলাতি, আর কোয়ালিটি খারাপ হলে তা দেশি।

আমাদের কারো কারো মনের অবস্থা হচ্ছে স্বদেশী ঠাকুরের চেয়ে বিদেশি কুকুরকে আমরা বেশি পূজনীয় মনে করি। ঠাকুর তাতে কী, এটা তো দেশি। কুকুর তাতে কী, এটা তো বিদেশি। আমরা পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করি যে, ধ্যান এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ইউরোপ এবং আমেরিকান পদ্ধতিগুলো আমাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। এটা আমাদের দাবি নয়। পরীক্ষিত সত্য।

২৮ এপ্রিল, ১৯৯০ নিউ সায়েন্টিস্ট সাময়িকীর এক রিপোর্টে বলা হয়, আমেরিকার ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয় ১০০টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করে যে, কোন প্রক্রিয়ায়, কোন মেথডে শিথিলায়ন ভালো হয়। প্রাচ্যের পদ্ধতিতে না পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে? ১০০টি রিপোর্টে বলা হয় যে, পাশ্চাত্যের যেকোনো পদ্ধতির চেয়ে প্রাচ্যের পদ্ধতি দ্বিগুণেরও বেশি কার্যকরী এবং কোয়ান্টাম মেথড হচ্ছে আমাদের প্রাচ্যের লেটেস্ট পদ্ধতি। অতএব আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান-যেকোনো মেথডের চেয়ে আমাদের পদ্ধতি দ্বিগুণ বেশি কার্যকরী।

প্রশ্ন : আমার তো কোনো সমস্যা নাই, রোগ নাই, আমি তো ভালোই আছি। আমি কেন মেডিটেশন করবো?

উত্তর : শুধু সমস্যা থাকলেই মেডিটেশন করতে হয়—এটা একটা ভুল ধারণা। বরং আসলে সফল মানুষরা মেডিটেশন করেন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিল্পপতিরা মেডিটেশন করেন। রাষ্ট্রনায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রশাসকরা, পেন্টাগনের জেনারেলরা করেন। কেন করেন? প্রশান্তির জন্যে, মস্তিষ্কে আরো বেশি ব্যবহার করার জন্যে।

আমরা আজ থেকে ২০ বছর আগে, ১৯৯৩ সালে বলেছি যে, মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান, মেডিটেশন হচ্ছে সায়েন্স। এটা কোনো ভোজবাজি নয়, অলৌকিক কিছু নয়। কারণ অলৌকিকত্ব এবং বিজ্ঞানের মধ্যে তফাত হচ্ছে অলৌকিক কিছুকে রিপিট করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের যেকোনো জিনিসকে রিপিট করা যায়। মেডিটেশনকে আমরা বিজ্ঞান বললাম ১৯৯৩ সালে, আর ২০০৩ সালে টাইম ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ নিবন্ধ করলো, The Science of meditation অর্থাৎ মেডিটেশনের বিজ্ঞান।

এ নিবন্ধে বলা হয়েছে, ‘এক কোটি আমেরিকান এখন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করেন। নব্বই দশকের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। ব্যস্ত অফিস এন্ট্রিকিউটিভের এ যুগে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে দলে দলে আমেরিকানরা এখন ঝুকছেন মেডিটেশনের দিকে। যার প্রমাণ মেডিটেশনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে এখন বিপুল সংখ্যায় মূলধারার জনগণের উপস্থিতি। দিন দিন মেডিটেশনের জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, মেডিটেশন অবিশ্বাসীরাই এখন সেখানে সংখ্যালঘু। মেডিটেশনের এই ব্যাপক বিস্তৃতির কারণ হলো, রহস্যের আবরণ থেকে বেরিয়ে মেডিটেশনের প্রক্রিয়া এখন অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ। সেই সাথে রয়েছে মেডিটেশনের ওপর পরিচালিত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিবাচক ফল।’

মূলধারার জনগণের পাশাপাশি মেডিটেশনকারীদের দলে নাম লিখিয়েছেন বিখ্যাতরাও। এদের মধ্যে আছেন ফোর্ড মটরসের প্রধান ধনকুবের বিল ফোর্ড, সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর দম্পতি, বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন এবং হলিউডের নামি-দামি সব শোবিজ তারকা। তাদের তো অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা কোনোকিছুর অভাব নেই। তারপরও কেন মেডিটেশন করেন। প্রশান্তির জন্যে। এই ব্রেনটাকে আরো সুন্দরভাবে, আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্যে, আরো সফল হওয়ার জন্যে।

পিছিয়ে নেই আমাদের দেশের সফলরাও। গত দুদশক ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছেন দেশের বরণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মবেত্তা, কবি, লেখক, শিল্পীসহ সফল ব্যবসায়ী, সমাজপতি

ও শোবিজ স্টার। পাশ্চাত্যের খ্যাতিমানদের মতো তারাও মেডিটেশন করছেন প্রশান্তির জন্যে, সফল হওয়ার জন্যে।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে জীবন্ত কিংবদন্তীর নাম। ৮৫ বছর বয়সেও ঈর্ষণীয় কর্মক্ষমতার অধিকারী এই মানুষটি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশ নেন।

চারটি দিন ৪০ ঘণ্টার পুরোটা সময় এত নিবিষ্টচিত্তে কেন তিনি কোর্সে ছিলেন সেকথা বলতে গিয়ে বলেন, ‘আসলে শেখার কোনো শেষ নেই। নেই কোনো বয়স। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন মানুষ শিখতে পারে। হলভর্তি এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে টানা চার দিন শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে গুরুজী যেভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন—এটি সত্যিই আমার খুব অবাক লাগছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—চিকিৎসাবিজ্ঞানের মানুষ বলে আমি জানি, আমাদের মস্তিষ্কে যে লক্ষ কোটি নিউরোন রয়েছে, তার অধিকাংশই আমরা ব্যবহার করি না। কিন্তু এগুলোকে কীভাবে উজ্জীবিত করতে হয়, কাজে লাগাতে হয়, গুরুজী তা চমৎকার বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমি বলবো, সব ধরনের নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে একজন ইতিবাচক মানুষ হয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা রয়েছে কোয়ান্টামে।”

শুধু কোর্সই নয়, বছরখানেক পর ৩৪৩ ব্যাচে তিনি কোর্সটি রিপিটও করেন পুরো ৪ দিন। ডা. এম আর খানের মতো একজন কর্মব্যস্ত জাতীয় ব্যক্তিত্ব যখন ৪ দিন সময় করতে পারেন, তখন একজন সফল মানুষ কেন মেডিটেশন করবে, কেন কোর্স করবে সে প্রশ্ন বোধ হয় আর থাকে না।

কোর্স করতে চাচ্ছি করতে পারছি না

প্রশ্ন : নানারকম সমস্যা জর্জরিত হয়ে ১৯৯৫ থেকে মেডিটেশন কোর্স করার ইচ্ছে ছিলো। আজও কোর্স করতে পারি নি। আমার অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয় নি। এটাই হয়তো আমার ভাগ্য।

উত্তর : আপনি ১৯৯৫ থেকে কোর্স করতে চাচ্ছেন। দেড় যুগেও করতে পারেন নি। তার মানে আপনার কোর্স করার ইচ্ছে কখনো প্রবল ছিলো না। কারণ ইচ্ছে প্রবল থাকলে দেড় যুগেও কোর্স করতে পারেন নি—এমনটি কখনো হতো না। কোর্স করার ব্যাপারে আপনার অবচেতনেই হয়তো কোনো

অনীহা বা দ্বিধা আছে। যে কারণে বাস্তবে আপনি কোর্স করতে পারছেন না। তাই ভেবে দেখুন এই দ্বিধাটা কী? উত্তরটা খুঁজে দেখুন, তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।

আপনার দ্বিধাটা কি কোর্স ফি নিয়ে? কেউ কেউ বলবেন যে, এত কোর্স ফি! ফি-র জন্যে অংশগ্রহণ করতে পারছি না।

ভুল ধারণা। আপনি নিয়ত করুন-ফি-র ব্যবস্থা কীভাবে হয়ে যাবে আপনি নিজেও টের পাবেন না। আমাদের কোর্সের ওপর স্রষ্টার রহমত রয়েছে। কোর্স করার জন্যে যিনি নিয়ত করেছেন তার ফি-র ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর এটা নিছক কোর্স ফি নয়-এ কোর্স করার মধ্য দিয়ে কোয়ান্টামের সাথে আপনি আজীবনের জন্যে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। অতএব এটা হচ্ছে ‘লাইফ লং এটাচমেন্ট’ বা ‘লাইফ লং মেম্বরশিপ ফি’ এবং ফাউন্ডেশন থেকে সারাজীবন আপনি মেডিটেশন সংক্রান্ত বা জীবনদৃষ্টির যেকোনো বিষয়ে সহায়তা পাচ্ছেন।

কোর্স না করাটা আপনার ভাগ্য বা নিয়তি নয়। এটা আপনার নেতিবাচকতার বৃত্ত। এ বৃত্ত ভাঙতে হবে।

আসলে প্রতিটি মানবশিশু অসীম শক্তি ও মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপরও পারিপার্শ্বিক প্রভাব, নেতিবাচক চিন্তার মনোজাগতিক শৃঙ্খল, ভ্রান্ত বিশ্বাসের বন্দি হয়ে আপনিও হয়তো ভাবছেন যে, এই দুঃখ আমার নিয়তি, এই অভাব আমার নিয়তি, এই ড্রাগ আমার নিয়তি, এই খারাপ রেজাল্ট আমার নিয়তি, এই রোগ আমার নিয়তি, এই মাইগ্রেন আমার নিয়তি, এই অশান্তি আমার নিয়তি বা এই অপমান-এটা আমার নিয়তি।

কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে-ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায়, দুঃখকে শক্তিতে রূপান্তরের এবং ব্যর্থতার দুষ্টচক্র ছিন্ন করার শক্তি স্রষ্টা আপনার মধ্যেই দিয়েছেন। কোয়ান্টাম মেথড এই শক্তিকেই জাগ্রত করার প্রক্রিয়া।

জীবনযাপনের এ বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার দুঃখকে শক্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, হতাশাকে প্রশান্তিতে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে করা হয় এমন অনেক কিছুকেই সম্ভব করতে পারবেন। কাজেই কোর্সের জন্যে এটা খরচ নয়, বিনিয়োগ। অতএব নিয়ত বা অভিপ্রায়কে প্রবল করুন। আপনার কোর্স করা হবে। বদলেও যাবেন আপনি।

অন্যকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করা

প্রশ্ন : মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের কীভাবে কোয়ান্টামে নিয়ে আসবো? কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবো। তাদের মেডিটেশনের প্রাথমিক ধাপগুলো কী?

উত্তর : আগে আপনার মধ্যে পরিবর্তন আসতে হবে। যখন অন্যরা আপনার মধ্যে পরিবর্তন দেখবে, অন্য ছেলে-মেয়েদের চেয়ে আপনাকে আলাদা দেখবে এমনিতেই তাদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হবে যে, আরে! এ-তো আগের মতো চিৎকার রাগারাগি করছে না। পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছে। রুটিনমতো চলছে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করছে। বাসার কাজে সাহায্য করছে। অর্থাৎ যে গুণগুলো মা-বাবা সন্তানদের মধ্যে দেখতে চান সেগুলো যখন দেখবেন, তারা এমনিই উদ্বুদ্ধ হবেন।

আমরা খুব সৌভাগ্যবান যে, ফাউন্ডেশনে আমরা দেখেছি ৪০% ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা সিনিয়র গ্রাজুয়েট, মা-বাবারা জুনিয়র গ্রাজুয়েট। অর্থাৎ সন্তান আগে কোর্স করেছে। তারপর মা-বাবাকে নিয়ে এসেছে।

কারণ নতুন বিষয়ের প্রতি বয়স্কদের চেয়ে তরুণদের আগ্রহ থাকে বেশি। অনেক সময় সন্তানরা মা-বাবাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, কোয়ান্টামে আসা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তারা বেয়াদবি করে নি। ধৈর্য ধরেছে, স্থান কাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করেছে। এমন হয়েছে, মা মনে করেছেন যে, ছেলে বোধ হয় কোর্স করে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তাই কোয়ান্টামের প্রতি ঘৃণা জন্মাবার উদ্দেশ্যে মা তাকে বাধ্য করেছেন তার গ্রাজুয়েট আইডি কার্ডে খুতু দিতে, পা দিয়ে মাড়াতে এবং শেষমেশ আমার ছবি ছিঁড়ে ফেলতে।

ছেলেটি যখন আমার কাছে এসব কথা বললো, তাকে বললাম, তুমি তোমার মায়ের সামনে তিনি যা যা বলছেন সবই করবে। তারপর জিজ্ঞেস করবে, মা তোমার সামনে তো খুতু দিলাম, পা দিয়ে মাড়িলাম। কিন্তু আমার মনের ভেতরে যে ছবি আছে সেটাকে কী করবো?

এই মা পরে কোর্স করেছেন। দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন। খানিকটা সংকুচিত ছিলেন আমি সব জানি বলে। কিন্তু আমরা বলেছি, না জেনে তিনি যা করেছেন সন্তানের কল্যাণচিন্তায় উদ্ভিন্ন হয়ে যেকোনো মা-ই তা করবেন। তিনি তখন বলেছেন, কোর্স করে তার ভুল তো ভেঙেছেই, তিনি এখন নিশ্চিত যে, তার ছেলে এত ভালো একটি সম্মুখে আছে

যেখানে তরুণ প্রজন্মকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। তিনি বলছিলেন তার ছেলের পরিবর্তনের কথা। একসময়কার বদমেজাজী ছেলে কতটা বদলে গেলে মায়ের এত অযৌক্তিক আচরণেও কোনোদিন ক্ষিপ্ত হয়ে যায় নি। যে ছেলেকে আগে পানিটা পর্যন্ত ঢেলে দিতে হতো সেই ছেলে এখন উল্টো মাকে পানি এগিয়ে দেয়।

কাজেই মা-বাবাকে প্রভাবিত করার জন্যে আর কিছু লাগবে না। শুধু নিজেকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি ভালো ছেলে বা মেয়ে হয়েছেন। মা-বাবা বিস্মিত হবেন, তারপর নিজেরাই আত্মপ্রকাশ করবেন কোর্সে আসার জন্যে।

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী একা কোনো কাজ করতে পারে না। এমনকি তার ব্যক্তিগত কাজেও আমার সাহায্য চায়। তার সমস্ত মনোযোগ তার বাবা এবং ভাই-বোনের ওপর, আমার ওপর নয়। তাকে কোনো কিছু বুঝিয়ে করানো যায় না। যেমন কোয়ান্টাম কোর্সে তাকে আনতেই পারছি না। ফলে অভিমান বাড়ছে, কী করবো?

উত্তর : খুব সহজ। তাকে কোর্সের কথা বলবেন না। বরং আপনাকে কুশলী হতে হবে। তার মনোযোগ যদি তার ভাই-বোনের প্রতি হয়, তাহলে তাদের প্রতি মনোযোগ দিন। তাদেরকে কোর্সে উদ্বুদ্ধ করুন। তারা যখন কোর্স করে ফেলবে তখন আপনার স্ত্রীর আত্মপ্রকাশ এমনভাবেই সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সবসময় সরাসরি যাওয়া যায় না। যেমন সাধারণভাবে নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া যায় না, আরেকজনের মাধ্যমে পাঠাতে হয় এটাও সে রকম।

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধুকে কোর্স করাতে আত্মপ্রাণ চেষ্টা করেছে। টাকাও আমি দেবো বলেছি। তারপরও তাকে রাজী করাতে পারছি না।

উত্তর : এখানেই আপনি ভুল করছেন। যে কোর্স করতে চাচ্ছে না তাকে কোর্স করানোর জন্যে আত্মপ্রাণ চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর আপনার টাকা দিয়ে বন্ধুকে কোর্স করানোর কথা ভুলেও ভাববেন না। তাকে ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করুন। তার সমস্যাগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করুন। কোর্সে তার সমস্যা কীভাবে দূর হতে পারে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। আপনি মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে এনে বোঝাতে পারেন।

কিছুদিন পর দেখবেন সে নিজেই এসে বলছে। অর্থাৎ কোর্সের কথা বলতে হলে, বলার ভঙ্গিটা সবসময় এমন রাখবেন যাতে আরেকজন বুঝতে পারে যে, এটা তার কল্যাণের জন্যে।

প্রশ্ন : আমার দুই ছেলে-মেয়েকে গ্রাজুয়েট কোর্স করিয়েছি কিন্তু ওরা নিয়মিত মেডিটেশন করে না। মা হিসেবে কী করবো? আমার স্বামী কোর্স করে নি, করার ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। কী করবো?

উত্তর : এটা সাধারণত স্বামীদের সমস্যা। এটা আমাদের পর্যবেক্ষণ যে, স্বামী কোর্স করে স্ত্রীকে কোর্স করাতে ব্যর্থ হয়েছেন এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। কিন্তু স্ত্রী কোর্স করে গিয়ে স্বামীকে কোর্স করাতে ব্যর্থ হয়েছেন এরকম স্ত্রীর সংখ্যা খুব কম। আপনি পরিসংখ্যানগত দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে নিয়মিত বোঝান। তিনি বুঝবেন।

আর ছেলে-মেয়েকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, জোর নয়। এমনকি মেডিটেশন করতেও জোর করবেন না। বরং তাদেরকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান যে, তোমাদেরকে এত সুন্দর একটা টেকনিক শেখানো হলো। এখন চর্চা কর। তাহলে তোমাদের রেজাল্ট ভালো হবে। আর যেহেতু তারা কোর্স করেছে, কখনো না কখনো মেডিটেশনের প্রয়োজন তারা অনুভব করবে। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় যখন তারা কিছুটা চাপের মধ্যে থাকবে তখন মেডিটেশনের কথা বলতে পারেন। দেখবেন তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন : যারা কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না তারা যদি কোয়ান্টাম মেথড এবং এর কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তাদেরকে এক কথায় কী বলবো যেন তারা কোয়ান্টাম সম্পর্কে একটি সঠিক ও ইতিবাচক ধারণা পায়?

উত্তর : কোয়ান্টাম মেথড সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে কি না তা নির্ভর করবে কোয়ান্টাম যে জীবনদৃষ্টি আপনাকে দিয়েছে সেটা আপনি কতটা অনুসরণ করছেন। তার আলোকে আপনি নিজেকে কতটা বদলাতে পেরেছেন। যদি বদলাতে পারেন তাহলে আর আপনাকে বলতে হবে না। আপনাকে দেখেই তারা বুঝতে পারবে। আর কোয়ান্টাম সম্পর্কে বলতে গেলে এর আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজগুলো যে কারো সামনে তুলে ধরাই

যথেষ্ট। আর এক কথায় বলতে পারেন, কোয়ান্টাম হচ্ছে ভালো থাকা ও ভালো রাখার বিজ্ঞান। তাছাড়া তাকে আলোকায়ন, সাদাকায়ন অনুষ্ঠানে নিয়ে আসতে পারেন। ‘কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস’ স্মারক পড়তে দিতে পারেন। ‘কোয়ান্টাম বিশ্বাস ও বাস্তবতা’ এবং ‘আপনিও সুস্থ হতে পারেন’-এ দুটি ডিভিডি দেখতে দিতে পারেন।

কোর্স করার পর বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয়ের পরিবারের কয়েকজন কোর্স করেছেন। কিন্তু সে আত্মীয়কে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না। তিনি বলেন, সেবা তো ঘরে বসেই করা যায়। এর জন্যে কোয়ান্টামে যেতে হবে কেন?

উত্তর : এখন আর তাকে বাস্তবে বোঝাতে যাবেন না। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন। আর বাস্তব আলাপচারিতায় সচেতনভাবেই কোয়ান্টামের কোনো প্রসঙ্গ আনবেন না। এতে বরং কোয়ান্টাম সম্পর্কে তার কৌতূহল বাড়বে। যখন তার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হবে তখন তাকে বলুন যে, সম্ভবন্ধ না হলে বড় কোনো ভালো কাজ করা যায় না। এজন্যে কোয়ান্টামে যেতে হবে।

প্রশ্ন : আমি ২৫৭ তম ব্যাচের গ্রাজুয়েট। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আসার পর আমার জীবনটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। আমার পরিবারে আমিই প্রথম এই ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত হয়েছি। আমার এই পরিবর্তনে অনেকেই শঙ্কিত এবং অবাকও। তাদের সামনে আমাকে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। আমি চাই আমার পরিবারের অন্য সবাই এখানে আসুক এবং জীবনটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করুক। কী পদ্ধতিতে আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারি?

উত্তর : পরিবারে প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়ার সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধা হচ্ছে যে, আপনি এগিয়ে গেলেন। অসুবিধা হলো-কোর্সের পর আপনার কথা-বার্তা জীবন আচরণে পরিবর্তন দেখে অন্যরা বিস্মিত হবে, প্রশ্ন করবে। তবে এটাও একটি ইতিবাচক দিক।

যেমন, একটি তরুণ বা তরুণী হয়তো বেপরোয়া ছিলো, উদ্ধত ছিলো

এবং কখনো কখনো হয়তো তার মধ্যে বখাটেপনাও ছিলো। মেডিটেশন চর্চা করার পরে মা-বাবা যখন তার মধ্যে পরিবর্তন দেখেন, দেখেন যে, এ আর আগের মতো রাগা রাগি করছে না, উত্তেজিত হচ্ছে না, বকাবকি বা ভাংচুর করছে না কিংবা টাকা-পয়সা দেয়ার জন্যে জোর-জবরদস্তি করছে না, চাইছে সুন্দরভাবে এবং যুক্তিসঙ্গত যেকোনো কিছু বোঝালে বুঝছে, তখন বিস্মিত হন। হয়তো অনেক সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটলো কি না সেটা অনুসন্ধানও লেগে যান। কারণ এটা মানুষের স্বভাবেরই অংশ যে, সে কারো আচরণগত পরিবর্তন দেখলেই প্রথম মনে করে তার মাথা ঠিক আছে কি না।

তারপর যখন দেখে যে মাথা ঠিকই আছে তখন কৌতূহলী হয়। জানতে চায়-কীভাবে এ পরিবর্তন হলো। জানার পর তার পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডলে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি গ্রুপ প্রশংসা করে, উৎসাহ দেয়। আরেকটি গ্রুপ সমালোচনা করে, বিরোধিতা করে। কারণ তারা নিজেরা ভালো হতে চায় না এবং অন্য কেউ ভালো হতে গেলে সেটাকেও মেনে নিতে পারে না। এটা পরিবার সহপাঠী সহকর্মী বন্ধু বা পরিচিত যেকোনো পরিমন্ডলে হতে পারে।

যেমন সেদিন ‘এ’ লেভেল পড়ুয়া আমাদের এক তরুণ কোয়ান্টিয়ার এসে আমাকে বলছিলেন, তিনি কোয়ান্টাম ল্যাভে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন শুনে সহপাঠীরা টিকাটিপ্পনী কেটেছে। বলেছে, ভূতের বেগার খাটা। এসব শুনে সে অনেকদিন আর ফাউন্ডেশনে আসে নি।

আমরা বললাম, এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ এই সহপাঠীরা তো সব অটেল অর্থ-বিশ্বের অধিকারী বাবা-মায়ের ননীর পুতুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার উৎস বৈধ নয়। তাদের কাছে জীবন মানে ব্র্যান্ড পোশাক, গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড, ডিভুস আর পার্টি-ডিসকোতে টাকা ওড়ানো। জীবনের লক্ষ্য কী, মানুষের জন্যে কাজ করার তৃপ্তি কেমন তা এরা অধিকাংশই জানে না।

কাজেই তারা যখন তাদের একজন সহপাঠীকে এ জীবনে দেখবে, তারা তো বিরূপ মন্তব্য করবেই। তা না হলে তারা তো তাদের এই অনৈতিক জীবনান্ধারকে বৈধতা দিতে পারবে না। তাকে ছোট করতে না পারলে তো সে নিজেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। ভালো বই পড়ার জন্যে তাকে ‘আঁতেল’ বলে যদি কোণঠাসা করতে না পারে তাহলে তো তাকেও ডিভুস বাদ দিয়ে ভালো বই পড়তে হবে। অতএব এদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কিছু নেই। আপনি আবার ল্যাভ কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করুন।

অতএব কোয়ান্টামের ব্যাপারে যত প্রশ্ন আসবে তত মাথা নাড়বেন এবং প্রশংসা করবেন যে, খুব ভালো প্রশ্ন করেছে। যে প্রশ্নের জবাব আপনার স্পষ্ট

জানা আছে, সেটার উত্তর দেবেন। যা জানা নেই, বিনয়ের সাথে বলবেন—এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। কখনোই বিতর্কে যাবেন না। আর যখন বুঝবেন অপর পক্ষ বিতর্কে যেতে চাচ্ছে তখন কৌশলে এড়িয়ে যাবেন।

আর আপনি ততটুকুই বলবেন যতটুকু আপনি করতে পারেন। যেমন, আপনি হয়তো দিনে একবেলা মেডিটেশন করছেন, বিনয়ের সাথে বলবেন, দেখুন, মেডিটেশন তো ভালো জিনিস, দুই বেলাই করা উচিত, কিন্তু আমি এক বেলাই করছি, চেষ্টা করছি কিন্তু দুই বেলা করতে পারছি না। নিজে দুই বেলা করছেন না, কিন্তু আরেকজনকে বলবেন যে, এই দুই বেলা মেডিটেশন কর, তাহলে আপনার কথার প্রভাব পড়বে না।

অতএব অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে আপনি নিয়মিত দুইবেলা মেডিটেশন করবেন। ফাউন্ডেশনের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করবেন। দেখবেন—আপনার মধ্যে তখন যে ইতিবাচকতা, যে প্রশান্ত প্রত্যয়, যে গুরুরিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরা দেখবে সেটাই তাদের মুগ্ধ করবে।

প্রশ্ন : আমার ইচ্ছা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ব্যাপারে আমার পরিবার আগ্রহী হোক। এজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। কেন?

উত্তর : সবকিছুর জন্যেই নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কোনো কোনো ফুল শিশুগাছে ফোটে, কোনো ফুল গাছ বড় হলে ফোটে, আবার শতাব্দীতে কোনো ফুল একবার ফোটে। আপনার পরিবার কবে কোর্সের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে তা নির্ভর করছে তাদের অবস্থার ওপর। আপনার কাজ হচ্ছে চেষ্টা করা। আজ হোক, কাল হোক একসময় পরিবার কোর্স করবে।

আজ থেকে দশ বছর আগে এবং আজকে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক নয়। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামে প্রথম কোর্স হয়। দ্বিতীয় ব্যাচে অংশগ্রহণকারী ছিলেন মাত্র ১১ জন। আজকে জায়গার অভাবে অনেককে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। আজ থেকে দশ বছর পরে ওয়ার্কশপ করার জন্যে হয়তো জায়গা পাওয়া যাবে না, ব্যাচে ব্যাচে ওয়ার্কশপ করতে হবে। এসব গুণ্ডু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এমনও হয়েছে—স্ত্রী কোর্স করেছেন, স্বামী কোর্স করতে আগ্রহী হন নি অথবা স্বামী কোর্স করেছেন, স্ত্রী কোর্স করতে আগ্রহী হন নি। কোর্সে এক শিক্ষিকা অংশ নিয়েছিলেন। তার স্বামী কোর্স করেছেন ১১ ব্যাচে আর তিনি এলেন ১৯০ ব্যাচে। কোর্স করে তিনি আফসোস করছেন আগে কেন করেন

নি। এখন তিনি মনে করছেন ফাউন্ডেশনের সাথে তার স্বামীকেও আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। কত দ্রুত তারা উৎসাহিত হবে তা সবসময়ই নির্ভর করছে কীভাবে আপনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন তার ওপর। কমান্ড সেন্টারে এনে তাদের বোঝাতে থাকুন। একসময় না একসময় তাদের সাড়া পাবেন।

আসলে, আপনি একজনকে দাওয়াত দিতে পারেন, সত্যের আলো তার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, কিন্তু সে গ্রহণ করবে কি না—এটা তার ব্যাপার।

অতএব, সত্যের বাণী, আলোকিত জীবনের বাণী পৌঁছানোটা আপনার কর্তব্য। কেউ গ্রহণ করবে কি করবে না—এ ব্যাপারে আপনার কোনো দায়িত্ব নাই। সে আপনার ভাই হোক, মা কিংবা ছেলে-মেয়ে, যে-ই হোক না কেন। পৌঁছানোটা আপনার দায়িত্ব, বাকিটা তার নিজের।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম সম্পর্কে কেউ ভালোভাবে না জেনে খারাপ মন্তব্য করলে কী করবো?

উত্তর : কেউ খারাপ মন্তব্য করলে কখনো উত্তেজিত হবেন না। মুচকি মুচকি হাসবেন, জোরে নয়। যখন জিজ্ঞেস করবে হাসছো কেন? তখন বলবেন যে, বলা যাবে না। এটা শুনে তার কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। সে হয়তো পীড়াপীড়ি করতে থাকবে বলার জন্যে। আপনি তখন বলুন, ঠিক আছে তিন দিন পর বলবো। তিন দিন পর দেখবেন, সে নিজে এসেই জানতে চাইছে। তখন তাকে কোয়ান্টাম সম্পর্কে খানিকটা বলেন আর বলেন যে, হাসছিলাম এজন্যে যে, এই সহজ জিনিসগুলো তোমাকে বোঝাতে পারি নি। কোয়ান্টাম হচ্ছে এই। দেখবেন মনোযোগ ও কৌতূহল নিয়ে সে আপনার কথা শুনছে।

প্রশ্ন : আমি হলে থাকি। হলের রুমমেট ও আশেপাশের লোকজন প্রথম প্রথম মেডিটেশন নিয়ে হাসাহাসি করতো। কিন্তু আমার দৃঢ়তায় তা দূর হয়েছে এবং তারাও মেডিটেশন করেছে। সাময়িক ক্লান্তি দূর করায় মেডিটেশনের গুরুত্ব তারা বুঝেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বই, স্মারক পড়েও মেডিটেশনের গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করে নি। গুরুজীকে নিয়েও বিভিন্ন কমেন্ট করেছে। এক্ষেত্রে আমার জবাব কী হতে পারে?

উত্তর : আপনার জবাবের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনার জবাব একটাই আর তা হচ্ছে নিজের প্রশান্তি। আপনার গুরুকে নিয়ে কমেন্ট করেছে। এর

জবাব যদি দিতে যান তাহলে তো আপনার আর তার মধ্যে কোনো তফাত থাকলো না। শুধু হাসবেন। হাসি দেখেই সে বুঝবে আপনি তাকে বোকা মনে করছেন। তার কমেন্টের জবাব দেয়ার প্রয়োজনও মনে করছেন না। এটাই মন্তব্যকারীর জন্যে সবচেয়ে বড় শাস্তি। আর বাকিটা হচ্ছে নিজের ভেতরের শক্তি। আপনি নিজের ভেতরের শক্তিকে বিকশিত করলে শুধু তার দিকে তাকালেই দেখবেন সে কমেন্ট ভুলে গেছে। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন, গুরুত্ব সাথে এবং সৎসঙ্গের সাথে একাত্ম থাকতে হবে।

প্রশ্ন : কেউ যদি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের গুরুজীকে গালি দেয়, ঐ সময় আমার করণীয় কী হতে পারে?

উত্তর : তাকে বলা যে, খুব ভালো লাগছে। আরও বলো। গালি দিচ্ছে, তবুও তো গুরুজীর নামটা নিচ্ছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নাম তো নিচ্ছে। এই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নামটা শুনলেই আমার মনটা ভালো হয়ে যায়।

আর আমাকে গালি দিলে তো আরো খুশি হবেন। কারণ আমার যা গুনাহ আছে গালির কারণে সেটা মাফ হয়ে যাচ্ছে। কারণ যেকোনোভাবেই হোক সে হয়তো ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বা আমার সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য পেয়েছে। সে সেই ভুল তথ্যটা আপনাকে দিচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনুন। কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন না। বরং বলবেন, আরো ভালো করে গালি দেয়ার জন্যে এই জিনিসগুলো পড়। পড়ে পড়ে আরো দোষ-ত্রুটি যা পাও সব বের কর, তারপর আবার আসো। এসে আবার বলো।

অর্থাৎ ফাউন্ডেশনকে যে গালিগালাজ করতে চায় শুধু তার কথা শুনে যাবেন। কোনো বিতর্কে যাবেন না। পাল্টা যুক্তি দিতে যাবেন না কখনো। কারণ তখন সে কাউন্টার এটাক করার পয়েন্ট পাবে। শুনে যাবেন এবং প্রশংসা করবেন। দেখবেন, একটা সময় সে আর বলবে না। কারণ সে আপনার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আপনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাকে পরাভূত করছেন এবং তাকে বুঝতেও দিচ্ছেন না যে পরাভূত হচ্ছে। আর আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, অতীতে যারা গালিগালাজ করেছেন, তাদের একটা বড় অংশ পরে কোর্সে অংশ নিয়েছেন।

প্রশ্ন : সবাই কোয়ান্টামের ভাষা বোঝে না। প্রো-একটিভ থাকতে চাইলেও সবসময় তা সম্ভব হয় না। কিছু মানুষ আবার ব্যঙ্গ করে। আমি কী করবো?

উত্তর : সমাজের সবাই কোয়ান্টামের ভাষা বুঝবে না—এটাই স্বাভাবিক। আর বোঝে না বলেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমি, আপনি—আমরা যারা বুঝি, আমাদের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আর অগ্রপথিকরাই স্মরণীয় হয়, অমর হয়। উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু বা আমেরিকায় এখন অনেকেই যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা মনে রেখেছি তাদের, যারা প্রথম গিয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে আপনি আপনার পরিমন্ডলে প্রথম। আপনার কথাই তারা মনে রাখবে, যারা পরে এসেছে তাদের নয়।

যখন নতুন কিছু শুরু হয়, তখন সেখানে যারা মেধাবী, প্রতিভাবান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান তারাই প্রথম তা গ্রহণ করেন। একই সাথে অনেক বিরোধিতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাসেরও শিকার তাকে হতে হয়।

কিন্তু একসময় সাধারণ মানুষ সত্যকে বুঝতে পারে এবং তখন তারা আসে স্রোতের মতো। কাজেই অন্যদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রভাবিত হবেন না। আপনি যে নতুন কিছু করছেন, ভিন্ন কিছু করছেন এটা তারই লক্ষণ। প্রথম ব্যঙ্গ করবে, তারপর কৌতূহলী হবে, শেষমেশ অনুসরণ করবে যদি আপনি আপনার বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং সত্যের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করেন।

আজ যেমন আপনাকে ব্যঙ্গ করছে, একসময় আমাকে ব্যঙ্গ করার লোকও ছিলো প্রচুর। পরবর্তীতে তারাই একে একে এসেছেন তা অনুসরণ করতে। তখন কিন্তু আমি তাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করি নি বা কথা শোনাই নি। বরং অভিনন্দন জানিয়ে বলেছি, খুব ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন আপনি উপকৃত হবেন। না এলে বঞ্চিত হতেন।

আর আমরা যখন শুরু করেছিলাম—১৯৯৩ এবং ২০১২—এই দুই সময়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। এখন ব্যঙ্গ নয়, প্রশংসা করার লোকই বেশি। তারপরও কিছু বিরোধিতা থাকবে—সেটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি বা অহংবোধ তাদেরকে এ পথে আসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

এর বাইরের যারা সাধারণ মানুষ তারা আসবে দলে দলে। কারণ নিঃস্বার্থভাবে আস্থা, নির্ভরতা, আশাবাদ এবং কল্যাণের যে সন্ধান ফাউন্ডেশন দিতে পারছে তা এ সময়ে খুব বিরল। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ এখন প্রতারিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে, স্বার্থান্বেষী চক্রের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কাজেই যে যত ব্যঙ্গ করুক আপনি আনন্দিত হবেন যে, অন্যরা যখন ভ্রান্তির পেছনে, অশান্তির পেছনে—আপনি তখন সত্যের পথে আছেন, কল্যাণ পথের অগ্রযাত্রী হিসেবে আছেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামের যেকোনো প্রোথামে আসার আগে বাসায় যে ঝামেলা হয় বা বাধা হয়, শান্তি লাগে না। এই বাসার বৃত্তটা ভাঙবো কীভাবে? গুরুজী, সুন্দর বুদ্ধি দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : বাসাটাকে সুযোগ বানিয়ে ফেলা উচিত। আপনার আচরণে হয়তো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা বাসায় সমস্যা সৃষ্টি করে। প্রোথামে আসার আগে বাসায় যে ঝামেলা সৃষ্টি হয় তা দুটো কারণে হতে পারে। প্রথমত, আপনার আচরণ বাসার লোকদের কাছে পছন্দনীয় নয়। আপনি আপনার আচরণ দিয়ে পরিবারকে প্রভাবিত করতে পারেন নি।

এজন্যে আগে আপনাকে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। আপনি যদি নিয়মিত মেডিটেশন করতেন তাহলে বাসার যে ঝামেলা-এটা আপনাকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করতো না। এই জিনিসগুলো যত আপনাকে কম প্রভাবিত করবে, তত বাসার লোকরাও আপনার সাথে সাথে প্রো-একটিভ হবে। অতএব, বাসা এবং ফাউন্ডেশনের মধ্যে ব্যালেন্স করতে পারাটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাসায় এমন আচরণ করবেন না যেটা রি-একটিভ। সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। বাসার জন্যে যা করণীয়, ফাউন্ডেশনের কাজ করছেন বলে সেটাকে অবহেলা করবেন না। সেখানে কোনো ঘাটতি রাখবেন না। একজন মানুষের সবকিছুর মধ্যে ব্যালেন্স করতে পারাটাই হচ্ছে অনন্য মানুষের বৈশিষ্ট্য। ফাউন্ডেশন-পেশা-বাসা-সবকিছুকে ব্যালেন্স করতে হবে।

যদি ফাউন্ডেশন করতে গিয়ে বাসা ধ্বংস করে ফেলেন, এটা সীমালঙ্ঘন হলো। যদি বাসা করতে গিয়ে ফাউন্ডেশনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন-এটা সীমালঙ্ঘন হলো। যদি ফাউন্ডেশন করতে গিয়ে পেশার বারোটা বাজিয়ে দেন, সেটা সীমালঙ্ঘন হলো। আবার পেশার জন্যে ফাউন্ডেশন বাদ দিয়ে দিলেন-এটা আপনার জন্যে ক্ষতিকর। অর্থাৎ ব্যালেন্স করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

বাসাটাকে সবসময় মনে করবেন এটা একটা এসেট। কোনো চেতনা যদি পরিবারে প্রবেশ না করে সেই চেতনা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না, লালিত হয় না। আর আমরা গুরুরিয়া আদায় করি যে, কোয়ান্টাম চেতনা পারিবারিকভাবে লালিত একটি চেতনা। আমাদের কার্যক্রমগুলোতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর সবাই মিলে অংশ নেন। সবাই মিলে চর্চা করার সুযোগই আমরা সৃষ্টি করতে চাই। আর এখন পারিবারিকভাবেই কোয়ান্টামের চর্চা হচ্ছে। অতএব, আপনি যদি বাসাকে

উদ্ধুদ্ধ করতে না পারেন তাহলে বলতে হবে আপনার কোথাও সমস্যা রয়েছে। সমস্যাটাকে শনাক্ত করুন। সেটাকে দূর করুন; বাসা আপনার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমার বাবা কোয়ান্টাম বা মেডিটেশন বোঝেন না। তার কাছ থেকে মিথ্যে বলে টাকা আনতে হয়। এতে কি আমার পাপ হচ্ছে ?

উত্তর : মিথ্যে কথা বলে আনবেন না। বলবেন, বাবা, আমি কোয়ান্টামে যাবো। এজন্যে আমার টাকা লাগবে। আমি তো সিগারেট খাওয়ার জন্যে, নেশা করার জন্যে বা আড্ডা দেয়ার জন্যে টাকা নিচ্ছি না। জীবনকে পরিবর্তন করার জন্যে আমি কোয়ান্টামে যাই। তুমি যদি আমাকে টাকা না দাও তাহলে এই আমি তোমার পায়ের কাছে বসলাম। এখান থেকে আমি নড়বো না, খাবো না, কোথাও যাবো না, কিছুই করবো না।

হয়তো তিনি শারীরিকভাবে মারতেও পারেন। তারপরও বলবেন, বাবা এই ভালো কাজে আমাকে তোমার সহযোগিতা করতে হবে। অর্থাৎ বাবা-মাকে সবসময় বলবেন বিনয়ের সাথে, নম্র হয়ে। কিন্তু একই সাথে আপনি যে ভালো কাজের সাথে আছেন এই বিশ্বাস আর সাহসটাও আপনার থাকতে হবে। বাবা তখন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করবেন। সামনে বকাবকি করলেও আড়ালে ঠিকই বলবেন—আমার ছেলে ভালো কাজ করে। বখাটে হয়ে যায় নি, নেশা বা বাজে আড্ডায় মেশে না।

প্রশ্ন : শ্বশুরবাড়িতে অনেক অবহেলিত হই, ফাউন্ডেশনে আসা তারা পছন্দ করেন না। এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

উত্তর : আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন এবং শ্বশুর-শাশুড়িকেও ধন্যবাদ দিন যে, তারা শুধু আপনার ফাউন্ডেশনে আসা অপছন্দ করা পর্যন্ত আছেন। তারা আপনাকে আসতে বাধা দেন নি বা তারা আপনাকে নির্যাতন করেন নি। আমাদের এমন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার রয়েছেন যাকে হাজবেন্ড ধরে পিটিয়েছেন যেন কোয়ান্টামে না আসে।

তারপরেও তিনি এসেছেন এবং বাসায় গিয়ে বলেছেন—আমি তো কোয়ান্টামে গিয়েছিলাম, আমাকে আবার মারো। এখন হাজবেন্ড ক'বার মারবেন! তিনি পরে কোর্স করেছেন। আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আপনার ওপরে নির্যাতন করেন নি এবং

যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বুঝতে না পারছেন তারা তো অবহেলা করবেনই। তাই আপনার করণীয় হচ্ছে সবসময় তাদের জন্যে দোয়া করা যে, হে প্রভু! তুমি তাদেরকে আরো ভালো করে দাও যাতে তারা নিজেরাই সত্যের পথে, আলোর পথে আসতে পারে। আর নিজের বিশ্বাসের জন্যে একটু কষ্ট তো করতে হবে, বিশ্বাসের পরীক্ষা দিতে হবে।

প্রশ্ন : আমার স্বামী একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট হওয়া সত্ত্বেও আমার মেডিটেশন করায় বাধা দেয়। কোয়ান্টাম এর কার্যক্রমে আসা নিয়ে প্রায়ই অশান্তি করে এবং নানা রকম কটুক্তি করে। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসবেন। আসলে স্বামীকে নিজের মতে হাঁ করানো—এটা তো প্রত্যেক স্ত্রীর জন্যে একটি সহজ কাজ। কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন এবং তাকে বোঝান যে, তাকে কত ভালবাসেন এবং বাস্তবে তার প্রতি একটু মনোযোগী হোন। আর কখন তিনি হাঁ বলবেন সেই সময়টা বুঝে কথা বলবেন। দেখবেন যে, সবকিছু খুব সহজ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমার বাবাকে কিছুতেই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে উদ্বুদ্ধ করতে পারছি না। তিনি বলেন, আমি পাগল না যে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করবো। আমার কোর্সে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি জানেন না। যতই বোঝাতে যাই তিনি রেগে যান। গুরুজী, আমি বাবাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝানোর চেষ্টা করছি, কোনো কাজ হচ্ছে না। কীভাবে ওনাকে বোঝাতে পারি ?

উত্তর : মেডিটেশনে ক্রমাগত তাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেরই একটি দুর্বল জায়গা আছে, আপনার বাবার সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটি খুঁজে বের করুন। তিনি যার কথা শোনে তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করুন। সবসময় সরাসরি হিট করা যায় না। কেবল খেলায় যেমন একটি গুটি দিয়ে আরেকটি গুটিকে হিট করতে হয়। কারণ যেটাকে আপনি পকেটে ফেলতে চাচ্ছেন সরাসরি সেটি পকেটে ফেলা যাচ্ছে না।

আপনিও আপনার বাবাকে সরাসরি কিছু বলতে পারছেন না। এক্ষেত্রে আরেকজনের মাধ্যমে তাকে বলতে হবে। যদি সঠিক লোক নির্বাচন করতে পারেন, তিনিই তাকে বোঝাতে পারবেন। দেখবেন, আপনার বাবা কোর্সে আসবেন। সেই সাথে দেখবেন—সেই আরেকজনও কোর্সে চলে এসেছেন।

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু ফাউন্ডেশনের ঘোর বিরোধী। বলে, মেডিটেশন ভুয়া জিনিস। নানান বিব্রতকর প্রশ্ন করে। এরপরে আমি কী বলবো?

উত্তর : মনে মনে তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবেন। আহা বেচারী! মেডিটেশন যে প্রমাণিত বিজ্ঞান, এই বাস্তব তথ্য সে এখনো জানে না। কিছুই বলবেন না, শুধু হাসবেন। আপনি জানেন যে, এ বিরোধী। তার সাথে কোনো বিতর্কে জড়াতে যাবেন না। সে যত বলে বলুক। হাসিমুখে শুনে যান। একজন ধ্যানী কখনো অন্যের কথায় বিব্রত বোধ করেন না। বিতর্কে কখনো জড়াবেন না এবং কাউকে এমন কোনো কথা বলবেন না, এমন কোনো মন্তব্য করবেন না যে, সেজন্যে পরে দুঃখ প্রকাশ করতে হয়।

কোয়ান্টাম, মেডিটেশন ও ইসলাম

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড ধর্ম বা ইসলামবিরুদ্ধ কি না? ইসলামবিরুদ্ধ কোনো কিছু এতে আছে কি না?

উত্তর : ইসলামের সাথে কোয়ান্টামের কোনো বিরোধ নেই। আমরা দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি যে, কোরআন-হাদীসের কোনো বিধানের সঙ্গে কোয়ান্টামের কোনো বিরোধ নেই।

আমরা যখন এ কোর্স জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত করি, আমরা আমাদের দেশের সমস্ত বিশিষ্ট আলেম, যত মতের আলেম আছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম পর্যবেক্ষক হিসেবে কোর্সে থাকার জন্যে এবং দেখার জন্যে যে, কোয়ান্টাম মেথডের কোনো সূত্র বা টেকনিকের মধ্যে ঈমান-আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আছে কি না, ইসলামবিরুদ্ধ কোনো কিছু আছে কি না।

অনেক বিশিষ্ট আলেম এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবাই এক বাক্যে বলেছেন যে, কোয়ান্টামের কোনো সূত্রের সাথে আমাদের ঈমান-আকীদার কোনো বিরোধ নেই।

অধিকাংশই খুব দুঃখ করে বলেছেন যে, আমরা তো বলি হৃদরিল ক্বালব ছাড়া নামাজ হয় না। শুধু রুকু-সেজদা দিলে, সূরা-কেরাত পড়লে নামাজ হয় না। নামাজের জন্যে প্রয়োজন হৃদরিল ক্বালব, একগ্রহীত্বতা। এই হৃদরিল ক্বালব কীভাবে সৃষ্টি করতে হয় এখানে এসে শিখে গেলাম। আলেমগণ যারা এ কোর্সে অংশ নিয়েছেন, সবাই একটি কথা বলেছেন যে, তাদের নামাজের

একাগ্রচিত্ততা, মনোযোগ আগের চেয়ে বেশি। তাই যারা ইবাদত-বন্দেগিতে একাগ্রচিত্ত হতে চান মেডিটেশন তাদেরকে চমৎকারভাবে সাহায্য করবে।

এছাড়া অনেক আগেই আমরা বলেছি, যদি কোনো আলেম প্রমাণ করতে পারেন যে, কোয়ান্টাম মেথড বই বা কোয়ান্টাম মেথডের কোনো কথা বা প্রক্রিয়ার সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ রয়েছে তাহলে আমরা তা সংশোধন করে নেবো। গত ২০ বছরেও কেউ একটি লাইন দেখাতে পারেন নি। অতএব নিশ্চিত মনে থাকবেন, নিশ্চিত মনে চর্চা করবেন।

প্রশ্ন : কোরআন ও রসুলের হাদীস সঠিকভাবে অনুধাবন অধ্যয়ন ও এর অনুসরণ করলে সাফল্য ও প্রশান্তি অবধারিত। সেক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বা এ জাতীয় কোনো মেথডের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

উত্তর : কোরআন এবং রসুলের হাদীস সঠিকভাবে অনুধাবন, অধ্যয়ন এবং অনুসরণ যাতে আপনি করতে পারেন এজন্যেই মেডিটেশনের প্রয়োজনীয়তা। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্ত মন নিয়ে আপনি কোরআন-হাদীস অনুধাবন বা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তা আপনার হৃদয়ঙ্গম হবে না, আপনি বুঝতে পারবেন না।

এখন বলবেন, মেডিটেশন নতুন জিনিস, নবীজীর যুগে তো এই মেডিটেশন ছিলো না, কোয়ান্টাম মেথড ছিলো না, মেডিটেশন করার প্রয়োজনটা কী? আসলে নবীজীর সময়ে এত টেনশন ছিলো না, এত যান্ত্রিকতা, এত প্রতিযোগিতা ছিলো না। তখন মানুষ উত্তেজিত হতো আবার ঠান্ডাও হতো। কিন্তু এখন মানুষ উত্তেজিত হয়, কিন্তু ঠান্ডা হয় না। যার ফলে সে সত্যকে অনুসরণ করতে পারে না।

সঠিকভাবে আপনি যাতে কোরআন এবং হাদীস অনুধাবন করতে পারেন, অধ্যয়ন করতে পারেন, হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এ জন্যে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। আর এ জন্যেই মেডিটেশন। ব্রেনটাকে বেশি করে ব্যবহার করতে মেডিটেশনের বিকল্প নেই। যখনই আপনি সঠিকভাবে অনুধাবন এবং অধ্যয়ন করতে পারবেন, তখনই আপনি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারবেন এবং মেডিটেশন এক্ষেত্রে অত্যন্ত চমৎকার সহায়ক শক্তি।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট। এরপর আর মেডিটেশনের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় তো প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরজ, যা অবশ্য পালনীয়। কোনো মুসলমান যদি তা না করে তাহলে ধর্মের একটি আবশ্যকীয় লঙ্ঘনের দোষে সে দোষী হবে। কিন্তু পাঁচ বার নামাজ আদায় করলেই কি সব হয়ে গেল?

আসলে শুধু চাল-ডালের তৈরি খিচুড়ি থেকেই একটি মানুষ তার দেহের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৯টি এমিনো এসিড পেতে পারে। তাই বলে কি মানুষ শুধু চাল-ডালই খায়? সবজি, মাছ-মাংস খায় না? একটা ঘরে শুধু খুঁটি, দেয়াল, ছাদ থাকলেই হয় না। ঘরের আসবাব, সাজ-সজ্জার উপকরণ, ইত্যাদিও লাগাতে হয়। অর্থাৎ ফরজ হলো মৌলিক, যেমন একটা ঘরের খুঁটি। কিন্তু শুধু খুঁটি থাকলেই ঘর হয় না, যদি না আরো পরিপূরক উপাদান তাতে সম্পৃক্ত হয়। তাছাড়া নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্যেও মেডিটেশন করা উচিত।

প্রশ্ন : আমার পরিচিত একজন খুব ধার্মিক। কোয়ান্টামে আমার আসা-যাওয়া দেখে বলে হারাম-হারাম, কাফের হয়ে যাবে। তাকে আমি কিছুই বলি নি। কী উত্তর দেবো?

উত্তর : কিছুই বলবেন না, কোনো উত্তর দেয়ার দরকার নেই। তিনি যখন হারাম-হারাম বলবেন, আপনি মুচকি হাসবেন। একমাত্র মূর্খ ছাড়া কেউ এরকম কথা বলে না। কারণ কোনোকিছু না জেনে যখন কেউ ফতোয়া দেয় তাকে মূর্খ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রশ্ন : ক্লাসমেট বলেছে, ফাউন্ডেশন নাকি ইসলাম থেকে দূরে রাখার জন্য কাজ করছে, আমি বিশ্বাস করি নি।

উত্তর : বিশ্বাস করেন নি তা বোঝাই যাচ্ছে, বিশ্বাস করলে আপনি আসতেন না। আসলে ফাউন্ডেশন ইসলামের মূল শিক্ষাকেই প্রচার করছে। নবী-রসুলরা যে কথাগুলো বলেছেন, ফাউন্ডেশনও একই কথা বলছে। আমরা যারা ফাউন্ডেশনের সাথে আছি, ফাউন্ডেশনে আসার পরে আমরা সবাই যার যার ধর্মপালনে আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়েছি।

প্রশ্ন : ইসলামের সাথে কোয়ান্টামের কোনো মতবিরোধ আছে কী? নাচ গান অভিনয়কে সাপোর্ট দেয়া হয় কেন?

উত্তর : নাচ, গান বা অভিনয় কী কাজে লাগানো হচ্ছে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ-এটা আপনাকে স্রষ্টার দিকে আকর্ষণ করে, না স্রষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা যে মিউজিক ব্যবহার করি এটা কি আপনার মনকে প্রশান্ত করে, না মনকে শয়তানের মতো অস্থির করে তোলে, অশান্ত করে। ইসলামে সেই জিনিসটা হারাম যেটা আপনার জন্যে ক্ষতিকর, আর সেই জিনিসটা হালাল যেটা আপনার জন্যে কল্যাণকর।

প্রশ্ন : আমি জানি যে, কোয়ান্টাম মেথড ইসলামসম্মত। কিন্তু অন্যদেরকে কীভাবে বোঝাবো?

উত্তর : আসলে অন্যদের বোঝানোটা খুব সহজ। অন্যরা যে ভাষায় বোঝেন সে ভাষায় বোঝাবেন। অন্যরা আপনাকে দেখে মনেই করে না যে, আপনি ইসলামসম্মত। সেজন্যে যাদেরকে দেখে মনে হয় এরা ইসলামসম্মত তাদের কথা বলবেন যে, তারা কোর্স করেছেন। এমন কোনো গ্রুপ নেই যে গ্রুপের আলেম-ওলামারা আমাদের কোর্সে অংশগ্রহণ করেন নি। বলবেন যে, অমুকে করেছেন, অমুকে করেছেন এবং সবাই বলেছেন যে, এর সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ উপায়। তাত্ত্বিক আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : আমার পরিবারের একজন সদস্য মেডিটেশন করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন, কিন্তু এখন তিনি বলেন, আল্লাহকে ডাকো। কোয়ান্টামে যেতে হবে না। ওখানে হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধরা আসে।

উত্তর : নবীজী (স)-এর ওখানে পৌত্তলিক আসতো, খ্রিষ্টান আসতো, ইহুদী আসতো। নবীজী তো কাউকে আসতে মানা করেন নি কখনো। নবীজীর ওখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন। এমনকি যখন নাজরান থেকে খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল মসজিদে নববীতে এলেন, আলাপ-আলোচনা শেষে যখন তারা বললেন যে, আমাদের তো এখন প্রার্থনার সময় হয়েছে, আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে আসি। নবীজী (স) বলেছিলেন, কেন, তোমরা কি এই জায়গাটাকে তোমাদের প্রার্থনা করার মতো পবিত্র মনে কর না? তখন মসজিদে নববীতে খ্রিষ্টানরা প্রার্থনা করলো।

সেই নবীর উম্মত হয়ে কত ছোট দৃষ্টি, কত গৌড়া, কত অন্ধ দৃষ্টি আমাদের! যে এটা বলেছে আমরা তার হেদায়েত কামনা করি। পরম প্রভু

তাকে হেদায়েত দান করুন। কারণ নবীজী (স) পৃথিবীতে এসেছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমত হিসেবে। শুধু আরবদের জন্যে নয়, শুধু মুসলমানদের জন্যে নয় বা নয় কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে। তিনি কাজ করেছেন সবার জন্যে।

অতএব, তাঁর প্রতিনিধিত্ব যারা করবেন, তারা সমস্ত সৃষ্টির জন্যে কাজ করবেন। বিশেষ কোনো জাতের বা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের জন্যে নয়। এটাই তাঁর যথাযথ অনুসরণ।

প্রশ্ন : মেডিটেশন মনকে প্রশান্ত করে। আমি কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম নামাজই একমাত্র মনকে প্রশান্ত করতে পারে। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : মনকে প্রশান্ত করার মতো নামাজ যাতে আপনি পড়তে পারেন এজন্যেই মেডিটেশন দরকার। শুধু ওঠা-বসা করলে, রুকু-সেজদা দিলে নামাজ হয় না। আমাদের নামাজীর সংখ্যা তো কম নয়। জুম্মার দিন বিশাল রাস্তা বন্ধ করে নামাজ হয়। যেভাবে আমরা নামাজ পড়ি তাতে যদি প্রশান্তি পাওয়া যেত, তাহলে আমাদের দেশে এত অশান্তি থাকতো না।

নামাজ ঠিকভাবে পড়ার জন্যে মনোযোগ প্রয়োজন। আর মেডিটেশন মানুষের মনকে বর্তমানে নিয়ে আসে। যখন আপনি মনকে বর্তমানে নিয়ে আসতে পারবেন, মনোযোগকে একত্র করতে পারবেন, আল্লাহকে হাজির নাজির হিসেবে অনুভব করতে পারবেন তখন সে নামাজ আপনি পড়তে পারবেন যে নামাজ মানুষকে প্রশান্ত করতে পারে। তখন আপনি বলতে পারবেন-নামাজই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ স্তরে যেতে হলে মেডিটেশন প্রয়োজন।

এজন্যেই রসুলুল্লাহ (স) মেডিটেশন করেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের ওপর মেডিটেশন চাপিয়ে দেন নি। নবীজী (স) কখনো চান নি, তিনি যত কঠোর সাধনা করেছেন তার অনুসারীদের ওপর তা চাপিয়ে দিতে। অনেক কিছু তিনি নিজে করেছেন কিন্তু আমাদের জন্যে বলেছেন-তোমরা করলেও করতে পারো।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. তারিক রামাদান তার The Messenger : The meanings of the life of Muhammad বইতে বলেছেন, He did not demand of his companions the worship, fasting and meditation that he exacted of himself. অর্থাৎ তিনি

যেভাবে ইবাদত করতেন, রোজা রাখতেন এবং মেডিটেশন করতেন—তিনি তাঁর অনুসারীদের ওপর সে কঠোরতাকে চাপিয়ে দিতে চান নি। তিনি তাঁর অনুগামীদের ব্যাপারে অনেক নরম ছিলেন।

প্রশ্ন : নবী-রসুলগণ মানুষকে যে আসল মুক্তির পথ দেখিয়েছেন কোয়ান্টাম কি সে কাজ করছে?

উত্তর : কোয়ান্টাম সে কাজই করছে। মানুষের অধঃপতনের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, ভ্রান্ত সংস্কার, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। যুগে যুগে নবী-রসুলরা এসেছেন মানুষকে এই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্যে। মনোজাগতিক দাসত্ব, ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে তাদেরকে নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান করেছেন। কোয়ান্টামে আমরা সেই কাজটাই করছি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—‘যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট।’ এই বিশ্বাসের শক্তিকে আমরা জাগ্রত করছি। বিশ্বাসের শক্তি একজন মানুষকে তার মনোজাগতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

আমরা বলেছি—বিশ্বাস করুন, আপনি সফল হবেন। আমরা বলেছি—বিশ্বাস করুন, রোগ থেকে আপনি মুক্তি পাবেন, আমরা বলেছি—বিশ্বাস করুন, মাথাব্যথা থাকবে না। কোমরে ব্যথা থাকবে না। হাঁটুতে ব্যথা থাকবে না। বিশ্বাস করুন, রুঁকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন।

যিনি বিশ্বাস করেছেন তিনি রুঁকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছেন। ব্যথা নাই, বেদনা নাই, রোগ নাই—রোগ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। আমরা বলেছি—বিশ্বাস করুন, আপনি প্রশান্তি পাবেন। আপনার ভেতরে শান্তি আসবে। গুক্রিয়া আদায় করুন, শোকরগোজার হোন। আপনার প্রাচুর্য আসবে, আপনার অভাব থাকবে না। আপনার জীবনে বরকত আসবে। লাখো মানুষ তা বিশ্বাস করেছে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে।

প্রশ্ন : টিভিতে প্রশ্নোত্তরের একটি লাইভ অনুষ্ঠানে একজন প্রশ্ন করেছিলেন—মেডিটেশন কী? মেডিটেশন কি ইসলামে গ্রহণযোগ্য? কোয়ান্টাম কি ইসলামসম্মত? হুজুররা উত্তরে বলেছেন, এটি ইসলামসম্মত নয়। শুনে আমার ছেলে মেডিটেশন করতে চায় না। মেডিটেশন কি ইবাদতের মধ্যে পড়ে?

উত্তর : কোন হুজুর কী বলেছেন এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এ সম্পর্কে কী বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা কোরআন

শরীফে সরাসরি মেডিটেশনের কথা বলেছেন।

‘তাফাক্কুর’ আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে কনটেম্প্লেশন, মেডিটেশন বা ধ্যান। আল কোরআনে অনেক জায়গায় শব্দটি রয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৯০-৯১ আয়াতে আল্লাহ জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন, ‘তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে (তাফাক্কুর) নিমগ্ন হয়’।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী বর্তমান বিশ্বের একজন সর্বজনমান্য ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ১৯৭৩ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূল আদ-দ্বীন অনুযায়িত হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মিশর সরকারের বোর্ড অফ রিলিজিয়াস এফেয়ার্স-এর সদস্যপদসহ আন্তর্জাতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেছেন, মেডিটেশন বা ধ্যান হচ্ছে উচ্চস্তরের ইবাদত।

বিশিষ্ট গবেষক ও মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক মালিক বাদরি তার মেডিটেশন বিষয়ক গ্রন্থ ‘Contemplation : An Islamic Psycho-Spiritual study’ ভূমিকায় বলেন, ‘গ্রন্থকার তার গ্রন্থে ধ্যান ও প্রশান্ত মনে সংচিন্তার আলোকে বিচার করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনাকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন’।

যথার্থই আল কোরআন বলে ‘আমি একটি বিষয়ে সতর্ক করছি, আল্লাহর সামনে দাঁড়াও একক বা যৌথভাবে এবং চিন্তা কর...’। এখানে ‘একক বা যৌথভাবে’ অর্থ হচ্ছে সামাজিক বা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রভাব বা চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিন্তা বা বিচার-বিশ্লেষণ করা। তিনি ইবাদতের একটি মাধ্যম হিসেবে ধ্যানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক ঘণ্টার ধ্যান সারা বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এছাড়া হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে, নবীজী (স) বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম (মেশকাত)।

যেখানে আল্লাহ তায়ালা এবং রসুলুল্লাহ (স) স্মরণ ধ্যান বা মেডিটেশনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, সেখানে অন্য কারো কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। অতএব এই বিষয়গুলোকে একেবারেই গুরুত্ব দেবেন না। আমরা সবসময় গুরুত্ব দেবো আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের কথায়।

প্রশ্ন : আপনি যখন কথা বলেন, তখন বলেন শোকর আলহামদুলিল্লাহ, প্রার্থনা কবুল করুন, ইবাদত-বন্দেগি-তার অনেকগুলো আরবি শব্দ। আমরা যারা

হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এ কথাগুলো বলতে ভালো লাগে না। তাই সব কথা যেন সহজভাবে আমরা বলতে পারি-তা-ই করলে ভালো হয়।

উত্তর : কিছু কিছু শব্দ কিন্তু এখন আর আরবি নাই। যেমন, শহীদ শব্দটি আরবি। কিন্তু এটি কি শুধু মুসলমানরা ব্যবহার করে? ক্ষুদিরামকে আমরা শহীদ ক্ষুদিরাম বলি। কলকাতায় শহীদ মিনার রয়েছে। শহীদ আরবি, মিনার শব্দটাও আরবি। আবার বাবু শব্দটি কিন্তু হিন্দু বা সংস্কৃত শব্দ নয়। বাবু শব্দটা হচ্ছে আরবি বা ফার্সি শব্দ। কিন্তু প্রত্যেক সনাতন ধর্মাবলম্বী পুরুষের জন্যে ‘বাবু’ সম্বোধন একটি সাধারণ ঘটনা।

আসলে কিছু শব্দ সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়। সেরকমই আমরা যে শব্দগুলো উচ্চারণ করি সাধারণভাবে এই শব্দগুলোর ব্যবহার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। আমরা শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলি, হরি ওম বলি, থ্যাংকস্ গড বলি, প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ভগবান তোমাকে ধন্যবাদ বলি, ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ বলি।

কারণ আমাদের কাছে আল্লাহ যেরকম পবিত্র, ঈশ্বর পবিত্র, ভগবান পবিত্র, গডও পবিত্র। কারণ একই প্রভুর অনেক নাম। যে নামে আমরা ডাকি একজনকেই ডাকি। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদের শিক্ষাও কিন্তু তা-ই যে, তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ‘একমেবদ্বিতীয়ং’। অতএব যে নামে ডাকুন কোনো অসুবিধা নেই। যেভাবে আপনার ভালো লাগে আপনি বলবেন। সেভাবেই তিনি সাড়া দিবেন।

আমাদের ফাউন্ডেশনে একজন খুব ব্যতিক্রমী সাধক এসেছিলেন। তাঁর বয়স ১১২ বছর। বাবা শিবানন্দ মহারাজ। ওনার জন্মস্থান বাংলাদেশ। কাশীতে তার আশ্রম আছে। আগরতলায় ১১২ তম জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে যাচ্ছেন।

যাওয়ার পথে ঢাকায় আমাদের ফাউন্ডেশনে এলেন। উনি দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে নিজেই উঠেছেন কোনো কিছু না ধরেই এবং দিব্যি চলাফেরা করছেন। কথাবার্তা, চেহারা দেখে যদি বয়স আন্দাজ করতে বলা হয়, যে কেউ বলবে, হয়তো ৭০-এর কোঠায়। তার খাবারও খুব মজার, খুব সহজ-সবজি, চাল-ডাল একসাথে রান্না করেন-তেল নাই, অন্য কিছু নাই। সকালবেলা উঠে যোগাসন করেন।

উনি বললেন যে, আমি ১৮ বার বলি শোকর আলহামদুলিল্লাহ। আমি তো প্রথমে অবাক যে, আমি ভুল শুনছি কি না। উনি আবার বললেন যে, আমি

সকালবেলা ১৮ বার শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলি। তারপর আমার মন্ত্র জপ করি। সকালবেলা প্রথমে শোকর আলহামদুলিল্লাহ ১৮ বার বলেন, তারপর উনি নারায়ণমন্ত্র জপ করেন। আসলে আলহামদুলিল্লাহ মানে হচ্ছে—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর মানে সৃষ্টিকর্তার।

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনি ইসলামের ব্যাপারে কতটুকু এক্সপার্ট যে, আপনি ধর্মীয় ব্যাপারে উত্তর দেন। আমাদের রসুলুল্লাহ (স) সারাজীবন তাওহীদের কথা বলেছেন, আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করেছেন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ থাকলো—আপনি যে হাদীসগুলো বলেন, তা সহি বা জাল কি না একটু যাচাই করে বলবেন। দুনিয়ার ব্যাপারে কোয়ান্টাম পারফেক্ট কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কোরআন এবং সহীহ হাদীসগুলোই ফলো করতে হবে। আমার প্রশ্নে আপনি কিছু মনে নেবেন না।

উত্তর : আসলে আমি এগুলোতে কখনো কিছু মনে নিই না। আর দুই নম্বর হচ্ছে যে, আমি কোনো ব্যাপারেই এক্সপার্ট না। কারণ ইসলাম যদি শুধু এক্সপার্টদের ধর্ম হতো তাহলে এটা সাধারণ মানুষের ধর্ম হতে পারতো না। ইসলাম হচ্ছে সাধারণ মানুষের ধর্ম। একজন সাধারণ মানুষ হওয়াই ইসলাম পালন করা, ইসলাম অনুসরণ করা এবং ইসলাম বোঝার জন্যে যথেষ্ট।

আর যাদেরকে এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ বলা হয়, আমরা বলি ঐ বিশেষ বিষয় ছাড়া সব ব্যাপারে সে অজ্ঞ। কিন্তু তারা মনে করে তারা সব ব্যাপারে এক্সপার্ট। কারণ জীবন শুধু কোনো বিষয়ের এক্সপার্ট হওয়ার নাম না। জীবন হচ্ছে জীবনের সবদিককে বোঝার নাম।

আপনি কোরআন খুব ভালো বুঝলেন। হাদীস খুব ভালো বুঝলেন কিন্তু এখনকার সময়কাল, এখনকার পরিবেশ, এখনকার জীবনজিজ্ঞাসা, এখনকার সমস্যা যদি আপনি না বোঝেন আপনি সমাধান করতে পারবেন না।

আপনি জীবনকে যদি গভীরভাবে না বোঝেন, জীবনের দুঃখ যদি না বোঝেন, জীবনের যন্ত্রণাকে যদি না বোঝেন, যুগের কষ্টকে যদি না বোঝেন, আপনি যে ব্যাপারেই এক্সপার্ট হোন না কেন, আপনি এ যুগের জন্যে একেজো হয়ে যাবেন।

কারণ প্রত্যেকটা যুগের কিছু নিজস্ব সমস্যা রয়েছে, নিজস্ব যন্ত্রণা রয়েছে, নিজস্ব কষ্ট রয়েছে এবং সেই যুগের আলোকে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সে সমস্যাগুলোর সমাধান আপনি তখনই করতে পারবেন যখন সেই সময়কে

সেই যুগকে আপনি বুঝবেন।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। ইসলামকে অনুসরণ করার জন্যে কোরআন-হাদীসে এক্সপার্ট হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামকে অনুসরণ করার জন্যে একজন সাধারণ বিশ্বাসী মানুষ হওয়াই যথেষ্ট। আন্তরিক হওয়াই যথেষ্ট যে, আমি আমার ধর্মকে অনুসরণ করবো, এটাই যথেষ্ট। বাকিটা আল্লাহই বলে দেবেন যে, তুমি কি করবে না করবে।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আমরা কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষাকে অনুসরণ করি, আন্তরিকভাবে অনুসরণ করি এবং আমাদের কোয়ান্টাম মেথডে কোথাও একটি বাক্য নেই যেটা কোরআন এবং হাদীসের শিক্ষা, রসুল (স)-এর শিক্ষার বিপরীত।

শুধু আজকে না, আজ থেকে ২০ বছর আগে আমরা বলেছি যে, পুরো কোয়ান্টাম মেথডে আমাদের পুরো কার্যক্রমে কেউ যদি দেখিয়ে দিতে পারেন যে, এই বাক্যটা কোরআন হাদীসের শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক—আমরা তাকে পুরস্কৃত করবো।

অতএব বিশ্বাসী হোন। আপনার বিশ্বাসই আপনাকে সত্যের সন্ধান দেবে। সূরা ফাতেহায় কী বলা হয়েছে? সূরা ফাতেহা পুরোটা হচ্ছে প্রার্থনা। আপনি যখনই নামাজে দাঁড়াচ্ছেন, আপনি প্রার্থনা করছেন। কোন পথে চলার জন্যে? সহজ-সরল পথে চলার জন্যে, হেদায়েতের পথে চলার জন্যে। এবং কোন পথ থেকে বিরত থাকার জন্যে? অন্ধকারের পথ থেকে, গহ্বরের পথ থেকে।

যখনই আপনি অন্তর থেকে এ প্রার্থনা করছেন—আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে যে আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করা। কারণ আপনি তো নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন আল্লাহর কাছে।

আল্লাহ তো আর সরাসরি এসে বলবেন না আপনার কাছে। আপনার মন বলবে যে, এটা ঠিক, এটা কর, এটা করো না। আর তারপরে আপনি যখন কোরআন এবং হাদীস পড়বেন, এর মর্মার্থ তখন আপনি বুঝতে পারবেন। যদি আপনার ভেতরে বিশ্বাস প্রবল থাকে।

যদি আপনার ভেতরে সমর্পণ থাকে—আপনি মর্মার্থ বুঝতে পারবেন। আর যদি সমর্পণ না থাকে, ঐ বিশ্বাস না থাকে তাহলে আপনি মর্মার্থেই যেতে পারবেন না কখনো। অতএব ইসলামকে অনুসরণ করার জন্যে আন্তরিক বিশ্বাসই যথেষ্ট।

কোর্স ফি

প্রশ্ন : আমি কোয়ান্টাম কোর্স করার কথা বললে অনেকে আমাকে বলেছে, তোমাদের প্রতি কোর্সে এত মানুষ হচ্ছে, দিন দিন সংখ্যা বাড়ছে; এখানে কি ফাউন্ডেশন ইচ্ছে করলে দুচারজন করে মানুষকে ফ্রি কোর্স করাতে পারে না? কারণ কিছু রোগী আছে যেমন সিজোফ্রেনিয়া বা মানসিকভাবে পর্যুদস্ত। এরা এ কোর্সটা করলে সুস্থ হয়ে যেতে পারে কিন্তু টাকার অভাবে তারা কোর্স করতে পারছে না। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তোমাদের প্রত্যয়ন জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করা। এই কল্যাণটুকু কি করা এতই কঠিন? গুরুজী, আমি এ কথার উত্তর দিতে পারি নাই। তাই আপনার কাছে উত্তর চাইছি।

উত্তর : প্রথমত, পৃথিবীতে এ ধরনের যত কোর্স রয়েছে তার মধ্যে আমাদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ফি হচ্ছে সবচেয়ে কম। আমেরিকাতে চারদিনব্যাপী এ ধরনের একটি কোর্স করতে আপনার লাগবে ৪০০০ ডলার বা আমাদের টাকায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। দীপক চোপড়া যে কোর্স পরিচালনা করেন ভারতের গোয়ায় এসে তার কোর্স ফি ৮৫ হাজার ইন্ডিয়ান রুপি। তা-ও শুধু নিরাময় অংশটুকু, বাকিগুলো নয়।

দ্বিতীয়ত, যে জিনিস মানুষ কোনো পরিশ্রম ছাড়া, মূল্য ছাড়া, বিনিময় ছাড়া গ্রহণ করে সেই জিনিসের মর্যাদা সে কখনো বোঝে না। এর এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। কমিউনিস্ট শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নে খাবার ছিলো সবচেয়ে সস্তা। রুটি আর ভদকা (একজাতীয় রাশিয়ান মদ) নামমাত্র মূল্যে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সরকার ভর্তুকির ব্যবস্থাও করেছিলো। রুটি সেখানে এত সস্তা ছিলো যে, বড় বড় বনরুটি দিয়ে বাচ্চারা ফুটবল খেলতো। কিন্তু এত সস্তায় খাবার সরবরাহ করেও সোভিয়েত ইউনিয়ন টিকে থাকতে পারে নি।

অর্থাৎ মানুষ যা ফ্রি পায় সেটার গুরুত্ব তার কাছে থাকে না। আমরা যখন কোর্স শুরু করি, প্রথম বছরে পরিচিতদের ধরে ধরে নিয়ে আসতাম। ফ্রি করার সুযোগ করে দিতাম। কারণ অন্তত বিশ, পঁচিশ, ত্রিশজন একটা ক্লাসে না থাকলে দেখতে ভালো লাগে না। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যত জন পয়সা ছাড়া কোর্স করেছেন, তাদের কেউই ফাউন্ডেশনের সাথে নাই। অনেকে চার দিন করার সময়ও পায় নি, দুদিন এসেছেন, তারপর আর

আসেন নি। তারা নাকি ব্যস্ত। কিন্তু যারা ফি দিয়ে কোর্স করেছিলেন তারা অনেকেই এখন পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের সাথে আছেন।

আমাদের করণ অভিজ্ঞতা আরো আছে। আমরা যখন ১০০ তম কোর্স করছিলাম আমাদের কোর্স ফি ছিলো সাড়ে চার হাজার টাকা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যেহেতু কোর্স এখন বিস্তৃত হচ্ছে, আমরা ছাত্রদের জন্যে বা যাদের প্রয়োজন তাদের জন্যে কিছু ছাড় দিতে পারি। আমরা ছাত্রদের জন্যে কোর্স ফি-র ২০০০ টাকা ছাড় দিলাম। অর্থাৎ আড়াই হাজার টাকা। আস্তে আস্তে কোর্সে লোক কমা শুরু করলো। যেখানে আমাদের কোর্সের সাধারণ উপস্থিতি ছিলো ৮০/৯০ সেখানে তা হয়ে গেল ৪০/৫০/৬০। আরো উল্লেখযোগ্য হলো ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি এখন আগের চেয়ে কম। বুঝতে পারছিলাম না কেন এ ক্রমাবনতি? যেখানে বাড়ার কথা সেখানে কমছে কেন?

এর মধ্যে এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী এসে বললো, সে তার ক্লাসমেটদের বলাবলি করতে শুনেছে যে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স নাকি এখন আর চলছে না। সেজন্যেই ফি কমে গেছে। তারা অনুমান করছে এই ফি আরো কমবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম আর কোনো কনসেশন থাকবে না। কোর্স ফি-ও ৫০০ টাকা বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা করা হলো। কয়েকদিন পর এক ছাত্র এসে আমাকে বললো, গত মাস পর্যন্ত তো আড়াই হাজার টাকা ছিলো! এখন স্টুডেন্ট কনসেশন নাই কেন? আমি বললাম, এই ৭/৮ মাস ধরে ২৫০০ টাকা ছিলো, তখন এলেন না কেন? বললো যে, আমরা তো ভাবছিলাম আরো কমবে বোধ হয়! সেজন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

আমরা বললাম, এখন আর কোনো সুযোগ নাই। যা-ই হোক পরের মাসেই কোর্সে উপস্থিতি বেড়ে গেল। পরের বছর যখন কোর্স ফি আরো ৫০০ টাকা বাড়লো, উপস্থিতি আরো বাড়লো। তার পরের বছর আরো। এভাবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোর্স ফি বাড়ার সাথে সাথে আমাদের কোর্সে উপস্থিতিও বাড়তে থাকে।

আসলে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব হচ্ছে, যা সে পর্যাণ্ড মূল্যের বিনিময়ে পেয়েছে বলে মনে করে সেটাকেই সে গুরুত্ব দেয় বেশি এবং কার্যকরী মনে করে এবং সেটাকে অনুশীলন করার ব্যাপারেও আন্তরিক থাকে বেশি। কিছু মানুষ এমনকি গর্বও বোধ করে।

তৃতীয়ত, আজ পর্যন্ত যিনি নিয়ত করেছেন যে, আমি কোর্স করবো, তিনি কোর্স করেছেন। টাকা তার কোর্স করার পথে কোনো অন্তরায় হয় নি। কোনো না কোনোভাবে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর এখন আমাদের

অফিসে কোর্স একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে কোর্সে অংশগ্রহণেচ্ছু যে কেউ নামমাত্র অর্থ জমা দিয়ে একাউন্ট খুলতে পারেন এবং এরপর নিয়মিতভাবে টাকা জমাতে পারেন।

যখনই কোর্স ফি পুরো হয়ে গেল, তিনি কোর্সে অংশ নিতে পারবেন। এবং এ কোর্সটা তিনি মনে রাখবেন সারাজীবন, কারণ কষ্ট করে যা শেখা হয়, যা অর্জন করা হয় সেটা মানুষ ধরে রাখে। কষ্ট ছাড়া যেটা পায়, সেটা আসলে ধরে রাখে না। অর্থাৎ ফি দিয়ে কোর্স করা এই কোর্স থেকে তার উপকৃত হওয়ার জন্যেই দরকার। কারণ যাকে আপনি বলছেন কোর্স ফি কমালে বা ফ্রি করলে সে আসতে পারতো, তাকে আপনি নিয়ে আসেন। দেখবেন যে প্রথম দিন আসার পর দুপুরেই তার মনে হবে ভালো লাগছে না, চলে যাওয়ার বাহানা খুঁজবে সে।

প্রশ্ন : সচ্ছল, মধ্যবিত্ত ও সক্ষম ব্যক্তি যারা, তারাই সুযোগ পাচ্ছি ব্যয়বহুল এ কোয়ান্টাম কোর্স করতে। সমাজের অসচ্ছল, আগ্রহী, নিম্ন আয়ের মানুষদেরকে কীভাবে কম খরচে এই সুন্দর কোর্সের সুযোগ করে দেয়া যায়?

উত্তর : সাধারণভাবে আমরা মনে করি, একজন মানুষকে আর্থিক সাহায্য করলেই বোধ হয় তার জীবনটাকে বদলানো যাবে। আসলে এটা একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। আর্থিক সাহায্য দিয়ে কখনও কারো জীবনকে বদলানো যায় না। এ প্রসঙ্গে ২০০৭ সালে সিডর বিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের ত্রাণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার কথা বলা যায়।

দুর্গত এলাকাগুলো সফর করে আমাদের কোয়ান্টিয়াররা দেখলেন, সিডর আঘাত হানার মাসখানেক পরেও মানুষজন রাস্তার পাশে ভাঙা ঘরবাড়ি, এলোমেলো পড়ে থাকা জিনিসপত্রের সামনে শুকনো মুখ করে বসে আছে। কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলছে, কোনো সাহায্য পায় নি। এইভাবে ত্রাণ তৎপরতা চালানো অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য নিচ্ছে। কিন্তু আবার পর দিন সেই ভাঙা ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সাহায্যের জন্যে।

তাদের কাজ দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিন্তু দ্বিগুণ-তিন গুণ মজুরি দিয়েও কাজের জন্যে রাজি করানো যায় নি। কারণ কাজ করার চেয়ে শুকনো মুখে বসে থেকে বিনাশ্রমে এই সাময়িক সাহায্য গ্রহণ করাকেই সে বেশি লাভজনক মনে করছে। কিন্তু এতে যে তার কোনো দীর্ঘমেয়াদী লাভ হবে না, সাময়িক এই সাহায্য শেষ হয়ে গেলে আবারও যে সে নিঃশ্ব, দুস্থ অবস্থায়

পতিত হবে এটা তাকে বোঝানো যাচ্ছে না। ফলে তাদের অবস্থারও কোনো পরির্তন ঘটে না।

যেমন তারা ঘর করার কথা বলে অনেকের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে, কিন্তু ঘর তারা বানাচ্ছে না। এই সুযোগে যত টাকা নিয়ে নেয়া যায়। অর্থাৎ টাকা দিয়ে বা ফ্রি-তে ছাড় দিয়ে আপনি কাউকে বড় করতে পারবেন না, যতক্ষণ না তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে।

যারা কষ্ট করে কোর্স ফি জোগাড় করে কোর্স করবেন কোর্সটা তিনি মনে রাখবেন সারাজীবন। কারণ কষ্ট করে যা শেখা হয়, যা অর্জন করা হয় সেটা মানুষ ধরে রাখে। কষ্ট ছাড়া যেটা পায়, সেটা আসলে ধরে রাখে না। যেমন হীরার গুরুত্ব এত কেন? কারণ হীরার দাম বেশি। হীরার দাম যদি কাচের সমান হয়ে যায় কেউ কিনবে না।

অতএব যেকোনো জিনিস আপনি যখন কষ্ট করে অর্জন করবেন, যখন মূল্য দিয়ে অর্জন করবেন, সেই জিনিসের প্রতি আপনার মমতা হবে তত বেশি। আমরা আগেও বলেছি, কোর্সের ব্যাপারে নিয়তটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনি নিয়ত করেন আপনি কোর্স করবেন। টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মেডিটেশন যেহেতু ধনী-গরিব সবার জন্যে, কিন্তু এর যে কোর্স ফি তাতে গরিবরা বঞ্চিত নয় কি? কোর্স ফি কেন বাড়ানো হয়?

উত্তর : কারণ হচ্ছে দ্রব্যমূল্য। যে কারণে নতুন পে-স্কেল হচ্ছে। কেউ তো বলছে না নতুন পে-স্কেল হওয়ার কারণ কী? যে কারণে নতুন পে-স্কেল হয়েছে, সেই একই কারণে কোর্স ফি বেড়েছে। আর গরিবরা বঞ্চিত কি না এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যখন কারো মধ্যে কোনো কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা ফল প্রসব করেই। এটি আমাদের কোর্সে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি।

আজ পর্যন্ত যারা কোর্স করতে চেয়েছেন, যার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে—সে যত গরিব হোক, কোর্স করার পথ তার জন্যে বেরিয়ে গেছে। হকার, গৃহকর্মী, গার্মেন্টস কর্মীসহ নিম্ন আয়ের অসংখ্য মানুষ আমাদের কোর্স করেছে। টাকা তাদের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর যে কোর্স করতে চায় না, কোর্স ফি যদি ৫০০ টাকাও করা হয় তা-ও সে করবে না।

কোর্স করাটা যদি ধনী বা গরিবের ওপরে নির্ভর করতো তাহলে এখনো আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ধনী রয়েছে। তাদের কজন কোর্স করতে

পেরেছেন? বরং যারা কোর্স করেছেন তাদের অধিকাংশই কষ্ট করে কোর্স ফি সংগ্রহ করেছেন এবং এ ব্যয়টাই তাদের জীবনের সবচেয়ে সার্থক ব্যয় হয়েছে, অন্য যেকোনো ব্যয়ের চেয়ে।

কোর্স করে লাভবান হয়েছেন এ রকম লোকের সংখ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। অতএব, কোর্স ফি যতই হোক এটি কোর্স করা বা না করার কোনো কারণ নয়। কোর্স ফি যদি ১০০০ টাকাও করা হয়, তখনও কোর্স করবেন না এরকম প্রচুর লোক থাকবেন।

কোর্সের সাথে কোর্স ফি এর সম্পর্ক খুব কম। আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আকাঙ্ক্ষা যার তীব্র হয়েছে, কোর্স করতে চেয়েছেন, এমন কেউ নাই যিনি কোর্স করতে পারেন নাই। ব্যবস্থা হয়েই গেছে, তিনি নিজেও বিস্মিত হয়েছেন যে, ব্যবস্থা এভাবে হতে পারে!

আসলে কোর্স ফি শুধু চার দিনের ফি নয়। এটা একটা লাইফ লং এটাচমেন্ট ফি। অর্থাৎ ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আজীবন সংযুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে যে সেবা সে গ্রহণ করছে তার এককালীন ফি।

আর কোর্স না করেও আমাদের অনেক কাজে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন। কোর্স করার আগে একজন মানুষ যাতে মেডিটেশনের ব্যাপারে ধারণা লাভ করতে পারেন, কোয়ান্টাম মেথড থেকে উপকৃত হতে পারেন সেজন্যে প্রতি মঙ্গলবার আমাদের সাপ্তাহিক আলোকায়ন প্রোগ্রাম আছে, প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক সাদাকায়ন প্রোগ্রাম আছে। এ প্রোগ্রামগুলো সবার জন্যেই উন্মুক্ত। প্রোগ্রামগুলোতে ফাউন্ডেশনের কাউন্সিলররা থাকেন, যাদের কাছ থেকে যে কেউ পরামর্শ নিতে পারেন।

কোর্স করার পরে পরিবারের কোনো সদস্য যখন ফাউন্ডেশনে অনাগ্রহী

প্রশ্ন : অনেক বোঝানোর পর আমার ছেলে কোর্স করেছে ২৪৭ তম ব্যাচে। কিন্তু এখন আর কোনো প্রোগ্রামে যেতে চায় না, মেডিটেশনও করতে চায় না। কীভাবে মোটিভেট করবো?

উত্তর : অস্থির না হয়ে আগে আপনাকে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। আপনার অন্তর্গত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। আমার মনে হয় আপনি

হয়তো নিয়মিত মেডিটেশন করছেন না। নিজে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। তারপর ছেলেকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান। আপনার মেডিটেটিভ লেভেল যখন ঠিক হবে তখন আপনার ছেলেরও ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তাকে চাপাচাপি করবেন না, জোর করবেন না। যেতে না চাইলে বকাবকিও করবেন না। কারণ জোর করে কোনো ভালো কাজও করানো যায় না।

প্রশ্ন : আমার পরিবারের সদস্য তিনজন, আমরা স্বামী-স্ত্রী এবং আমাদের মেয়ে। সবাই কোর্স করেছে কিন্তু আমার স্বামী প্রোগ্রামগুলোতে আসে না। আমি এবং আমার মেয়ে খুব চেষ্টা করি কিন্তু পারি না। কীভাবে পারবো দয়া করে যদি বলেন?

উত্তর : কোর্স যেহেতু তিনি করেছেন কাজেই প্রোগ্রামেও তিনি একদিন আগ্রহী হবেন। তবে ‘খুব চেষ্টা’ করতে যাবেন না। কারণ অনেক সময় বেশি বললেও আগ্রহ উবে যায়; বরং এখন কিছুদিন তাকে আর বলবেনই না। আপনারা প্রোগ্রাম থেকে এসে নিজেরা নিজেরা আলোচনা করতে পারেন যে, এই এই হলো। কিন্তু তার সামনে নয়। দেখবেন যে, কৌতূহলী হয়ে উঠছেন তিনি। আর পাশাপাশি কমান্ড সেন্টারে তার জন্যে দোয়া করবেন যাতে তিনি নিয়মিত প্রোগ্রামে আসেন।

কোয়ান্টাম চেতনার সাথে অসামঞ্জস্যতা

প্রশ্ন : যদি কোনো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের আচরণ কোয়ান্টাম চেতনার সাথে খাপ না খায় তখন কী করণীয়? কীভাবে উদ্ধৃত করা যায়?

উত্তর : তাকে উদ্ধৃত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো—যে বিষয়ে তাকে উদ্ধৃত করতে চাচ্ছেন, সে বিষয়ের মডেল নিজেই হয়ে যাওয়া। কারণ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা নিজেরা বদলাতে পেরেছেন তারাই অন্যদের সবচেয়ে ভালো উদ্ধৃত করতে পারেন। আর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পরেও একজন মানুষ দ্বিমত পোষণ করতে পারে। এটাও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ চার দিনেই একজন মানুষ পুরোপুরি বদলে যাবে, জীবনের সব সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলবে তা না-ও হতে পারে। তাকে সময় দিতে হবে, সুযোগ দিতে হবে।

এর জন্যে উত্তেজিত হওয়া যাবে না, বিতর্কে জড়ানো যাবে না, জোর করে তাকে বোঝাতে যাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই। তাকে ফাউন্ডেশনে আসতে বলতে পারেন। অর্গানিয়ারদের সাথে কথা বললে স্বাভাবিকভাবেই তার অনেক সংশয়-বিতর্কের অবসান ঘটবে। অর্থাৎ কারো বিতর্কিত আচরণ থেকে সাথে সাথে মনে মনে বা প্রকাশ্যে উত্তেজিত হয়ে যাবেন না। ধৈর্য ধরুন, সহনশীল সমমর্মী আচরণ করুন। দেখবেন তাকে জয় করার পথ পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : আমার ছোটভাই ও আমি কোর্স করেছি। ছোট ভাইটি মা-বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো। কোর্সের পরও তার কোনো উন্নতি নেই। এমনকি ঠিকমতো মেডিটেশনও করছে না। আমি তাকে ভালো করার মনছবি দেখছি। কিন্তু বাস্তবে আমি কী পদক্ষেপ নেবো বুঝতে পারছি না।

উত্তর : কারো কারো ধারণা যে, কোয়ান্টাম কোর্স করলেই একজনের আচার আচরণ রাতারাতি বদলে যাবে। কোনো কোনো মা-বাবা সন্তানদেরকে নিয়ে আসেন যেন কোনোরকমে কোর্স করলেই বোধ হয় সে রাতারাতি বদলে যাবে। আসলে ভালো জিনিস জানা বোঝা এবং ভালো হওয়া এ দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। দীর্ঘদিনের আচরণ অভ্যাস বদলাতে সময় লাগে। হয়তো ভেতরের পরিবর্তনটা খুব দ্রুত চলে আসতে পারে।

কিন্তু চেতনাগত পরিবর্তনটা আচরণগত পরিবর্তনে রূপ নিতে সবসময়ই সময় লাগে। এমনকি নবী-রসুলরাও যারা যুগে যুগে এসেছিলেন মানুষের আচরণগত পরিবর্তন এবং সদাচারী হওয়ার শিক্ষা দিতে, তারাও বছরের পর বছর ধরে তাদের অনুসারীদের সেই শিক্ষা অনুসারে আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তো সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু আমরা অনেকেই সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হই না।

আমরা বলি যে, কোর্স করেছে দুই দিন হয়ে গেল, এখনো তো পরিবর্তন হয় নি। আর তখনই আমরা বড় ধরনের ভুল করি। এতে তার ভেতরের পরিবর্তনের আগ্রহটাই বাধাগ্রস্ত হবে। ভাববে—ও আচ্ছা, আমাকে তো বলছে, চেষ্টা হয় নি, তাহলে তো আমি আগেই ভালো ছিলাম। যেরকম ছিলাম, সেরকমই থাকবো। এরকম খোঁটা যখনই দেয়া হয়, তখন তার পরিবর্তনটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিছিয়ে দেয়া হয়। অন্তত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তার একটা রিজার্ভেশন সৃষ্টি হয়ে যায়।

এজন্যে তাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, পরিবর্তনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শুধু বলবেন, বাহ! তোমাকে তো আগের চেয়ে ভালো লাগছে। তোমার রাগ তো একটু কমেছে।

অর্থাৎ সবসময় তাকে উদ্বুদ্ধ করবেন। সে যে ভালো হচ্ছে এটা তাকে বলবেন। কারণ, একজন মানুষ যখন প্রশংসা পায়, তখন এমন কিছু করতে সে দ্বিধাবোধ করে যা এই প্রশংসার বিপরীত। তার মনে হয়—এ কাজটা করবো? এটা করলে তো প্রশংসা পাবো না এবং দেখা যাবে যে, সে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছে।

আসলে কোনো কোনো মা-বাবা ভালোটাকে প্রশংসা করেন না, আর খারাপ কিছু পেলে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিন্দা-মন্দ করার জন্যে। অথচ সন্তানকে শোধরাবার উপায় হচ্ছে ভালোর প্রশংসা করা, ছোটখাটো খারাপকে অনেক ক্ষেত্রে দেখেও না দেখার ভান করা। অর্থাৎ তার মধ্যে যে দোষটি আছে, তা যে আপনারা জানেন, সেটি বুঝতে না দিয়ে পরোক্ষ উদাহরণ দিয়ে দোষগুলো ধরিয়ে দেয়া। কারণ, তাহলে সে-ও একধরনের সংকোচের গভির মধ্যে থাকবে—যে, মানুষ তার দোষগুলো সম্পর্কে জানে না, তাদের সামনে ভালো থাকার জন্যে।

তাকে সবসময় ফাউন্ডেশনে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সে যদি তার চেতনার যারা সঙ্গী তাদের সাথে বেশি সময় কাটাতে পারে তখন তার পরিবর্তনটা অনেক দৃশ্যমান হবে।

প্রশ্ন: আমার আগেই আমার বাবা কোর্স করেছেন। পাঁচ বছর বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু এখন নিজের ইচ্ছায় অসুস্থতার দিকে যাচ্ছেন। কথা বলতে গেলে নানান তর্ক করেন। এমনসব কথা বলেন যে, রাগ উঠে যায়। ছোটখাটো বিষয় নিয়েও খুব ঝামেলা করেন। বাসায় থাকা খুব সমস্যা হয়ে গেছে। আবার সন্তান হয়ে এ অবস্থাও দেখা যায় না। এসব কারণে হতাশায় ভুগছি। আমার করণীয় কী?

উত্তর : আমরা আনন্দিত যে, কোর্স করার পর পাঁচ বছর আপনার বাবা সুস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন আবার অসুস্থ হয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে তার বয়স হয়েছে। হয়তো রিটায়ার্ড এইজ। এই বয়সে কারো কারো মধ্যে এক ধরনের সেনালিটি বা বয়সজনিত মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। যেটাকে সেকেন্ড চাইল্ডহুডও বলে। অর্থাৎ শিশুর মতো অবুঝ, অসহায়, অন্যদের ওপর

নির্ভরশীলতা। আপনার বাবার অবস্থাও এখন তা-ই। তার এখন প্রয়োজন মমতা, যত্ন, মনোযোগ এবং পরিচর্যা।

আপনার প্রশ্ন থেকে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে আপনার বাবাকে আপনি খুব ভালবাসেন। সেই ভালবাসার দৃষ্টিতেই তাকে দেখুন। তাকে আসলে মানসিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ মনে করার কারণ নেই। কারণ, সুস্থ হলে তিনি এ ধরনের আচরণ করতেন না। তিনি হয়তো আপনাদের কাছ থেকে এখন আরো মনোযোগ চাচ্ছেন। তর্ক করা বা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝামেলা করার ব্যাপারগুলো হয়তো সেটার কারণেই হচ্ছে। তাকে এখন একটি শিশুর মতো দেখুন। রাগ করবেন না। তর্ক করবেন না। যতদিন বেঁচে আছেন সাধ্যমতো খেদমত করার চেষ্টা করুন। কারণ চলে যাওয়ার পর তো আর এই সুযোগ পাবেন না। পাবেন না বাবা বলে ডাকার মতো কাউকে।

আর আপনার বাবার জন্যে দোয়া করবেন, প্রতিদিন দুবার মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে বাবাকে নিয়ে আসুন। মমতা দিয়ে তাকে বোঝান যে, আপনি তাকে কত ভালবাসেন, তার নিরাময় কামনা করুন। আমি বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ আপনার বাবাকে নিয়ে এ সমস্যা থাকবে না।

মেডিটেশন



সাফল্যের শক্তি রহস্য

প্রশ্ন : একজন মানুষের সাফল্যের রহস্য কী? কেন সে বিশ্বাস করবে যে, সফল হবার সামর্থ্য তারও রয়েছে?

উত্তর : সফল হওয়ার জন্যে একজন মানুষের অর্থ-বিত্ত, বংশমর্যাদা, শান-শওকত, ডিগ্রি-পদবি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ সফল হবার জন্যে তার যা প্রয়োজন তা স্রষ্টা জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষকে দিয়ে দিয়েছেন এবং প্রতিটি সফল মানুষ এ সম্পদ বা পুঁজিকে ব্যবহার করেই সফল হয়। আর যারা ব্যবহার করে না তারাই হয় ব্যর্থ, হতাশ আর অকর্মণ্য। আর এই সম্পদ বা পুঁজির নাম হচ্ছে মস্তিষ্ক।

এই মস্তিষ্ক যে কত বড় পুঁজি, কত বড় সম্পদ তা আমরা কিছুটা বুঝতে পারবো যদি আমরা হিসেব করে দেখি মস্তিষ্ককে বাজারে কিনতে হলে কি রকম দাম দিতে হতো। আমরা জানি, মস্তিষ্কের কাছাকাছি যে যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায় তা হচ্ছে কম্পিউটার।

ফ্রে-১ হচ্ছে আশির দশকের একটা সুপার কম্পিউটার। এর ওজন সাত টন। আর মস্তিষ্কের ওজন হচ্ছে দেড় কিলো। ফ্রে-১ কম্পিউটারের এই সাত টনের দেহে ৬০ হাজার মাইল তার ব্যবহার করা হয়েছে। আর মস্তিষ্কের এই দেড় কেজি ওজনের মধ্যে যে তার ব্যবহার করা হয়েছে এর দৈর্ঘ্য দুই লক্ষ মাইল। ফ্রে-১ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ মিলিয়ন ক্যালকুলেশন বা হিসেব করতে পারে, মস্তিষ্ক পারে ২০ হাজার বিলিয়ন। অর্থাৎ মস্তিষ্ক এক মিনিটে যে কাজ করতে পারবে ফ্রে-১ সুপার কম্পিউটারের সেটি করতে লাগবে ১০০ বছর।

যে কারণে নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলেন, যেকোনো সুপার কম্পিউটারের চেয়ে মস্তিষ্ক হচ্ছে কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। এখন দাম হিসাব করুন। একটা কম্পিউটারের দাম ৫০ হাজার টাকা। মস্তিষ্ক ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। ১০ লক্ষ দিয়ে ৫০ হাজারকে পূরণ করুন। কত হয়? পাঁচ হাজার কোটি টাকা। পাঁচ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক আপনি।

ফ্রে-১ এর পর গত তিন দশকে আরো অনেক শক্তিশালী সুপার কম্পিউটার তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম কম্পিউটার আই বি এম রোড-রানার পর্যন্ত মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাকে স্পর্শমাত্র করতে পারে নি। বরং মস্তিষ্ক নিয়ে বিজ্ঞানীরা যতই গবেষণা করছেন ততই তারা বুঝতে

পারছেন বিশাল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তীরে ধেয়ে আসা ঢেউই কেবলমাত্র তারা গুণছেন।

মস্তিষ্কের মাত্র একটি বিষয়ও যদি আমরা দেখি, তাহলেও এর বিশাল কর্মক্ষমতা ও প্রতিটি মানুষের অফুরন্ত কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আরেকটু ধারণা করতে পারবো।

মস্তিষ্কে ১০০ বিলিয়ন নিউরোন সেল রয়েছে। প্রতিটি নিউরোন এক হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ নিউরোনের সাথে সংযুক্ত। কতগুলো যোগাযোগ সম্ভব? যুক্তরাষ্ট্রে মেডিটেশন সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রপথিক হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের প্রফেসর ড. হার্বার্ট বেনসন খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘সংখ্যাটি হবে : ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০।’

এটাকে আপনি অন্যভাবেও দেখতে পারেন। আপনি আপনার টেবিলে একটার ওপর একটা সাধারণ সাইজের টাইপ করার কাগজ রাখুন। রাখতে থাকুন। এটা উঁচু হতে থাকবে। আপনি যদি আপনার মস্তিষ্কের সম্ভাব্য নিউরোন সংযোগ সংখ্যার সমসংখ্যক কাগজ রাখতে চান, তাহলে কাগজের ঢিবি উঁচু হতে হতে চাঁদ পার হয়ে, সৌরজগৎ পার হয়ে গ্যালাক্সি পার হয়ে যাবে। এমনকি আমাদের জানা মহাবিশ্বের সীমানা (১৬ বিলিয়ন আলোকবর্ষ) পার হয়ে যাবে। তারপরও কাগজ রয়ে যাবে।

অর্থাৎ সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ দিয়েই স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রয়োজন শুধু এই অফুরন্ত সম্ভাবনাময় জৈব কম্পিউটারকে পরিকল্পিতভাবে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে শেখা।

প্রশ্ন : মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার জন্যে কী করা উচিত?

উত্তর : মস্তিষ্করূপী বিস্ময়কর জৈব কম্পিউটার যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন সুসংহত মানসিক প্রস্তুতি। আর মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত বা অভিশ্রায়। কারণ মন পরিচালিত হয় দৃষ্টিভঙ্গি বা নিয়ত দ্বারা। আর মস্তিষ্কে চালায় মন। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করেছেন মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে। ড. এলেন গোল্ডস্টেইন, ড. জন মটিল, ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড ও ড. ই রয় জন দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন, একজন প্রোগ্রামার যেভাবে কম্পিউটারকে পরিচালিত করে, তেমনি মন মস্তিষ্কে পরিচালিত করে।

মস্তিষ্ক হচ্ছে হার্ডওয়ার আর মন হচ্ছে সফটওয়ার। নতুন তথ্য ও নতুন

বিশ্বাস মস্তিষ্কের নিউরোনে নতুন ডেনড্রাইট সৃষ্টি করে। নতুন সিন্যাপসের মাধ্যমে তৈরি হয় সংযোগের নতুন রাস্তা। বদলে যায় মস্তিষ্কের কর্মপ্রবাহের প্যাটার্ন। মস্তিষ্ক তখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন বাস্তবতা উপহার দেয়। নতুন বাস্তবতা ভালো হবে না খারাপ হবে, কল্যাণকর হবে না ক্ষতিকর তা নির্ভর করে মস্তিষ্কে দেয়া তথ্য বা প্রোথ্রামের ভালো-মন্দের ওপর। কল্যাণকর তথ্য ও বিশ্বাস কল্যাণকর বাস্তবতা সৃষ্টি করে আর ক্ষতিকর তথ্য বা বিশ্বাস ক্ষতিকর বাস্তবতা উপহার দেয়।

ধরুন, ব্রেনে যদি প্রোথ্রাম দিতে থাকেন—পোড়া কপাল, পোড়া কপাল, পোড়া কপাল—ব্রেনের জন্যে এটা কমান্ড হয়ে যায় যে, কপালটাকে পোড়াতে হবে। অতএব যেখানে গেলে আপনি অপমানিত হবেন, কষ্ট পাবেন, যন্ত্রণা পাবেন ব্রেন ঘুরে ফিরে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে যাতে অপমানিত হয়ে, লাঞ্ছিত হয়ে আপনি বলতে পারেন যে, ‘বলেছিলাম না, আমার পোড়া কপাল’। আবার ব্রেনে যদি প্রোথ্রাম দিতে থাকেন সাফল্য সাফল্য সাফল্য—তাহলে আপনি সাফল্যের সূত্র খুঁজে পাবেন। যেখানে গেলে সহযোগিতা পাবেন, ব্রেন আপনাকে ঘুরে ফিরে ওখানে নিয়ে যাবে। তাই মনের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই ব্রেনকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন।

আর মনের শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশনের ফলে খোদ মস্তিষ্কেই ঘটেছে এমন কিছু পরিবর্তন যা একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তাসহ তার বোঝার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এ নিয়ে নিউজউইক ম্যাগাজিনের ১০ জানুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, একজন মানুষের মস্তিষ্কের নিউরোন ও সিন্যাপসের (দুটি নিউরোনের মধ্যবর্তী সংযোগ পথ) সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয় উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তা। আর গবেষণায় দেখা গেছে, ক্রমাগত মনোযোগ দিয়ে বিস্তৃত করা যায় এ সিন্যাপসকে। আরো দেখা গেছে, মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করে নিয়মিত মেডিটেশনে তার পুরাত্ব বেড়েছে। আর মেডিটেশনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করার চূড়ান্ত যোগসূত্রটা হচ্ছে স্ট্রেস সারাতে মেডিটেশনের অব্যর্থ ফল। বিজ্ঞানীরা বলেন, স্ট্রেস নিউরোনের শত্রু। স্ট্রেসের ফলে নিঃসৃত কর্টিসোল হরমোন নিউরোনের মায়োলিন শিথ নামক আবরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, বাধাগ্রস্ত করে নিউরোনগুলোর আন্তঃপারস্পরিক যোগাযোগকে। মেডিটেশনের প্রথম লাভই যেহেতু প্রশান্তি,

তাই একজন নিয়মিত ধ্যানী সবসময়ই সাধারণদের তুলনায় বুদ্ধিমান, প্রজ্ঞাবান এবং সফল বেশি।

প্রশ্ন : আমরা কেন এই বিশাল শক্তিভান্ডারকে ব্যবহার করতে পারি না? কেন ব্যর্থতা আসে?

উত্তর : আসলে মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনাকে সবসময় শৃঙ্খলিত ও পঙ্গু করে রাখে সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে প্রচলিত ধারণার শৃঙ্খলে সে ক্রমান্বয়ে বন্দি হয়ে পড়ে। পরিবেশ যা তাকে ভাবতে শেখায় সে তা-ই ভাবে, যা করতে বলে তা-ই করে।

প্রতিটি সম্ভাবনাময় মানবশিশু মনোজাগতিক দাসত্বের কারণে পরিণত হয় এক অসহায় নিরুপায় প্রাণীতে। সার্কাসের হাতির জীবনের দিকে তাকালে এই মনোজাগতিক দাসত্বের বিষয়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

জঙ্গল থেকে দূরন্ত প্রাণ চঞ্চল হস্তি শাবককে ধরে এনে ছয় ফুট লোহার শিকল দিয়ে শক্ত পাটাতনের সাথে বেঁধে রাখা হয়। প্রথমদিকে হস্তিশিশু শিকল ছেঁড়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালায়। কিন্তু এত ছোট শরীর দিয়ে সে জিঞ্জির ভাঙতে পারে না। উল্টো তার পা-ই রক্তাক্ত হয়ে যায়। ফলে এক সময় এই গন্ডি ও বন্দিত্বের কাছে হস্তি শিশু আত্মসমর্পণ করে। এভাবে তার মধ্যে তৈরি হয় সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে এই গন্ডি, এই জিঞ্জির থেকে তার মুক্তি নেই। এটাই তার নিয়তি।

হস্তি শিশু বিশালদেহী পূর্ণাঙ্গ হাতিতে পরিণত হওয়ার পরও শিকল দিয়ে তাকে ছাগল বাঁধার খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেও সে ছয় ফুট বৃত্তকেই তার পৃথিবী ধরে নেয়। যখনই শিকলে টান পড়ে তখনই সে তার বৃত্তের আরো ভেতরে প্রবেশ করে। ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে বলে, এর চেয়ে আর এগুনোর সাধ্য তোমার নেই।

এমনকি দেখা গেছে, সার্কাস মেলায় আগুন লাগলেও হাতি তার শিকল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে না। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারণ ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে সেখানেই দাঁড় করিয়ে রাখে। যখন তার দেহের শক্তি দিয়ে এক টানে খুঁটিসহ সব কিছু উপড়ে ফেলতে পারে, তখনও সে ভাবে, এই ছয় ফুট বৃত্তই আমার নিয়তি। তার এ শৃঙ্খল লোহার শিকলের নয়, খুঁটির নয়। এ শৃঙ্খল হচ্ছে মনের।

আমাদের অবস্থাও তা-ই। আমাদের প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি পরিবারের পুরো জাতির বিপুল সম্ভাবনা, শক্তি ও সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও সংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস, শোষক ও পরাভববাদীদের আরোপিত মিথ্যা ধারণার শৃঙ্খলে আমরা নিজেদেরকে গন্ডিবদ্ধ ও বন্দি করে ফেলেছি। মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙতে পারলেই আমরা আমাদের বিশাল শক্তিভান্ডারকে ব্যবহার করতে পারবো। ব্যর্থ থেকে সফল হবো।

প্রশ্ন : মন নিয়ন্ত্রণ কথাটার মানে কী? একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : মনকে নিয়ন্ত্রণ করার আগে আমাদের অবশ্য মন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা স্মরণ রাখা উচিত। বিজ্ঞানীরা মনকে ভাগ করেছেন তিন ভাগে। সচেতন, অবচেতন এবং অচেতন। সচেতন মন সবকিছুকেই নিজের ধারণা, যুক্তি ও বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করে। কিন্তু অবচেতন মন ভালো-মন্দ কোনো কিছুই বিচার করার চেষ্টা করে না। সে যে তথ্য, পরিকল্পনা বা আইডিয়া পায়, সেভাবেই প্রভাবিত হয়ে কাজ শুরু করে দেয়। প্রভাবটা আপনার জন্যে ভালো হোক বা ক্ষতিকর সে বিবেচনা করে না।

ভয়, ক্রোধ বা বিশ্বাস দ্বারা গভীরভাবে তাড়িত হলে যেকোনো ধরনের প্রভাবে অবচেতন মন সহজেই সাড়া দেয়। মনের অবচেতন অংশ আবার সচেতন অংশের কথা সহজেই শোনে। ভয়, সীমাবদ্ধতা বা ভুল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সচেতন মন সবসময় অবচেতন মনের দরজা বন্ধ করে রাখতে চায়।

অথচ প্রজ্ঞার সাথে সচেতন মনের যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে অবচেতন মন। কারণ সচেতন ও অচেতন মনের মাঝখানেই অবস্থান করছে অবচেতন মন। বিজ্ঞানীরা যাকে মনের অচেতন অংশ বলে মনে করেন, সাধকরা সেটাকেই মনে করেন মনের মহাচেতন অংশ। শুধুমাত্র অবচেতন ও অচেতনের মাঝখানের দরজা খুলতে পারলেই সচেতন মন প্রজ্ঞা বা মহাচেতনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।

আমরা আগেই জেনেছি, অবচেতন মন ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। আর অবচেতন মন আলাদীনের দৈত্যের মতো কখনও অলস বসে থাকতে পারে না। তার চাই কাজ। আপনি যদি তাকে আপনার কল্যাণে ইচ্ছানুসারে ব্যস্ত না রাখেন তাহলে সে আপনার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই কাজের কাঁচামাল হবে

আপনার ভয়, ভীতি, অপছন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত বিষয়সমূহ। খারাপ বা ভালো যে বিষয় সে পাক না কেন অবচেতন মন সে চিন্তাকে তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অবচেতন মন যেহেতু ভালোমন্দ বিচার না করেই প্রেরিত চিন্তাকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেহেতু সাফল্যের জন্যে আপনি কী চান সে সম্পর্কে অবচেতন মনকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পাঠাতে হবে। তাহলেই অবচেতন মন সেই চিন্তা ও নির্দেশকে তার যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

আর আমরা জানি, মনের প্রতিটি কাজ করে দেয় আমাদের ব্রেন। আর ব্রেন কাজ করে বিশেষ নিয়মে। সক্রিয় অবস্থায় ব্রেন থেকে প্রতিনিয়ত খুব মৃদু বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিকিরিত হয়। বিজ্ঞানীরা একে বলেন, ব্রেন ওয়েভ। ১৯২৯ সালে ডা. হ্যাস বার্জার ইলেকট্রো এনসেফেলোগ্রাফ (ইইজি) যন্ত্র দ্বারা এই ওয়েভ বা তরঙ্গ মাপেন। মানসিক চাপ, সতর্কতা, তৎপরতামূলক পরিস্থিতিতে ব্রেনের বৈদ্যুতিক বিকিরণ বেড়ে যায়। তখন ব্রেন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ডে ১৪ সাইকেল থেকে ২৬ সাইকেল পর্যন্ত। একে বলা হয় বিটা ব্রেন ওয়েভ।

চোখ বন্ধ করে বিশ্রামকালে একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব সৃষ্টি হলে ব্রেনের বৈদ্যুতিক তৎপরতা কমে যায়। এ অবস্থায় ব্রেন ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সি দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ডে আট থেকে ১৩ সাইকেল। একে বলা হয়, আলফা ব্রেন ওয়েভ। থিটা ব্রেন ওয়েভ আলফার চেয়ে ধীর। এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে চার থেকে সাত সাইকেল।

এরপর রয়েছে গভীর নিদ্রাকালীন ব্রেন ওয়েভ। এর ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ০.৫ থেকে তিন সাইকেল। একে বলা হয় ডেল্টা ব্রেন ওয়েভ। ব্রেন ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেন্ডে ২৭ বা তার ওপরে উঠে যেতে পারে হঠাৎ উত্তেজিত অবস্থার ফলে। একে বলা হয় গামা ব্রেন ওয়েভ।

আমরা জানি বিশ্রাম, তন্দ্রা বা নিদ্রাকালীন সময়ে অবচেতন মন সবচেয়ে সৃজনশীল থাকে ও ভালোভাবে কাজ করে। আর বিশ্রাম বা তন্দ্রাকালীন সময় দেহ-মন পুরোপুরি শিথিল হয়ে গিয়ে ব্রেন ওয়েভ নেমে যায় প্রতি সেকেন্ডে ১৩ থেকে চার সাইকেলে, বিজ্ঞানের পরিভাষায় আলফা/ থিটা লেভেলে।

এখন যদি আমরা কৃত্রিমভাবে শিথিলায়নের (Relaxation) মাধ্যমে শরীর-মনে বিশ্রাম ও তন্দ্রাকালীন আবহ সৃষ্টি করতে পারি, তাহলেও ব্রেন ওয়েভ নেমে আসবে আলফা/ থিটা লেভেলে। আর ব্রেন ওয়েভকে আলফা/

খিটা লেভেলে নামিয়ে আনতে পারলেই ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি হবে। অবচেতন মনের গভীরের শক্তিকে কাজে লাগানোর পথ হবে মুক্ত।

আপনি প্রবেশ করতে পারবেন মনের আরও গভীরে। সচেতন মন যেমন অবচেতনকে যথাযথ নির্দেশ প্রদান করতে ও সৃজনশীলভাবে কাজে লাগাতে পারবে, তেমনি পারবে অচেতন বলয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে। আর অবচেতন তখন সেই নির্দেশ বা ধারণাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুকূল ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সিতে নিরলস কাজে নেমে পড়বে। শরীর-মনকে শিথিলায়নের মাধ্যমে ব্রেন ওয়েভকে আলফা লেভেলে নিয়ে মনের ধ্যানাবস্থা সৃষ্টিই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, মন নিয়ন্ত্রণ, মেডিটেশন বা পরিকল্পিত ধ্যানের প্রথম ধাপ।

প্রশ্ন : মেডিটেশন আসলে কী?

উত্তর : তিনটি দিক থেকে আমরা মেডিটেশনকে ব্যাখ্যা করতে পারি :

প্রথমত, সচেতনভাবে পেশি এবং স্নায়ুর শিথিলায়ন। সাধারণভাবে শরীর যখন শিথিল হয় তখন আমরা অচেতন হয়ে যাই, ঘুমিয়ে পড়ি। মেডিটেশনে দেহ শিথিল হবে কিন্তু চেতনা সজাগ থাকবে, আপনি সচেতন থাকবেন।

দ্বিতীয়ত, অস্থির মনকে স্থিরকরণ এবং মনোযোগকে সুচাগ্র করা। আমাদের মন হয় অতীত নিয়ে অনুশোচনা করে, না হয় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, সে বর্তমানে থাকতে চায় না, স্থির থাকতে চায় না। আমাদের মনের অবস্থা হচ্ছে অনেকটা বাঁদরের মতো।

বাঁদরের সবচেয়ে প্রিয় খাবার হচ্ছে কলা। আপনি একটা বাঁদরকে খুব আদর করে এক কাঁদি কলা দিয়ে বসিয়ে বলেন যে, ‘বাঁদর ভাই, বাঁদর আপা, তুমি বসে বসে কলা খাও’। বাঁদর কী করবে? প্রথম কলাটা ছিঁড়ে নিয়েই সে গাছের ডালে উঠবে। এক কামড় খেয়ে আরেক ডালে যাবে। আর এক কামড় খেয়ে আর এক ডালে যাবে। দেখা যাবে আর এক ডালের সাথে লেজ পেঁচিয়ে সে দোলনার মতো দুলাচ্ছে।

বাঁদর যেরকম এক জায়গায় থাকতে পারে না আমাদের মনও সেরকম স্থির থাকতে চায় না। সবসময় ফুটবলের মতো গুধু লাফালাফি করে। ওপর থেকে পড়ে আবার ওপরে ওঠে। আমাদের মনকে বর্তমানে নিয়ে আসা, অর্থাৎ অস্থির মনকে স্থির করা হচ্ছে মেডিটেশনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মন স্থির হলেই মনোযোগ সুচাগ্র হয়।

সুচাগ্র মনোযোগের শক্তিকে আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। একখণ্ড কাগজ রোদে সারাদিন রেখে দিলেও তাতে আগুন ধরবে না। কিন্তু একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস সূর্যের আলোতে ধরে ফোকাস পয়েন্টটি কাগজের ওপর ফেললে কয়েক মুহূর্তেই তাতে আগুন ধরে যায়। তেমনি মনোযোগ সুচাগ্র হলে যেকোনো জটিল বিষয়ও সহজে বোঝা যায়।

তৃতীয়ত, আত্মনিমগ্নতা। যখন একজন মানুষ আত্মনিমগ্ন হয়, নিজের আত্মার সাথে, অন্তরতম আমি-র সাথে, field of pure potentialities এর সাথে সংযুক্ত হয় তখনই সে প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। তার দৃষ্টি, তার অনুভবের দরজা খুলে যায়। সে নতুন সত্যকে অনুভব করতে পারে।

প্রশ্ন : অনেকেই বলেন মেডিটেশনের প্রাপ্তি কী তা এককথায় বুঝিয়ে বলতে। কিন্তু এতবড় প্রাপ্তি এক কথায় বুঝিয়ে বলা কীভাবে সম্ভব তা আমার বোধগম্য হয় না। এক্ষেত্রে সর্বোত্তম জবাব কী হতে পারে?

উত্তর : আসলে মেডিটেশনের প্রাপ্তি এত ব্যাপক যে, তা এককথায় বুঝিয়ে বলা সত্যি কঠিন। তারপরেও যদি কেউ জানতে চায় তো বলবেন মেডিটেশনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে ভালো থাকা, 'ভালো আছি' এই কথাটি বলতে পারা। আপনি যদি মেডিটেশন করেন তাহলে অন্তর থেকে বলতে পারবেন যে, 'আমি ভালো আছি'।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করে কি আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবো?

উত্তর : নিশ্চয়ই পারবেন। প্রত্যেকটি সমস্যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাধানের বীজ-নতুন সম্ভাবনা। সফল ব্যক্তির সমস্যার মধ্যে সম্ভাবনাকেই খুঁজে বের করেন। কিন্তু আমরা-সাধারণ মানুষরা-সমস্যা এলেই টেনশন গুরু করে দেই। সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি গামা লেভেলে, উত্তেজিত অবস্থায়। ফলে সমাধানের পথ তো খুঁজে পাই-ই না বরং সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলি।

আসলে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে আলফা লেভেলে, আত্মনিমগ্ন অবস্থায়। মেডিটেশনে স্থির অবস্থায় ব্রেনকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তাদের বিজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, ব্যবসায়ীরা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের ব্রেন এবং মন স্থির থাকে, সমস্যার ভেতরের সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করে আনতে পারেন তারা।

তাই কোয়ান্টামে আমরা বলি, সমস্যা + টেনশন = সংকট।

এবং সমস্যা + মেডিটেশন = সমাধান।

সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান না হওয়ার কারণ হচ্ছে, সে সমস্যা নিয়েই বেশি ভাবে। সমাধান নিয়ে নয়। নিজেকে সে সমস্যার অংশ করে ফেলে। আর সফল মানুষরা সমস্যা নিয়ে নয় ভাবেন এর সমাধান নিয়ে। তারা সমাধান পেয়ে যান। নিয়মিত মেডিটেশন করলেই আপনি সমাধান নিয়ে ভাবতে শিখবেন। সমাধান বেরিয়ে আসবে।

প্রশ্ন : আপনাদের ক্যাসেটে লেখা থাকে ‘টেনশন মুক্তির জন্যে মেডিটেশন (শিথিলায়ন)’। মেডিটেশন কীভাবে টেনশন থেকে মুক্তি দিতে পারে?

উত্তর : আসলে সহজভাবে বলতে গেলে, টেনশন কেন হচ্ছে? দুশ্চিন্তা করছেন, বিপদের কল্পনা করছেন, সেজন্যে টেনশন হচ্ছে। চিন্তা যদি করতেই হয় দুশ্চিন্তার দরকার কী? সুচিন্তা করুন। একজন লোক ছোরা নিয়ে দৌড়াচ্ছে, এটা কল্পনা না করে কল্পনা করুন একজন গোলাপ নিয়ে দৌড়াচ্ছে আপনার পেছনে। আহা! বেচারী! আমাকে ধরতেও পারছে না, গোলাপটা দিতেও পারছে না! কল্পনা করলেই তো মনে শান্তি এসে যায়।

শিথিলায়নে আমরা এই সুন্দর সুন্দর চিন্তাই করছি। তাই টেনশন চলে যাচ্ছে। টেনশনের ব্যাপারে নবীজী (স)-এর একটা হাদীস এখানে উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন যে, ‘উত্তেজিত হলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়, বসা থাকলে শুয়ে পড়।’ টেনশনের প্রকৃতি হচ্ছে শোয়া মানুষকে দাঁড় করিয়ে দেয়া। তাই দাঁড়ানো মানুষ যদি শুয়ে পড়তে পারে, তার উত্তেজনা, টেনশন দূর হয়ে যাবে। শিথিলায়নে আমরা আসলে প্রত্যেকটা কোষকে শুইয়ে দিই।

অবশ্য এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। টেনশনের শারীরিক প্রকাশ হচ্ছে ‘ফ্লাইট অর ফাইট রেসপন্স’। বিজ্ঞানী ওয়ালটার ক্যানন তার গবেষণায় দেখেছেন, আমরা যখন কোনো বিপদকে অনুভব করি তখন হাইপোথ্যালামাস নামে ব্রেনের একটা ছোট অঙ্গে রাসায়নিক সংকেত যায়। হাইপোথ্যালামাস আবার আমাদের সিম্পেথটিক নার্ভাস সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে। সিম্পেথটিক নার্ভাস সিস্টেম তখন এড্রিনালিন, নোরিপাইনফ্রাইন, কর্টিসল ইত্যাদি নানা ধরনের স্ট্রেস হরমোন তৈরি করে।

এই স্ট্রেস হরমোনগুলো তখন রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দেহকে পালানো বা লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত করে তোলে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়

এবং বৃহৎ পেশিগুলোতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। চামড়ার নিচে রক্ত কণিকাগুলো সংকুচিত হয় যাতে এক্সিডেন্ট হলে বেশি রক্তপাত না হয়। চোখের মণি বড় হয়ে যায়। তাই আমরা ভালো দেখতে পাই। ব্লাড সুগার বেড়ে যায় দেহে শক্তির যোগান দেয়ার জন্যে। হজম এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ঘ্রোথ হরমোন বন্ধ হয়ে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আর এ সবগুলো প্রক্রিয়াই হয় যাতে আমরা জোরে দৌড়াতে পারি বা লড়াই করতে পারি।

১৯৬৭ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক ড. হার্বার্ট বেনসন তার গবেষণায় দেখলেন অদ্ভুত ব্যাপার। যখনই একজন মানুষ মেডিটেশন করছে তখন তার দেহে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা স্ট্রেস এর প্রতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। মেডিটেশনে সিম্পেথটিক নয়, অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের প্যারাসিম্পেথটিক ব্রাঞ্চ সক্রিয় হয়ে উঠছে।

এই ব্রাঞ্চই আমাদের প্রশান্ত করে। রক্তে এড্রিনালিন, নোরিপাইনফ্রাইন ও কর্টিসলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নার্ভ ও মাংসপেশি শিথিল হয়ে উঠছে। মেটাবলিক রেট কমে যাচ্ছে। অক্সিজেন গ্রহণ ও হার্টবিট হ্রাস পাচ্ছে। ব্লাড প্রেশার কমছে। দেহে ব্যথা বা আঘাতের অনুভূতি হ্রাস পাচ্ছে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ক্ষমতা বাড়ছে। রোগমুক্তির প্রক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠছে।

অর্থাৎ শিথিলায়ন বা মেডিটেশনের শারীরিক প্রকাশ টেনশনের শারীরিক প্রকাশের সম্পূর্ণ বিপরীত। শিথিল দেহে টেনশন থাকতে পারে না।

অধ্যাপক বেনসন তার গবেষণার আলোকে 'The Relaxation Response' নামে একটি বই লেখেন, যা অল্প সময়েই যুক্তরাষ্ট্রে বেস্ট সেলারে পরিণত হয়। হাজার হাজার আমেরিকান টেনশনমুক্তির জন্যে মেডিটেশন চর্চা শুরু করেন। আজ পর্যন্ত টেনশনকে মোকাবেলা করার জন্যে এর চেয়ে কার্যকর কোনো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব আপনি নিঃসংকোচে টেনশনমুক্তির জন্যে মেডিটেশন চর্চা করতে পারেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন কীভাবে সঠিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : মেডিটেশন আসলে একজন মানুষের ভালো দিক এবং মন্দ দিক—দুইই বুঝতে সাহায্য করে। আর ভালো দিককে বিকশিত করা এবং মন্দ দিককে পরিবর্তনের জন্যে যে ভেতরের তাগিদ থাকা দরকার এটা একজন মানুষ লাভ করে আত্মনিমগ্ন অবস্থাতেই।

যদি একজন মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন করে, তার ভেতরে পরিবর্তনের এমন একটা অনুরণন সৃষ্টি হয় যা তার বাইরের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং অন্যান্য সবকিছুকে আগাগোড়া বদলে দিতে পারে। আর কোয়ান্টাম মেথডের মেডিটেশন যেহেতু ডায়নামিক বা সক্রিয় তাই এই মেডিটেশনে ডাবল একশন।

এই মেডিটেশনে আমরা অটোসাজেশন দিচ্ছি। অটোসাজেশন হচ্ছে মস্তিষ্কে ক্রমাগত প্রোগ্রাম দেয়া। এবং যখনই মস্তিষ্ক ক্রমাগত একটা প্রোগ্রাম পেতে থাকে তখন সে সেই অনুসারে কাজ শুরু করে এবং আমি যা হতে চাই এই হওয়াটা তখন সহজ হয়। ভেতরের যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব জড়তা সংকোচ ভয়-ভীতি-এগুলো খুব সহজে উপড়ে ফেলা যায় অটোসাজেশনের মাধ্যমে।

আপনি শুধু ছয় মাস নিয়মিত চর্চা করে দেখুন অটোসাজেশন কাজ করে কি না। আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন, আপনার ব্যক্তিত্বকে কতখানি বদলে দিতে পারে অটোসাজেশন তা দেখে!

প্রশ্ন : অন্যায় বা পাপ করলে কি মেডিটেশনের মাধ্যমে মাফ পাওয়া যায়?

উত্তর : মাফ করার মালিক আল্লাহ। তিনি গাফুরুর রহীম বা ক্ষমাশীল। যে কাউকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন, যদি সে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায় এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করে।

মেডিটেশন মানুষকে একাত্ম হতে সাহায্য করে। যখন একজন মানুষ আত্মনিমগ্ন হয় তখনই তার মধ্যে অনুশোচনাটা ভেতর থেকে আসে। ক্ষমা পাওয়ার জন্যে এই ভেতরের অনুশোচনাটাই দরকার।

প্রশ্ন : চেতনার ছয়টি মাত্রা কী কী? এই ছয়টি মাত্রা পুরোপুরি আয়ত্ত করা কীভাবে সম্ভব?

উত্তর : চেতনার প্রথম মাত্রা হচ্ছে জাগৃতি। দ্বিতীয় মাত্রা নিদ্রা। তৃতীয় মাত্রা স্বপ্ন। চতুর্থ মাত্রা অতিচেতনা। পঞ্চম মাত্রা অনন্ত চেতনা। ষষ্ঠ মাত্রা হচ্ছে একাত্ম চেতনা এবং এই ছয়টি মাত্রাই পুরোপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব। এর জন্যে দরকার সাধনা, চেষ্টা।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা এবং মেডিটেশন না করে কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করা কি এক?

উত্তর : আসলে মেডিটেশনের লেভেলে গিয়ে যে চিন্তা করা সেই চিন্তা সাধারণ লেভেলে চিন্তা করার চেয়ে অনেক অনেক গভীর। বিটা লেভেলে আসলে নিজস্ব স্বার্থ চিন্তাটাই বেশি প্রকট হয়। তাছাড়া বিটা লেভেলে আমরা যা চিন্তা করি তা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রভাবিত। তাই বিটা লেভেলে সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান বলেন, শিল্প বলেন, সাহিত্য বলেন, যা কিছু সৃজনশীল, যা কিছু কল্যাণকর সবকিছু মানুষ আবিষ্কার করেছে যখন সে আত্মনিমগ্ন হয়েছে।

যখন একজন মানুষ কিছু সময় বাইরের পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে তখন তার জীবনদৃষ্টিতে সেই চিন্তার, সেই ভাবনার গভীর ছাপ পড়ে। তার জীবনদৃষ্টি পরিবর্তিত হয়।

যুগে যুগে যারা পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছেন, ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তন করেছেন তারা কেউ মিছিল করতে করতে, ভাঙচুর করতে করতে, জ্বালাও পোড়াও করতে করতে, জিন্দাবাদ মর্দাবাদ করতে করতে পরিবর্তন করেন নি। কারণ ভেতর থেকে পরিবর্তন না এলে জোর করে বাইরে থেকে পরিবর্তন আনা যায় না।

পরিবর্তন সবসময় আসে নীরব মুহূর্তে, ধ্যানের স্তরে। যখন একজন মানুষ আত্মনিমগ্ন হয়, নিজের আত্মার সাথে, ‘অন্তরতম আমি’র সাথে, field of pure potentialities-এর সাথে সংযুক্ত হয় তখনই সে প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। তার দৃষ্টি, তার অনুভবের দরজা খুলে যায়। সে নতুন সত্যকে অনুভব করতে পারে।

ইতিহাসের দিকে তাকান, হযরত ইব্রাহীম (আ) আত্মনিমগ্ন হলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—কে আমার স্রষ্টা? একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন পাঁচদিন—তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেলেন এবং সেই নতুন জ্ঞান তাঁর অনুসারীদের মাঝে প্রচার করলেন।

হযরত মুসা (আ) সিনাই পাহাড়ে চলে গেলেন, আত্মনিমগ্ন হলেন। স্রষ্টার সাথে তাঁর কথা হলো। স্রষ্টার বাণী লাভ করলেন এবং সেই বাণী নিয়ে এসে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত করলেন।

যিশুখ্রিষ্ট বা হযরত ঈসা (আ) মাঝে মাঝে পাহাড়ে চলে যেতেন। আত্মনিমগ্ন হতেন এবং স্রষ্টার বাণী এনে মানুষের মাঝে, অনুসারীদের মাঝে প্রচার করতেন। আমাদের মুনি-ঋষিরা তপোবনে চলে যেতেন, হিমালয়ে চলে যেতেন, সাধনা করতেন। সিদ্ধিলাভ করে আবার লোকালয়ে এসে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতেন।

মহামতি বুদ্ধ অশ্বথ বৃক্ষের নিচে বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন, তারপর বোধি লাভ করলেন। রসুলুল্লাহ (স) হেরা গুহায় বছরের পর বছর ধ্যানমগ্ন থাকলেন, তারপরে তিনি নবুওয়াত লাভ করলেন। অতএব মেডিটেশনে চিন্তা আর মেডিটেশন না করে চিন্তা কখনোই এক নয়।

আসলে মেডিটেটিভ লেভেলে চিন্তা আর সাধারণ লেভেলে চিন্তা এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যকে আমরা একটা পরিচিত উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি। আমরা জানি, বিজ্ঞানী নিউটন কীভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারেন। একদিন তিনি আপেল গাছের নিচে মেডিটেশনে বসেছিলেন। এমন সময় একটা আপেল নিচে পড়লো। তার মনে প্রশ্ন জাগলো, আপেলটা নিচে কেন পড়লো? ওপরে কেন উঠলো না? গভীর ভাবনায় মগ্ন হলেন তিনি। আবিষ্কার করলেন ল' অফ গ্রাভিটেশন।

আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কি গাছ থেকে আম পড়তে দেখেন নি? দেখেছেন, দেখার সাথে সাথে কী করেছেন? এদিক-ওদিকে তাকিয়েছেন। দৌড়ে গিয়ে আমটাকে ধরেছেন। ছুরি দিয়ে ছিলেছেন। ঝাল-মরিচ, লবণ লাগিয়েছেন। খেয়ে ফেলেছেন। কেন? কারণ তারা দেখেছেন বিটা লেভেলে। দেখার সাথে সাথে জিভে পানি চলে আসছে। আহ! কী সুন্দর আম একটা পড়লো। কিন্তু নিউটন দেখেছিলেন আত্মনিমগ্ন অবস্থায়। একই ফল পড়া থেকে কেউ ফল খায়, আর কেউ বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করে। এটাই হচ্ছে আলফা এবং বিটা লেভেলের মধ্যে তফাত।

প্রশ্ন : ঘুম আর শিথিলায়ন কি একে অপরের পরিপূরক? দিনের বেলা ঘুমের পরিবর্তে কি কোনো নির্দিষ্ট সময় শিথিলায়ন করলে দিনের বেলায় ঘুম প্রয়োজন হবে না?

উত্তর : আসলে একজন মানুষ দিনের বেলায় ঘুমের সময় কীভাবে পায় আমি এটাই বুঝি না। জীবন তো একটাই। আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি ব্যয় করে ফেলেন তো জীবনকে উপভোগ করবেন কীভাবে? এমনিই তো রাতে আট ঘণ্টা ঘুমাচ্ছেন। আপনার ৬০ বছর আয়ু হলে ২০ বছর ঘুমিয়েই কাটালেন, জীবনের এক তৃতীয়াংশ ঘুমেই চলে গেল। তারপরও আবার দুপুরের ঘুমের কী প্রয়োজন?

শিথিলায়ন শুধু দিনের ঘুম নয়, আপনার রাতের ঘুমের প্রয়োজনকেও কমিয়ে দেবে। কারণ অনেক বিবেচনাতেই শিথিলায়ন ঘুমের চেয়ে বেশি

উপকারী। যেমন টেনশন বা দুশ্চিন্তা করলে আমাদের রক্তে ল্যাকটেট নামক ক্ষতিকারক টক্সিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন, ঘুম অবস্থায় রক্তে ল্যাকটেট যে পরিমাণ কমে, শিথিলায়নে কমে তার চার গুণ। অর্থাৎ ল্যাকটেটের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষেত্রে আধা ঘণ্টা মেডিটেশন দুই ঘণ্টা ঘুমের সমান উপকারী।

ইউনিভার্সিটি অফ কেন্টাকির বায়োলজির প্রফেসর ড. ব্রুস ওহারা একদল কলেজ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণায় ছাত্রছাত্রীদের তিনটি দলে ভাগ করে তাদের একদলকে মেডিটেশন করানো হয়, অন্যদলকে ঘুমাতে বলা হয় এবং তৃতীয় দলকে টিভি দেখানো হয়।

এরপর তাদের বলা হয় একটা নির্দিষ্ট স্ক্রিনে বাতি জ্বলে ওঠার সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিতে। দেখা গেল, সবচেয়ে দ্রুততার সাথে বোতামে চাপ দিতে পেরেছে যারা মেডিটেশন করেছে তারা। সে তুলনায় যারা ঘুমিয়ে ছিলো তাদের তৎপরতা ছিলো বেশ ধীর। অর্থাৎ ঘুমের চেয়ে মেডিটেশনের পরে মস্তিষ্কের সমন্বয় ও তৎপরতা বেশি থাকে।

তাই আমরা বলি, আপনার সুবিধাজনক সময়ে আধাঘণ্টা করে মোট এক ঘণ্টা মেডিটেশন করুন। এতে আপনি চার ঘণ্টা ঘুমের সমান উপকার পাবেন। আর চার ঘণ্টা ঘুমাবেন। চার ঘণ্টা ঘুম, এক ঘণ্টা মেডিটেশন সমান আট ঘণ্টা ঘুমের উপকার। জীবন থেকে আরো তিন ঘণ্টা সময় বেরিয়ে এলো কাজ করার জন্যে। অবশ্য হঠাৎ করে আপনি ঘুমের পরিমাণ কমাতে পারবেন না। ধীরে ধীরে কমাতে হবে।

মেডিটেশনের প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া

প্রশ্ন : মেডিটেশনের পরিবেশ, পোশাক ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে কিছুর বলবেন কী?

উত্তর : মেডিটেশনের সময় হালকা আলো থাকবে। পর্যাপ্ত বাতাস থাকবে। কখনো অন্ধকার রুমে মেডিটেশন করবেন না। রাতে যখন মেডিটেশন করবেন সবসময় হালকা আলো জ্বালিয়ে করবেন। একটু যদি হাত মুখ ধুয়ে নেন বা ঠান্ডা পানির ঝাপটা মুখে দিয়ে নেন তো খুব ভালো হবে। এছাড়া টিলেঢালা আরামদায়ক পোশাক পরবেন এবং চশমা খুলে নেবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন শুয়ে, বসে বা কীভাবে করলে সবচেয়ে ভালো হবে?

উত্তর : মেডিটেশন আপনি শুয়ে, চেয়ারে বসে বা মেঝেতে বসে অর্থাৎ যেভাবে করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেভাবেই করবেন।

মেডিটেশন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে চাইলে অথবা বিশেষ কোনো সমস্যা থাকলে শুয়ে মেডিটেশন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে শক্ত বিছানায় মাদুর বা পাতলা কার্পেট বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন। প্রয়োজনে মাথার নিচে একটি পাতলা বালিশ দিতে পারেন। শোয়ার পর হাত থাকবে দেহের দুপাশে, হাতের তালু থাকবে ওপরের দিকে। দুপায়ের মাঝখানে অন্তত চার আঙুল ফাঁক থাকবে। তবে শুয়ে করলে ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

সাধারণভাবে চেয়ারে বসে করাটাই ভালো। কারণ তাহলে মেরুদণ্ড খাড়া থাকবে, আপনি সচেতন থাকবেন, ঘুমিয়ে পড়বেন না। ফলে ধ্যানের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবেন। প্রাচীন মিশরীয়রা চার হাজার বছর আগে চেয়ারে বসে মেডিটেশন করতেন। চেয়ারে যখন বসবেন দুই পা মাটিতে লেগে থাকবে। দুই পায়ের মাঝখানে ছয় থেকে আট আঙুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। দুই হাত দুই হাঁটুর ওপরে থাকবে। তবে মেরুদণ্ড সোজা থাকলেও শক্ত থাকবে না।

প্রশ্ন : বজ্রাসন বা গোমুখাসনে শিথিলায়ন বা মেডিটেশন করা যাবে কী?

উত্তর : যারা যোগের বিভিন্ন আসন জানেন—পদ্মাসন, সুখাসন, গোমুখাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি যেকোনো আসনে বসে মেডিটেশন করতে পারেন। বজ্রাসনে এতক্ষণ বসে থাকতে যদি অসুবিধা না হয় তাহলে করতে পারেন। গোমুখাসনেও যদি অভ্যস্ত হয়ে যান, মেডিটেশন করতে পারেন। যারা নামাজ পড়েন জায়নামাজে যেভাবে বসেন সেভাবেই মেডিটেশন করতে পারেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করার প্রথম নিয়ম হিসেবে জানি যে, চেয়ারে বসে করলে মেরুদণ্ড সোজা করে মাটিতে পা রেখে করতে হবে। কিন্তু অনেকে বলে প্রাকটিস হয়ে যাওয়ার পর দেহভঙ্গি কোনো ব্যাপার না। আসলে কি তাই?

উত্তর : দেহভঙ্গি সবসময়ই ব্যাপার। আমাদের অধিকাংশের সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন মনে করি আমরা এক্সপার্ট হয়ে গেছি, তখন ভাবি এখন আর নিয়ম আমার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক নয়। যেমন নামাজের

নিয়ম আছে। আপনি যদি মনে করেন প্রথমদিকে নিয়মমতো পড়বো, এরপর আর লাগবে না, তাহলে হবে না। নামাজে প্রথম যেভাবে দাঁড়াতে হবে যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন ঐভাবেই দাঁড়াতে হবে। সেরকম মেডিটেশন যেভাবে প্রথম আপনি শুরু করেছেন, যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন সেভাবে করতে হবে, যদি শারীরিক কোনো সমস্যা না হয়। আর মেডিটেশন নিয়মিত করলে শারীরিক সমস্যা এমনিতেই কম হবে।

প্রশ্ন : অনেক সময় মেরুদণ্ড সোজা করে মেডিটেশন করলেও শেষে নিজেকে আবিষ্কার করি, মেরুদণ্ড বেশ বাঁকা হয়ে বসে আছি।

উত্তর : যদি মেডিটেশনের মাঝখানে বুঝতে পারেন যে, মাথা ঝুঁকে গেছে—সচেতনভাবে সোজা হবেন। যাদের মেরুদণ্ড বেশি বাঁকা হয়ে যায় তারা গোমুখাসন করবেন। যত গোমুখাসন করবেন তত মেরুদণ্ড সোজা থাকবে।

দম

প্রশ্ন : শ্বাস এর চেয়ে প্রশ্বাসে একটু বেশি সময় নেয়ার কি কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে? থাকলে অনুগ্রহ করে জানানবেন।

উত্তর : এটা খুব সহজ। দম নেয়ার সময় আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং দম ছাড়ার সময় শরীরের জন্য ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেই। আমরা যখন প্রশ্বাসে বেশি সময় নিচ্ছি তখন ভেতরের যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এটা বেশি পরিমাণে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটাই ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন : শিথিলায়নের উদ্দেশ্য যদি চেতনাকে উজ্জীবিত করা হয় তাহলে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা কি?

উত্তর : বুক ফুলিয়ে শ্বাস হচ্ছে দেহকে উজ্জীবিত করার জন্যে, চেতনাকে নয়। শিথিলায়নে আমরা দেহকে শিথিল করতে চাই। এসময় দেহে অক্সিজেনের প্রয়োজন হ্রাস পায়। দম নেয়ার সময় পেট ফুললে ফুসফুস কম সম্প্রসারিত হয়। দেহে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই শিথিলায়নের সময় আমরা পেট ফুলিয়ে দম নেই।

প্রশ্ন : মেডিটেশন চলাকালে বুক ভরে দম নিতে পারি না, নাক বন্ধ থাকে ।

উত্তর : নাক বন্ধ থাকলে তো চিকিৎসা করতে হবে । হালকা ধরনের নাক বন্ধ হলে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম করলে তা ভালো হয়ে যাবে । কিন্তু এটা যদি বেশিদিন ধরে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া উচিত । সাধারণভাবে সাইনুসাইটিসের জন্যে নাক বন্ধ হতে পারে, আবার পলিপ্সের জন্যে হতে পারে ।

যদি সাইনুসাইটিসের জন্যে হয় তাহলে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের সাথে সাথে রাতে শোয়ার সময় এবং ভোরবেলা জাগার সাথে সাথে গরম পানি দিয়ে গার্গল করলে নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে । আর পলিপ হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে ।

মনের বাড়ি

প্রশ্ন : মনের বাড়ির ব্যাপারটি এখনো আমার কাছে সঠিকভাবে বোধগম্য হয় নি । বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হবো ।

উত্তর : আসলে মনের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার সর্বোত্তম প্রয়োগ আপনি তখনই করতে পারবেন যখন মন সকল প্রকার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রশান্ত ও আনন্দিত থাকবে । এই জন্যেই মনের বাড়ি ।

তাই মনের বাড়ি তৈরি করবেন এমন কোথাও যে জায়গাটা আপনার খুব পছন্দ । হয়তো কোথাও বেড়াতে গিয়ে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আপনার মন খুব ভালো হয়ে গিয়েছিলো । সেখানে আপনি মনের বাড়ি বানিয়ে নিতে পারেন । অথবা টিভিতে বা পোস্টারে দেখা আপনার কোনো প্রিয় স্থান বা কোনো কাল্পনিক জায়গাতেও আপনি মনের বাড়ি বানিয়ে নিতে পারেন । পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র, জঙ্গল যা আপনাকে আনন্দ দেয় সবকিছু মিলিয়ে মনের মতো করে মনের বাড়ির পরিমন্ডল সৃষ্টি করুন ।

তেমনিভাবে দেশে-বিদেশে যে বাড়িটা আপনার পছন্দ সেটাকেই মনের বাড়ি বানিয়ে নিন । যদি কোনো বাড়িই পছন্দ না হয় তাহলে কাল্পনিকভাবে বাড়ি তৈরি করে নিতে পারেন । অর্থাৎ মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যে জায়গাটাকে মন খুব পছন্দ করে । একজন মানুষ সারাদিন কাজ কর্ম করে যখন বাড়িতে ফেরে তখন সে যেমন প্রশান্তি অনুভব

করে, এক ধরনের নিশ্চয়তা অনুভব করে, মনের বাড়িতেও মন যেন তেমনি প্রশান্ত, আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠে।

মনের বাড়ি যাওয়ার পথে আলফা স্টেশন রয়েছে। আলফা স্টেশন হচ্ছে মস্তিষ্কে আলফা ওয়েভ সৃষ্টি হওয়া। যেরকম আমরা কোথাও যেতে চাইলে বাস বা রেল স্টেশনে গিয়ে উঠি সেরকম মস্তিষ্কে আলফা ওয়েভ সৃষ্টি হলে মন প্রশান্ত হয়। তারপর মনের আরো গভীর স্তরে প্রবেশের রূপকল্পই হচ্ছে মনের বাড়ি।

মনের বাড়িতে একটি দরবার কক্ষ থাকবে। দরবার কক্ষটা বেশ বড়সড় করে বানাবেন। দরবার কক্ষের ডানদিকে একটা পথ থাকবে, সেটা দিয়ে নিরাময় কক্ষে যাওয়া যাবে। দরবার কক্ষের বামদিকে থাকবে কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার পথ।

মনের বাড়িতে প্রয়োজন অনুসারে আরো যত রকম কক্ষ যোগ করতে চান করতে পারেন। যারা সংগীত চর্চা করেন সেখানে একটা রেযাজকক্ষ বানিয়ে নিন। যারা অভিনয় করেন তারা একটা অভিনয়ের মঞ্চ বানিয়ে নিন।

কারো কারো মনে হতে পারে যে, এত সুন্দর বাড়ি বানালাম। স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, প্রিয়জন সবাইকে বাদ দিয়ে একা পড়ে থাকবো? একা থাকার প্রয়োজন নেই। আপনি যাকে ইচ্ছা ওখানে নিয়ে যেতে পারেন। গিয়ে দেখবেন যে, সবাই আপনাকে ওয়েলকাম হোম, ওয়েলকাম হোম, ওয়েলকাম হোম করছে। শুধু যার সাথে ঝগড়া করেন তাকে নিয়ে যাবেন না। তাহলে দেখা যাবে ওখানে গিয়েও ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে কী কী যানবাহন ব্যবহার করতে পারি বা কী কী উপায়ে যাওয়া যেতে পারে?

উত্তর : আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে যেতে পারেন, যাদের একটু দৌড়ানোর অভ্যাস আছে, দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যেতে পারেন। বলবেন যে, এখানেও দৌড়াতে হবে? রিকশা নিয়ে যেতে পারেন। বলবেন এখানেও রিকশা? পরীর মতো ডানা মেলে উড়ে চলে যেতে পারেন। বলবেন পরী ব্যাকডেটেড ব্যাপার, আধুনিককালে পরী-টরী কিছু নেই। তাহলে কী করবেন, ওখানে গিয়েই দেখবেন যে, ড্রাইভার আপনার জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ গাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে যেতে পারে, ধানক্ষেত দিয়ে যেতে পারে, জঙ্গলের ওপর দিয়ে যেতে পারে, পানির ওপর

দিয়ে যেতে পারে, আকাশ দিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ যেভাবে আপনার খুশি সেভাবে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : নিজের বাড়িকে মনের বাড়ি কল্পনা করতে কি কোনো অসুবিধা আছে?

উত্তর : নিজের বাড়ি যদি আপনার মনের মতো হয় তাহলে নিজের বাড়িকেই মনের বাড়ি ভাবতে পারেন। আর যদি ভাড়াবাড়িতে থাকেন তাহলে মনের মতো একটা বাড়ি বানাতে দোষ কোথায়? এটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

প্রশ্ন : আমার মনের বাড়ি আমি মৃদু শ্রোতধারার ঝর্নার পাশে জঙ্গলের মধ্যে রেখেছি। আমি কি সবসময় এই বাড়িতেই যাবো নাকি এই বাড়ি চেঞ্জ করতে পারবো। অন্য পরিবেশেও যেতে পারবো।

উত্তর : বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি ভাড়াটিয়া-ভাড়াবাড়িতে থাকেন। তাই বাড়ি বদলাতে চান। যতদিন বদলাতে চান বদলান। বাড়ি, পরিমন্ডল সবকিছু বদলাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। বদলাতে বদলাতে একটা বাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। যেটা আপনার একেবারে মনে গেঁথে যায়, পছন্দ হয়ে যায় সেটাতে আপনি থাকবেন।

প্রশ্ন : মনের বাড়ির দরবার কক্ষ, নিরাময় কক্ষ, কমান্ড সেন্টার-এসব কি পরিবর্তন করা যাবে? নাকি এর কোনোটা নিষেধ আছে?

উত্তর : কোনোটার ওপর নিষেধ নেই। ইচ্ছামতো বদলে নেবেন। কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : মনের বাড়ির কিছু অংশ বদলাতে চাচ্ছি। কিন্তু এ স্তরে কী কী রাখবো তা স্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারছি না। তাহলে কি আগের মতোই থাকবে?

উত্তর : আসলে যারা প্রবীণ তাদের পক্ষে মনের বাড়ি বানানো একটু কঠিন, একটু কষ্টকর। কেন? তাদের নানারকম যুক্তি কাজ করে। ট্রান্স ভেন্টিলেশন হবে কি না, জানালা কোন দিক দিয়ে করবো, দরজা কোন দিক দিয়ে করবো-এ নিয়ে তাদের অনেক চিন্তা। কিন্তু যারা নবীন তাদের এসব নিয়ে অত চিন্তা-ভাবনা নাই। দরজা নাই তাতে কি, জানালা দিয়ে ঢুকে যাবো।

তা-ও না থাকলে লাফ দিয়ে ঢুকে যাবো। মনের বাড়ি বানানো তাদের জন্যে খুব সহজ এবং তারা খুব সুন্দর সুন্দর মনের বাড়ি বানিয়ে ফেলে।

একবার কোর্সের দ্বিতীয় দিন ক্লাসে ঢোকার সময় লক্ষ্য করলাম—এক দূরন্ত কিশোর তার দাদা-নানার বয়সী তিন-চারজনকে মনের বাড়ির ওপর লেকচার দিচ্ছে। দুচারটা শব্দ কানে গেল, কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম যে, বাবা, মনের বাড়ি কোথায় বানালে?

সে একগাল হেসে বললো, গুরুজী, হোয়াইট হাউজটা আমার খুব পছন্দ, হোয়াইট হাউজকেই আমি আমার মনের বাড়ি করেছি। অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাসভবনকে সে তার মনের বাড়ি বানিয়েছে।

আপনি যতদিন না স্পষ্ট ধারণা করতে পারছেন ততদিন মনের বাড়ি আগের মতোই থাকুক। যখনই স্পষ্ট ধারণা আসবে—বাড়ি বদলে ফেলবেন।

প্রশ্ন : ক) মেডিটেশন করার সময় মনের বাড়িতে গিয়ে হেঁটে বেড়ানোর সময় প্রায়ই পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাই না। মনে হয় অতলে ডুবে যাচ্ছি—এ অবস্থায় কী করবো?

খ) মেডিটেশনের সময় যা ভাবি না তা-ই দেখি। যেমন, আমি ভাবছি নদীতে সাঁতার কাটছি বা বর্নার পানিতে নেমেছি, এরপর আমি আর পানি থেকে উঠতে পারি না। ডুবে যেতে থাকি।

গ) আমার মনের বাড়ি একটা দ্বীপের মধ্যে বানিয়েছিলাম। কয়েকদিন যাবৎ সেখানে গেলেই মনে হচ্ছে দ্বীপে পানি উঠে একটা অংশ ডুবে যাচ্ছে।

ঘ) গাড়ির দরজা খুলেছি, কিন্তু বার বার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমি গাড়িতে উঠতে পারি না। অবশেষে হেঁটে মনের বাড়িতে যাই।

ঙ) আমার মনের বাড়িকে কিছুতেই বড় করতে পারি না। যতবারই বড় করি ততবারই ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঢুকতে গেটের সামনে একটু জঞ্জাল হয়ে থাকে, পরিষ্কার করতে পারছি না। এটা নিয়ে খুব টেনশনে আছি। এটা কি আমার মনের সংকীর্ণতা, না অন্য কিছু? এটা কি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে আমার মেডিটেশনে?

চ) আমি নিয়মিত মেডিটেশন শুরু করেছি। সমস্যা হলো মনের বাড়ির আশপাশের পরিসর অপরিষ্কার মনে হচ্ছে। মনের বাড়ির একটা অংশ খুবই অস্পষ্ট, অন্ধকার, দরজা-জানালা কিছুই নেই। চেষ্টা করেও এর সমাধান করতে পারি নি। কীভাবে সুন্দর প্রাণবন্ত একটা মনের বাড়ি পেতে পারি?

উত্তর : আপনি আসলে অবচেতনভাবে মনের গভীরে যেতে চাইছেন না। আপনার ভেতরের কোনো নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক সত্তা আপনার গভীরে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করছে, সেটার প্রকাশ ঘটছে এভাবে।

এটা কাটানোর উপায় হচ্ছে নিয়মিত মেডিটেশন করা এবং অটোসাজেশন দেয়া যে, আমি এবার মেডিটেশনে যাবো, গভীর একাগ্রতার সাথে মেডিটেশন করবো। প্রতিটি জিনিস আমি যেভাবে চাইবো সেভাবেই ঘটবে। সচেতনভাবে যা চাই, অবচেতন স্তরেও তারই প্রতিফলন আমি দেখতে পাবো। আমার মনের বাড়ি সুন্দর থাকবে, পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত থাকবে, আমার দ্বীপ পানির ওপরে থাকবে, ইচ্ছে করা মাত্র গাড়ির দরজা খুলে যাবে। আমি খুব চমৎকারভাবে যেতে পারবো, থাকতে পারবো এবং সমস্ত সত্তা নিয়ে আমি আমার মনের বাড়ির আনন্দকে উপভোগ করতে পারবো। সেই সাথে মনের বিষ ও মনের বাঘ দূর করার মেডিটেশনগুলো কিছুদিন চর্চা করলে আপনি উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন : যখন গভীর লেভেলে যাই তখন শরীর ঝাঁকি খায় কেন?

উত্তর : আসলে ঝাঁকি খাওয়ার অর্থও একই। আপনি গভীর স্তরে যেতে চাচ্ছেন; কিন্তু অবচেতনে ভয় বা অন্য কোনো নেতিবাচক আবেগ কাজ করছে। এক্ষেত্রে আলফা স্টেশনে মনের বিষ বা মনের বাঘ দূর করার মেডিটেশনগুলো কিছুদিন চর্চা করলে এ বাধা দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মনের বাড়িতে পৌঁছানোর পর আমার মনের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। আশেপাশে, বাগানে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে আর সেখানেই প্রকৃতির মাঝে ধ্যান বা মনছবি দেখতে ইচ্ছা করে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : বাড়ি-ঘর যদি ভালো না লাগে জোর করার দরকার নেই। জঙ্গলই ঠিক আছে। বাড়ি আসুক, বৃষ্টি আসুক, কী অসুবিধা? বৃষ্টিতে ভিজবেন, রোদে পুড়বেন। জঙ্গলে যদি মশা-টশা থাকে কামড় খাবেন। যতদিন পর্যন্ত ঢুকতে ইচ্ছা না হয় ঢুকবেন না। যখন ইচ্ছা করবে তখন ঢুকবেন।

প্রশ্ন : রাতে মেডিটেশন করলে মনের বাড়িতে গিয়ে দিন না রাত মনে করবো, ঠিক করতে পারি না।

উত্তর : মনের বাড়িতে সবসময় রাত, সবসময় দিন। আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা মনে করবেন। যদি রাত হয় বাতি জ্বালিয়ে নেবেন। মনের বাড়িতে তো আর লোডশেডিং নেই।

প্রশ্ন : মনের বাড়ির রুমটিতে এসি থাকবে না জানালা খোলা থাকবে?

উত্তর : যদি কোনো ঠান্ডা পরিবেশে হয় এবং সে ঠান্ডা যদি আপনার জন্যে সহনীয় হয় তাহলে আপনি জানালা খোলা রাখতে পারেন। আর যদি খুব গরম জায়গাতে হয় তাহলে সেখানে এসি লাগানো ভালো। অর্থাৎ এসি থাকবে না খোলা জানালা থাকবে সেটা নির্ভর করছে আপনি কেমন অনুভব করছেন তার ওপর।

প্রশ্ন : প্রত্যেক জিনিসই সুন্দর হলে তার প্রতি আলাদা আকর্ষণ থাকে। আমার মনের বাড়ির সব কিছু সুন্দর কিন্তু আমি অর্থাৎ নায়ক যদি ফিজিকেলি কালো ও শরীরের গড়ন সুন্দর না হয় তাহলে সেখানে আনন্দটা বা সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। এজন্যে কী করবো?

উত্তর : ওখানে গিয়ে নিজেকে সুন্দর সুপুরুষ হিসেবে কল্পনা করবেন তাহলেই হলো। আর কালো হলেই কি অসুন্দর হয়? কালো কিন্তু সাদার চেয়েও সুন্দর হতে পারে। আবার ধবধবে ফর্সা কিন্তু কোনো সৌন্দর্য নেই—তা-ও হতে পারে। সুতরাং কালো বলেই নিজেকে অসুন্দর মনে করার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন : মনের বাড়ি গিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায় না? যেমন, হে মঙ্গলময় ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা কর।

উত্তর : ঈশ্বরকে ডাকার জন্যে, ভগবানকে ডাকার জন্যে, আল্লাহকে ডাকার জন্যে মনের বাড়ির চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথাও নাই। মনের বাড়িতে আপনি যেভাবে চান সেভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। চাইলে একটা গীর্জা তৈরি করে ফেলুন। মন্দির তৈরি করে ফেলুন। অথবা নামাজের জন্যে একটা কক্ষ তৈরি করুন। আপনি যেভাবে সুবিধা বোধ করেন সেভাবেই করতে পারেন।

অবলোকন

প্রশ্ন : মনের বাড়িতে গেলে কিছুই দেখতে পারি না। সব অন্ধকার মনে হয়। তারপরও মনছবি বা অটোসাজেশন দিচ্ছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে তা বাস্তবে হচ্ছে। কিন্তু আমি কেন সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাই না?

উত্তর : আসলে পরিষ্কার দেখতে পেলেন কি পেলেন না তাতে কী আসে যায়? আপনার মনছবি যদি বাস্তব হয়ে যায়, অটোসাজেশন বাস্তব হয়ে যায় সেটাই যথেষ্ট। দেখলে ভালো, কিন্তু না দেখলেও কোনো অসুবিধা নেই যদি আপনার কাজ হয়ে যায়। কারণ ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ। আপনি খুব সুন্দর দেখলেন কিন্তু বাস্তবে হলো না। অর্থাৎ ফলাফল নেই, শুধু দেখা হলো। তার চেয়ে আপনি দেখলেন না কিন্তু বাস্তবায়িত হলো এটা অনেক ভালো এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় যখন কোনো চেহারা অথবা কোনো লেখা বা কোনো কিছু আমাদের চোখের সামনে পরিষ্কার হচ্ছে না—তখন তাতে কী বুঝবো? হয়তো আমি প্রাণপণ চাচ্ছি পরিষ্কার হোক।

উত্তর : প্রাণপণ চাওয়ার কোনো দরকার নেই। পরিষ্কার হলে ভালো, না হলে আরো ভালো। কারণ প্রাণপণ অর্থাৎ জোর করে ছবি দেখার চেষ্টা করলেই মাথাব্যথা করবে। আসলে আমরা এক্ষেত্রে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাই। আমরা ভাবি আরেকজন কত সুন্দর দেখছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অথবা অমুকে সেদিন কোর্স করলো, এখনই দেখতে পাচ্ছে, আমি এত বছর পরও দেখতে পাচ্ছি না। আমার বোধ হয় মেডিটেশন হচ্ছে না।

আসলে অবলোকন মানে কিন্তু শুধু দেখা নয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যেকোনো ইন্দ্রিয়যোগে অনুভব করার নাম হচ্ছে অবলোকন। যদি বলা হয় যে, আম অবলোকন করুন। আম দেখলে অবলোকন হলো। চোখ বন্ধ, দেখা হয় নি, আমার দ্রাণ পেলেন, তা-ও অবলোকন হলো। দ্রাণ পান নি, আমার স্পর্শের অনুভূতি অনুভব করলেন, অবলোকন হয়ে গেল। স্পর্শের অনুভূতি হয় নি, আম যে খেয়েছিলেন সেই স্বাদটাকে অনুভব করলেও অবলোকন হয়ে গেল। তা-ও যদি না হয় ‘আম’ শব্দটা যে শুনলেন তাতেও অবলোকন হয়ে গেল।

তাই কোয়ান্টামে আমরা বলি, দেখলে ভালো, না দেখলে আরো ভালো। দেখলে ভালো কারণ দেখার একটা আনন্দ আছে। এই যে বাড়ি, এই যে

ঘর—কী সুন্দর! আর না দেখলে আরো ভালো! কারণ দেখলেই তো এটাকে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। না দেখলে কোনো ঝামেলা নেই।

তাই দেখাটা অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়। শুধু ভাববেন—এই যে আমার মনের বাড়ি। এই তো পাখিটা উড়ে গেল। আহা! কী সুন্দর ফুল, কী সুন্দর গন্ধ। ভাবনার সাথে সাথে মনটা প্রশান্ত হয়ে উঠবে, ব্রেন আলফা লেভেলে চলে যাবে। আসলে মেডিটেশন করা বা মেডিটেটিভ লেভেলে যাওয়া খুব সহজ।

প্রশ্ন : আমার অবলোকন করার ক্ষমতা একেবারেই কম। আমি এ ব্যাপারে কী করতে পারি?

উত্তর : ভিজুয়ালাইজেশন ক্ষমতা বা অবলোকন শক্তি বাড়ানোর জন্যে কিছু চর্চা করতে পারেন। মাকে আপনার সামনে বসান। ভালো করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারপর চোখ বন্ধ করে তার চেহারা অবলোকন করার চেষ্টা করুন। আবার তাকিয়ে দেখুন, আবার চোখ বন্ধ করে দেখুন। মা-ও খুশি হবেন যে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন, আবার আপনার অবলোকন ক্ষমতাও বাড়বে। অর্থাৎ আপনার প্রিয় মুখ যেটি, সেটিকে প্রথম অবলোকন করার চেষ্টা করুন। সামনা-সামনি না পেলে ছবি দিয়েও চর্চা করতে পারেন। যাদের অবলোকন স্পষ্ট নয়, অনুভব শক্তি যাদের একটু কম তারা এই চর্চার মাধ্যমে নিজের অনুভব শক্তিকে খুব চমৎকারভাবে বাড়িয়ে নিতে পারেন। কিছুদিন চর্চার পর দেখবেন, চোখ বন্ধ করে যা ভাবতে চাচ্ছেন সেটাই আপনি ভাবতে পারছেন।

প্রশ্ন : আমি সবাইকে অবলোকন করতে পারি। কিন্তু নিজেকে অবলোকন করতে পারি না। এর কারণটা বললে উপকৃত হবো।

উত্তর : আসলে আমরা আমাদের নিজেদেরকে সবচেয়ে কম দেখি। বাকি সবাইকে তো সবসময় দেখছি। নিজেকে তো আয়নায় ছাড়া দেখতে পাচ্ছি না। এ কারণে নিজেকে দেখা খুব কঠিন। নিজেকে দেখতে চাইলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন। চারপাশে আয়না রাখুন, যদিকে তাকাবেন নিজেকে দেখবেন। দেখবেন নিজেকে অবলোকন করা খুব সহজ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমি দুই মাস মনের বাড়ি স্পষ্ট দেখতাম। এখন খুব ঝাপসা দেখি।

উত্তর : আসলে অস্থিরতাটা বেড়ে গেছে। যখনই এরকম হবে ৪০ দিন শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করবেন। যখনই মনে হবে যে, মেডিটেটিভ লেভেল আগের মতো হচ্ছে না, কেমন যেন অস্থির লাগছে, অথবা মেডিটেশনে বসছেন, আগে স্পষ্ট হতো এখন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তখন ৪০ দিন আবার শিথিলায়ন করবেন। আবার লেভেলটা চমৎকার হয়ে যাবে। এছাড়া লামা কোয়ান্টায়ন আছে। যাদেরই সুযোগ থাকবে তাদের লামা কোয়ান্টায়নে অংশ নেয়া উচিত। মনের অস্থিরতা কমে যাবে। প্রশান্তি বাড়বে। মনের বাড়ি আবার স্পষ্ট হবে।

শিথিলায়ন

প্রশ্ন : আত্ম উন্নয়নের জন্যে নিয়মিত কোন মেডিটেশন করা উচিত?

উত্তর : আত্ম উন্নয়নের জন্যে নিয়মিত শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন করবেন। শিথিলায়ন ক্যাসেট বা সিডি নম্বরের দিক দিয়েও প্রথম, উপকারিতার দিক দিয়েও প্রথম।

আসলে আপনি যে ধারারই মেডিটেশন করুন না কেন—সুফিধারার হোক, সনাতন ধর্মের হোক, বৌদ্ধ ধর্মের হোক অথবা ধর্মনিরপেক্ষ হোক—শিথিলায়ন হচ্ছে সকল মেডিটেশনের মা। আমরা বলি শিথিলায়ন হচ্ছে ১, বাকি মেডিটেশনগুলো হচ্ছে ০। ১ এর ডানপাশে আপনি যত শূন্য যোগ করতে থাকবেন তত সংখ্যার মূল্য বাড়তে থাকবে। কিন্তু ১ এর অনুপস্থিতিতে যতগুলি শূন্যই থাকুক না কেন সবই মূল্যহীন। ঠিকমতো শিথিল হতে না পারলে মেডিটেশনের বাকি টেকনিকগুলো কোনোটাই কাজ করবে না। তাই নিয়মিত শিথিলায়ন চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : শিথিলায়ন কীভাবে করবো?

উত্তর : নিজে নিজে শিথিলায়ন চর্চার জন্যে আপনি কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে শিথিলায়নের (শিথিল প্রক্রিয়া) অডিও ফাইল ডাউনলোড করে নিতে পারেন। আপনি শুধু চোখ বন্ধ করে সেখানে যা যা বলা হয় তা করে গেলেই হবে। তারপরও আপনার অনুশীলনের সুবিধার জন্যে আমরা ধাপে ধাপে শিথিলায়নের পর্যায়গুলো আলোচনা করছি।

হালকাভাবে চোখ বন্ধ করুন। দ্রু ও চেহারা কুঁচকাবেন না। চোখের দুই পাতাকে ধীরে ধীরে একসাথে লেগে যেতে দিন। চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই আপনি কোনো কিছু দেখা থেকে বিরত থাকছেন এবং সবচেয়ে সক্রিয় ইন্দ্রিয় চোখকে বিশ্রাম দেয়ায় কোনো কিছু দেখে উত্তেজিত বা চিন্তিত্রস্ত হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছেন।

এবার নাক দিয়ে লম্বা দম নিন। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেবেন বিশেষ পদ্ধতিতে। বুক ফুলিয়ে নয়, দম নেয়ার সাথে ধীরে ধীরে আপনার পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আবার দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ চুপসে যাবে। দম নেয়া ও ছাড়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের ওপরের অংশ ওঠানামা করবে। এক, দুই, তিন, এভাবে গুণে গুণে ছয় থেকে ১০ বার দম নিন। দম নেয়ার চেয়ে দম ছাড়তে সামান্য বেশি সময় নিন। দম নিতে নিতে ভাবুন, ‘প্রকৃতি থেকে অফুরন্ত প্রাণশক্তি আমার দেহে প্রবেশ করছে।’ আর দম ছাড়তে ছাড়তে ভাবুন ‘শরীরের সকল দূষিত পদার্থ বাতাসের সাথে বেরিয়ে যাচ্ছে।’ এভাবে ছয় থেকে ১০ বার দম নেয়ার পর দম স্বাভাবিক হতে দিন। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকুন।

আপনার চোখ বন্ধই আছে। এক মুহূর্তে মনের চোখে নজর বুলিয়ে যান, মাথার তালু থেকে পায়ের পাতায়। এবার প্রথম ১০ সেকেন্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন মাথার তালুর পেশিগুলোতে। আপনি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অনুভব করবেন সেখানে রক্ত চলাচল বাড়ছে। সেখানে একটু গরম গরম লাগছে বা একটু শিরশির করছে। এরপর অনুভব করবেন, তালুর পেশি শিথিল হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে আপনি পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ ও চোখের পাতা, ঠোঁট ও জিহ্বা, চোয়াল, মুখমন্ডল, গলা, ঘাড়, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, উরু, হাঁটু, পা, গোড়ালি ও পায়ের পাতায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন। বর্ণিত প্রতিটি অঙ্গে ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড করে মনোযোগ দিন। মনের চোখ দিয়ে নির্দিষ্ট অঙ্গ অবলোকন করুন।

অবলোকনের সাথে সাথে অনুভব করবেন প্রতিটি অঙ্গে রক্ত চলাচল বেড়ে যাচ্ছে। পেশি শিথিল হয়ে ভারী হয়ে আসছে। (অনুশীলন শুরুর আগে কোন অঙ্গের পর কোন অঙ্গে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবেন তা কয়েকবার পড়ে মুখস্থ করে ফেলুন। তাহলে অনুশীলনের সময় কোনো অসুবিধা হবে না)

আপনি যখন মাথা থেকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে পায়ের পাতা পর্যন্ত নামতে থাকবেন, তখন অনুভব করুন যে, বরফগলা পানি যেমন বরফের গা

বেয়ে নিচের দিকে নামে, তেমনি শিথিলতা শ্রোতের মতো আপনার গা বেয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ভাবুন আপনার অঙ্গ শিথিল ও নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে। এবার আবার পাঁচ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম ছাড়ুন। দম নেয়ার চেয়ে ছাড়ার জন্যে সময় একটু বেশি দিন। এরপর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দিন।

এবার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন দমের ওপর। বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে ঢুকছে তা অনুভব ও মনের চোখে অবলোকন করুন। অনুভব ও অবলোকন করুন বাতাস কীভাবে ফুসফুসের প্রতিটি কোষে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে আসছে। দমের আসা-যাওয়ার ওপর আপনার মনোযোগ দিন। বাতাস স্বাভাবিক যাওয়া-আসা করবে, আপনি শুধু দমের প্রতি খেয়াল রাখুন। (এক থেকে দুই মিনিট আপনি দম অবলোকন করুন) এরপর অনুভব করুন আপনার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

আপনি এবার সচেতন হোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে। কীভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আপনার শরীরকে নিচের দিকে টানছে তা অনুভব করুন। নিজের ওজন অনুভব করুন। অনুভব করুন মাথার ওজন। কাঁধ বুক নিতম্ব হাত পায়ের ওজন বেড়ে গেছে তা খেয়াল করুন। অনুভব করুন তা ভারী হতে হতে জড় পদার্থে পরিণত হচ্ছে। অনুভব করুন দেহের জৈব কোষগুলো আর জৈব কোষ নেই, পরিণত হয়েছে বালুকণায়।

অনুভব করুন আপনার সারা দেহ এখন বালুকণায় পরিণত হয়েছে। এবার অনুভব ও অবলোকন করুন আপনার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে বালুকণাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করেছে। আঙুল হাত পা বুক পেট উরু—সব বালুর মতো ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। আপনি পরিণত হচ্ছেন এক বালুর স্তুপে। যত স্পষ্টভাবে সম্ভব কল্পনা করুন যে, আপনার পুরো শরীর সূক্ষ্ম বালুকণার স্তুপে রূপান্তরিত হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

আপনি এখন সূক্ষ্ম বালুকণার স্তুপ। এখন আপনি অনুভব করুন উত্তর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে। বাতাসের বেগ আস্তে আস্তে বাড়ছে। বাতাস ঝড়ের রূপ নিচ্ছে আর আপনার শরীরের অবশিষ্টাংশ হিসেবে যে বালুকণাগুলো রয়েছে ঝড় তা উড়িয়ে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আপনার শরীর বলতে আর কিছুই নেই। আপনার বলতে এখন রয়েছে শুধু আপনার চেতনা, আপনার মন।

আপনি এখন পরিপূর্ণরূপে শিথিল। শিথিলায়নের গভীর স্তরে পৌঁছে

গেছেন আপনি। আপনার ব্রেন ফ্রিকোয়েন্সি বিটা স্তর থেকে নেমে গেছে আলফায়। মনের বাড়ির পথে এখন আপনি আলফা স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। এই স্টেশনে আপনার জন্যে রয়েছে বিশেষ ওয়েটিং রুম।

এবার মনে মনে বলুন, আলফা স্টেশন থেকে এখন আমি আরো গভীরে মনের বাড়িতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমি যতক্ষণ মনের বাড়িতে থাকবো, ততক্ষণ বাইরের যেকোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দে আমার মনোযোগ আরো গভীর হবে। তবে আগুন, ভূমিকম্প বা কোনো বিপজ্জনক বা জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমি যত গভীর লেভেলেই থাকি না কেন, মুহূর্তে পুরোপুরি জেগে উঠবো এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

আলফা স্টেশন থেকে মনের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে এবার বিশেষ কাউন্ট ডাউন শুরু করুন। ১৯ থেকে ০ গণনার পর আপনি আলোর পথ দিয়ে পৌঁছে যাবেন মনের বাড়িতে। ১৯ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনি কল্পনায় অবলোকন করুন শীতল নীল স্নিগ্ধ আলো বর্ষিত হচ্ছে আপনার ওপর। আলোয় আপনি অবগাহন করছেন। আলোর এক দীর্ঘ পথ রচিত হয়েছে আপনার জন্যে। আর সে পথ পৌঁছে গেছে মনের গভীর স্তরে।

আপনি ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ উচ্চারণ করুন। এবার মনে মনে বলুন, ‘আলোর পথ দিয়ে আমি পৌঁছে যাচ্ছি মনের গভীর থেকে গভীরে’। আবার ১০, ৯, ৮, ৭, ৬। মনে মনে বলুন, ‘গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি আমি’। ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ উচ্চারণ করুন। মনে মনে বলুন, ‘আমি পৌঁছে গেছি মনের বাড়িতে’। অনুভব করুন এক অনাবিল প্রশান্তি।

মনের বাড়িতে পৌঁছার পর আপনি প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি উপভোগ করুন। ফুলের সুবাস, পাতার রং, পাখির কলতান, বার্নার শব্দ বা সমুদ্রের তরঙ্গ, আকাশে মেঘের ভেলা, যা যা দেখতে পান সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখুন, স্পর্শ করুন, অনুভব করুন।

এবার মনের বাড়ির দরবারে আরাম করে বসুন। (প্রথমবার মেডিটেশন করার সময় আলফা স্টেশন ও মনের বাড়ি বানাবেন)

মনের বাড়ি চেতনার এক শক্তিশালী স্তর। এ স্তরে পৌঁছার সাথে সাথে মন দেহের প্রতিরক্ষা ও নিরাময় ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোগমুক্তির কাজে নিয়োজিত করে। এ স্তরে মন যেকোনো কল্যাণমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্রেনকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে। মনের বাড়িতে আপনার যেকোনো ‘অটোসাজেশন’ মস্তিষ্ক সহজেই গ্রহণ করে।

এবার ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করুন। মনে মনে বলুন, ‘ভবিষ্যতে শিখিলায়নের উদ্দেশ্যে যখনই আমি চোখ বন্ধ করে আরাম! আরাম! আরাম! উচ্চারণ করবো তখনই আমার দেহ-মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি পরিপূর্ণ শিথিল হয়ে যাবো। যখনই এরপর ১৯ থেকে ০ গণনা করবো তখনই মনের বাড়িতে পৌঁছে যাবো।’

এরপর মনকে আরও কিছু ইতিবাচক অটোসাজেশন দিতে পারেন। যেমন-মনে মনে বলতে পারেন, ‘এখন থেকে আমার স্মৃতিশক্তি বাড়বে। আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়বে। আমার মনোযোগ বাড়বে। আমার শরীর ও মন সবসময় সুস্থ থাকবে। অমূলক ভয়ভীতি ও নেতিবাচক চিন্তা বা নেতিবাচক কথার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে আমার মন ও মস্তিষ্ক পুরোপুরি মুক্ত থাকবে। ইতিবাচক চিন্তা আমার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। আমি যা চাই ইতিবাচক চিন্তা দিয়ে তা পাবো। প্রতিদিন আমি সবদিক দিয়ে ভালো হচ্ছি, লাভবান হচ্ছি, সফল হচ্ছি।’

অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মনোদৈহিক বা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো ইতিবাচক কথা সংযোজন করতে পারেন। পছন্দসই অটোসাজেশন নির্মাণে ‘জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ বই-এর সাহায্য নিতে পারেন। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরই এখন শক্তিতে পরিণত হবে।

এরপর আপনি সময় নিয়ে মনছবি বা অন্যান্য যা করার প্রয়োজন তা করতে পারেন। এরপর বেশ কয়েকবার মনে মনে বলুন, সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন।

এবার জেগে ওঠার পালা। আপনাকে এখন মনের বাড়ি থেকে বাস্তুবে ফিরে আসতে হবে। প্রথমে লম্বা দম নিন। মনে মনে বা আওয়াজ করে বলুন, ‘০ থেকে ৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাবো, আমি পুরোপুরি জেগে উঠবো, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সজীব উৎফুল্ল ও তরতাজা অনুভব করবো।’

এবার গণনা শুরু করুন। ০, ১। অনুভব করুন উড়ে যাওয়া বালুকণাগুলো চারপাশ থেকে এসে আপনার শরীর গঠন করেছে। ২, ৩। লম্বা দম নিন। অনুভব করুন বালুকণাগুলো প্রাণবন্ত জৈবকোষে পরিণত হয়েছে। ৪, ৫। আবার লম্বা দম নিন। মনে মনে বলুন, ‘৭ গুণে আমি চোখ মেলে তাকাবো, আমি পুরোপুরি জেগে উঠবো, পূর্ণ সচেতন অবস্থায় শারীরিক ও

মানসিকভাবে পুরোপুরি সজীব উৎফুল্ল ও তরতাজা অনুভব করবো।’ ৬, ৭। এবার চোখ মেলুন। মাথা ও ঘাড় নাড়ুন। পা টান টান করুন। হাত নাড়ুন। আস্তে আস্তে উঠে বসুন বা দাঁড়ান। জোরে বলুন, ‘বেশ ভালো লাগছে। বেশ বেশ ভালো লাগছে।’

নিয়মিত শিথিলায়ন করলে আপনার শরীর মন আপনার সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবে (Condition reflex response)। একসময় দেখবেন শিথিল হওয়ার জন্যে এত লম্বা নিয়ম পালন করার প্রয়োজনই হচ্ছে না। শুধু চোখ বন্ধ করে কয়েকবার লম্বা দম নিয়ে এবং ১/২ মিনিট দম অবলোকন করে ‘আরাম’ ‘আরাম’ ‘আরাম’ উচ্চারণের সাথে সাথে আপনার দেহ-মনের সকল অপ্রয়োজনীয় তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি পরিপূর্ণরূপে শিথিল হয়ে যাবেন এবং ১৯ থেকে ০ গণনার সাথে সাথে মনের গভীর স্তরে মনের বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত শরীর-মন আপনার সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ ধৈর্য ধরে প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করে শিথিলায়ন করে যান।

শিথিলায়ন রপ্ত করার জন্যে নিয়মিত দিনে দুই বার করে ৪০ দিন চর্চার কর্মসূচি নিন। কারণ মেডিটেশন লেভেলে পৌঁছতে পারলেই এর পরবর্তী সূত্রগুলো কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা গেছে, নিজে নিজে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যেকোনো বয়সের একজন শিথিলায়ন করতে পারেন। কেউ ১০/১৫ দিনের মধ্যেই শিথিলায়ন রপ্ত করে ফেলতে পারেন, কারো হয়তো বা নিজে নিজে রপ্ত করতে নিয়মিত ২/৩ মাস চর্চার প্রয়োজন হতে পারে।

প্রশ্ন : শিথিলায়ন ক্যাসেটে সুরের ভুবনে হারিয়ে যাবার সময় কী কল্পনা করবো?

উত্তর : খুব সুন্দর প্রশ্ন। যখন সুর বাজতে থাকবে আপনি ভাবুন আপনি একটা প্রজাপতি। চমৎকার বাগানে এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ যা কল্পনা করতে আপনার ভালো লাগে তা-ই কল্পনা করবেন।

প্রশ্ন : শিথিলায়ন করতে গিয়ে তো শুধু ঘুমভাব ছাড়া আর কোনো অনুভূতি পেলাম না। তবে কি আলফা লেভেলে পৌঁছানো সম্ভব না?

উত্তর : একবার মেডিটেশন করে তো আর মেডিটেশন বোঝা সম্ভব নয়। কোর্স করে নিয়মিত মেডিটেশন করা আর কোর্স না করে মাঝে মাঝে মেডিটেশন করার মধ্যে পার্থক্য এখানে। ঘুমভাব আর মেডিটেশনের মধ্যে পার্থক্য বুঝবেন যখন আপনি চার দিনের কোর্স করে মেডিটেশনে দক্ষতা অর্জন করবেন অথবা দীর্ঘ দিন অনুশীলন করে মেডিটেশন আয়ত্ত করবেন।

প্রশ্ন : এক মাস বা ৪০ দিন শিথিলায়ন একটানা করতে গিয়ে মনে হচ্ছিলো মনের সাথে শরীরও এতো শিথিল হয়ে যাচ্ছে যে, সবকিছুতেই বিমুনিভাব। এ থেকে মুক্তি পাবো কীভাবে?

উত্তর : শিথিলায়ন মানুষকে চাপা করে, তার মধ্যে কখনো গা-ছাড়া ভাব এনে দেয় না। গা-ছাড়া ভাব এলেই বুঝতে হবে যে, আপনি শারীরিকভাবে দুর্বল। এবং এই দুর্বলতা দূর করার জন্যে আপনাকে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে।

প্রশ্ন : আমি যখন মেডিটেশনে খুব মগ্ন হই, আপনার সাথে রহম বলয়ে প্রার্থনা করি, তখন খুব ভালো লাগে কিন্তু মেডিটেশন শেষ হলে খুব মাথা ঘোরায় এবং ঘণ্টা দুয়েক খুব দুর্বল লাগে, কিন্তু খুব শান্তি লাগে। দুর্বলতা যাবে কীভাবে?

উত্তর : এর কারণ হচ্ছে শারীরিক দুর্বলতা। মেডিটেশনের গভীর লেভেলে যেতেও কিন্তু শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই শারীরিকভাবে দুর্বল থাকলে গভীর লেভেলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ দুর্বল লাগে। এর জন্যে ভিটামিন খেতে হবে। শাকসবজি ও ফল খেতে হবে। যে ঋতুতে যে শাকসবজি ও ফল বেশি পাওয়া যায় সেই শাকসবজি ও ফল বেশি করে খাবেন।

অটোসাজেশন

প্রশ্ন : অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন কী? কীভাবে এটি কাজ করে?

উত্তর : অটোসাজেশন হচ্ছে ইতিবাচক শব্দের সম্মিলনে গঠিত বাক্যমালা। শব্দ বা কথা এক প্রচণ্ড শক্তি। ধর্মীয় মতে সৃষ্টির শুরু হচ্ছে শব্দ। ইসলাম ধর্ম

অনুসারে আল্লাহ তায়াল্লা সৃষ্টি করতে চাইলেন। তিনি বললেন, কুন্-‘হও’, হয়ে গেল। সনাতন ধর্ম অনুসারে-ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি ওংকার ধ্বনি দিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়ে গেল। সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানের সর্বশেষ মতবাদ হচ্ছে সৃষ্টির শুরুতে একটি বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিলো। এই বিস্ফোরণও কিন্তু শব্দ। তাহলে আমরা দেখছি ধর্ম ও বিজ্ঞান-দুই অনুসারেই সৃষ্টির শুরুতে রয়েছে শব্দ।

আবার, সৃষ্টির গভীরে কী? বস্তুর গভীরে কী? প্রাণের গভীরে কী? বস্তুকে ভাঙতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত আপনি পাবেন বিভিন্ন পরমাণু। আপনার দেহ যে কোষগুলি দিয়ে গঠিত সে কোষের কেন্দ্রে আছে ডিএনএ অণু। এই ডিএনএ অণুকে ভাঙলেও আপনি পাবেন কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের পরমাণু। পরমাণুর ভেতরে ঢুকলে আপনি পাবেন বিভিন্ন সাব-এটমিক পার্টিকেল। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে এই পার্টিকেলগুলো এনার্জি অর্থাৎ শক্তিরূপে থাকতে পারে, আবার পার্টিকেলরূপেও থাকতে পারে। যেকোনো মুহূর্তে পার্টিকেল থেকে এনার্জি আবার এনার্জি থেকে পার্টিকলে পরিণত হতে পারে। এই পার্টিকেল এবং এনার্জির যে মধ্যবর্তী অবস্থা তাকে বলা হয় কোয়ান্টা। Quantitative bundle of energy, একটা তরঙ্গগুচ্ছ বা স্পন্দনগুচ্ছ। যেমন, আমরা শব্দ শুনি কীভাবে? একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, সেই তরঙ্গটা কানে এসে আঘাত করে, ফলে আমরা শব্দ শুনি। অর্থাৎ আমরা দেখছি-বস্তুর গভীরে শব্দ, প্রাণের গভীরে শব্দ।

আবার সৃষ্টির শেষে কী? ধর্ম বলে সৃষ্টির শেষে রয়েছে ইসরাফিলের শিঙার হুংকার। কিরকম শব্দ হবে বোঝাই যাচ্ছে। বিজ্ঞান বলে একটা বিগ ক্রাশও হবে, সবকিছু ধসে যাবে। ধসে গেলে কী হবে? শব্দ। তাহলে আমরা দেখছি সৃষ্টির শুরুতে শব্দ, বস্তুর গভীরে শব্দ, প্রাণের গভীরে শব্দ, সৃষ্টির শেষেও শব্দ। এই জন্যে শব্দ এত শক্তিশালী।

আসলে শব্দ শুধু বাস্তবতার বিবরণ দেয় না বাস্তবতা সৃষ্টিও করে। শব্দ কীভাবে বাস্তবতা সৃষ্টি করে? ছোট্ট উদাহরণ দেই। আপনি কয়েকবার তেঁতুল, তেঁতুল, তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন মুখে লালা চলে এসেছে। আপনি তেঁতুল দেখেনও নি। মুখেও দেন নি। শুধু তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করেছেন মাত্র। মুখের লালা কিন্তু বস্তু। অর্থাৎ শব্দ শুধু বস্তুর বিবরণ দেয় না বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখে।

অটোসাজেশন ও প্রত্যয়নে আমরা শব্দের এই ইতিবাচক ক্ষমতাকে নিজেদের কল্যাণে ব্যবহার করি। প্রত্যয়নকে বিজ্ঞানীরা বলেছেন ‘ব্যক্তি

ইমেজ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি’। মনোবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন, সাফল্যের অনুভূতি নিয়ে আমরা সফলভাবে কাজ করতে শিখি। আমাদের অতীত সাফল্যের স্মৃতি বর্তমান প্রেক্ষাপটে আত্মবিশ্বাস যোগায়, ফলে আমরা সফলভাবে কাজ করতে পারি।

কথা উঠতে পারে, যে মানুষটি অতীতে শুধু ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছে সে সাফল্যের অনুভূতি আনবে কীভাবে? উপায় অবশ্যই আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা গবেষণা করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের নার্ভাস সিস্টেম কল্পনা এবং বাস্তবতার মধ্যে তফাত করতে পারে না। বাস্তব ঘটনায় যে ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়, কাল্পনিক ঘটনার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়।

চিন্তা করুন আপনি যখন সিনেমা দেখতে যান তখন কী করেন? হয়তো দেড়শ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে সিনেমা হলে ঢুকেছেন। ওখানে গিয়ে নায়িকার দুঃখ দেখে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন। নায়িকা কিন্তু এই দুঃখের অভিনয় করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। ঐ কান্নার অভিনয় করতে গিয়ে যে তার কত গ্লিসারিন খরচ হয়েছে, সে খবরও আপনার জানা নেই। সে গ্লিসারিন চোখে দিয়ে কেঁদে পয়সা উপার্জন করলো আর আপনি গ্লিসারিন ছাড়া পয়সা দিয়ে কেঁদে এলেন। আপনি তো জানেন যে, আপনি অভিনয় দেখতে গিয়েছেন। তারপরও আপনি কাঁদছেন কেন? কারণ আপনার নার্ভাস সিস্টেম এটাকে অভিনয় মনে করছে না, সে এটাকেই বাস্তব মনে করছে।

আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজেকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করার বড় অস্ত্র। বাস্তবে সাফল্যের অভিজ্ঞতা না থাকলেও কল্পনায় গভীর প্রত্যয় নিয়ে নিজেকে সফল বলে ভাবলে, মুখে বার বার সাফল্যের কথা বললে, ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে সাফল্যের অনুভূতি তৈরি হবে। এই সাফল্যের অনুভূতি বাস্তব সাফল্যকে আকর্ষণ করবে। ইতিবাচক কথার অন্তর্নিহিত শক্তি এখানেই।

প্রশ্ন : বলা হয় জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন। এটা কীভাবে সম্ভব? কিছু কথা, কিছু শব্দ, কিছু বাক্য কীভাবে জীবনে এত বড় পরিবর্তন আনতে পারে?

উত্তর : অটোসাজেশনে ছোট ছোট কথা, শব্দ বার বার উচ্চারিত হয়ে সৃষ্টি হয় বিশ্বাস ও শক্তির এক অন্তরূপ যা বদলে দেয় সবকিছু। তৈরি করে নতুন

বাস্তবতা। বার বার উচ্চারিত ইতিবাচক শব্দ বা কথার প্রভাব সম্পর্কে সাধকরা সচেতন ছিলেন আদিকাল থেকেই। প্রতিটি ধর্মেই ইতিবাচক কথা বা বাণীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নবীজী (স) বলেছেন, কারো সাথে দেখা হলে সালাম বিনিময়ের পর কুশল জিজ্ঞেস করলে বলবে, ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি’। কেন বলেছিলেন, বললে কী হবে, না বললে কী ক্ষতি, এসব আমরা হাজার বছর ধরেও বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝি নি।

বিশ শতকের শুরুতে মনোবিজ্ঞানীরা এই ‘ভালো আছি’ বলার গুরুত্ব বুঝতে শুরু করলেন। ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ডা. এমিল কোয়ে বাস্তব গবেষণায় দেখলেন—ভালো কথা বার বার বললে ভালো জিনিসগুলোই তার দিকে আকৃষ্ট হয়। সে ভালো হতে থাকে। তিনি তার ক্লিনিকে রোগমুক্তির জন্যে প্রয়োগ করলেন অটোসাজেশন। ১৯১০ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত মাইগ্রেন, মাথাব্যথা, বাতব্যথা, এজমা, প্যারালাইসিস, তোতলামি, টিউমার, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, অনিদ্রা থেকে হাজার হাজার মানুষকে ভালো করেছেন এই অটোসাজেশন প্রয়োগ করে। তার এই নিরাময় প্রক্রিয়ায় রোগীকে কিছুদিন সকালে ও বিকেলে একাত্ত মনোযোগ দিয়ে ২০ বার বলতে হতো ‘ডে বাই ডে ইন এভরি ওয়ে আই এম গেটিং বেটার এন্ড বেটার’। ব্যস, রোগ উধাও।

বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃত প্রফেসর এম ইউ আহমেদ নিজের ওপর এই অটোসাজেশন প্রথম প্রয়োগ করেন ১৯৩৪ সালে। প্যারাটাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে চার মাস ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে থাকার পর ডাক্তাররা তার বাঁচার আশা বাদ দিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেন। তাকে বজরা নৌকা করে বরিশালে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় উঠেই তিনি ভেতর থেকে বাঁচার মন্ত্র পেলেন। অন্তর থেকেই বার বার বলতে লাগলেন—‘আমি বাঁচতে চাই! আমি বাঁচবো!’ তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। একই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৩ সালেও ৬৪ বছর বয়সে ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ অবস্থা থেকে বেঁচে ওঠেন তিনি।

প্রফেসর এম ইউ আহমেদ শুধু নিজের ওপরই অটোসাজেশন প্রয়োগ করেন নি; তাঁর প্রবর্তিত মেডিস্টিক সাইকোথেরাপি প্রক্রিয়ায় অটোসাজেশন দিয়ে হাজার হাজার রোগী বিভিন্ন জটিল ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছেন বিস্ময়করভাবে। মনোদৈহিক রোগ নিরাময়ে প্রফেসর এম ইউ আহমেদ অত্যন্ত সফলভাবে অটোসাজেশন প্রয়োগ করেন তিন দশক ধরে।

স্বাভাবিকভাবেই আপনার মনে আবারো প্রশ্ন জাগবে অটোসাজেশন অর্থাৎ শুধু কিছু কথা কিছু শব্দ কিছু বাক্য কীভাবে জীবনে এত বড় পরিবর্তন আনতে

পারে। এ রহস্যও বিজ্ঞানীরা আস্তে আস্তে উন্মোচন করেছেন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা হাজার হাজার গবেষণা করে দেখেছেন, মানুষের নার্ভাস সিস্টেম বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে কোনো তফাত করতে পারে না। বাস্তব ঘটনা দেখলে যে ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়, সেই একই ঘটনা কল্পনা করলেও একই ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়। যে কারণে সিনেমায় আমরা অভিনয় দেখে হাসি আবার কান্নায় বিষাদে মন ভরে ওঠে। আপনি জানেন পুরোটাই অভিনয়। কিন্তু তারপরও উদ্বেজনা বা বিষাদের রেশ কাটাতে সময় লাগে। এই সূত্রকেই মনোবিজ্ঞানীরা কাজে লাগাচ্ছেন কখনো অটোসাজেশনে, কখনো মনছবিতে।

নবীজীর (স) ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি!’ বলতে বলার রহস্য এখানেই। আপনি দিনে ২০/৩০/৪০ জনের সাথে দেখা হওয়ার পর যদি একই কথা বলেন, তাহলে ৪০ বার আপনার মস্তিষ্কে এই ভালো থাকার বাণী যাচ্ছে। বার বার একই বাণী যাওয়ার ফলে মস্তিষ্কে ভালো থাকার তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে। ভালো থাকার আকুতি বাড়ছে।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা দীর্ঘ পরীক্ষায় দেখেছেন, যখনই মস্তিষ্কে নতুন তথ্য যায়, মস্তিষ্কে নতুন ডেনড্রাইট অর্থাৎ একটি নিউরোন থেকে আরেকটি নিউরোনে নতুন সংযোগ পথ তৈরি হয়। ক্রমাগত একই তথ্য যেতে থাকলে মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো (Working Structure) বদলে যায়। মস্তিষ্ক তখন এই নতুন বাস্তবতা সৃষ্টিতে লেগে যায়।

অটোসাজেশনে আপনি আসলে একই কথা, একই বাণী বার বার বলে মন ও মস্তিষ্কের বিশাল শক্তিভান্ডারকে সক্রিয় করে তোলেন। আপনার মনোদৈহিক প্রক্রিয়া নিজের চাওয়াকে পাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ও যোগ্য করে তোলে। পাওয়ার মনোদৈহিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই চাওয়া পরিণত হয় বাস্তবতায়। অতি দ্রুতই বদলে যায় সব। মনে হয় সব অলৌকিক। নিজেকে মনে হয় ভাগ্যের বরপুত্র।

প্রশ্ন : অটোসাজেশনের মাধ্যমে কি মনোযোগ ও স্মরণশক্তি বাড়ানো যায়?

উত্তর : অবশ্যই অটোসাজেশনের মাধ্যমে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায়। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্যে অটোসাজেশন হতে পারে :

এ মুহূর্ত থেকে আমি যা দেখবো এবং যা শুনবো তার সবকিছুই স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পুরোপুরি মনে রাখবো। কারণ আমার মন সবসময় সবকিছু মনে রাখে। আমার স্মৃতি অত্যন্ত নিখুঁত। যা-ই আমি স্মরণ করতে

চাই, তার সবটাই সাথে সাথে স্মরণ করতে পারবো। আমার স্মৃতি এখন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুরোপুরি কাজ করবে।

প্রশ্ন : প্রত্যয়ন এবং অটোসাজেশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : অটোসাজেশন আপনি মনে মনে আওড়ালেই হলো। বিশ্বাস করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রত্যয়ন বিশ্বাসের সাথে করতে হবে। ধরুন, আপনি বিশ্বাস করেন না যে, আপনি সাহসী। বিশ্বাস না করেই বলছেন আমি সাহসী, আমি সাহসী, আমি সাহসী-এটা হচ্ছে অটোসাজেশন। আবার যখন বিশ্বাস করে বলছেন যে, আমি সাহসী, আমি সাহসী-এটা হচ্ছে প্রত্যয়ন। অর্থাৎ যখন কথা, বাক্য, শব্দ বা বাণীর সাথে বিশ্বাস যোগ করছেন তখন এটা প্রত্যয়ন হচ্ছে।

এক নাগাড়ে যেকোনো অটোসাজেশন বিশ্বাস করেন আর না করেন যদি দিতে থাকেন, আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন এর সুফল দেখে। কোয়ান্টামে একটি মেয়ে আসতো। তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ে। এত ভীর্ণ ছিলো যে, একটা পোকা দেখলেও চিৎকার করে উঠতো।

মেডিটেশন করার পরে তার নাকি পোকা দেখলেই ওটা ধরে দেখতে ইচ্ছা করে, ওটার হাত কেমন, পা কেমন ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকে বললাম, মা তুমি কি বড় হয়ে জুরোলজিস্ট হতে চাও? সে বললো, না। বললাম, তাহলে এত পোকা ধরার দরকার নাই। অর্থাৎ এত ভীর্ণ একটা মেয়ে-সে এত সাহসী হয়ে গেছে।

অটোসাজেশন চর্চা

প্রশ্ন : প্রয়োজনে আমি কি নিজে অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন তৈরি করে নিতে পারবো?

উত্তর : সাধারণভাবে মনগড়া অটোসাজেশন না দেয়াই ভালো। কারণ কথায় যদি উপকার হতে পারে তাহলে কথাটা ঠিকভাবে না হলে তা ক্ষতির কারণও হতে পারে।

মনগড়া অটোসাজেশন কিরকম ক্ষতিকর হতে পারে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই। অনেক বছর আগে আমাদের শান্তিনগর অফিসে এক মা

এলেন তার ছেলেকে নিয়ে। ছেলের কানে নাকি ভোঁ-ভোঁ, শোঁ-শোঁ শব্দ হয়। আমি বললাম, এটা তো শারীরিক সমস্যা। আপনার তো নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া উচিত।

ভদ্রমহিলা বললেন, নিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে বলেছে। আমি তা-ই করেছি। সাইকিয়াট্রিস্ট আপনার কাছে নিয়ে আসতে বলেছেন। কারণ এটা বানিয়েছেন আপনি, আপনিই পারবেন ঠিক করতে।

ছেলেটিকে আলাদা করে চেয়ারে নিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাবা ব্যাপারটা কী?’ আমাকে খুলে বলো।’

ছেলেটি ঘটনা বললো। তার এসএসসি পরীক্ষার পর হাতে যখন বেশ সময় আছে, চাইলো আমাদের মেডিটেশন কোর্সে আসতে। মাকে বললো তাকে কোর্সে ভর্তি করে দিতে। কিন্তু মা-তো রেগে আশুন। কারণ এটা ১৯৯৩ সালের ঘটনা। এখন তো মা-বাবারা বাচ্চাদেরকে মেডিটেশন করতে উদ্বুদ্ধ করেন। কারণ, এখন শিক্ষিত সবাই জানেন যে, মেডিটেশন কল্যাণকর একটা বিষয়। কিন্তু তখন মেডিটেশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিলো না।

তারা বললেন, এই বয়সে মেডিটেশন! না না কিছুতেই না। বরং এখন লাফালাফি কর, নাচানাচি কর। বুড়ো যখন হবি তখন মেডিটেশন করবি। কিন্তু ছেলের তো আগ্রহ। যখন মা-বাবাকে রাজী করতে পারলো না সে গোপনে কোয়ান্টামের অফিস থেকে ক্যাসেট, বই নিয়ে গেল। বাসায় গিয়ে রুম বন্ধ করে মেডিটেশন চর্চা করতে লাগলো।

তার একটা সমস্যা ছিলো। সে যখন পড়তে বসতো তখন মনে হতো যেন মাথা দিয়ে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। এখন এই সমস্যা দূর করার জন্যে কী অটোসাজেশন দেবে সে ভেবে পাচ্ছে না। এর মধ্যে একদিন সে টিভিতে এক ম্যাজিক দেখছিলো যে, ম্যাজিশিয়ান কিছু খাচ্ছে আর দুই কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সে-তো সাথে সাথে আইডিয়া পেয়ে গেল। মেডিটেশনে বসে অটোসাজেশন দেয়া শুরু করলো—‘আমার মাথার যত গরম দুই কান দিয়ে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।’

ব্যস, ক’দিন পরে তার মাথা ঠান্ডা হয়ে গেল। কিন্তু কান দিয়ে ভোঁ-ভোঁ, শোঁ-শোঁ শব্দ শুরু হলো। কারণ অটোসাজেশন অনুযায়ী তার মাথার গরম কান দিয়ে ধোঁয়া হয়ে বেরোনের শব্দ ছিলো এটা। ভয় পেয়ে যখন মা-বাবাকে বললো, তারা প্রথমে ইএনটি এক্সপার্ট, তারপর সাইকিয়াট্রিস্ট, সবশেষে আমার কাছে নিয়ে এলেন। আমি বুঝলাম, সমস্যাটা কোথায়? তাকে সেভাবে সাজেশন দিয়ে দিলাম। ঠিক হয়ে গেল।

আলীবাবার সেই গল্পে তো পড়েছেন—চিচিং ফাঁক বললে দরজা খুলবে। এখন চিচিং ফাঁক না বলে আপনি যদি আলু ফাঁক, টমেটো ফাঁক বলতে থাকেন, খুলবে? খুলবে না। তাই মনগড়া অটোসাজেশন দেবেন না। ‘জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ বইয়ে মোট এক হাজার চারটি অটোসাজেশন আছে। সেখান থেকে আপনার প্রয়োজনমতো যেকোনো অটোসাজেশন চর্চা করতে পারেন। প্রয়োজনে ফাউন্ডেশনে এসে কাউন্সিলরদের পরামর্শ নিন।

তারপরও বিশেষ প্রয়োজনে অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন তৈরি করতে হলে নিম্নোক্ত সহজ নিয়মগুলি অনুসরণ করতে পারেন :

- এই প্রত্যয়ন বা অটোসাজেশন সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত। তাই ‘আমি’ বা ‘আমার’ শব্দ ব্যবহার করুন।
- পুরোপুরি ইতিবাচক হোন। যা কামনা করেন তাই লিখুন।
- অটোসাজেশনে সবসময় ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করুন। নেতিবাচক শব্দ বর্জন করুন। রোগ-ব্যাধির উল্লেখ যত কম করেন তত ভালো। যেমন ‘আমার হাটের অসুখ ভালো হয়ে যাবে’ না বলে বলবেন ‘আমার হৃৎপিণ্ড ভালোভাবে কাজ করবে’, আমার বহুমূত্র ভালো হয়ে যাবে বা ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে না বলে বলবেন যে ‘আমার অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস যথাযথভাবে কাজ করবে’।
- বর্তমান কাল বা ভবিষ্যৎ কালজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করবেন।
- অতীতের সাথে বা অন্যের সাথে তুলনা করবেন না।
- অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন অবশ্যই বাস্তবসম্মত হতে হবে।
- কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করবেন না। সময়সীমা ক্ষতিকর হতে পারে, এতে টেনশন সৃষ্টি হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, আপনার অবচেতন মনের স্বয়ংক্রিয় সৃজনশীল কর্মধারা সবসময়ই পরিচালিত হয় আপনার নির্ধারিত লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। আপনি অবচেতন মনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব দিলে অবচেতন মন আপনার সচেতন মনের চেয়েও সুচারুভাবে আপনাকে লক্ষ্য অর্জনের পথে নিয়ে যাবে। আপনি অবচেতন মনের স্বয়ংক্রিয় গাইডেন্স সিস্টেমের ওপর অনায়াসে নির্ভর করতে পারেন। অবচেতন মন বলে দেবে আপনি কীভাবে আপনার লক্ষ্যে পৌঁছবেন।

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আত্ম উন্নয়নের মূল সূত্র হচ্ছে—আপনি যা হতে

চান, কল্পনায় তা হোন অর্থাৎ সেরকম ভান করুন এবং কল্পনায় যে রকম কাজ করবেন, বাস্তবেও তা-ই হবে। তবে আপনি যা হতে চান সে সম্পর্কে আপনাকে আন্তরিক, সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হতে হবে।

প্রশ্ন : পরিবারের সদস্য বা পরিচিত অন্যকে কি অটোসাজেশন দিতে পারবো?

উত্তর : অটোসাজেশন সবসময় নিজেকে দেয়ার জন্যে। অন্যকে দেয়ার জন্যে নয়। অন্যের জন্যে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন ব্যতীত অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন কতটুকু কার্যকরী? সর্বাবস্থায় অটোসাজেশন দেয়া যাবে?

উত্তর : যখন খুশি আপনি অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন চর্চা করতে পারবেন। তবে মেডিটেশনে যখন দেবেন এটা বেশি ফলপ্রসূ হবে কারণ মনের বাড়িতে আপনার অবচেতন মনের চ্যানেল খুলে যায়, অবচেতন মনের তথ্যভান্ডার পুনর্বিন্যস্ত করা সহজ হয়। এছাড়া ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে অথবা রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগমুহূর্তও অবচেতনের সাথে যোগাযোগ করার সুন্দর স্বাভাবিক সময়।

প্রশ্ন : একটি বিষয়ে অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন চলাকালে সফল না হওয়া পর্যন্ত কি অন্য বিষয়ে প্রত্যয়ন করা যায়?

উত্তর : যায় যদি সেটা পরস্পরবিরোধী না হয়। যেরকম আপনি প্রত্যয়ন করলেন যে—আমি চট্টগ্রামে যাবো। চট্টগ্রামে পৌঁছানোর আগেই যদি প্রত্যয়ন করেন যে, আমি রংপুর যাবো তাহলে তা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে আর চাকরির ব্যাপারে একই সাথে হতে পারে।

পড়াশোনার প্রত্যয়নের সাথে সাথে চাকরির ব্যাপারেও প্রত্যয়ন হতে পারে। ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের জন্যে প্রত্যয়ন হতে পারে; স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যয়ন হতে পারে। এভাবে ৪/৫/১০টা প্রত্যয়ন একই সাথে হতে পারে, যদি পরস্পরবিরোধী না হয়।

প্রশ্ন : প্রত্যয়ন একসাথে বেশি করলে এবং তা যদি পরস্পরবিরোধী হয় তবে কি সবগুলোর ওপরই প্রভাব ফেলবে?

উত্তর : কেন পরস্পর বিরোধিতায় যাবেন? একটা একটা করে করেন যাতে পরস্পর বিরোধী না হয়। অনেকগুলো একসাথে মিশিয়ে করার তো প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন : প্রত্যয়ন কোথায় করবো?

উত্তর : প্রত্যয়ন করবেন আপনার মনের বাড়ির দরবার কক্ষে বসে।

প্রশ্ন : ৬৪০ নং অটোসাজেশনে চাওয়াকে সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়েছে। এতে ১৯টি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। দয়া করে এই অটোসাজেশন সম্পর্কে কিছু বললে কৃতজ্ঞ হবো।

উত্তর : ‘চাওয়াকে সংজ্ঞায়িত করতে পারলে মন স্থির হয়, অতৃপ্তি কমতে থাকে। ১৯টি এমন বিষয়ের তালিকা আমার আছে যা আমি মৃত্যুর আগে অর্জন করবো।’-জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ বইয়ের ৬৪০ নং অটোসাজেশনের এ ১৯টি বিষয় আপনি বেছে নেবেন আপনার জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য অনুসারে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে বলা অটোসাজেশনগুলো কি একবার বললেই হবে, নাকি বার বার মেডিটেশন করে বার বার বলতে হবে? যেমন আমি সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, কর্মঠ ইত্যাদি। প্রত্যয়নের সময় মূলকথা কতবার বলতে হবে?

উত্তর : যতবার খুশি বলবেন। বার বার বলবেন। যত বেশি বলবেন উপকার তত বেশি হবে।

প্রশ্ন : প্রতিদিনের প্রতিবারের মেডিটেশনে অটোসাজেশন কি ভিন্ন হতে পারে?

উত্তর : একই অটোসাজেশন অনেকদিন ধরে নিয়মিত দিতে হবে। অটোসাজেশনের সংখ্যা অনেকগুলো হতে পারে। কিন্তু তা বার বার নিয়মিত দিতে হবে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে প্রত্যয়ন করি কিন্তু বাস্তবে কোনো পরিবর্তন দেখি না। কীভাবে প্রত্যয়ন করলে বাস্তবেও তার ফল পাবো?

উত্তর : সফল এবং ইতিবাচক প্রত্যয়নের জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত, কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। আপনার মধ্যে ভালো হওয়ার, ভালো থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতে হবে যে, আমি মাইগ্রেন চাই না, সাইনুসাইটিস চাই না, ব্যথা চাই না, দুঃখ চাই না, আমি ভালো থাকতে চাই।

কী রকম তীব্র হতে হবে? একজন ডুবন্ত মানুষের কাছে অক্সিজেনের আকাঙ্ক্ষা যেরকম তীব্র সেরকম তীব্র। একজন ডুবন্ত মানুষের সামনে আপনি এক হাতে ৫০ টাকার একটা অক্সিজেনের সিলিন্ডার আর অন্য হাতে দশ কেজি হীরা ধরে যদি প্রশ্ন করেন কোনটা নেবে? সে অক্সিজেনের সিলিন্ডার নেবে। কারণ সে ভাববে, বেঁচে থাকলে হীরা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এখন যদি দশ কেজি হীরা নিই তাহলে তো আরো নিচে চলে যাবো!

একজন ডুবন্ত মানুষের কাছে অক্সিজেনের আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র, আপনি যা চান, সেটি রোগমুক্তি হোক, সাফল্য হোক, কোনো গুণ হোক সেটার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষাও তেমনি তীব্র হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তথ্য। অবচেতন মনের তথ্যভান্ডারের পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

তৃতীয়ত, পুনরাবৃত্তি। বার বার এই আকাঙ্ক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

চতুর্থ হচ্ছে, নীরবে কাজ। ঘটনা ঘটায় জন্যে নীরবে কাজ করতে হবে।

আপনি চিন্তা করে দেখুন এই চারটি শর্ত আপনি পূরণ করছেন কি না। যদি পূরণ করে থাকেন তবে আপনার অটোসাজেশন বা প্রত্যয়ন বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন : প্রত্যয়নের প্রথম ধাপে বর্তমান অবস্থার বর্ণনা কি শুধু মেডিটেশনে মনে মনে করবো না স্বাভাবিক অবস্থায়ও করা যাবে?

উত্তর : এটা শুধু একবার। প্রথম ধাপ যেটা বর্তমান অবস্থার বর্ণনা এবং দ্বিতীয় ধাপ যেটা ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের বর্ণনা এটা শুধু মেডিটেশনে একবার বলবেন। এরপর থেকে যখনই মেডিটেশন বা বাস্তবে প্রত্যয়ন চর্চা করবেন। তখন শুধু প্রত্যয়ন, অর্থাৎ শেষ অংশটা বলবেন। ধরুন, আপনি ভয় পান। প্রথমবার মেডিটেশনে আপনি প্রথমে বলবেন আমি ভয় পাই। এরপর বলবেন আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য যে, আমি সাহসী হতে চাই। সবশেষে বলবেন আপনার প্রত্যয়ন, আমি সাহসী। শুধু প্রথমবারে এই তিনটা অংশ থাকবে। এরপরে যতবার প্রত্যয়ন করবেন শুধু তৃতীয় অংশটা বলবেন। অর্থাৎ শুধু বলবেন যে, আমি সাহসী, আমি সাহসী, আমি সাহসী।

প্রশ্ন : প্রত্যয়নে কি শুধু রেজাল্ট বলবো না কি দূর করতে চাচ্ছি তা বলবো । যেমন ‘আমার ভয় দূর হবে, আমি সাহসী হবো’ ।

উত্তর : ভয় দূর হবে এটা বলার দরকার নেই। অটোসাজেশনে সবসময় ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করবেন। নেতিবাচক শব্দ বর্জন করবেন। কেন তার কারণটা বোঝার জন্যে নিচের গল্পটা পড়ুন।

এক ভদ্রলোক গ্রামে যাচ্ছেন, স্যুট-বুট পরে। খাল পার হবেন। খালের ওপর বাঁশের চিকন পুল। পুলের মাঝামাঝি যখন এসেছেন হঠাৎ খেয়াল করলেন যে, খালের ঐ পারে এক পাগল বসে আপন মনে কাদামাটি নাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই উনি মনে করলেন পাগলের তো বুদ্ধি কম। সে যদি এখন এই কাদামাটি নাড়া বাদ দিয়ে হঠাৎ করে বাঁশ ধরে নাড়াচাড়া শুরু করে তাহলে তো আমি পড়ে যাবো। তো আগে থেকেই তাকে একটু সতর্ক করে দিই। উনি পুলের ওপর থেকে চিৎকার দিলেন ‘এই পাগলা বাঁশ নাড়িস না কিন্তু!’

পাগলের কিন্তু এতক্ষণ এদিকে কোনো খেয়ালই ছিলো না। শুনে মনে হলো-আরে! এ তো ভালো কথা মনে করেছে! একটু ভালো করে বাঁশটা নেড়ে দেই। বলে আচ্ছামতো দিলো নাড়া। ভদ্রলোক স্যুট-বুটসহ একেবারে খালের পানিতে পড়ে গেলেন।

এই পাগল কিন্তু তার মতোই ছিলো। যেই তাকে ‘না’ করার কথা মনে করিয়ে দেয়া হলো অমনি সে ওটা করতেই ছুটে এলো।

আমাদের মনও কিন্তু এক ধরনের পাগল। ভয়ের কথা মনে করিয়ে দিলে দেখা যাবে আরো বেশি করে ভয় পাচ্ছে। একই কারণে অটোসাজেশন ও প্রত্যয়নে রোগব্যাধির উল্লেখ যত কম করেন তত ভালো। যেমন ‘আমার হার্টের অসুখ ভালো হয়ে যাবে’ না বলে বলবেন ‘আমার হৃৎপিণ্ড ভালোভাবে কাজ করবে’, আমার বহুমূত্র ভালো হয়ে যাবে/ ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যাবে না বলে বলুন, ‘আমার অগ্ল্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস যথাযথভাবে কাজ করবে’।

প্রশ্ন : প্রত্যয়নে চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতার অভাব থাকলে কীভাবে তা বৃদ্ধি করা যেতে পারে?

উত্তর : সেজন্যে অটোসাজেশন দেবেন। চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষাটা যাতে তীব্র হয়। আসলে প্রত্যয়ন কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।

আমেরিকার একটি মন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হচ্ছে সাইকো কেবারনেটিক্স। এর উদ্ভাবক ছিলেন প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল মলজ। প্রত্যয়ন সংক্রান্ত অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রফেসর মলজ দিয়েছেন তার বইয়ে। একটা উদাহরণ খুব মজার। ম্যাক্সওয়েল মলজ বলছিলেন, আমাদের সাইকো কেবারনেটিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্যে একদিন এক যুবক এলো। সে তার দুরবস্থা ব্যাখ্যা করলো। তার কোনো অর্থ নেই। সে (তার মতে) ঋণ জর্জরিত এবং বিষণ্ণতায় আক্রান্ত। যুবক অবিবাহিত। মা তার সাথে থাকে। আরিজোয়ানার স্কটসডেলে তার একটা আর্ট শপ রয়েছে। সেখানে সে নিজের ও অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম বিক্রি করে। অত্যন্ত মেধাবী ভাস্কর হওয়া সত্ত্বেও নিজের সম্পর্কে তার ধারণা অত্যন্ত বাজে। ওয়ার্কশপ ও সেশনে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।

অবচেতন মনে তথ্য পুনর্বিন্যাসকালে সে ছয়টি প্রত্যয়ন করে :

১. আর্ট শপ এমন দামে বিক্রি হবে যে, তাতে আমার সকল দেনা শোধ হয়ে যাবে।

২. আমি বাসা বদলাতে পারবো।

৩. আমার মায়ের থাকার জন্যে নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে।

৪. ব্যাংকে আমার ১০ হাজার ডলার জমা থাকবে।

৫. আমি আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবো এবং ভাস্কর্য করার পর্যাপ্ত সময় পাবো।

৬. আমার ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

সে নিয়মিত কল্পনায় এ সবগুলো ঘটনা ঘটে যেতে দেখতে লাগলো। এভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটার পর এক সন্ধ্যায় আমার কাছে এসে হাজির হলো। বললো, ‘আমি বোধ হয় ক্রেজি হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমার মনে একটা সুখানুভূতি এসেছে, কিন্তু বাস্তবে আমার অবস্থার এক বিন্দু নড়চড় হয় নি।’

আমি তাকে বললাম, তুমি যা অনুভব করছো, তা হচ্ছে পরিবর্তন। আর যখন তোমার ভেতরে এই পরিবর্তন এসেছে, তখন বাস্তবেও তুমি এই পরিবর্তন উপভোগ করবে।

বাস্তবে তা-ই ঘটেছিলো। তার ছয়টি প্রত্যয়নই মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবতায় পরিণত হয়।

আসলে প্রথম পরিবর্তনটা আসতে হবে মনে, দৃষ্টিভঙ্গিতে। যে কারণে আমরা বলি যে, দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে। মনে যখন পরিবর্তন আসবে বাস্তবতাও বদলে যাবে।

প্রশ্ন : সমস্যা বেশি হলে প্রত্যয়ন কীভাবে করবো?

উত্তর : একটা একটা করে করবেন। ঐ যে কথায় আছে না যে, বাঁশের আঁটি যদি ভাঙতে হয় তাহলে দড়ি খুলে বাঁশগুলোকে আলাগা করতে হয়। অতএব সমস্যাকে একটা একটা করে ধরুন। খুব দ্রুত সমাধান পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : প্রত্যয়নের পর ঐ ব্যাপারে কোনো নেগেটিভ ঘটনা ঘটলে কী করবো?

উত্তর : অপেক্ষা করবেন এবং প্রত্যয়ন করতে থাকবেন। যেকোনো ঘটনার ক্ষেত্রেই বাধা আসতে পারে, বিলম্ব আসতে পারে। সেজন্যে সবসময় অপেক্ষা করবেন। আপনি আপনার প্রত্যয়ন করে যাবেন। নীরবে ধৈর্যের সাথে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে প্রত্যয়ন করি ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনে কোনো প্রত্যয়ন ঠিক রাখতে পারি না। যা প্রত্যয়ন করি সেটা আরো বেশি ভঙ্গ করি কেন?

উত্তর : এরকম হলে সাথে সাথে তওবা করবেন। আবার নতুন করে প্রত্যয়ন করবেন। যেহেতু আপনি ভালো কাজের জন্যে প্রত্যয়ন করছেন, যতবার আপনি ভাঙলেন ততবার নতুন করে প্রতিজ্ঞা করবেন যে, আমি আবার করবো। একটা শিশু যখন দাঁড়াতে শেখে, পুরোপুরি দাঁড়াতে পারার আগে সে বার বার পড়ে, আবার বার বার উঠে দাঁড়ায়। আপনিও তা-ই করবেন।

অটোসাজেশন কী হবে

‘জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ বইটি থেকে আপনার মনমতো অটোসাজেশন বেছে নিন।

প্রশ্ন : আমি চাই দৃঢ় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে। সেজন্যে কীভাবে অটোসাজেশন দেবো? কীভাবে বুঝবো আমার ইচ্ছা প্রত্যাশায় রূপ নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে?

উত্তর : প্রথমেই আপনাকে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে। আপনি কী রকম দৃঢ়, বলিষ্ঠ হতে চান, কীভাবে আকর্ষণীয় হতে চান সেগুলো আগে নিজের কাছে সুস্পষ্ট হতে হবে। তারপরে অটোসাজেশন দেবেন, আমি দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চাই। তারপর এই গুণগুলো অর্জনের জন্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। সবসময় গুণের আলোকে নিজের সমস্ত আচরণকে বিচার করতে হবে। নিয়মিত নিজেকে মূল্যায়ন করতে করতে একসময় দেখবেন আপনি দৃঢ় বলিষ্ঠ এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠছেন।

প্রশ্ন : আমি ধনী হতে চাই। প্রভাবশালী, প্রতিভাধর, বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী হতে চাই। কীভাবে প্রত্যয়ন করবো?

উত্তর : একটা একটা করে ধরুন তাহলে পারবেন। বুদ্ধিমান সেনাপতি কিন্তু একসাথে অনেকগুলো ফ্রন্ট খোলেন না। একটা একটা করে ফ্রন্ট খোলেন। প্রথমে ধনী হোন। তারপরে প্রভাবশালী হোন। তারপরে আপনার বহুমুখী যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটান। জ্যাক অফ অল ট্রেড্‌স হওয়ার আগে একটা বিষয়ে মাস্টার হওয়া উচিত। একটা বিষয়ে মাস্টার হওয়ার পরে আপনি যদি জ্যাক অফ অল ট্রেড্‌স হন সেটা আপনার অতিরিক্ত গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর একটা বিষয়ে মাস্টার না হয়ে যদি আপনি জ্যাক অফ অল ট্রেড্‌স হতে চান তাহলে আপনি কিছুই পাবেন না।

কথা আছে না-‘রোলিং স্টোন গেদার্স নো মস’। সেরকম যদি সব বিষয়ে যোগ্য হতে চান তাহলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। প্রথমে একটা বিষয়ে মাস্টার হোন। তারপরে বহুদিকে আপনার চিন্তাকে ছড়িয়ে দিন।

প্রশ্ন : কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন করা যায়?

উত্তর : আপনি রোগমুক্তির জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন। মানসিক উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন, পারিবারিক ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বসের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও বসের আনুকূল্য লাভের জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে ভাল বোঝাবুঝির অবসান ও তাদের আনুকূল্য ও স্নেহ লাভের জন্যে প্রত্যয়ন করতে পারেন।

মেডিটেশন অনুশীলন

প্রশ্ন : যখন সময় পাই না ১০/১৫ মিনিট মেডিটেশন করি। এতে কোনো সমস্যা আছে কি?

উত্তর : এতে কোনো সমস্যা নেই। ১০/১৫ মিনিট আত্মনিমগ্ন থাকবেন। কিছু উপকার আপনি পাবেন। বিশেষ প্রয়োজনে আপনি এটি করতে পারেন। তবে মেডিটেশনের উপকার পুরোপুরি পেতে হলে ৩০ মিনিট করতে হবে।

প্রশ্ন : দিনে দুই বার মেডিটেশন করা হয়ে ওঠে না, নিয়মিত একবার করতে চেষ্টা করি। আমার কি লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে?

উত্তর : দিনে দুই বার না খেলে মেজাজ ঠিক রাখা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। দিনে দুই বার খাওয়া যেমন আপনার জন্যে প্রয়োজনীয়, দুই বার মেডিটেশন করাও তেমনই প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন : দুইটি মেডিটেশন কি একবেলায় করা যায় কিংবা একবারে করা যায়?

উত্তর : আপনি যদি রাতের এবং দুপুরের খাবার একসাথে খেয়ে ফেলতে পারেন তাহলে দু'বারের মেডিটেশন একবারে করে নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন দুইবেলা খাবার লাগবে, একবেলা বেশি খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে থাকতে পারবেন না, তাহলে মেডিটেশন দুইবেলাই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : একসঙ্গে অনেকগুলো মেডিটেশন করলে কি ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে? মেডিটেটিভ লেভেল ভালো করার জন্যে এবং অনেকগুলো দিকে নিজের উন্নতির জন্যেই এটা করতে আগ্রহ প্রকাশ করছি।

উত্তর : একসঙ্গে অনেকগুলো মেডিটেশন করার তো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে একেকদিন একেকটা মেডিটেশন হতে পারে।

শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন প্রত্যেকদিন একবার করে করবেন। অথবা যারা নিরাময় করবেন, তারা একবার শিথিল প্রক্রিয়ায় নিরাময় অর্থাৎ নিরাময়-১, আরেকবার অন্য মেডিটেশন করবেন। লেভেল ঠিক করার জন্যে, নিজের উন্নতির জন্যে দিনে দুবেলা মেডিটেশনই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : সময় থাকলে দিনে দুবারের বেশি মেডিটেশন করা যাবে কি?

উত্তর : আসলে যারা সংসারী মানুষ তাদের জন্যে দিনে দুবেলা মেডিটেশনই যথেষ্ট। তবে পেশা-বাসার দায়িত্ব পালনের পরও যদি দুবারের বেশি মেডিটেশন করার সময় আপনার থাকে, সেক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবায় আরও কাজ করার সুযোগ আছে আপনার। মাটির ব্যাংক বিতরণ করুন। আলোকিত জীবনের বাণী পৌঁছে দিন মানুষের কাছে। আর মেডিটেশন ছাড়াও আপনি ফাউন্ডেশনের ‘হে মানুষ শোনো’, ‘পবিত্র ধর্মবাণী’, ‘আত্মজাগরণ’ কিংবা ‘জীবনকণিকা’ অডিও সিডিগুলো শুনতে পারেন।

প্রশ্ন : দুটি মেডিটেশনের মধ্যে কয় ঘণ্টা পার্থক্য থাকা দরকার?

উত্তর : সাধারণভাবে দুটো মেডিটেশনের মধ্যে ৬ ঘণ্টা পার্থক্য থাকা ভালো।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন নিয়মিত দুইবেলা মেডিটেশন করতে। কিন্তু যখন কোয়ান্টামের কোনো প্রোথাম থাকে এবং সেখানে মেডিটেশন করানো হয় সেদিন কি বাসায় এসে আবার মেডিটেশন করবো?

উত্তর : এক্ষেত্রে সেদিন বাসায় এসে মেডিটেশন না করলেও চলবে।

কখন

প্রশ্ন : মেডিটেশন কখন করা ভালো? ভোরে, ভোর রাতে, সন্ধ্যায় বা রাতে, দুপুরে বা সকালে?

উত্তর : এটা সবসময় ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে। একেকজনের মানসিক অবস্থা একেক সময় একেক রকম থাকে। কেউ কেউ রাতের বেলায় মেডিটেশনে ভালো বোধ করেন। আবার কেউ ভালো বোধ করেন ফজর নামাজের আগে। কেউ আবার ফজর নামাজের পর মেডিটেশনে বসলে ঘুমিয়ে পড়েন। কারো হয়তো দুপুর বেলা-বাসায় ছেলে-মেয়ে, হাজবেন্ড কেউ নেই, এসময় নিরিবিলা মেডিটেশন করতে ভালো লাগে। অর্থাৎ মেডিটেশন কখন করা ভালো, এটা সবসময় নির্ভর করবে কোন সময়টা আপনি ভালো মনে করছেন তার ওপর। প্রত্যেকের বেলায় এক নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন : মেডিটেশন দুপুর কিংবা রাতে খাবারের আগে নাকি পরে করবো ।

উত্তর : দুপুরে করলে খাওয়ার আগে করবেন । রাতে শোয়ার আগে করবেন, এবং সবসময় খাওয়ার অন্তত দুঘণ্টা পরে ঘুমাতে যাবেন । এটা একটা রুটিন করে নেয়া উচিত । রাতের বেলা আমরা অনেক সময় খেয়েই ঘুমাতে যাই এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয় । খাওয়ার দুঘণ্টা পরে ঘুমাতে যাওয়া উচিত । খাওয়ার দেড়ঘণ্টা পরে মেডিটেশন করবেন, তারপরে ঘুমাতে যাবেন ।

কীভাবে

প্রশ্ন : মুসলমানরা নামাজ পড়ার পূর্বে ওজু করে নেয়-কারণ এটা পবিত্র হওয়ার একটি প্রক্রিয়া এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর দিদার লাভ করাটাই হয়তো মুখ্য বিষয় । মেডিটেশনও তো তা-ই । তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ওজু করছি না কেন ? দয়া করে উত্তর দেবেন গুরুজী ।

উত্তর : নামাজ পড়ার আগে আল্লাহ তায়াল্লা ওজু করতে বলেছেন এজন্যে আমরা নামাজ পড়ার আগে ওজু করি । মেডিটেশন করার ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা নেই । তবে হাতমুখ ধুয়ে নেয়াটা সবসময় ভালো । আপনি যদি মনে করেন হাত মুখ ধুয়ে নেবেন, একটু ভালো করে পানির ঝাপটা দিয়ে নেবেন, খুব ভালো । যদি মনে করেন ওজু করবেন, ওজু করতে পারেন ।

প্রশ্ন : মেডিটেশন খালি বা ভরপেটে করতে হবে এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে কি?

উত্তর : আসলে খুব ভরা পেটে বা খুব খালি পেটে কোনোটাই ভালো নয় । ভরা পেটে করলে ঘুম আসার সম্ভাবনা বেশি । খাবার পর করতে চাইলে কিছুক্ষণ বজ্রাসন করে তারপর করতে পারেন । আর পেটে ক্ষুধা থাকলে তো মেডিটেশনে মনোযোগ দিতে পারবেন না । অতএব মেডিটেশন করবেন পেট হালকা ভরা আছে এমন অবস্থায় ।

প্রশ্ন : অন্ধকার ঘরে কেন মেডিটেশন করা যাবে না?

উত্তর : অন্ধকার ঘরে মেডিটেশন করতে নিষেধ করার কারণ, অন্ধকার ঘরে মেডিটেটিভ লেভেলে হঠাৎ যদি ভয়ের কিছু মনে হয়, ভয়ের কোনো অনুভূতি

হয় আপনি আরো বেশি ভয় পেয়ে যেতে পারেন। অন্ধকার সবসময় ভয়ের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। অতএব হালকা আলোতে মেডিটেশন করবেন। অকারণ ভয় থেকে মুক্ত থাকবেন। তাই অন্ধকার ঘরের চেয়ে হালকা আলোয় মেডিটেশন সবসময় ভালো হয়।

প্রশ্ন : চোখ খোলা রেখে মেডিটেশন করা সম্ভব কি না? অর্থাৎ মনের বাড়ি গিয়ে চোখ খোলা রেখে প্রত্যয়ন বা অটোসাজেশন দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : প্রাথমিক পর্যায়ে চোখ খোলা রেখে মেডিটেশন লেভেলে থাকা কঠিন হবে। চর্চা করতে থাকুন, এক সময় নিশ্চয়ই চোখ খোলা রেখেও পারবেন। তবে প্রাথমিক অবস্থায় চোখ বন্ধ রেখেই মেডিটেশন করবেন। এতে আপনি দ্রুত কনডিশন হবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশন ও ব্যায়াম-এ দুটির মধ্যে কোনটা আগে করবো?

উত্তর : এটা আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। কেউ মনে করেন-ব্যায়াম করে মেডিটেশন করে একবারে রিল্যাক্স করবো। আবার কেউ মনে করেন ব্যায়াম করে মেডিটেশন করলে ক্লান্তি চলে আসতে পারে, ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। কিছুদিন চর্চা করে দেখুন কোনটাতে আপনি সুবিধা বোধ করছেন। যেভাবে সুবিধা বোধ করবেন সেভাবে করবেন। তবে দুটোই আপনার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জীবনের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ।

কোথায়

প্রশ্ন : মেডিটেশন কি যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে করা যায়?

উত্তর : মেডিটেশন যেকোনো সময়ে করা যাবে কিন্তু যেকোনো স্থানে করার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। আপনি ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। এত উন্মুক্ত জায়গা দেখে বসে গেলেন মেডিটেশন করতে। বাস এবং ট্রাক কখন যে আপনাকে আল্লাহর পেয়ারা (!) বানিয়ে দেবে সে খোঁজও থাকবে না। তাই স্থান নির্বাচন করার আগে খেয়াল করবেন এ স্থানটা মেডিটেশনের জন্যে নিরাপদ কি না, সুন্দর কি না।

প্রশ্ন : ধ্যান করার জন্যে অনুকূল বা আরামদায়ক পরিবেশ না পেলে কী করা উচিত? অথবা ন্যূনতম কতটুকু আদর্শ পরিবেশে ধ্যান করা সম্ভব?

উত্তর : যেকোনো পরিবেশে, যেকোনো জায়গাতেই আপনি মেডিটেশন করতে পারেন, যদি আপনার সেরকম মানসিক প্রস্তুতি থাকে। আসলে মেডিটেশনের জন্যে কোনো বিশেষ জায়গার প্রয়োজন নেই। আর আপনি সবসময় বিশেষ জায়গা পাবেন এমন কোনো কথা নেই। কারণ ধ্যানটা তো মনের ব্যাপার। আপনাকে যা করতে হবে তাহলো মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া, পারিপার্শ্বিকতা থেকে মনকে সরিয়ে আনা। প্রথমে হয়তো কোলাহলে অস্বস্তি হবে, কিন্তু এভাবে করতে করতেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, এরপর কোলাহল আর কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আর মেডিটেশনে তো আমরা অটোসাজেশন দিচ্ছি, যেকোনো অপ্রয়োজনীয় শব্দে আমার মনোযোগ আরো গভীর হবে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল পরিবেশেও আপনি চমৎকার মনোযোগের সাথে মেডিটেশন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : ট্রেনে বা গাড়িতে রিকশায় ২/৩ মিনিটের জন্যে বা বেশি সময়ের জন্যে মেডিটেশন করা যায় কি না?

উত্তর : যায়। কিন্তু সম্ভাবনা আছে আপনি একেবারে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে পৌঁছে যাবেন। ধরুন, আপনি রিকশা দিয়ে যাচ্ছেন, সামনে রিকশা ব্রেক কষলো বা পেছন থেকে ধাক্কা দিলো। আপনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হার মানিয়ে রিকশাওয়ালার ওপর দিয়ে সামনে গিয়ে পড়বেন। তাই রিকশায় উঠে মেডিটেশন করতে যাবেন না।

তবে বাস, ট্রেন বা গাড়িতে বেশি সময়ের জন্যে যখন আপনি ভ্রমণ করছেন বা জ্যামে বসে আছেন—তখন মেডিটেশন করতে পারেন। অবশ্য নিজে ড্রাইভ করার সময় কখনো মেডিটেশন বা অটোসাজেশনের সিডি শুনতে যাবেন না।

প্রশ্ন : আমি ঢাকায় ফ্যামিলি ছাড়া থাকি। আমরা ছয়জন একটি বাসা ভাড়া করে থাকি। সমস্যা হয় রাতে মেডিটেশন করা নিয়ে। সবাই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ও পড়ে। আমার রুমমেটও পড়ে। এ অবস্থায় মেডিটেশন করলে সবাই হাসবে বা পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারবো না বলে অপেক্ষা করি। কিন্তু এক পর্যায়ে রাত বেশি হলে ঘুম চলে আসে এবং মেডিটেশন না

করেই ঘুমিয়ে পড়তে হয়। দেরি করে ঘুমাই বলে সকালে উঠতে দেরি হয়ে যায়। বাড়িতে গেলেও সবাই দেখে ফেলবেন বলে মেডিটেশন করা হয় না। কারণ তারা কেউ এটা পছন্দ করছেন না। এজন্যে প্রায়ই মেডিটেশন অনিয়মিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : আসলে আপনার অবস্থা হচ্ছে পাছে লোকে কিছু বলে, অর্থাৎ রি-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি নিজেই মনে করছেন মেডিটেশন করে খুব অন্যায় কিছু করে ফেলেছি, কেউ যেন না দেখে। তা না করে যে রুমে অন্যরা পড়ে সে রুমেই আপনি বসে মেডিটেশন করুন। অন্যরা প্রথমে হাসাহাসি করবে, নানারকম মন্তব্য করবে, এমনও হতে পারে খোঁচা দিচ্ছে। হাসাহাসি করলে আপনিও হাসেন। একদিন, দুইদিন, তিনদিন-এরকম চলার পর তারা নিজেরাই রণে ভঙ্গ দেবে। আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখলে তারাি আপনাকে বিরক্ত করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

নিয়মিত এই পরিবেশে মেডিটেশন করে গেলে কিছুদিন পরে আপনার রুমমেটরাই মেডিটেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কারণ আপনার বিশ্বাস, আপনার নীরবতা, আপনার প্রশান্ত প্রত্যয় অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে।

এ প্রশ্নটি যদি ১৯৯৩ সালের হতো তাহলে হয়তো ঠিক ছিলো। তখন মেডিটেশন যারা করতো তাদেরকে আশেপাশের অনেকেই পাগল বলতো। আমাকেও পাগল বলার লোকের অভাব ছিলো না। আর বিশ বছর পর এখন তো সমাজের সচেতন মহলের সবাই মেডিটেশনের ব্যাপারে আগ্রহী। এখন মেডিটেশন চর্চাকারীদের পাগল বলার মতো নির্বোধ লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর কয়েক বছর পরে যারা মেডিটেশন জানবে না বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তাদেরকেই কোনো বিশেষ নির্বোধ প্রাণীর সাথে তুলনা করবে। অতএব নির্দিধায় মেডিটেশন করুন।

প্রশ্ন : যারা শহরে মেসে বা এমন বাসস্থানে থাকেন যা অত্যন্ত লোকারণ্য। তাদের পক্ষে দুদন্ড শান্তিতে মেডিটেশন করাও খুব কঠিন হয়। আমাদের যদি ফাউন্ডেশন থেকে এমন একটা রুম দেয়া হয় যেখানে ক্যাসেট ছাড়া যার যখন ইচ্ছা সেখানে গিয়ে মেডিটেশন করে আসতে পারে। এমন একটি মৌনাবাস করা যেতে পারে যেটি সকাল সাতটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে শুধু মেডিটেশনের জন্যে। প্রতিবারের জন্যে ১০ টাকা চার্জ রাখা যেতে পারে যা কখনোই অন্য কোনো প্রোগ্রামের জন্যে বন্ধ থাকবে না।

উত্তর : এরপরে বলবেন যে, ফাউন্ডেশন রুম করে নি তাই আমার মেডিটেশন হয় নি। মেডিটেশন করার জন্যে ফাউন্ডেশনের রুমের প্রয়োজন আছে? এই ঢাকা শহরে এক মসজিদ থেকে বেরতে গিয়ে হাঁচট খেলেও দেখা যায় যে, আরেক মসজিদের দরজায় গিয়ে পড়েছেন—এত মসজিদ। আশেপাশে সব জায়গাতেই মসজিদ। ঢুকে যান। আপনি তো ক্যাসেট ছাড়া করছেন। ক্যাসেট বা ওয়াকম্যান ব্যবহার করলে হয়তো বলতো যে, কী জানি বসে বসে গান শুনছে নাকি? যেহেতু আপনি এটা করছেন না, বসে পড়ুন ওখানে। নীরবে আত্মনিমগ্ন হোন। কেউ কিছু বলবে না।

সুযোগ পেলে মন্দিরের আঙিনায় নীরবে মেডিটেশন করতে পারেন। এর জন্যে কোনো পয়সা খরচও হচ্ছে না।

আর এখন ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে প্রায় সব জেলা শহরেই রয়েছে ফাউন্ডেশনের বেশ কয়েকটি সেন্টার/ শাখা/ সেল ও প্রি-সেল। খোঁজ করে দেখুন, ওখানেও আপনি মেডিটেশন করার সুযোগ পাবেন।

সবসময় মনে রাখবেন—একটা কাজ না করার জন্যে এক হাজার একটা অজুহাত দেখানো যেতে পারে। কিন্তু কাজটি করার জন্যে একটা কারণই যথেষ্ট যে, কাজটি আমি করবো। অতএব স্রষ্টা আপনাকে যে মস্তিষ্ক দিয়েছেন তা ব্যবহার করে বিকল্প বের করুন। এই ব্রেনটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন : আমি ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে অফিস করি, বাসে যাতায়াত প্রায় ৪০ মিনিট। বাসে মেডিটেশনের সময় মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে উঠি—বাস এখন কোন জায়গায় পৌঁছলো! আমার কি মেডিটেশন হচ্ছে? কী করবো?

উত্তর : এটা সময়ের খুব সুন্দর সদ্ব্যবহার হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাঝে মাঝে লেভেল ভেঙে গেলেও কোনো সমস্যা নেই। এক সময় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। তবে সিটে বসে পা দুটো সামনের সিটের সাথে এমনভাবে ঠেস দিয়ে রাখবেন, যাতে গাড়ি হঠাৎ ব্রেক কষলেও আপনার কোনো অসুবিধা না হয়।

আর মেডিটেশনের আগে আপনার সাথে ব্যাগ বা মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে সাবধানে থাকে সেটা নিশ্চিত করে নেবেন।

প্রশ্ন : আমি যখন মেডিটেশন করি তখন আমার সন্তানরা আমার গায়ের ওপর বসে থাকে, গুঁতাগুঁতি করে, চুল ধরে টানে, এ অবস্থায় মেডিটেশন হয় কি?

উত্তর : খুব ভালো মেডিটেশন হয়। সন্তানরা আপনার সাথে গুঁতাগুঁতি করবে না তো কি আরেক মহিলার সাথে গিয়ে গুঁতাগুঁতি করবে? সে তো বোঝে যে, গুঁতাগুঁতির জায়গা আমার এই একটাই।

এতে মেডিটেশনের কিছু হবে না। উত্তেজিত না হলে মেডিটেশনের লেভেল নষ্ট হয় না। অতএব সন্তান গুঁতাগুঁতি করলে আনন্দিত হবেন, কয়দিন পর দেখবেন তাদের গুঁতাগুঁতির উৎসাহ কমে গেছে।

আমাদের দেশের একজন খুব বড় লেখক এবং আলেম ছিলেন। ইসলামের ওপর অনেক বই আছে তার। আমি যখন সাংবাদিক ছিলাম একদিন তার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তার টেবিলে, মেঝেতে সর্বত্র ছড়ানো-ছিটানো বই। মাশাআল্লাহ তার সন্তানের সংখ্যাও ছিলো বেশ। তারা কেউ বইয়ের ওপর লাফাচ্ছে, কেউ টেবিলে লাফালাফি করছে, দুইজন ঘাড়ের ওপর বসে আছে এবং ঐ অবস্থায় উনি লিখে চলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এভাবে লেখেন কী করে? উনি বললেন-ওরা করবেটা কী। ওদের একটা কাজে ব্যস্ত করে রেখেছি, আমি আমার কাজ করছি।

সন্তানের প্রতি কখনও বিরক্ত হবেন না। সন্তান তো সন্তানই। বাচ্চা বলেই তো গুঁতাগুঁতি করে। আরেকটু যখন বড় হবে তখন দেখবেন সে-ও আপনার পাশে বসে আছে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় চুম্বকের অবস্থান অনুসারে উত্তর-দক্ষিণ হয়ে বসতে হবে কি না। নাকি চুম্বকের সাথে মিল রাখার কোনো দরকার নেই। কোনটা ভালো হয়, চুম্বকের মতো উত্তর-দক্ষিণ না কি যেকোনো দিকে মুখ করে বসা?

উত্তর : যখন সাধনার পথে অগ্রসর হবেন তখন নানাজন নানারকম কথা বলবে। আসলে মেডিটেশনে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম বলে কিছু নেই। সব দিক আল্লাহর। তাই যে দিকেই মুখ করে বসবেন তাতেই মেডিটেশন হবে। শুধু মনটাকে একাত্ম করতে হবে যা ভাবছেন তার ওপর।

কোন মেডিটেশন করবো?

প্রশ্ন : কোর্সের পর যে ৪০ দিন মেডিটেশন করতে বলা হয়-সেটা কি নির্দিষ্ট কোনো মেডিটেশন করতে হবে না যেকোনো মেডিটেশন হলে চলবে?

উত্তর : কোর্সের পরে ৪০ দিন শিথিলায়ন মেডিটেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা নিরাময়ের মেডিটেশন করছেন তারা নিরাময়-১ এবং নিরাময়-২ আর নিরাময় না করলে শিথিলায়ন একবার এবং অন্য যেকোনো মেডিটেশন ৪০ দিন করবেন।

প্রশ্ন : অনেক বিষয়ে মেডিটেশন আছে। কখন কোনটা করা উচিত? দিনে দুইবার মেডিটেশনের সময় শিথিলায়নের সাথে আর কোনটা করা উচিত? সব বিষয়ে মেডিটেশন নিয়ে কোনো শিডিউল তৈরি করা কি সম্ভব? এ ব্যাপারে আলোচনা করলে অনেকেরই উপকার হবে।

উত্তর : এখন কিন্তু সুবিধা আছে। যেমন মনছবি ক্যাসেটে, সাইড-‘এ’তে শিথিল প্রক্রিয়ায় মনের বাড়ি যাচ্ছেন। অতএব শিথিলায়ন মেডিটেশন না করে আপনি মনছবি ‘এ’ সাইড করলেও শিথিলায়নের সমান উপকার পাবেন। আবার নিরাময়ের ক্যাসেট/ সিডি নম্বর ৬, সেটারও সাইড ‘এ’ হচ্ছে শিথিল প্রক্রিয়ায় মনের বাড়িতে যাওয়া। অর্থাৎ শিথিলায়ন-১, মনছবি-১ এবং নিরাময়-১-এই তিনটার যেকোনো একটা করতে পারেন। এর সাথে আপনি সুখী জীবন বা অন্য যেকোনো মেডিটেশন করতে পারেন।

একেক সময় একেক মেডিটেশন করুন। কখনো যদি মন একটু খারাপ থাকে তাহলে সকাল-বিকেল আনন্দের মেডিটেশন করেন। মন ভালো হয়ে যাবে। যদি হীনম্মন্যতায় ভোগেন-কী করবেন? ৯ নম্বর ক্যাসেটের ‘হও উন্নত শির’। যদি মানুষের সামনে যেতে লজ্জা লাগে, জড়তা-সংকোচ থাকে, তাহলে ৯ নম্বরের ‘বি’ সাইড লজ্জা, সংকোচ, জড়তা। পারিবারিক সম্পর্ক ভালো করার জন্যে বিশেষ মেডিটেশন রয়েছে। যারা প্রার্থনায় আনন্দ পান তাদের জন্যে সার্বজনীন প্রার্থনার মেডিটেশন রয়েছে। কোরআনের দোয়ার মেডিটেশন রয়েছে। অর্থাৎ যা যা মেডিটেশন রয়েছে সেগুলো প্রয়োজনমতো আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি স্বাধীন।

প্রশ্ন : প্রায় চার বছর আগে আমার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী কোর্স করার পর নিমগ্ন পড়াশোনা মেডিটেশনটি অনুশীলন করতে খুব ভালো লাগে। নিয়মিত এ মেডিটেশন করার ফলে আমার স্মৃতিশক্তির অসাধারণ উন্নতি হয়েছে। মাথা ঠান্ডা হয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতি সহজে মোকাবেলা করতে পারছি। রাতে এ মেডিটেশনটি করতে আমার খুব ভালো লাগে।

আবার অন্যান্য শারীরিক সমস্যার কারণে নিরাময়ের মেডিটেশন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। আবার প্রতিদিন মনছবি অনুশীলন করতে ইচ্ছে করে। আবার নিয়মিত রাগ ক্ষোভ দুঃখ ভয় ইত্যাদির মেডিটেশনও করতে ইচ্ছে করে। দিনে অন্তত একবার শিথিলায়ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতগুলো মেডিটেশনের মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করবো। উল্লেখ্য, যে গত প্রায় দুই মাস যাবত মেডিটেশন করা হচ্ছে না। আমি আবার মেডিটেশন করতে চাই। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিলে কৃতজ্ঞ হবো।

উত্তর : অনেক কিছুই ভিড়ে হারিয়ে যাবেন না। যেকোনো একটি বিষয়ে মাস্টার হতে হবে। কৌশলটা খুব সহজ। আপনি গভীর শিথিলায়ন করুন, যখন মিউজিক শুরু হবে আপনি মনছবি দেখুন। এরপর হিলিং সেন্টারে চলে যান। হিলিং শেষে কমান্ড সেন্টারে যেতে চাইলে আবার দরবার কক্ষে ফিরে আসুন। তারপর নিয়মমতো কমান্ড সেন্টারে যান।

অর্থাৎ শিথিলায়ন মেডিটেশনে আপনি মনছবি, হিলিং, কমান্ড সেন্টার-সব একসাথেই করতে পারেন। এছাড়া মাঝে মাঝে অন্য মেডিটেশনও করতে পারেন। কিছুদিন শিথিলায়ন করুন সকালবেলা, এরপর ইচ্ছে হলে আনন্দের মেডিটেশন করতে পারেন, ব্রেনের মেডিটেশন করতে পারেন। অর্থাৎ যতগুলো মেডিটেশন আছে আপনি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে চর্চা করতে পারেন। কিন্তু প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শিথিলায়ন।

আপনার যেহেতু নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিলো আর নিমগ্ন পড়াশোনার মেডিটেশন আপনার ভালো লেগেছে, নিয়মিত চর্চায় আপনি উপকার পেয়েছেন, এই মেডিটেশনটি আপনি রাতের বেলায় করবেন। তাহলে দুটো মেডিটেশনের মধ্যে সবকিছুই চলে আসছে। আর ভয় দূর করার জন্যে অটোসাজেশন দেবেন। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে আলাদা মেডিটেশন করার সময় বা সুযোগ থাকে না। সেক্ষেত্রে অটোসাজেশন দেবেন। অটোসাজেশন বইটি যখন পড়বেন, উপলব্ধি করবেন-এখানে জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ইতিবাচক অটোসাজেশন দেয়া আছে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে মনের ক্ষোভ দূর করার পরও রয়ে গেল। কী করা যায়?

উত্তর : এটাকে আরো কয়েকবার সাফ করতে হবে। অনেক ময়লা আছে যা একবার সাফ করলে যায় না, ওটাকে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার পরিষ্কার করতে

হয়। এটাও সেরকম। কিছুদিন রাগ-ক্ষোভের মেডিটেশন চর্চা করুন। দেখবেন দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : কতদিন চর্চার পর আমার মনের বাঘ দূর হবে?

উত্তর : এটা আসলে বলা মুশকিল। কালকে থেকেও চলে যেতে পারে। পরশু থেকেও চলে যেতে পারে। আপনি যত আন্তরিকতার সাথে চর্চা করবেন তত তাড়াতাড়ি মনের বাঘ আপনাকে ছেড়ে পালাবে। আর সবসময় অটোসাজেশন দেবেন, আমি সাহসী! আমি সাহসী!

প্রশ্ন : ব্যবসায়িক সফলতার জন্যে কোন মেডিটেশনটি করা প্রয়োজন?

উত্তর : ব্যবসায়িক সফলতার জন্যে প্রত্যেকদিন সকালবেলা মনছবির মেডিটেশন করবেন। সকালে ঘুম ভাঙতেই দিন শুরু করবেন শোকর আলহামদুলিল্লাহ বা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ বলে। তারপরে মনছবির মেডিটেশনে ব্যবসায়ে যে ধরনের সফলতা চান, সেই সফলতাকে দেখুন। মেডিটেশনে দিনের কাজের ছক তৈরি করুন। দেখুন—প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে করতে পারছেন। ব্যবসায়িক সফলতা আসবে।

প্রশ্ন : আমি ছোটবেলা থেকেই ইন্ট্রোভার্ট টাইপের ছেলে। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে আমার কোন মেডিটেশন করা উচিত?

উত্তর : আপনি আগে দেখেন যে, আপনার এ অন্তর্মুখিতা আপনার ক্ষতি করেছে কি না। এ অন্তর্মুখিতা যদি আপনাকে সৃজনশীল কাজে ও একা যে কাজ করা যায় সেগুলোতে দক্ষ করে তোলে তাহলে এই অন্তর্মুখিতা আপনার জন্যে খুব ভালো। আর যদি মনে করেন যে, এ অন্তর্মুখিতার কারণে আপনার মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করে, জড়তা কাজ করে—যে জড়তার কারণে আপনি অন্যের সাথে মিশতে পারেন না, নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। তাহলে সংকোচ ও জড়তা কাটানোর জন্যে আপনি মেডিটেশনের ৯ নম্বর ক্যাসেট/ সিডি নিয়মিত ব্যবহার করুন, আপনার সংকোচ ও জড়তা কেটে যাবে। আপনি খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে অন্যের সাথে মিশতে পারবেন।

কীভাবে লেভেল ভালো করবো?

প্রশ্ন : মেডিটেশনের গভীর লেভেলে যাওয়ার জন্যে কোন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : মেডিটেশনের গভীর লেভেলে যাওয়ার জন্যে ফল নয়, প্রক্রিয়ার দিকে নজর দেবেন। এই প্রক্রিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। যত হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা নিয়ে চিন্তা করবেন তত কম হবে। যত চিন্তা করবেন ‘হচ্ছে’ তত বেশি হবে।

ব্যাখ্যাটা খুব সহজ। যত চিন্তা করছেন, আহ্ খুব সুন্দর মনের বাড়ি, মনটা প্রশান্ত হচ্ছে আপনি আলফা লেভেলে চলে যাচ্ছেন। আর যখন চিন্তা করছেন কিরে হচ্ছে কি হচ্ছে না, মনের বাড়ি দেখছি কি দেখছি না। টেনশন সৃষ্টি হচ্ছে। আর টেনশন সৃষ্টি হলে ব্রেন চলে যাচ্ছে গামা লেভেলে।

অর্থাৎ যখনই হচ্ছে কি হচ্ছে না চিন্তা করছেন আপনি আস্তে আস্তে গামা লেভেলে চলে যাচ্ছেন। আর যখন হচ্ছে ভাবছেন তখন অটোমেটিক আপনি আলফা লেভেলে চলে যাচ্ছেন। অতএব ‘পারফরমেন্স কনশাস’ হবেন না। শুধু প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করে যাবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেটিভ লেভেল ভালো করার জন্যে কী করতে পারি?

উত্তর : মেডিটেটিভ লেভেল ভালো হবে যখন আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হবে। যত ইতিবাচক ও কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারবেন, তত মেডিটেশন ভালো হবে। এজন্যে দিন শুরু করবেন ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলে এবং দিনে যতবার মনে পড়ে ততবার বলবেন—শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি।

দ্বিতীয়ত, মেডিটেশনের সময়টা ঠিক করে নেবেন। ভাববেন—আমি প্রতিদিন ঠিক এ সময়ে মেডিটেশন করবো এবং এ সময় মেডিটেশন ছাড়া অন্য কিছু করবো না। দেখবেন আপনার দেহ-মন কন্ডিশন্ড হয়ে যাচ্ছে। আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মেডিটেটিভ লেভেলে চলে যাচ্ছেন।

একটি কাজ যখন নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত করা হয় তখন দেহ-মন কন্ডিশন্ড হয়ে যায় ঐ সময়ে ঐ কাজটি করার জন্যে। যে কারণে নামাজ সুনির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বলা হয়েছে। আজকে ভোরে মেডিটেশন করলেন, আবার আরেকদিন ভাবলেন শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, আচ্ছা একটু গড়াগড়ি

দিই, ৮টার সময় উঠে মেডিটেশন করলেন, আবার আরেকদিন সকালবেলায় উঠে দৌড় দিলেন, দুপুর বেলা মেডিটেশন করলেন—এতে লেভেল ভালো না-ও হতে পারে। তাই নিজে সময় ঠিক করে নেবেন যে, আমি প্রতিদিন এ সময় মেডিটেশন করবো। দেখবেন মেডিটেশনের লেভেলটা চমৎকার হচ্ছে।

এছাড়া মেডিটেটিভ লেভেল ভালো করার জন্য নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টায়ন এবং ‘কোয়ান্টাম কোয়ান্টায়নে’ অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ।

(কোয়ান্টায়ন সম্পর্কে আরো স্পষ্ট ধারণার জন্যে কোয়ান্টায়ন অধ্যায় দেখুন)

ক্যাসেট/ সিডি-তে না নিজে নিজে?

প্রশ্ন : মেডিটেশন ক্যাসেট/ সিডি দিয়ে করলে, না ক্যাসেট/ সিডি ছাড়া করলে বেশি কার্যকরী?

উত্তর : আসলে দুটোই কার্যকর। ক্যাসেট/ সিডি দিয়ে করলেও কার্যকর, ক্যাসেট/ সিডি ছাড়া করলেও কার্যকর। তবে প্রথম দিকে ক্যাসেট/ সিডি দিয়ে করা ভালো। এতে লেভেলটা খুব দ্রুত সুন্দর হয়। যখন অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, তখন ক্যাসেট/ সিডি দিয়েও করতে পারেন, ক্যাসেট/ সিডি ছাড়াও করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমার হাজবেন্ড, ছেলে ও আমি—আমরা তিনজনেই কোয়ান্টাম কোর্স করেছি। নিয়মিত দুবেলা শিথিলায়ন মেডিটেশন করতে চেষ্টা করি সিডিতে। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকায় মাঝে মাঝে বাদ পড়ে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে—দীর্ঘসময় ধরে বিদ্যুৎ না থাকলে মেডিটেশন কীভাবে করবো?

উত্তর : দীর্ঘসময় বিদ্যুৎ না থাকলে মেডিটেশন কীভাবে করবেন সে প্রশ্ন আসছে। কিন্তু আপনার প্রয়োজনীয় অন্য কাজ কি আপনি বিদ্যুৎ না থাকলে বন্ধ রাখেন? মেডিটেশনকে যদি প্রয়োজনীয় মনে করতে পারেন, তাহলে যেকোনো অবস্থাতেই আপনি মেডিটেশন করার সুযোগ করে নেবেন।

আর মেডিটেশন যে সিডি দিয়েই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মেডিটেশনের ধাপগুলো মুখস্থ করে ফেলুন। মেডিটেশন—সুযোগ পেলে সিডি দিয়ে করবেন, যখন পাবেন না তখন নিজে নিজে করবেন। কিছুদিন চর্চার পর দেখবেন নিজে নিজেই চমৎকার মেডিটেশন করতে পারছেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামের ক্যাসেট যখন বাসায় শুনবো তখন কি ওয়াকম্যানের সাহায্যে একাই শুনবো নাকি ডেকসেটে শুনবো?

উত্তর : অন্য কারো যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে আপনি ডেকসেটে শুনতে পারেন। অথবা ওয়াকম্যান দিয়েও শুনতে পারেন। এটা আপনার সুবিধা অনুসারে। তবে হেডফোন যত কম ব্যবহার করা যায় তত ভালো, কারণ এতে কানের ক্ষতি হয়। যেমন, অনেকেই আজকাল এমপি থ্রি প্লেয়ার বা আইপডে হেডফোন বা ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শোনেন। বাজারেও আসছে নিত্যনতুন এমপি থ্রি প্লেয়ার বা আইপড। মোবাইল ফোনসেটেও আছে এমপি থ্রি অপশন। শ্রবণ বিশেষজ্ঞদের গবেষণা থেকে জানা যায়, দীর্ঘক্ষণ ধরে উচ্চশব্দ আমাদের কানের ভেতরের শ্রবণযন্ত্রের নাজুক কোষ নষ্ট করে দেয়। এতে শ্রবণশক্তির সমূহ ক্ষতি—এমনকি তা চিরতরে নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : ক্যাসেট/ সিডি ছাড়াই আমি মেডিটেশন করছি। কারণ আমি ১৫/২০ মিনিট করে মেডিটেশন করি এবং প্রতিবারে অটোসাজেশন, মনছবি এবং কমান্ড সেন্টারে যাই, এভাবে মেডিটেশন কতটুকু ফলপ্রসূ? ক্যাসেটের সব কথাই প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তাই এখন ক্যাসেট ছাড়াই আমার সুবিধা।

উত্তর : আমরা ৩০ মিনিট সময়টাকেই বেশি কার্যকরী মনে করি। অতএব ক্যাসেট দিয়ে বা ক্যাসেট ছাড়া—মেডিটেশন ৩০ মিনিট করা উচিত।

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত মেডিটেশন করি। ক্যাসেট ছাড়া মেডিটেশন করলে অসুবিধা আছে কি না। নিজে নিজে মেডিটেশন করতে কোনোদিন একঘণ্টারও ওপরে সময় লেগে যায়। সময়ের ব্যাপারে কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না।

উত্তর : যদি ক্যাসেট/ সিডি ছাড়া মেডিটেশন করতে বেশি সময় লেগে যায় তাহলে ক্যাসেট/ সিডি ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন : ক্যাসেটের মাধ্যমে মেডিটেশন করার সময়ে হঠাৎ কেউ ডেকে ফেললে এরপর আমি কি ক্যাসেট টেনে পুনরায় নতুনভাবে করবো না কি ঐ অবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে শুনবো?

উত্তর : হঠাৎ ডেকে ফেললে চোখ মেলবেন। আবার চোখ বন্ধ করে যেখান থেকে চোখ মেলেছিলেন, সেখান থেকে করবেন। নতুন করে আবার শুরু করার দরকার নাই।

প্রশ্ন : সিডিতে মেডিটেশন করার সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে মেডিটেশন করতে সমস্যা হয়। আপনি বলেছেন বাকি অংশটুকু কল্পনা করে নিজে নিজে করতে। কিন্তু আবার যখন বিদ্যুৎ আসে তখন সিডি প্রথম থেকে চলতে থাকে। তখন মেডিটেশনের বাকি অংশটুকু সম্পন্ন করতে আরো কষ্ট হয়। কারণ সিডি অফ করে দেয়ার কেউ থাকে না। কী করবো বললে উপকৃত হবো।

উত্তর : বিদ্যুৎ চলে গেলে চোখ মেলে আপনি সিডি অফ করে আবার মেডিটেশন শুরু করে দেবেন। যে পরিস্থিতিই হোক সে পরিস্থিতিকে প্রো-একটিভ থেকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাবেন।

প্রশ্ন : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা এবং কল্পনা, ব্রেন-এই মেডিটেশন করতে আমি আগের ক্যাসেট ব্যবহার করি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি ঐ ক্যাসেটগুলোতে, আমি কি ঐ ক্যাসেটগুলোই ব্যবহার করতে পারবো মেডিটেশনের জন্যে?

উত্তর : কেন পারবেন না। যেটা আপনার পছন্দ সেটা ব্যবহার করবেন। আপনি যদি পুরনো ক্যাসেটে অভ্যস্ত হন কোনো অসুবিধা নাই। খামোখা নতুন ক্যাসেট কিনে পয়সা খরচ করার দরকারটা কী?

প্রশ্ন : মেমোরি কার্ডে আমাদের মেডিটেশনগুলো কপি করা গেলে চর্চা করতে সুবিধা হতো। এ ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করছি।

উত্তর : আপনি করতে পারেন, যতগুলো মেডিটেশন রয়েছে সব মেমোরি কার্ডে ভরে ফেলুন। আমাদের সিডি বা ক্যাসেটের কোনো কপিরাইট নেই। আমরা ওয়েবসাইটেও লিখে দিয়েছি Copyright belongs to humanity। শুধু নিজের মেমোরিতেই নয় যত জনের মেমোরিতে সম্ভব আপনি ভরে দিন, কোনো অসুবিধা নেই; বরং এটি অনেক ভালো ও সওয়াবের কাজ।

ফল পাচ্ছি না

প্রশ্ন : আমি মাস্টার্সের ছাত্র। প্রতিদিন একটানা চারটি ক্লাস করার পর মাথা ও ঘাড় ভীষণ ব্যথা করে। দিনে তিন বার মেডিটেশন করেও এরকম হচ্ছে। এখন কী করবো?

উত্তর : শিক্ষার্থীদের দিনে দুবার মেডিটেশনই যথেষ্ট। আর ঘাড়-মাথা ব্যথার জন্যে ব্যায়াম করতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করলে শারীরিক দুর্বলতা কেটে যাবে, মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারবেন। মেডিটেশন করেও এরকম হচ্ছে কারণ আপনি আসলে শিথিল হতে পারছেন না। নিয়মিত ৪০ দিন দুই বেলা শিথিলায়ন করুন। দেহ-মন শিথিল হলে ঘাড় বা মাথাব্যথা থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি যখনই মেডিটেটিভ লেভেলে যেতে চাই তখন আমার প্রচুর উচ্চ রক্তচাপ শুরু হয়ে চোখ, মাথার দুই পাশ ও মাথাব্যথা শুরু হয়। আমার ধারণা জন্মেছে যে, যদি সবাই আমার জন্যে হিলিং করেন, তাহলে আমি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবো। দয়া করে আমার জন্যে একটু ব্যবস্থা করবেন।

উত্তর : আসলে পুরো ধারণাটাই ভুল। আমাদের এখানে তো মেডিটেশন শব্দটা আমরা দুই দশক ধরে শুনছি। পাশ্চাত্যে কিন্তু ষাটের দশক থেকে শুরু করে মেডিটেশনের ওপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে। আজ পর্যন্ত মেডিটেশনের ওপরে যতজন গবেষণা করেছেন তারা কেউ একটা ঘটনাও পান নি যেখানে মেডিটেটিভ লেভেলে যাবার সময় উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়। অতএব এই ধারণা ভুল। মেডিটেশনে উচ্চ রক্তচাপ বরং কমে যায়। আপনি হয়তো মেডিটেশনে গিয়ে জোর করে ছবি দেখার চেষ্টা করেন। তাই হয়তো এমন হচ্ছে।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করার ফলে মানুষের আবেগের তীব্রতা কি কমে যায়? আমার মনে হচ্ছে আমার ইমোশন ভেঁতা হয়ে গেছে।

উত্তর : মেডিটেশন মানুষকে শোকরগোজার হতে শেখায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার, ঠান্ডা মাথায় ভাবার ক্ষমতা বাড়ায়।

কিন্তু তার সুকুমার বৃত্তিগুলোতে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না। সত্যিকারের দুঃখকষ্ট যদি আসে তাতে সে আবেগপ্রবণ হবে, তার চোখে পানিও আসতে পারে।

যেমন রসুলুল্লাহ (স) এর সঙ্গী মারা যাবার পর তিনি তার মৃত সঙ্গীর কপালে চুমু খেলেন। চুমু খাওয়ার সময় তার দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছিলো। পানি পড়ছিলো তার সঙ্গীর মুখে। এটাই স্বাভাবিক। এটাই মানবিকতা।

কাজেই ধ্যান কখনও মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে নষ্ট করে না, তবে অহেতুক দুঃখবিলাসকে নষ্ট করে দেয়। আগে আপনি হয়ত দুঃখবিলাসী ছিলেন, অহেতুক আবেগ আপনাকে তাড়িত করতো, এখন সেটা করছে না। আপনার আবেগ পরিশীলিত হয়েছে, এটা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আর মমতা এবং আবেগ এক নয়। মেডিটেশন করলে ভালবাসা, মায়া-মমতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর আবেগ হ্রাস পায়।

প্রশ্ন : আমি নিজে নিজে মেডিটেশন করছি। আজও মনের বাড়িতে পৌঁছাতে পারছি কি না বুঝতে পারছি না, কীভাবে বুঝবো?

উত্তর : এটা নিজে নিজে বোঝা খুব কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। নিজে বুঝতে হলে অনেক সময় লাগে। সহজে বোঝার জন্যেই শিক্ষকের প্রয়োজন, কোর্সের প্রয়োজন।

মেডিটেশনে ঘুম পায়

প্রশ্ন : মনের বাড়িতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কোথাও হারিয়ে যাই। দয়া করে সমাধান দেবেন।

উত্তর : মনের বাড়িতে গিয়ে অন্য কোথাও হারিয়ে গেলে হবে না। সচেতন থাকতে হবে। আসলে শিথিলায়নে গিয়ে আপনি আরো বেশি শিথিল হয়ে গেছেন মানে তন্দ্রায় চলে যাচ্ছেন। সেজন্যেই মনে হচ্ছে যে, কোথাও হারিয়ে যাচ্ছেন। আপনি যখন ঠিকভাবে শিথিল হবেন তখন আর কোথাও হারিয়ে যাবেন না। এজন্যে বসে মেডিটেশন করবেন এবং মেরুদণ্ড সোজা রাখবেন।

প্রশ্ন : আমি মেডিটেশনের সময় শুধু ঘুমিয়ে পড়ি। কী করবো?

উত্তর : মেডিটেশনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। প্রয়োজনে নিয়মিত অটোসাজেশন দেবেন। মেডিটেশন করার আগে প্রয়োজনে একটু শবাসন করে নেবেন, একটু শিথিলায়ন করে নেবেন, না হয় চা খেয়ে নেবেন। কিন্তু মেডিটেশনে ঘুমাবেন না।

শুয়ে মেডিটেশন করলে যাদের ঘুম আসে তারা কখনো শুয়ে মেডিটেশন করবেন না। বসে মেডিটেশন করবেন। যদি বসে মেডিটেশনে ঘুম পায় তাহলে পদ্মাসনে বসে মেডিটেশন করুন। তন্দ্রা আসার কোনো সুযোগই থাকবে না।

তারপরও যদি কাজ না হয় তাহলে দাঁড়িয়ে মেডিটেশন করবেন। দাঁড়িয়ে মেডিটেশন করা যায়। নাচতে নাচতে মেডিটেশন করা যায়। হাঁটতে হাঁটতে মেডিটেশন করা যায়। চোখ খোলা রেখেও মেডিটেশন করা যায়। আমরা চোখ বন্ধ করছি কারণ এটা সহজ। অতএব যখনই ঘুম আসবে আপনি দাঁড়িয়ে মেডিটেশন করবেন। দেখবেন, ঘুম আসছে না। কয়েকবার ঝাঁকি খাবেন, কিন্তু ঘুম আসবে না।

আর সব শেষ হিসেবে নিজেকে শান্তির ব্যবস্থা তো আছেই। অর্থদন্ড। ৫০ টাকা মাটির ব্যাংকে। যদি মনে হয় ৫০ টাকা একটা টাকা হলো? তাহলে ৫০০ টাকা। ৫০০০ টাকা। সেটাও যদি যথেষ্ট মনে না হয়, টাকার অংক বাড়াতে থাকেন। দেখবেন টাকার মায়ায় ঘুম আসবে না।

প্রশ্ন : কয়েক মাস ধরে মেডিটেশন করতে গেলেই ঘুমিয়ে পড়ছি কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। দাঁড়িয়ে, পদ্মাসনে-যেভাবেই করি না কেন, একই সমস্যা। হতাশায় ভুগছি। কী করলে সঠিকভাবে মেডিটেশন করতে পারবো?

উত্তর : বোঝা যাচ্ছে আপনার নিজের শরীরের ওপরে আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। এজন্যে আপনাকে শারীরিক শক্তিটা বাড়াতে হবে, অর্থাৎ নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

মেডিটেশনে চোখে পানি

প্রশ্ন : মেডিটেশন চলাকালে চোখে পানি আসে। কারণটা দয়া করে বলবেন?

উত্তর : অনেকের একটু রিলাক্স করলে চোখে পানি চলে আসে। চোখের পানি খুব ভালো জিনিস। যত আসে তত ভালো। ভেতর থেকে যদি পানি আসে মনে রাখবেন আপনার অনেক দুঃখ, অনেক শোক, অনেক বেদনা, অনেক ব্যথা যা আপনি কাউকে বলতে পারেন নাই—সেগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : যখন মেডিটেশনে নিজের দুঃখের কথা মনে করি বা অবলোকন করি তখন দুঃখের কথা মনে পড়ে ঠিকই কিন্তু কান্না পায় না বা আবেগপ্রবণ হই না। অথচ অন্যসময় অতি সাধারণ সাধারণ বিষয়ে অনেক আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি এবং কান্না পায়। দয়া করে এর কারণ একটু ব্যাখ্যা করলে খুশি হবো।

উত্তর : কারণটা খুব সহজ। কান্না হচ্ছে একটা স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি। কেউ কেউ আছেন ইচ্ছে করলেই কাঁদতে পারেন। কিন্তু সবাই ইচ্ছে করলেই কাঁদতে পারে না। হাসি যেমন আসে ভেতর থেকে, কান্নাও তেমনি আসে ভেতর থেকে। যখন দুঃখের কথা অবলোকন করেন তখন আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন। অনেকটা জোর করে কাঁদার চেষ্টা করার মতো। তাই অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়, ভেতরের কান্নাটা চাপা পড়ে যায়। অতএব কান্নার চেষ্টা করবেন না। কান্না যখন আসার স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন দুঃখকে উপলব্ধি করতে। আমি মা-বাবা হারাই নি। ভালবাসার মতো ভালবাসা আজও পাই নি। মহানবী (স)-এর জীবনের কষ্টগুলো অনুভব করার চেষ্টা করেছি। নিজের জীবনে অনেক অপ্রাপ্তি রয়েছে যা আগে আমাকে অনেক কাঁদাতো। এবার দুঃখের মেডিটেশনে কেঁদেছিলাম।

বর্তমানে আমার কোনো কষ্ট নেই। আমার মনে হয়, বিভিন্ন কারণে কষ্ট লাগলেও ভুলে থাকার চেষ্টা করি। ঐ কান্না আর আসে না। আমার কী তাহলে মেডিটেশন হচ্ছে না? কোর্সের শিক্ষা কি আমি গ্রহণ করতে পারছি না? আমি অনেক এগুতে চাই। নিজের ভেতরের কল্যাণশক্তিকে কাজে লাগাতে চাই।

উত্তর : আসলে সবসময় কান্না আসার প্রয়োজন নেই। আপনার কান্না যেটুকু আসার এসে গেছে। পরে আবার কিছু কান্না জমা হলে কাঁদবেন। এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

মেডিটেশনে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হওয়া

প্রশ্ন : মেডিটেশন করার সময় অনেক উল্টাপাল্টা কথা মনে আসে। হঠাৎ খেয়াল করি অজান্তে গান করছি। দয়া করে সমাধান দেবেন।

উত্তর : এটা হতে পারে। মেডিটেশন করতে করতে হঠাৎ করে নিজের অজান্তে অন্যমনস্কভাবে গানও করে ফেলতে পারেন। অন্য জায়গায় হারিয়ে যেতে পারেন। এরকম যখনই হবে বিরক্ত হবেন না। মেডিটেশনে যেখানে ছিলেন সেখানে মনটাকে নিয়ে আসবেন। সেখান থেকে আবার শুরু করবেন।

আর কিছু শান্তির ব্যবস্থা হতে পারে। যতবার মন অন্যদিকে যাবে, খেয়াল করতে হবে। একবার গেল, দুইবার গেল, তিনবার, চারবার-এটা গুণতে হবে। যতবার মন অন্যদিকে চলে যায়, গুণে প্রত্যেকবারের জন্যে এক টাকা করে মাটির ব্যাংকে রাখতে হবে। যদি টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তবে দেখা যাবে, টাকার ভয়ে মন অন্যদিকে যাচ্ছে না। এটি পরীক্ষিত এবং যে কেউ এটি চেষ্টা করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি মেডিটেশন করছি ছয়/ সাত মাস হলো। আগে মেডিটেশন অনেক মনোযোগ দিয়ে করতাম। এখন পারি না, অনেক রকম চিন্তা চলে আসে, অনেক সময় মেডিটেশনের মাঝে ভুলে যাই আমি মেডিটেশনের কোন ধাপে আছি? এখন মনে হয় যে, আমার মেডিটেশনই হয় না।

উত্তর : এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। আসলে এখানেই আমরা ভুল করি। ছয় মাস আগে যখন আপনি মেডিটেশন শুরু করেছিলেন, তখন আপনার মন যে অন্যদিকে চলে যেত তা বুঝতেই পারতেন না। আপনার মনে হতো আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে মেডিটেশন করছেন। এখন আপনি মনোযোগের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন, তাই মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলে বুঝতে পারছেন।

এই সময়ে এসে সাধারণত আমরা যে ভুল করি তা হলো মেডিটেশন হচ্ছে না ভেবে মেডিটেশন করা বাদ দিয়ে দেই। আসলে কিন্তু এখনই প্রকৃত মেডিটেশনের পর্যায় শুরু হচ্ছে। আপনি সচেতন হয়ে উঠছেন-মন অন্যদিকে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছেন। এখন করণীয় হচ্ছে, যখনই মন অন্যদিকে যাবে, মনটাকে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসা। যখনই মনে হবে যে, লেভেল নেই, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখান থেকে আবার শুরু করুন।

আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন সেটা মেডিটেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নিয়মিত মেডিটেশন করতে থাকুন। যত সময় যাবে আস্তে আস্তে চিন্তাগুলো থিতাতে থাকবে। আপনি ইলহামের স্তর, দিব্যজ্ঞানের স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবেন। আপনারা যারা একবছর, দেড় বছর, দুবছর, দশ বছর ধরে মেডিটেশন করছেন তারা এ চিন্তাগুলোকে বেশি করে শনাক্ত করতে পারবেন। এটা খুব ভালো লক্ষণ। কারণ এরপরেই আপনার জন্যে মেডিটেশনের আরো ভালো লেভেল আসছে।

প্রশ্ন : দীর্ঘদিনের মেডিটেশনের পরও এখনও মাঝে মাঝে অমনোযোগী হয়ে পড়ি, কী করলে আরো বেশি মনোযোগী হতে পারবো?

উত্তর : আসলে এটা নিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। দীর্ঘদিন মেডিটেশন চর্চার পরও অমনোযোগ হতেই পারে। একবার হযরত ইমাম আবু হানিফা (র)-এর কাছে একজন এসে বললেন, আমার একটি বিষয় মনে পড়ছে না। ইমাম আবু হানিফা (র) বললেন, দুই রাকাত নফল নামাজ পড়, নামাজের মধ্যে মনে পড়ে যাবে। অর্থাৎ যদিও নামাজের আদব হচ্ছে অন্য কোনো ভাবনায় মনকে বিক্ষিপ্ত হতে না দেয়া, কিন্তু অধিকাংশের ক্ষেত্রেই তা হয় না। অধিকাংশেরই মন নামাজে খুব সহজে অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করে। মেডিটেশনও হচ্ছে এরকম। মেডিটেশনে বসলে শয়তান সবসময় নানারকম ভালো-খারাপ চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যেন মেডিটেশন থেকে মন অন্যদিকে থাকে। অতএব এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। উত্তেজিত হওয়া বা রাগ করার কিছু নেই। যখনই অন্য চিন্তা চলে আসবে, আবার সাথে সাথে তওবা তওবা বা বাতিল বাতিল বলে মনটাকে মূল চিন্তায় নিয়ে আসবেন।

মেডিটেশনে শারীরিক-মানসিক অস্বস্তি

প্রশ্ন : মেডিটেশনে আমার মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব হয়। কী করবো?

উত্তর : মেডিটেশন করলে একজন মানুষ শারীরিকভাবে প্রথম যে উপকার লাভ করেন তা হলো-শিথিলতা, প্রশান্তি। আর যখন এই শিথিলতা আসে তখন দেহের অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায়। এসময় দেহে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ সাধারণত ১০ থেকে ২০ ভাগ হ্রাস পায়। কিন্তু আপনার

ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি কমে গিয়েছিলো। এজন্যে মাথা ঘোরানো বা বমি বমি ভাব লেগেছে। আবার কারো রক্তচাপ কম থাকলেও মেডিটেশনের সময় মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব হতে পারে। এরকম মাথা ঘোরানো বা বমি বমি ভাব হলে ঐ অবস্থাতেই লম্বা করে কয়েকবার দম নেবেন দম ছাড়বেন। দেখবেন যে, মাথা ঘোরানো বা বমি বমি ভাব চলে গেছে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে আমার মুখে খুব লালা চলে আসে। কী করবো?

উত্তর : মেডিটেশনে আপনি আসলে খুব রিল্যাক্স করেছেন। এটা খুব ভালো লক্ষণ। ঘুমের মধ্যে যেমন অনেক সময় লালা পড়ে বালিশ ভিজে যায় অনেকটা সেরকম। মুখে বেশি লালা চলে এলে কী করবেন? নিজের লালা নিজের জন্যে অমৃত। গিলে ফেলবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় গলা শুকিয়ে গেলে কী করবো?

উত্তর : কী আর করবেন! মনের বাড়িতে তো কোনোকিছুর অভাব নেই। কেয়ারটেকারকে বললেই হয় যে, দুটো ডাব নিয়ে এসো। আপনি কল্পনায় দেখুন যে, সে ডাব এনে কেটে আপনাকে দিচ্ছে আর আপনি খাচ্ছেন। ব্যস, পয়সাও খরচ হলো না। তৃষ্ণাও মিটে গেল।

প্রশ্ন : হেলান দিয়ে মেডিটেশন করলে ঘুমিয়ে যাই আর পিঠ সোজা করে মেডিটেশন করলে ঘাড়ে ব্যথা করে। কী করবো?

উত্তর : এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আসলে কখনো এতক্ষণ সময় নিয়ে ঘাড় সোজা করে কোথাও বসে থাকেন নি। এমনি বসে থাকলেও হাত-পা নেড়েছেন, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়েছেন। আমাদের ঘাড়ের স্বভাবই হচ্ছে সবসময় নড়াচড়া করা। কিন্তু মেডিটেশনে আপনি অনেকক্ষণ সময় ঘাড়টাকে সোজা করে ছিলেন। তাই মেডিটেশনের পর ঘাড়ে পিঠে ব্যথা স্বাভাবিক। কয়েকদিন চর্চা করলে অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আর এই ব্যথাটা থাকবে না।

আর আপাতত মেডিটেশন থেকে যখন উঠে আসবেন তখন সাজেশন দিয়ে আসবেন, যেন স্বাভাবিক অবস্থায় আসার পর আর ব্যথা না থাকে।

তবে যদি এরকম ব্যথা বেশিদিন চলে তাহলে বুঝতে হবে হয়তো কোনো শারীরিক অসুবিধা আছে। কোয়ান্টাম ব্যায়াম করবেন। তাহলে এ অসুবিধা আর থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত মেডিটেশন করি। কিন্তু হঠাৎ কোনো শব্দ শুনলে আমার বুক কেঁপে ওঠে এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় দয়া করে বলবেন কী?

উত্তর : এরকম উপায় বলার জন্যেই তো আমরা। এটা দয়া নয়, এটা আমাদের কর্তব্য। আপনাকে কোয়ান্টাম ব্যায়াম করতে হবে। স্নায়বিক দুর্বলতা আছে বলে আপনার এরকম হচ্ছে। হঠাৎ শব্দ শুনলেই মনে হচ্ছে-গেছি! আর নাই! নিয়মিত ব্যায়াম করলে এ সমস্যা আর থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি দীর্ঘদিন মেডিটেশন করছি, অবশ্য মাঝে মাঝে বাদ যায়। সমস্যা হচ্ছে, স্বাভাবিক আসনে মেডিটেশন করতে গিয়ে প্রায় সময়ই ডান পায়ে ঝাঁঝ ধরে যায় এবং মেডিটেশনে ব্যাঘাত ঘটে। কী করলে দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

উত্তর : স্বাভাবিক আসন কোনটা-চেয়ারে বসে? চেয়ারে বসলে কেন ডান পায়ে ঝাঁঝ ধরবে? ডান পায়ে ঝাঁঝ ধরা মানে হচ্ছে পা তার মালিককে বলছে-আমাকে একটু খাটাও। একটু হাঁটাও, না হয় ব্যায়াম করাও। পায়ের মালিক এটা বুঝতে পারছেন না। তা না হলে ঝাঁঝ ধরবে কী জন্যে? অর্থাৎ হাঁটতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে তাহলে পায়ের ঝাঁঝ কেটে যাবে।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় চুলকানি হলে কী করবো? কারণ অনেক সময় চুলকানি চরম পর্যায়ে চলে আসে।

উত্তর : এটা অনেকেরই হয়। সারাদিন চুলকায় নি। কিন্তু যেই চোখ বন্ধ করে দম নিচ্ছেন, মনে হচ্ছে এখানে চুলকাচ্ছে ওখানে চুলকাচ্ছে। যদি চুলকায় প্রথম প্রথম মেডিটেশনে একটু চুলকে নেবেন কোনো অসুবিধা নাই।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে আমার খুব গরম লাগে। অনেক সময় হাত-পা-ও ঘামে। কী করবো?

উত্তর : মেডিটেশনে কারো কারো গরম বেশি লাগে। মনে হয় যে, শরীর ঘেমে যাচ্ছে। এটাও স্বাভাবিক। আপনার যদি মেডিটেশনের সময় খুব গরম লাগে তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনি কোয়ান্টাম এনার্জি ফিল্ডের খুব গভীরে ঢুকে গিয়েছিলেন, সেজন্যেই গরম লেগেছে। কয়েকদিন চর্চা করলে এই গরম লাগাটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এরপরে যখন মেডিটেশন করবেন অটোসাজেশন দেবেন। অন্য সময়ে যেহেতু আপনার হাত-পা ঘামে না মেডিটেশনেও হাত-পা ঘামবে না।

প্রশ্ন : যখন মেডিটেশনের খুব গভীরে চলে যাই বলে মনে হয় তখন শরীরে একটা শিরশির বিমবিম ভাব অনুভব করি। এ ব্যাপারে করণীয় কী?

উত্তর : কারো কারো এটা হয়, সমস্ত শরীর মনে হচ্ছে একদম নাই। অস্তিত্ব নাই। এটা হতে পারে, তবে এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই।

প্রশ্ন : আমি মেসে থাকি। নিরিবিলি কক্ষে মেডিটেশন করার সুযোগ নেই। অনেকে টীকা-টিপ্পনি কাটে। মেডিটেশন করতে গিয়ে লেভেল নষ্ট হয়। এ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করবো?

উত্তর : প্রথম প্রথম সমস্যা হবে। কিন্তু নিয়মিত মেসের সবার সামনে মেডিটেশন করে যাবেন। দেখবেন লেভেল ঠিক থাকছে। বরং কিছুদিন পরে দেখবেন অন্যরা মেডিটেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। কারণ আপনার বিশ্বাস এবং মৌনতা, আপনার নীরবতা, প্রশান্ত প্রত্যয় অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু আপনি যদি বিরক্ত হন অন্যরা আপনাকে খোঁচা দিতে আরো উৎসাহ পাবে।

প্রশ্ন : ইদানীং মেডিটেশনে বসতেই পারি না। মেডিটেশন করতে বসলেই অদ্ভুত এক অস্থিরতা শুরু হয়। মেডিটেশন করবো কি করবো না—এই ভেবেই সময় শেষ। মনোযোগ আর হয় না। এ অবস্থায় কি করণীয়।

উত্তর : মেডিটেশনে বসলে যখনই অস্থিরতায় পেয়ে বসবে, বিরক্তি লাগবে তখনই বুঝবেন যে, খুচরা শয়তান চলে এসেছে। খুচরা শয়তানের গল্পটি হচ্ছে শেখ সাদীর গুলিস্তার গল্প। গল্পটা এরকম।

শয়তানের দরবার। সন্ধ্যাবেলা ইবলিস দরবারে বসেছে, আর যত খুচরা শয়তান, যত চেলা-চামুন্ডা আছে সারাদিন কাজ-কর্ম শেষে সব রিপোর্ট করছে। একেকজন এসে বলছে, ইবলিস শুনছে। কেউ বলছে যে, আমি তিনটা খুন করিয়েছি আজকে। কেউ বলছে, দুর্নীতি করিয়েছি। কেউ বলছে, গাছ কাটিয়েছি। কেউ বলছে, আমি রাহাজানি করিয়েছি। ইবলিস যার যার কাজ অনুসারে তাকে পুরস্কার দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর ইবলিস খেয়াল করলো যে, এক শয়তান চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা বলছে না। ইবলিস বললো, এই, তুমি কিছু কর নাই? সে বললো, হুজুর, তেমন কিছু করতে পারি নাই।

আচ্ছা ঠিক আছে, যা করেছে তা-ই বল।

তখন খুচরা শয়তান বলা শুরু করলো যে, ‘হুজুর, আপনি তো জানেন আমি নিজে চলাফেরা করতে পারি না। সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই, কাউকে দেখি না। অনেকক্ষণ পরে দেখি এক মাদ্রাসার ছাত্র যাচ্ছে (এখন যে রকম স্কুল, শেখ সাদীর যুগে মাদ্রাসা ছিলো এরকম জ্ঞান কেন্দ্র)।

আমি ভাবলাম যে, কাউকে যখন পেলাম না তখন একেই ধরি। বললাম, দেখ, এই রোদের মধ্যে এত কিতাব নিয়ে তুমি যাচ্ছে! ওস্তাদজী তো আসবেন না, ক্লাসও হবে না। খামাখা এই রোদে যাওয়ার দরকারটা কী। তার চেয়ে কী সুন্দর গাছ—এই গাছের ছায়ায় বস। কিছুক্ষণ লাফালাফি কর, কিছুক্ষণ নাচানাচি কর। কিছুক্ষণ গান গাও, কিছুক্ষণ ঘুমাও। কিছুক্ষণ—এই যে কী সুন্দর ফল, ফল খাও। তারপরে আবার বিকেলবেলা বই পুস্তক নিয়ে বাসায় চলে যাবে। ওস্তাদজীও এলেন না, ক্লাসও হলো না, আর তোমার এই রোদে এতদূর হাঁটতে হলো না।

খুচরা শয়তান বললো, হুজুর, সে আমার কথা শুনলো। সে গাছের নিচে গিয়ে বসলো। বই পুস্তক রেখে কিছুক্ষণ লাফালাফি, নাচানাচি, কিছুক্ষণ ঘুম, ডান্ডাগুলি খেললো, ফল পেড়ে খেলো। তারপরে বিকেলে বাসায় চলে গেল।

ইবলিস এতক্ষণ সিংহাসনে বসেছিলো। এই শুনে একেবারে সিংহাসন ছেড়ে এসে ‘আমার প্রাণের খুচরা!’ বলে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তুমি তো সর্বোত্তম কাজ করেছে! খুচরা শয়তান হা করে তাকিয়ে আছে। বলে যে, হুজুর, কিছু করতে পারলাম না, এজন্যে আমাকে সবার সামনে এই রকম অপমান! ইবলিস বললো যে, আরে, তুমি তো তোমার কাজের ডাইমেনশনই বোঝ নাই, তুমি যে কত বড় কাজ করেছে তা কি তুমি জানো!

আরে, এই ব্যাটা তিনটা খুন করিয়েছে, এ-তো এই প্রজন্ম শেষ। ছিনতাই করিয়েছে, এই প্রজন্ম শেষ। রাহাজানি, এই প্রজন্ম শেষ। আর তুমি কী করেছো? একটা ছাত্রকে জ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে রেখেছো। সম্ভাবনা হচ্ছে, এই ব্যাটা মূর্খ হলে এর ছেলে মূর্খ হবে, তার ছেলে মূর্খ হবে। অর্থাৎ তোমার কাজের প্রভাব তিন প্রজন্ম পর্যন্ত চলবে। আর মূর্খদের দাস বানিয়ে রাখা, আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা খুব সহজ। সুতরাং আজকের সেরা কাজটা তুমিই করেছো। সেরার খেতাব তোমার জন্যে।

তাই যখনই মেডিটেশন করতে গেলে অস্থির লাগবে, যখনই মনে হবে যে, উঠে পড়তে পারলে ভালো বা পড়াশোনায় যখন মন বসতে চাইবে না, অন্যকিছু করতে ইচ্ছা করবে, তখনই বুঝবেন যে, খুচরা শয়তান এবার আপনার মাথার মধ্যে চলে এসেছে। সতর্ক হয়ে যাবেন। কয়েকবার লম্বা দম নিয়ে মেডিটেশন বা নিজের কাজে মন দেবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় মাঝে মাঝে শরীর পাথরের মতো ভারী হয়ে যায়। তখন খুব অস্বস্তি লাগে। কী কারণে এরকম হয় তা বললে উপকৃত হবো।

উত্তর : মেডিটেশনে আপনার শরীর খুব ভারী লাগছে। এর অর্থ হলো—আপনার দেহ আপনার কমান্ড শুনতে শুরু করেছে। মেডিটেশনে তো ওজন বেড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। যা ওজন ছিলো তা-ই আছে। তাহলে ভারী লাগছে কেন? কারণ আপনি বলছেন আমার ভারী লাগছে। আপনার দেহ যখন আপনার এই কমান্ড শুনছে, অন্য কমান্ডগুলোও শুনবে। এটা খুব ভালো লক্ষণ।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে আমি খুব নড়াচড়া করি। কীভাবে কমানবো?

উত্তর : আপনার এই নড়াচড়া কি আপনার মনোযোগে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে? যদি ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তাহলে এ নিয়ে চিন্তিত হবার কারণ নেই।

প্রশ্ন : মাঝে মধ্যে এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন মেডিটেশন বাদ পড়ে যায় এতে কি কোনো সমস্যা হবে? নিয়মিত মেডিটেশন করলে কতটা উপকৃত হওয়া যাবে? আর যদি বা পরে আবার করি, আবার বাদ পড়ে এভাবে বাদ দিয়ে করলে কি কোনো সমস্যা হবে?

উত্তর : যেদিনই খেয়াল করবেন বাদ পড়ে গেছে, সেদিন থেকেই আবার শুরু করবেন। একসময় দেখবেন আর বাদ পড়ছে না।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের ব্যাপারে আমার আন্তরিকতার কিছুটা অভাব রয়েছে। আমার মা খুব একাত্মতা ও নিষ্ঠার সাথে মেডিটেশন করেন, আমি তার মতো পারি না। আমি আরো বেশি আন্তরিক হতে চাই। কীভাবে এগুবো?

উত্তর : আপনি যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে যারা নিয়মিত মেডিটেশন করে তাদের সাথে যুক্ত হতে হবে। সজ্ঞের গুরুত্বটাই এখানে। ফাউন্ডেশনে যখন আসবেন, অনেককে মেডিটেশন করতে দেখবেন অথবা মেডিটেশন করে তাদের সাফল্যের কথা শুনবেন তখন আপনি উৎসাহ পাবেন। কোনো সমস্যা থাকলে কাউন্সিলরদের সাথে আলাপ করে তার সমাধান পেয়ে যাবেন।

তাছাড়া যেকোনো কাজে জবাবদিহিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সজ্ঞ এই জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। জবাবদিহিতা সৃষ্টির আরেকটি পথ হচ্ছে আত্মপর্যালোচনা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বা রাতে শোয়ার আগে পুরোদিনের কার্যক্রমকে পর্যালোচনা করুন। ভাবুন—সারাদিন আমি কী করেছি, কতটুকু ভালো কাজ করেছি, কতটুকু খারাপ কাজ করেছি। আজকে মেডিটেশনের লেভেলটা কেমন ছিলো। প্রয়োজনে নিজের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

তৃতীয়ত, সজ্ঞ আপনাকে সেবামূলক কাজের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেবে। স্রষ্টার রহমত ছাড়া আসলে কল্যাণকর বড় কিছু হয় না। যখনই আপনি অন্যের উপকার করবেন—আপনার ওপরে স্রষ্টার রহমত বর্ষিত হবে, আপনি যে জিনিসটা চাচ্ছেন সেটা পাওয়া আপনার জন্যে সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন কি সকাল ও রাতে মেডিটেশন করে যাবো? কাজের চাপে কখনো সকালে মেডিটেশন হয় না। আর রাতে শরীর এত ক্লান্ত থাকে যে, মেডিটেশন করতে করতে ঘুম আসে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : সকালে যদি কাজের চাপে মেডিটেশন করতে না পারেন, দুপুরে করবেন। দুপুরে না পারলে বিকেলে করবেন। অর্থাৎ যখন পারবেন করবেন। সময় করতে না পারা—এটা কিন্তু খোঁড়া অজুহাত। মেডিটেশন করাটা যদি আপনার কাছে অগ্রাধিকার পেত তাহলে আপনি ঠিকই সময় বের করে

ফেলতেন। আপনার উপকারের জন্যেই মেডিটেশন।

আমরা অনেক সময় ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে মেডিটেশন করি না। ব্যস্ত হলেই সফল হওয়া যায় না। সফল তারাই হন যারা ব্যস্ততার ফসলকে ঘরে তুলতে পারেন। এ নিয়েও গল্প আছে।

এক ফাদার এক ট্যাক্সি ক্যাবে উঠেছেন। ক্যাবের ড্রাইভার খুব রাফ চালাচ্ছে। ফাদারের মনে হলো—সে যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছে এক্সিডেন্ট না করে যায় না। ফাদার তো ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলেন যেন এক্সিডেন্ট না হয়। কিন্তু এক্সিডেন্ট হয়েই গেল।

ফাদারও মারা গেলেন, ড্রাইভারও মারা গেল। মারা যাওয়ার পরে যখন বিচার হলো, দুইজনকেই স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। তবে ড্রাইভার আগে যাবে ফাদার পরে যাবে।

ফাদার বললেন, ঈশ্বর, এটা কীরকম কথা! আমি সারাজীবন চার্চে ধর্মপ্রচার করেছি, তোমার গুণগান গেয়েছি। এই ড্রাইভার কোনোদিন তোমার গুণগান করে নি। সে আগে যাবে, আমি পরে যাবো—এটা তো অযৌক্তিক। এর ব্যাখ্যা দিতে হবে।

ঈশ্বর বললেন, দেখ, ব্যাখ্যা খুব সহজ। তুমি যখন চার্চে ভাষণ দিতে তখন লোকজন ঘুমাতো। আর এই ড্রাইভার যখন গাড়ি চালাতো, তখন তার গাড়িতে যে উঠতো সে আমার নাম মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারতো না। এত রাফ চালাতো যে, যে-ই বসতো—গাড়ি থেকে না নামা পর্যন্ত ক্রমাগত আমার কথা স্মরণ করতে—‘ঈশ্বর, বাঁচাও! ঈশ্বর, বাঁচাও! ঈশ্বর, বাঁচাও!’ তুমি যে কাজ করেছো, তার ফলাফল কী? তার কাজের ফলাফল তোমার কাজের ফলাফলের চেয়ে ভালো।

এটা যদিও কৌতুক, এর থেকেও কিন্তু শেখার আছে। কাজ করলেন অনেক, কিন্তু ফলাফল পেলেন না, তাতে কী লাভ?

ব্যস্ততার ফসল আপনি তখনই ঘরে তুলতে পারবেন যখন আপনি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন এবং পরিকল্পনামাফিক গুছিয়ে সময়ানুবর্তিতার সাথে কাজ করতে পারবেন, অর্থাৎ সুবিন্যাসায়ন করতে পারবেন। এটা আপনি তখনই পারবেন, যখন আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। তা না হলে কাজগুলো জট পাকাতে থাকবে, কাজের ফসল আপনি ঘরে তুলতে পারবেন না। তাই আপনার সাফল্যকে আরো অর্থবহ, পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী করার জন্যে মেডিটেশন একান্ত জরুরি। আপনার প্রতিদিনের খাওয়া-ঘুম যেমন জরুরি, মেডিটেশনও তেমনি।

প্রশ্ন : মেডিটেশন করতে বা নামাজ পড়তে গেলে মনে হয় ‘সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে’। এক্ষেত্রে কী করবো?

উত্তর : আসলে যে কাজে উপকার বেশি, সেই কাজটাতেই অনীহা সৃষ্টি হয় বেশি। মনে হচ্ছে যে, সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আড্ডা দিতে সময় নষ্ট হয় না, টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখতে সময় নষ্ট হয় না, কনসার্টে যখন নাচানাচি করি তখন সময় নষ্ট হয় না।

সময় নষ্ট হয় কখন? যখন আমরা আত্ম অনুসন্ধান করতে যাই। যখন আমি নিজেকে ডিসিপ্লিন্ড করতে যাই, যখন আমি জীবনের সবকিছুকে চ্যানেলাইজড করতে চাই তখন। অর্থাৎ যে কাজটা আমার উপকার করবে সবচেয়ে বেশি, সেটা যখন করতে যাই তখনই মনে হয় যে, সময় নষ্ট হচ্ছে। আর যে কাজগুলোতে আমরা সময় নষ্ট করছি সে কাজগুলোতে কখনোই মনে হয় না সময় নষ্ট করছি। যদি মনে করতাম তাহলে সে কাজগুলো আমরা করতে পারতাম না।

আপনি আপনার সারাদিনের কাজ হিসেব করুন। দেখবেন—কাজের চেয়ে অনেক বেশি সময় আপনি নষ্ট করছেন অকাজে। বরং আপনি যখন নামাজ পড়ছেন এবং মেডিটেশন করছেন, এই সময়টা আপনার ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে আপনার কল্যাণের জন্য। মেডিটেশন এবং নামাজ—এই দুটো আপনার অন্তরকে প্রশান্ত করবে এবং ভালো জিনিসগুলোকে আপনার দিকে আকর্ষণ করবে। আপনি জীবনে ভালো বেশি করবেন, মন্দের পরিমাণ আপনার জীবন থেকে কমে যাবে যদি আপনি মনোযোগ দিয়ে নামাজ পড়েন এবং মেডিটেশন করেন। একটা সময় আপনার মনে হবে—সময়ের এর চেয়ে ভালো বিনিয়োগ আপনি করতে পারতেন না।

প্রশ্ন : কোর্স করার পর ৪০ দিন টানা দুবেলা মেডিটেশন করতে বলেছেন। আমি টানা ২২ দিন দুবেলা মেডিটেশন করার পর অসুস্থতার জন্যে মেডিটেশন করতে পারি নাই প্রায় ১৫ দিন। এখন ৪০ দিন কীভাবে পূরণ করবো? দিনে কবার এবং কতক্ষণ পর পর মেডিটেশন করা যায়?

উত্তর : ২২ দিন করার পর যেহেতু বাদ পড়ে গেছে, এখন থেকে ৪০ দিন আবার নতুন করে শুরু করুন। এর মধ্যে যদি বেড়াতে গিয়ে বাদ পড়ে তাহলে আবার ৪০ দিন শুরু করুন। যতবার বাদ পড়বে ততবার প্রথম থেকে শুরু করবেন। আপনি অনুভব করবেন—ভেতরের শক্তি কত বিকশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন : আমার এখনও ৪০ দিনে ৮০টি মেডিটেশন হয় নি বিভিন্ন সমস্যার কারণে। আমার পরীক্ষার পরে তো অনেক সময় আছে তখন কি করলে হবে?

উত্তর : তখন করলে তখন হবে। এখনকার খাওয়াটা যদি আপনি পাঁচদিন পরে খান, সেটা কি এখনকার খাওয়া হবে? পাঁচদিন পরের খাওয়া হবে। অর্থাৎ আপনি যা মিস করেছেন তা মিসই করেছেন। পরীক্ষার আগে নিয়মিত মেডিটেশন করলে তা পরীক্ষায় ভালো করতে সাহায্য করতো। তবে যা হয় নি তা হয় নি। পরীক্ষার পর আবার শুরু করুন।

প্রশ্ন : আমি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়েছি ২০০৪ সালে। কিন্তু নিয়মিত মেডিটেশন করছি গত দু বছর, এখন আমার পেশাগত কাজ এত বেড়ে গেছে যে বলার মতো না। নিয়মিত মেডিটেশন করা খুবই কঠিন। এদিকে আমাদের শাখার এক প্রো-মাস্টার বললেন, কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা নিয়মিত মেডিটেশন না করলে দুর্দশার বৃত্তে পতিত হন। এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : আমরা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনার কাজ বেড়ে যাওয়ার জন্যে। মেডিটেশন করলে প্রকৃতির নিয়মেই কাজ বেড়ে যায়। এটার কিন্তু একটা চক্র আছে। চক্রটা হচ্ছে এই রকম-কোর্স করার পর প্রথমদিকে যখন একজন গ্রাজুয়েট নিয়মিত মেডিটেশন করেন, তার কাজ ও ব্যস্ততা বাড়ে, তিনি ভালো অবস্থায় যান। যখন ভালো অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন তিনি ব্যস্ততার অজুহাতে মেডিটেশন ছেড়ে দেন। ফলে তিনি ফিরে যান আবার আগের অবস্থানে। এরকম একটা দুটো নয়, প্রচুর ঘটনা রয়েছে।

আমাদের ১ম ব্যাচের এক গ্রাজুয়েট। ভদ্রলোক আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন, অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ ছিলো যে, কোর্স ফি দেয়ার সামর্থ্য ছিলো না। প্রথমদিকে তো কোর্সে এলেই আমরা খুশি হতাম। ফি দিলে ভালো, না দিলে আরো ভালো, মেডিটেশন করলেই হলো। তিনি কোর্স করলেন।

কোর্স করার পর প্রথমদিকে মেডিটেশন খুব নিয়মিত। সবকিছু ঠিকঠাক। চমৎকার কিছু পারিপার্শ্বিক সুযোগ এলো। উনি টাকা করলেন, অনেক টাকা। সেনাকল্যাণ ভবনে বিশাল ফ্লোর নিয়ে অফিস নিলেন, সেই অফিসের মাসিক ভাড়াই দিতেন চার/পাঁচ লাখ টাকা। এরপর কোনো খবর নাই। বহুদিন পর এসে বললেন, মেডিটেশন করার কোনো সময় পাচ্ছি না গুরুজী। আমার জন্যে আপনি মেডিটেশন করতে থাকেন। যত টাকা লাগে আমি দেবো।

বললাম, আমি মেডিটেশন করলে তো আমার উপকার হবে, আপনার তো উপকার হবে না। যেমন আমি খেলে কি আপনার পুষ্টি হবে? হবে না। তেমনি আমরা মেডিটেশন করলে আপনার উপকার তো হবে না। আপনি যেহেতু অনেক বিদ্বান হয়েছেন—আপনার মেডিটেশনের প্রয়োজন আরো বেশি।

উনি আমার কথা শুনলেন না। টাকার পেছনে দৌড়াতে থাকলেন। দেড়শ দুশ কোটি টাকার সম্পদ হয়ে গেল। তারপর বেশি সম্পদ হলে যা হয়, টেনশন, অস্থিরতা বাড়লো। ব্যবসা নিয়েও কিছুটা জটিলতা হলো। একসময় হার্টফেল করলেন। মৃত্যুর পর তার টাকা-পয়সা কোথায় কী আছে তার পরিবারের কারোর জানার সুযোগ থাকলো না। এত সম্পদ তার সন্তানদেরও কোনো কাজে লাগলো না। আসলে আলো পাওয়ার পরে, শক্তির উৎস পাওয়ার পরে তা যদি কেউ ব্যবহার না করে, তার দুর্দশা কে মেটাবে!

তাই ব্যস্ততা বাড়লেও মেডিটেশন বাদ দেবেন না। মনে রাখবেন, জীবনে সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। কাজ, পরিবারের প্রতি মনোযোগ, মেডিটেশন—সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। রাঁধতে যেমন জানতে হবে, চুল বাঁধতেও জানতে হবে। সুবিন্যাসায়ন করতে শিখতে হবে, তাহলেই আর সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন : আমি ২৯৩ তম কোর্সে অংশ নেয়ার পর বিশেষভাবে উপকৃত হয়ে তার পরেরবার আবার রিপিট করেছি এবং সাইকি, ব্যায়াম এবং প্রথমায়ন করেছি। কিন্তু এখন নিয়মিত মেডিটেশন করতে পারছি না। মেডিটেশন করতে গেলেই মনে হয় আগের মতো হচ্ছে না। একদিন পরে অর্থাৎ বিরতি দিয়ে করলে আবার ভালো হচ্ছে।

উত্তর : মেডিটেশন সবসময় নিয়মিত করবেন। আপনার মেডিটেশন আগের মতো হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা চিন্তা করতে যাবেন না। আসলে মেডিটেশন কিন্তু একইরকম হচ্ছে। কিন্তু নতুন নতুন একটা জিনিস আমাদের যত আনন্দ দেয়, কিছুদিন পর সেই একই জিনিস আর সেরকম আনন্দ দিতে পারে না, কারণ আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়।

হাজীর বিরিয়ানি অনেকদিন পর পর খাই বলে ওটা হাজীর বিরিয়ানি। আপনিও সেরকম মেডিটেশন বিরতি দিয়ে করছেন বলে আপনার মনে হচ্ছে ভালো হচ্ছে। হাজীর বিরিয়ানিও যদি নিয়মিত খান ওটা ডাল-ভাতের মতোই হয়ে যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন ঐ ডাল-ভাতটা গুরুত্বপূর্ণ। মেডিটেশনও তেমনি নিয়মিত না করলে আপনি বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন : কোর্সের পর দুমাস মেডিটেশন করে আর করা হচ্ছে না। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রোথামে আসা হয় না। শাখা সেলেও যাওয়া হয় না। এখন আমি আবার নতুন করে প্রতিদিন মেডিটেশন করতে চাই। কী করা উচিত?

উত্তর : আজকে থেকেই মেডিটেশন শুরু করা উচিত। আসলে ভালো কোনো কাজের কথা যখন আপনার মনে হবে, উচিত হচ্ছে কালবিলম্ব না করে প্রথম সুযোগেই তা শুরু করে দেয়া। কারণ আমাদের জীবনে আমরা অনেক ভালো ভালো পরিকল্পনা করেও শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়িত করতে পারি না এই আজ করবো, কাল করবো-দীর্ঘসূত্রিতার কারণে।

একই কারণে আপনি সুযোগ থাকলে আজকেই কাছাকাছি যেকোনো সেন্টার, শাখা বা সেলে চলে যান। সংকোচের কোনো কারণ নেই। ছেলে-মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার পর আবার যখন তারা ফিরে আসে মা-বাবা যেমন খুশি হন। আমরাও পরিবারের হারানো সদস্যদের ফিরে পেলে তেমনি খুশি হই।

আর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে আপনার এই নতুনভাবে শুরু করাটা হতে পারে সবচেয়ে ফলপ্রসূ। আসলে কোর্স রিজুভিনেশন যে কতটা উপযোগী সে প্রসঙ্গে বলছিলেন আলোকিত মানুষ গড়ার অগ্রপথিক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। পর্যবেক্ষক হিসেবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের উচ্ছ্বাস ১৪ ব্যাচে চার দিন অংশ নেয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে কোর্সের ব্যাপারে তার অনুভূতির প্রসঙ্গে বলছিলেন স্ত্রী মিসেস রওশানারা সায়ীদের কথা।

২০০২ সালের জুলাইয়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৪৬ তম ব্যাচে অংশ নেয়ার কিছুদিন আগে থেকে সায়াটিকার ব্যথায় ভীষণ অসুস্থ ছিলেন তার স্ত্রী। স্ত্রীর সেসময়কার অবস্থা এবং কোর্স করার পর তার পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমার স্ত্রী একবার প্রায় নয় মাস মেরুদন্ডের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে ছিলেন। একজন গৃহিণী যার ওপর পুরো পরিবারের দায়িত্ব থাকে, যাতে তিনি অভ্যস্ত থাকেন-এই দায়িত্ব থেকে তাকে যদি এভাবে বঞ্চিত হয়ে একটা বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়-একা, নিঃসঙ্গ। দিনের পর দিন নয়টা মাস-এটা যে কতখানি কষ্টদায়ক তা অনুমান করা যায়।

সেই সময় উনি কোয়ান্টাম কোর্স করতে গেলেন এবং আমি খুবই আশ্চর্য হলাম যে, কোর্স করে দেখা গেল আস্তে আস্তে তার ব্যথাটা চলে গেল। এন্ড শি বিকেম নরমাল। একদম সুস্থ একজন মানুষ! তারপরে অনেক বছর চলে গেছে। তিনি একদম নরমাল।

কিন্তু এর মধ্যে আবার তার সেই একই জিনিস হলো। কিছুতেই আর সারে না। কত রকম ওষুধ, কত রকম চিকিৎসা, কত রকম থেরাপি—কিছুতেই সারে না! তখন অনেকেই পরামর্শ দিলো যে, তুমি এ কোর্সে আবার যাও। রিপিট কর। হয়তো কিছুটা ভালো হবে। এবং সত্যি সত্যি রিপিট করে আসার পরের দিন থেকে তিনি খুব ভালো এবং এখনো ভালো আছেন।’

অর্থাৎ কোর্স রিপিটে অংশ নেয়া প্রত্যেক গ্রাজুয়েটের জন্যেই অত্যন্ত কার্যকরী। আমাদের এমন অনেক গ্রাজুয়েট আছেন যারা ৩০/৪০/৫০ বারও কোর্স রিপিট করেছেন। তারা বলেন, যতবারই রিপিট করেন ততবারই নতুন নতুন উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হন। তাই যত রিপিট তত মজা।

আর যারা একটু অনিয়মিত হয়ে গেছেন, আবার নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের জন্যে এটা হতে পারে খুব চমৎকার একটি সূচনা।

প্রশ্ন : বহুদিন অনুশীলন না করার পর কীভাবে আবার পূর্বের স্তরে পৌঁছানো যাবে অর্থাৎ প্রথমে কোন ক্যাসেট কত বার দিনে করতে হবে? এক্ষেত্রে দ্রুত ধারাবাহিকতা অর্জনের জন্যে কী করা যায়?

উত্তর : আসলে বহুদিন যদি অনুশীলন না করে থাকেন, তাহলে প্রথমে যেটা করবেন, সেটা হলো শিথিলায়ন। শিথিল প্রক্রিয়ায় শিথিলায়ন [১ নং সিডির এ সাইড] এবং মনছবি [৫ নং সিডির এ সাইড] ব্যবহার করবেন। এ দুটো চল্লিশ দিন করুন। দেখবেন যে সব ঠিক হয়ে গেছে। সম্ভব হলে কোর্স রিজুভিনেশন করে নিতে পারেন। তার চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে ফাউন্ডেশনের সাথে সংযুক্ত থাকবেন। সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলে যাবেন, মঙ্গলবার আলোকায়নে আসবেন। ফাউন্ডেশনে এখন অনেক ধরনের প্রোগ্রাম। যত প্রোগ্রামে যুক্ত হবেন তত আপনার মেডিটেটিভ লেভেল ভালো হবে।

তবে মনে রাখবেন দ্রুত কিছু করা যায় না। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় না। কাঁঠাল কিলিয়ে পাকালে হাতের অবস্থাও খারাপ হয়, কাঁঠালের অবস্থাও খারাপ হয়। তাই ধীরে ধীরে লেভেলটাকে ঠিক করে নিয়ে আসবেন।

প্রশ্ন : দেশের বাইরে অবস্থানকালে যদি ফাউন্ডেশনের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রাখতে না পারি, তাহলে কি আমার মেডিটেশনের শক্তি ধীরে ধীরে কমতে থাকবে? কারণ এখনই কয়েকদিন না এলে মনে হয় যে, পাওয়ার কমে যাচ্ছে।

উত্তর : এটা নির্ভর করে আপনার আন্তরিকতার ওপর। আপনি যদি মেডিটেশনকে ভালবাসেন, আপনি যদি ফাউন্ডেশনকে ভালবাসেন, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তেও যদি চলে যান, আপনার শক্তি কখনোই কমবে না। আর যদি আপনি ফাউন্ডেশনের প্রতি ভালবাসায় আন্তরিক না হন, তাহলে শান্তিনগরে আমাদের অফিসের পাশেও যদি আপনি বসে থাকেন, আপনার পাওয়ার থাকবে না।

ফাউন্ডেশনে আমরা যে পরিবার এটা তো জৈবিক পরিবার না। আমরা হচ্ছে আত্মিক পরিবার। আর আত্মা যেকোনো কালে, যেকোনো স্থানে বিচরণ করতে পারে। যদি কোয়ান্টামের প্রতি অন্তরের টান থাকে, যত দূরেই থাকুন না কেন, আপনি অনুভব করবেন আপনার গুরু আত্মিক শক্তি আপনার সাথে রয়েছে। যেমন যদি আপনি তিন হাজার মাইল দূরেও যান, মা-কে কি ভুলে যাবেন কখনো? বরং দূরে গেলে মায়ের প্রতি টান আরো বাড়ে। একইভাবে আপনার যদি আসলেই ফাউন্ডেশনের প্রতি ভালবাসা থাকে, যত দূরে যাবেন তত মন আরো কাছে থাকবে, তত পাওয়ার আরো বাড়তে থাকবে।

আর যোগাযোগ তো এখন খুব সহজ। ই-মেইলে যোগাযোগ রাখবেন। তাছাড়া সব তথ্যের জন্যে আমাদের ওয়েবসাইট রয়েছে। আছে কোরাম। তাই যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি দূরে নন। সবসময় মনে রাখবেন, you belong to a family। অতএব আনন্দে দুঃখে বেদনায় ফূর্তিতে সবসময় মনে রাখবেন যে, ফাউন্ডেশন আপনার। আপনি ফাউন্ডেশনের।

প্রশ্ন : আমি ৩৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। কোর্স করার পর কখনো মেডিটেশন করি নি। এখন ডাক্তার আমাকে বলেছে মেডিটেশন করতে। কী করবো?

উত্তর : কী আর করবেন! ডাক্তারের পরামর্শ যেহেতু শিরোধার্য কাজেই সেটাই অনুসরণ করবেন। আসলে সাধারণত গৈয়ো যোগী ভিখ পায় না। বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ওয়াল্ট ডিজনির একটি ঘটনা আছে। তার ছয় বছর বয়সী মেয়েটি স্কুলে গিয়ে যখন শুনলো যে, তার বাবা ওয়াল্ট ডিজনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, বাড়ি এসে বিস্মিত সে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, ড্যাডি আর ইউ ওয়াল্ট ডিজনি? ডিজনি ইয়েস বলার পরও সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ‘আর ইউ দ্যাট ওয়াল্ট ডিজনি?’ বাবা এবার জোর দিয়ে বললেন ‘ইয়েস’। মেয়ে তখন দৌড়ে গিয়ে তার অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে এসে বাড়িয়ে দিয়ে বললো ‘দেন প্লিজ গিভ মি এন অটোগ্রাফ।’ অর্থাৎ বাবার খ্যাতি

সম্পর্কে স্কুলে শোনার পর তার মনে হলো বাবার একটা অটোথ্রাফ দরকার। আপনিও তেমনি ১৯৯৪ সালে ৩৯ ব্যাচে কোর্স করার পর ২০০৮ সালে ডাক্তারের কাছে শুনে এখন অনুভব করতে পারছেন মেডিটেশনের গুরুত্বকে। আমরা অবশ্যই আনন্দিত এক যুগেরও বেশি সময় পরে আমাদের একজন সদস্যের প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে। আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, যাতে ডাক্তারের কাছে আপনাকে আর অসুখ নিয়ে যেতে না হয়।

প্রশ্ন : অনেক গ্রাজুয়েটের মতো আমারও নিয়মিত মেডিটেশন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে নি। আমি মনে করি, নিয়মিত মেডিটেশন করার জন্যে আরো জোরদার প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। সেল-এর যে কর্মসূচি তা নিয়মিত মেডিটেশনের জন্যে যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর : আসলে আপনি আপনার নিজের দায়িত্ব যদি সেলের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন তাহলে কী হবে? সেল কি প্রতিদিন আপনার বাসায় গিয়ে আপনাকে বলবে, ভাই, আজকে মেডিটেশন করেছেন কি না? যদি তা-ও করে তারপরেও দেখা যাবে যে, সেলের লোকজন যখন আপনার বাসায় যাচ্ছে তখন আপনি গৃহকর্মীকে বলছেন-এই বল, বল, বাসায় নাই। আপনি যদি ওপরে উঠতে না চান তাহলে ঠেলে ঠেলে আপনাকে ওপরে ওঠানো যাবে না। বরং বাঁশ দিয়ে ঠেলেতে গেলে আপনারও বিপদ হবে, বাঁশেরও বিপদ হবে। এতো সুযোগ-সুবিধার মধ্যে যদি আপনি নিয়মিত অভ্যাস করতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে, আপনি অশুভ বৃত্তের মধ্যে আছেন। এই বৃত্তের বাইরে আপনাকেই নিজ উদ্যোগে বেরতে হবে।

চর্চা : বিভিন্ন

প্রশ্ন : সরাসরি মনের বাড়িতে যাওয়া ও বের হওয়া যাবে কি না? নাকি এতে কোনো শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হবে?

উত্তর : আসলে মেডিটেশনে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে যে ধাপ অতিক্রম করে মনের বাড়িতে যাওয়ার কথা সে সে ধাপ অতিক্রম করেই মনের বাড়িতে যাবেন এবং যে প্রক্রিয়ায় ফিরে আসার কথা ঠিক সে প্রক্রিয়ায় ফিরে আসবেন। নাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বৈকি।

প্রশ্ন : উপকৃত হবো কি হবো না—এই দ্বন্দ্ব নিয়ে কী করবো?

উত্তর : এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন। আসলে বিশ্বাসই হচ্ছে মূল। আপনি যদি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় ভাবেন, দূর! ডাক্তারের কাছে গিয়ে কী হবে, আমার এই রোগ কি আর ভালো হবে! তাহলে ডাক্তারের ওষুধে কিছু হবে? হবে না। অতএব প্রথমে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করতে হবে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সভ্যতার যা কিছু দেখছেন, সবকিছু মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং যত সৃজনশীল জিনিস—সব মানুষ মেডিটেটিভ লেভেলে তার ব্রেনকে ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে। অতএব উপকৃত হবেন কি হবেন না—এই সন্দেহ রাখার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের সময় মনে প্রশ্ন এলে কী করবো?

উত্তর : প্রশ্ন মনে করে রাখবেন। এরপরে সুযোগমতো প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন। আপনি যদি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হন তাহলে আপনার নিকটবর্তী সেন্টার/শাখা/সেল-এর দায়িত্বশীলদের সাথে কথা বলতে পারেন। আর এখনো যদি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার সুযোগ আপনার না হয়ে থাকে তাহলে কোর্সে অংশ নিন; বেশিরভাগ প্রশ্নেরই জবাব পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের এক পর্যায়ে দরবারে আরাম করে বসতে বলা হয় কিন্তু তার আগে তো বালু হয়ে উড়ে গেছি, বসবো কীভাবে?

উত্তর : আসলে বালু হয়ে যাওয়ার পরে যা অবলোকন করছেন তা আপনার দেহ নয়। আপনার শরীর বালু হয়ে উড়ে গেছে কিন্তু আপনার চেতনা তো আছে। আপনার চেতনাকে ভাববেন একটা ছায়ারূপে, একটা অবয়বরূপে। দরবার কক্ষে বসা, হিলিং সেন্টার বা কমান্ড সেন্টারে যাওয়া—সব কিন্তু আপনার কাল্পনিক অবয়ব করছে, শারীরিকভাবে আপনি করছেন না।

প্রশ্ন : আমি আপনার কণ্ঠস্বর ছাড়া মেডিটেশন করতে পারি না। ফলে আমাকে ক্যাসেটের মাধ্যমে করতে হয়।

উত্তর : এটা এক ধরনের কন্ডিশনিং। এটাকেও আপনি ডিকন্ডিশনিং করতে পারেন। প্রথমদিকে একটু অসুবিধা হবে। মনে হবে যে, মেডিটেশন হচ্ছে

না। আপনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। ধীরে ধীরে নিজে নিজেই করতে পারবেন—আমার কণ্ঠের প্রয়োজন হবে না।

প্রশ্ন : আমার সবচেয়ে প্রিয়জন বিদেশে। তার জন্যে সবসময় মন জ্বলে। এই মন জ্বলা ব্রেনে আঘাত করছে। আমি অসুস্থ হচ্ছি। প্রিয়জনের জন্যে মন জ্বলা কীভাবে দূর করবো?

উত্তর : খুব সহজ। মনের বাড়িতে প্রিয়জনকে নিয়ে আসুন। দেখুন যে, প্রিয়জনের সাথে আপনি কথা বলছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দৌড়াদৌড়ি করছেন। মন জ্বলবে না। যখনই মন জ্বলবে আপনি মেডিটেশনে বসে যাবেন। প্রিয়জনকে চোখের সামনে দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে বসলে মনে বার বার খারাপ চিন্তা আসে। মনের বাড়িতে ভয়ের চিন্তা আসে। ইচ্ছা না থাকার পরও মনে খারাপ কথা আসে। আমি ভয়ে থাকি যে, আমার মেডিটেশন নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মেডিটেশন কি সত্যি নষ্ট হবে?

উত্তর : কোনো দুশ্চিন্তা বা কুচিন্তা এলে মনে মনে তওবা তওবা বলবেন। তারপর মনকে আশ্তে করে আবার সঠিক চিন্তার দিকে নিয়ে আসবেন। আসলে আপনিও মানুষ। যদি কখনোই দুশ্চিন্তা কুচিন্তা না আসতো আপনি মানুষ হতেন না। তাই ভুল করলে তওবা করবেন। কিন্তু এটা নিয়ে উৎকর্ষিত হয়ে মেডিটেশনের লেভেল নষ্ট করবেন না।

মেডিটেশনের অপব্যবহার

প্রশ্ন : মনের বাড়িতে কী কী করা যাবে, কী কী করা যাবে না?

উত্তর : মনের বাড়িতে সব কিছু করা যাবে, শুধু খারাপ কিছু করা যাবে না, নিজের ও অন্যের জন্যে ক্ষতিকর কিছু করা যাবে না। আপনার মনে হতে পারে আমি তো এখন মেডিটেশন পারি, মনকে কনসেনট্রেট করতে পারি, তো অমুক আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে, ঠিক আছে, এবার ওকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দেই। মনের বাড়িতে গিয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের কোনো

ক্ষতির চিন্তা করেন তাহলে আপনার সর্বনিম্ন শাস্তি হচ্ছে আপনার পুরো সিস্টেম শর্টসার্কিট হয়ে যেতে পারে। এরপরে আপনি আর মনের বাড়িতেই যেতে পারবেন না, যখন ধ্যানে বসতে যাবেন মনে হবে কিছু একটা ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন শাস্তি। এছাড়া শারীরিক-মানসিকভাবে আপনি বিপর্যস্ত হতে পারেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আপনি আক্রান্ত হতে পারেন যদি মনের বাড়ির এ শক্তিকে আপনি অন্যের ক্ষতির জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করতে চান।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে হঠাৎ করে কারো প্রতি অভিশাপ চলে এলে কী করবো?

উত্তর : সাথে সাথে তওবা তওবা বা বাতিল বাতিল বলবেন। যার প্রতি অভিশাপ এসেছে তার মঙ্গল কামনা করবেন। যদি এমন হয় যে, সে আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছে যে, তার মঙ্গল কামনা আসে না। তাহলে বড়জোর আপনি প্রভুর কাছে বিচার দিয়ে দেবেন যে, প্রভু অমুক আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। তুমি এর উপযুক্ত বিচার করে দাও। কিন্তু বিচারে শাস্তি কী হবে এটা আবার বলতে যাবেন না যে, তাকে পঙ্গু করে দাও, তাকে অন্ধ করে দাও। শাস্তির ভার প্রভুর হাতে ছেড়ে দেবেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো অন্যের কোনো ক্ষতি, অন্যের কোনো অমঙ্গল, অন্যের কোনো অকল্যাণ মনের বাড়িতে আপনি করতে যাবেন না।

প্রশ্ন : আমি একজনকে খুব পছন্দ করি। এজন্যে কী করতে পারি? তাকে কোনোভাবে বোঝাতে পারছি না। মেডিটেশনের মাধ্যমে কোনোকিছু করা কি সম্ভব?

উত্তর : এজন্যে আপনি পছন্দ করা বাদ দিতে পারেন। যাকে আপনি বোঝাতে পারছেন না, তাকে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নাই। মেডিটেশনের মাধ্যমে তাকে বোঝাতে যাওয়ার মতো বোকামি কখনো করতে যাবেন না। আপনি বিটা লেভেলে তাকে বোঝাতে পারছেন না, তার মানে সে আপনাকে পছন্দ করে না। আর পছন্দ কখনো চাপিয়ে দেয়া যায় না।

আপনি যখনই জোর করতে যাবেন এটা রিবাউন্ড করবে এবং একটা সময় এর জন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে। একটা সময় আপনার সমস্ত যুক্তি সমস্ত আবেগকে সে পরিত্যাগ করবে। কারণ পছন্দ সবসময় দুইতরফা হওয়া

উচিত। আর একতরফা কোনো কিছুকে আপনি যদি বাস্তবে বা মেডিটেশনের মাধ্যমে জোর করে চাপিয়ে দেনও, তার পরিণতি কখনো ভালো হবে না। আর আপনি যদি মেয়ে হন, তাহলে এটা আপনার জন্যে আরো বিপদজনক।

আসলে আমরা এখনটায় ভুল করি। আমরা চিন্তা করি না—আমি যাকে পছন্দ করি সে আমাকে কতটুকু পছন্দ করে। চিন্তা করি না—তারও অন্য কোথাও পছন্দ থাকতে পারে। ছেলে হলে এক ধরনের পাগল হই, মেয়ে হলে আরেক ধরনের পাগল হই। মেডিটেশনকে পছন্দ চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের deeper level-এর প্রতিটি কথাই নাকি সত্য। সাধারণ কথার চেয়ে ১০০০ গুণ শক্তিশালী। তাহলে আমার বাসায় যে হকার পেপার দিয়ে যায় সে যে দৈনিকটি দিয়ে যায়, আমি change করে অন্য কোনো দৈনিক নিতে চাই। deeper level-এ হকারকে যদি বলি তুমি কাল থেকে অমুক দৈনিক পত্রিকা দিয়ে যাবে তাহলে কি সে তা-ই দেবে? কিংবা কোনো বন্ধুকে আজ আমার বাসায় আসতে বললে কি সে আসবে?

উত্তর : আসলে এটা খুব অবাস্তব প্রশ্ন। যে কথাটা হকারকে মুখে বলে দিলেই হয় সেটার জন্যে ধ্যানের গভীর স্তরে যাবার দরকারটা কি? আমার এখানে গ্লাসে পানি আছে, আমি এটা চাইলেই তুলে খেতে পারি। এর জন্যে মেডিটেশন করার কি কোনো প্রয়োজন আছে?

আর বন্ধুকে বাসায় আসতে বললে অবশ্যই আসবে যদি তাকে আগে থেকে আমন্ত্রণ জানান এবং সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে তার আসার মতো অবস্থাও থাকতে হবে। ধরুন সে জার্মানিতে আছে। এখন আপনি তাকে আসতে বললেও তো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অর্থাৎ যে কাজগুলো আপনি সহজ স্বাভাবিকভাবেই করতে পারেন সেগুলো আধ্যাত্মিকতা দিয়ে করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন একবার এক সাধু এক গৃহস্থকে বললেন, দেখ, আমি চোখের ইশারায় কীভাবে এক লোটা পানি উঠোন থেকে বারান্দায় নিয়ে আসি। এ আমার ৪০ বছরের সাধনা। বলে সে তা-ই করলো। গৃহস্থ এবার বললো, বাবা, এবার আপনি দেখুন আমি কীভাবে লোটা নিয়ে আসি। বলেই সে হাঁক দিয়ে ডাকলো তার ছেলেকে, এই, এক লোটা পানি এদিকে দিয়ে যা। ছেলোটো তা-ই করলো। সাধু হা হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

অন্যকে মেডিটেশন শেখানো

প্রশ্ন : কোনো এসোসিয়েট যদি দুবেলা নিরাময়ের মেডিটেশন করতে চান তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে?

উত্তর : কোনো এসোসিয়েট দুবেলা কিংবা তিন বেলাও যদি নিরাময়ের মেডিটেশন করেন, অসুবিধা নেই। নিরাময়ের মেডিটেশনসহ থ্রাজুয়েটদের অন্যান্য মেডিটেশনও সবাই করতে পারেন। তবে কমান্ড সেন্টার এবং প্রো-মাস্টার্স মেডিটেশন প্রশিক্ষণ ছাড়া করা নিজের জন্যে ক্ষতিকর।

প্রশ্ন : দরিদ্র কেউ মেডিটেশন শিখতে চাইলে তাকে শেখানো যাবে কি?

উত্তর : কেন যাবে না? যারা কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন তারা তৃতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত অর্থাৎ নিরাময় কক্ষ পর্যন্ত যত মেডিটেশন আছে, যত পদ্ধতি শেখানো হয়েছে তা যে কাউকে শেখাতে পারেন। আসলে আরেকজনকে মেডিটেশন শেখানো তো অনেক পুণ্যের কাজ, সওয়াবের কাজ। আর গরিব হয়েছে বলে তাকে শেখানো যাবে না এমন কোনো কথা থাকতে পারে না। অতএব আপনি যে কাউকে শেখাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই।

বিব্রতকর প্রশ্ন

প্রশ্ন : মনে হয় আমাদের সব সমস্যার সমাধান অটোসাজেশন আর ধ্যানে সম্ভব, আসলে ব্যাপারটা কি এত সহজ?

উত্তর : আসলে ব্যাপারটা এতই সহজ। আসুন। চর্চা করুন। আপনি নিজেও একমত হবেন। কারণ যখন অটোসাজেশন দেবেন, ভেতরের শক্তি জ্বালাত হবে। যখন মেডিটেশন করবেন—মন প্রশান্ত হবে, মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারবেন। মানুষ তার সকল জৈবিক সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার সমাধান করেছে মস্তিষ্কে ব্যবহার করে, ঠান্ডা মাথায় নিরলস পরিশ্রম করে।

প্রশ্ন : বই পড়া বা ভালো কিছু পড়ার পর মেডিটেশনের মতো ঝরঝরে অনুভূতি হয়। বই পড়লে নতুন জ্ঞান লাভ হয় যা মেডিটেশন করলে হয় না।

বই পড়লে ঝরঝরে অনুভূতি লাভ এবং মেডিটেশন দুটোই হচ্ছে। এক্ষেত্রে কি মেডিটেশন ছেড়ে দেবো?

উত্তর : আসলে বই পড়ে নতুন জ্ঞান লাভ করা যায় না। আজ পর্যন্ত যত সাধক এসেছেন, যত মহামানব এসেছেন, যত বিজ্ঞানী এসেছেন কেউই বই থেকে নতুন জ্ঞান লাভ করেন নি। সবাই আত্মনিমগ্ন অবস্থায় নতুন জ্ঞান লাভ করেছেন। বই থেকে যা পাওয়া যায় সব পুরনো জ্ঞান। নিউটন তার সূত্র কোনো বই থেকে পান নি। আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি কোনো বই থেকে পাওয়া যায় নি।

যত বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এসেছেন তারা কোনো সূত্র বই থেকে পান নি। সূত্র আবিষ্কার করেছেন আত্মনিমগ্ন অবস্থায়। সেটা বইয়ে এসেছে এবং বই পড়ে আমরা তা জেনেছি। অর্থাৎ নতুন জ্ঞান কিন্তু বই থেকে পাওয়া যায় না। যে কারণে যুগে যুগে কালে কালে যারা পৃথিবীকে কিছু দান করেছেন তারা মেডিটেশন করেছেন। নতুন জ্ঞান লাভ করবেন-সে উদ্দেশ্যেই আপনার মেডিটেশন করা উচিত।

প্রশ্ন : মেডিটেশন দিয়ে যদি সব চাওয়াই পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে মানুষ এখনো মেডিটেশনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না কেন।

উত্তর : না জানার জন্যে। জানতে তো হবে যে, কোনটা দিয়ে কী পাওয়া যায়। কাটা জায়গায় দুর্বাঘাস চিপে রস দিলে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়, এটা না জানলে তো আপনি দুর্বাঘাস ফেলে ডেটলের জন্যে দৌড়াবেনই। আমাদের অবস্থা কিন্তু তা-ই হচ্ছে। আমরা আমাদের সমস্ত সমাধান কাছে রেখে দূরে দৌড়াচ্ছি। তাই যত তাড়াতাড়ি জানবো তত আমাদের মঙ্গল।

প্রশ্ন : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে যদি ছক আকারে কাজটি করা যায় তাহলে তো সাফল্য অবশ্যই আসবে। তবে নিয়মিত মেডিটেশনের প্রয়োজন কেন?

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন আসলে ছক অনুসারে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাবে। মনকে স্থির করতে না পারলে, মনের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে ছক অনুসারে চলতে পারবেন না। যারা ছক অনুসারে কাজ করেন তারা হয় মেডিটেশন না হয় অন্য কিছু অনুশীলন করেন। কোনো কিছু অনুশীলন ছাড়া কখনো ছক অনুসারে কাজ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : কোর্সে এসে সবার পক্ষে কি ধ্যানের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব?

উত্তর : হ্যাঁ, সবার পক্ষেই ধ্যানের স্তরে বা মেডিটেশন লেভেলে যাওয়া সম্ভব এবং এটা মানুষের জন্মগত ক্ষমতা। আসলে ধ্যানের স্তরে আপনি কিন্তু হরহামেশাই যাচ্ছেন। বসে থাকতে থাকতে যখনই চোখের পাতা একটু ভারী হতে শুরু করলো, আপনি আলফা লেভেলে চলে গেলেন। আলফা লেভেলে যাওয়ার জন্যে কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

প্রশিক্ষণ প্রয়োজন শুধুমাত্র আলফা লেভেলে অনেকক্ষণ থাকতে পারার জন্যে। যেমন, নদীতে হাবুডুবু খাওয়ার জন্যে কোনো প্রশিক্ষণের দরকার নাই। কিন্তু ভেসে থাকার জন্যে প্রশিক্ষণের দরকার আছে। তেমন সাধারণ মানুষ যখন বসে থাকে তখন আলফা থেকে দ্রুত থিটা, তারপরে ডেল্টা লেভেলে চলে যায়, অথবা আলফা-থিটা, থিটা-আলফা করে। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন আলফা লেভেলে ৩০/৪০ মিনিট/ ১ ঘণ্টা থাকতে পারার জন্যে।

আর বিজ্ঞান এ কাজ আমাদের জন্যে খুব সহজ করে দিয়েছে। আমরা ধ্যানের স্তরে যাওয়ার জন্যে মনোবিজ্ঞানের আধুনিক সূত্রগুলোই সহজভাবে ব্যবহার করছি।

একারণেই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণের জন্যে কোনো পূর্ব যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। যারা বাংলা বোঝেন এবং চেয়ারে বসতে পারেন তারাই কোর্সে অংশ নিতে পারেন।

অনেকেই মনে করেন একটা চেয়ারে চারদিন ৪০ ঘণ্টা ক্লাস করা খুব কষ্টকর ব্যাপার হবে। কিন্তু আদৌ তা নয়। এটা সাধারণভাবেই আনন্দদায়ক সহজ ব্যাপার। ১৯৯৪ সালের ঘটনা। প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান তখন মাঝে মাঝেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজিজ মেহের তাকে বললেন, তুমি মহাজাতকের কোয়ান্টাম কর। ভালো হয়ে যাবে। কবি শামসুর রাহমান যেহেতু পূর্ব পরিচিত, তিনি ফোন করে আমার কাছে জানতে চাইলেন কোয়ান্টাম সম্পর্কে। যখন শুনলেন প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা করে চার দিন ৪০ ঘণ্টা ক্লাস, চেয়ারে বসে থাকতে হবে—তিনি বললেন, আমি তো ১০ ঘণ্টা শুয়েই থাকতে পারি না। এত কষ্ট। আর বসে থাকা অসম্ভব। আমরা বললাম—আসেন। আপনার খুব ভালো লাগবে। চার দিন ৪০ ঘণ্টা তিনি একটা সাধারণ চেয়ারে বসে ছিলেন। এবং বসে থেকে মেডিটেশন করতে করতেই অনেক সুস্থ ও ভালো হয়ে উঠলেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ছিলেন।

প্রশ্ন : মেয়েদের মেডিটেশন করার দরকার কি? আমার তো মনে হয় তারা এমনিতেই আলফা লেভেলে থাকে ।

উত্তর : আসলে মেডিটেশনে আমরা আলফা লেভেলটাকে ব্যবহার করছি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে অনন্ত সম্ভাবনা, যে অনন্ত শক্তি রয়েছে সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে তাকে নিজের এবং মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার জন্যে । এখানে মেয়ে এবং ছেলে বলে কোনো কথা নেই । সবারই মেডিটেশন শেখা উচিত এবং চর্চা করা উচিত ।

মেডিটেশন কোর্স পরবর্তী করণীয়

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আমার পরবর্তী করণীয় কী?

উত্তর : কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর আপনার কিছু করণীয় রয়েছে । কোর্সের মাধ্যমে আপনি জীবনকে সফল করার যে বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো হাতে পেয়েছেন তাকে আরো ভালোভাবে প্রয়োগ করে জীবনে সফল হওয়ার জন্যে নিয়মিত অনুশীলন ও ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হোন ।

□ দিন শুরু করণ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে । সকালে ঘুম ভাঙতেই বলুন, ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম! থ্যাংকস গড বা প্রভু আমি কৃতজ্ঞ নতুন একটি দিনের জন্যে’ । সারাদিনে শতবার বলুন, ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’ ।

□ প্রতিদিন দুবার মেডিটেশন করণ । একবার শিথিল প্রক্రిয়ায় শিথিলায়ন [সিডি-১, সাইড-এ] । আরেকবার সুখী জীবন/ মনছবি [সিডি-৫]/ সার্বজনীন প্রার্থনার মেডিটেশন । শিক্ষার্থীরা করণ শিক্ষার্থী মনছবি [সিডি-৩১] । নিরাময়ের জন্যে [সিডি-৬] ও দেহ-মনকে আনন্দে প্লাবিত করার জন্যে করণ মেডিটেশন আনন্দ [সিডি-১০] ।

□ কোয়ান্টাম শক্তি সংহত করার জন্যে প্রতিদিন দুই দফায় ৩০ মিনিট হিসেবে এক ঘণ্টা করে ৪০ থেকে ৫৭ দিনের মধ্যে ৪০ ঘণ্টা মেডিটেশন সম্পন্ন করণ ।

□ পরিবারকে আলোকিত করণ । বৃহস্পতিবারকে পালন করণ পারিবারিক দিবস হিসেবে । পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসে কথা বলুন, একত্রে যেকোনো বেলার খাবার খান, মেডিটেশন করণ, মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকেলে আলোকিত পরিবার কার্যক্রমে অংশ নিন । আপনার

পরিবারে প্রশান্তি ও প্রাচুর্য আরো বাড়বে।

□ প্রতি মঙ্গলবার আলোকায়ন কার্যক্রমে অংশ নিন। ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে সারাদিনে মোট ১০টি সেশনে অনুষ্ঠিত হয় এ কার্যক্রম। এছাড়াও ঢাকার বনশ্রী কার্যালয়সহ ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও মিরপুর সেন্টারে একাধিক সেশনে অনুষ্ঠিত হয় আলোকায়ন কার্যক্রম। আলোকিত জীবনের ওপর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, মেডিটেশন ও কাউন্সেলিংয়ের এ কার্যক্রমে আপনার আত্মীয় ও বন্ধুকে সাথে নিয়ে আসতে পারেন। এত আপনার অন্তর্গত শক্তি বাড়তে থাকবে।

□ ঢাকায় মাসের প্রথম বুধবার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের জন্যে প্রজ্ঞা জালালি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নিন।

□ প্রতি শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে আপনার নিকটবর্তী সেন্টার/শাখা/ সেল/ প্রি-সেল-এর সাদাকায়ন কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নিন।

□ সুস্বাস্থ্যের জন্যে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম করণ।

□ নিজের ও পরিচিতদের নিরাময় ও সাফল্য কামনায় সদকা হিলিংয়ে নাম দিন।

□ সুযোগ পেলেই কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নিন। এতে চার দিনের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সকে আপনি অনুভব করবেন উপলব্ধির নতুন মাত্রায়। পারলে প্রতিবছর দুই বার করে কোর্স রিজুভিনেশন করণ।

□ হিরণ্যায় মৌনতার শক্তিকে অনুভব করতে হলে অংশ নিন বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টামমে ৩ দিনব্যাপী কোয়ান্টায়নে।

□ লামার কোয়ান্টামমে কোয়ান্টাম সাফারি এক চমৎকার আয়োজন। কোয়ান্টামমের প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে প্রায় প্রতি মাসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ সাফারি। ভ্রমণের বৈচিত্র্যময় স্বাদ উপভোগ করতে সপরিবারে অংশ নিন।

□ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট www.quantummethord.org.bd ভিজিট করণ। এতে যেকোনো সময় আপনি পাবেন ফাউন্ডেশন সম্পর্কে আপডেটেড তথ্য ও কর্মসূচি।

□ কোয়ান্টাম মেথড বই হাতের কাছে রাখুন। সময় করে চোখ বোলান।

□ মেডিটেশনের কথা, জীবন-যাপনের বিজ্ঞানের কথা পরিচিতদের কাছে নিঃসংকোচে আন্তরিকতার সাথে বলুন। মেডিটেশনের হাজারো তথ্যের প্রামাণ্য দলিল ‘কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস’ কাছে রাখুন। পড়তে দিন, উপহার দিন পরিচিতদের। আত্মীয়-বন্ধুদের ক্যাসেট, সিডি, শোকরানা ডিভিডি ‘আপনিও

সুস্থ হতে পারেন’, ‘কোয়ান্টাম বিশ্বাস ও বাস্তবতা’ এবং অন্যান্য কোয়ান্টাম সামগ্রী উপহার দিন। ধ্যানের আলোয় আলোকিত করার, সৃষ্টির সেবায় সংসঙ্গে একাত্ম করার চেষ্টা করুন চারপাশের মানুষকে।

□ আপনার রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি বা যেকোনো কাজের সাফল্য কামনায় আজ থেকেই কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক-এ টাকা রাখুন। বন্ধু বা পরিবারের সবাইকে এতে টাকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করুন। ব্যাংক ভরে গেলে কেন্দ্র বা নিকটবর্তী সেন্টার/ শাখা/ সেলে/ থ্রি-সেলে জমা দিয়ে নতুন ব্যাংক উপহার হিসেবে নিয়ে যান।

□ কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে নিয়মিত রক্ত দিন। বন্ধু ও আত্মীয়দের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করুন। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কোয়ান্টাম ল্যাব বা ব্লাড ক্যাম্পে কাজ করুন। সুযোগ থাকলে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করুন।

□ সঠিক জীবনদৃষ্টি লাভে পড়ুন শিষ্টাচার, অটোসাজেশন, পরিবার, স্বাস্থ্য, প্রার্থনা, সুবচন ও জীবন কণিকা শিরোনামে ফাউন্ডেশনের একাধিক কণিকা সেট। উপহার দিন প্রিয়জনকে।

কোয়ান্টা ধ্বনি ও ভঙ্গি

প্রশ্ন : কোয়ান্টা ধ্বনি করার আগে কি কোনো প্রকার মেডিটেশন করতে হবে?

উত্তর : আসলে জরুরি অবস্থায় তো মেডিটেশন করার সময় থাকবে না। হাইজ্যাকার ছোরা নিয়ে আসছে। আপনি যদি বলেন যে, ও বাবা, দাঁড়াও, আমি একটু মনের বাড়িতে গিয়ে নিই, তাহলে তো হবে না।

কিন্তু মেডিটেটিভ লেভেলে গিয়ে আপনি প্রত্যেকদিন কন্ডিশনিং করবেন। মনের বাড়িতে এই অটোসাজেশনটি নিয়মিত দেবেন : আমি যখনই কোয়ান্টা ভঙ্গি করবো বা কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করবো সাথে সাথে আমার চেতনা মহাচেতনার সাথে যুক্ত হবে এবং আমি সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে আমি যা-ই পড়বো, যা-ই শুনবো সব আমি মনে রাখবো ও বুঝতে পারবো। আমার যখন প্রয়োজন সব আমি সুন্দরভাবে বলতে এবং লিখতে পারবো। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে আমি আমার রাগ ক্রোধ ক্ষুধাকে অনায়াসে দমন করবো।

প্রশ্ন : এই ধ্বনির কার্যকারিতা কি আজ থেকেই পাবো? নাকি আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে?

উত্তর : এটা এখন থেকেই হবে এবং আপনি যত চর্চা করবেন এর শক্তি তত বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : মন্ত্র উচ্চারণ না করে শুধু ভঙ্গি করেই কি সুফল পাওয়া যাবে?

উত্তর : দুটোর যেকোনোটা আপনি করতে পারবেন। মন্ত্রও প্রয়োগ করতে পারবেন, ভঙ্গিও প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু যখন চর্চা করবেন, রপ্ত করবেন তখন মন্ত্র এবং ভঙ্গি দুটোই করবেন যাতে যেকোনোটা আপনি প্রয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : সারাদিন ভালো থাকার জন্যে এই ভঙ্গি করে বের হলে কি সারাদিন বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকবো?

উত্তর : আসলে বিপদ-আপদ ছাড়া তো জীবন হয় না। এমন মানুষ খুঁজে পাবেন না, যার জীবনে বিপদ আসে নি, ঝঞ্ঝা আসে নি। সফল মানুষ সেটাকে অতিক্রম করেছেন, ব্যর্থরা সেটার সামনে পরাজিত হয়েছেন। অতএব সকাল বেলা কোয়ান্টা ভঙ্গি করে বেরোবেন বিপদ থেকে শুধু মুক্ত থাকার জন্যে নয়; বরং বিপদ এলে বিপদকে যেন ঠান্ডা মাথায় সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে পারেন সেই জন্যে।

এরপর প্রতিনিয়ত এই ভঙ্গি এবং ধ্বনিকে আপনি কাজে লাগাতে পারবেন। ট্রাফিক যখন ডানে-বামে কোনোদিকেই নড়াচড়া করছে না আমাদের অনেক গ্রাজুয়েট তখন উত্তেজিত না হয়ে এই ভঙ্গি করে অপেক্ষা করেন। দেখা যায় যাওয়ার পথ সহজ হয়ে গেছে। অথবা শীতের রাত, ৪টায় হাইওয়েতে যানবাহন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এই ভঙ্গি করে অপেক্ষা করছেন যানবাহন চলে আসছে। অথবা—সব গাড়ি উত্তর দিকে যাবে, দক্ষিণে কোনো গাড়ি যাবে না। এই ভঙ্গি করে অপেক্ষা করছেন দক্ষিণের গাড়ি চলে আসছে। অতিরিক্ত ভাড়া চাচ্ছে, এই ভঙ্গি করে অপেক্ষা করছেন, ন্যায্য ভাড়ায় যানবাহন পাওয়া যাচ্ছে।

আলাপ-আলোচনা নেগোসিয়েশনে—অপরপক্ষ জিলাপির পঁয়চ পঁয়চাচ্ছে। আপনি উত্তেজিত না হয়ে এই ভঙ্গি করে অপেক্ষা করতে থাকেন। সে পঁয়চাতে পঁয়চাতে নিজের পঁয়চে নিজেই পড়বে।

অথবা নার্ভাস ফিল করছেন—টিচারের রুমে ঢুকতে, বসের রুমে ঢুকতে, কোয়ান্টা ভঙ্গি করে ঢুকে যান। দেখা যাবে যে, উনি যে জন্যে ডেকেছিলেন

সে প্রসঙ্গ হয়তো ভুলেই গেছেন। অন্য প্রসঙ্গে আলাপ করে ছেড়ে দিয়েছেন আপনাকে।

অথবা অহেতুক বা অযৌক্তিকভাবে ভয় পাচ্ছেন। কোয়ান্টা ভঙ্গি করণ বা মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি করণ, দেখবেন যে, ভয় কেটে গেছে।

বাসায় ফিরতে দেরি হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন যে, বাসায় আজ তুলকালাম কান্ড হবে। যদি অকারণে দেরি করে থাকেন, অহেতুক আড্ডাবাজিতে দেরি করে থাকেন, আগে অনুশোচনা করণ যে, না, কাজটা ঠিক হয় নি, ভবিষ্যতে এরকম আর করবো না। তারপর মনে মনে বলুন, বাসায় যাচ্ছি শান্তির জন্যে, গিয়ে যেন সব শান্ত দেখি। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে ঢুকুন বাসায়। দেখবেন—উদ্বেজনার পরিবর্তে উৎকর্ষ। হয়তো বলবেন যে, বাসায়ও যদি এই ভঙ্গি জানে তখন কী হবে? তখন তো আরো সুবিধা। উনিও আলফা, আপনিও আলফা। আলফা-আলফায় কোনো সমস্যা থাকে না।

প্রশ্ন : কোনো ক্ষেত্রে যখন আমি কোয়ান্টা ভঙ্গি এক হাতে করি। তাতে যত তাড়াতাড়ি কাজ হয় দুই হাতে করলে কি দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি কাজ হবে?

উত্তর : না, আপনি এক হাতে করলেও যা, দুই হাতে করলেও তা, এর সাথে মন্ত্র উচ্চারণ করলেও সেই একই কাজ হবে।

প্রশ্ন : আমি একবার বেখেয়ালে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে মিথ্যা বলেছিলাম। এখন কী করবো?

উত্তর : আল্লাহ আপনাকে মাফ করণ। ভবিষ্যতে আর মিথ্যা বলবেন না। এই যে অনুশোচনার অনুভূতিটা আপনার মধ্যে এসেছে, এটাকেই আমরা পছন্দ করি। আল্লাহ তায়ালা সবসময় অনুশোচনাকারীকে, তওবাকারীকে ভালবাসেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন।

প্রশ্ন : আমার কোয়ান্টা ধ্বনি-ভঙ্গি আমার সাথে এডাপ্টেড। কিন্তু এটা অপরজনকে সক্রিয়ভাবে কী করে প্রভাবিত করবে?

উত্তর : আসলে আপনি যখন কোয়ান্টা ভঙ্গি করছেন তখন আপনি আলফা লেভেলে। সাথে সাথে আপনার মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনি একাগ্র হচ্ছেন এবং আপনার মন প্রশান্ত হচ্ছে, আপনার মস্তিষ্ক ঠান্ডা হচ্ছে। এবং যদি

আপনি মনোযোগ দিয়ে কোনো চিন্তা করেন, এই চিন্তার ফলে যে ব্রেন ওয়েভ সৃষ্টি হয়, সেই ব্রেন ওয়েভ, আলফা ব্রেন ওয়েভ খুব সহজে অন্যের মস্তিষ্কে চলে যেতে পারে এবং ভালো কাজে, ভালো বিষয়ে তাকে প্রভাবিত করা সহজ হয়। কারণ আপনি তো কল্যাণের জন্যে এটা ব্যবহার করছেন। তিনি উত্তেজিত না হলে তার কল্যাণ হবে। অর্থাৎ আপনার প্রো-একটিভিটি তাকে রি-একটিভ হওয়া থেকে বাঁচাচ্ছে।

প্রশ্ন : গালির জবাবে গালি না দিয়ে কোয়ান্টা ধ্বনি করে সিদ্ধান্তের ব্যাপারটা আবার বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর : গালির জবাবে গালি দেয়া মানে হচ্ছে আপনি রেগে গেছেন। আর রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। রেগে না গিয়ে তাত্ক্ষণিকভাবে নিজেকে প্রশান্ত করার জন্যে কোয়ান্টা ধ্বনি চমৎকার। যখনই মনে হবে—এই রাগ এখন পা থেকে মাথার দিকে উঠতে যাচ্ছে, লম্বা দম নিন। ধীরে ধীরে দম ছাড়ুন। মনকে জিজ্ঞেস করুন যে, মন, এখন আমি কী করবো? দেখবেন যে, আপনি ঠান্ডা মাথায় সে অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। রাগ নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ নিজেকে মুহূর্তে শান্ত করতে এ ভঙ্গি প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন : কেউ আমার সাথে ঝগড়া করছে—এমন সময় যদি ভঙ্গি বা ধ্বনি উচ্চারণ করি তখন কি সে জন্ম হয়ে যাবে, না কি শান্ত হয়ে যাবে?

উত্তর : প্রথমত, বুদ্ধিমান মানুষ কখনো ঝগড়ার মধ্যে যায় না। দ্বিতীয়ত, এই যে আপনি ধ্বনি উচ্চারণ করে অন্যকে শান্ত করতে চাচ্ছেন এর পেছনে উদ্দেশ্যটা কিন্তু ভালো না। উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আপনি তার উপরে কর্তৃত্ব করতে চান এবং সেটা আবার প্রকাশ্যে দেখাতেও চান যে, দেখ, আমি পারি তোমাকে ঠান্ডা করতে। আমরা যা শিখছি তা নিজের এবং অন্যের কল্যাণের জন্যে। আপনাকে যদি আরেকজন কোনো কিছু উচ্চারণ করে জন্ম করে দেয় সেটা যেরকম আপনার ভালো লাগবে না সেরকম আপনি যদি অন্যকে জন্ম করেন সেটাও তো তার ভালো লাগবে না। সেজন্যে কাউকে জন্ম করতে কখনো এই টেকনিক প্রয়োগ করবেন না। বরং তাকে সৎপথে আনার জন্যে, ভালো পথে আনার জন্যে এই টেকনিক প্রয়োগ করবেন এবং বোঝানোর চেষ্টাটা যত মমতার সাথে হবে, তত ভালো।

প্রশ্ন : টেন্ডার দাখিল করার সময় সর্বনিম্ন দরে কাজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোয়ান্টা ভঙ্গি কাজে আসবে কি?

উত্তর : সর্বনিম্ন রেট নির্ধারণের জন্য কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করবেন।

প্রশ্ন : পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টা ধ্বনির কোনো উপকারিতা আছে কি?

উত্তর : কোয়ান্টা ভঙ্গি করলে জ্ঞান অর্জন সহজ হয় বলেই একে জ্ঞান মুদ্রা বলা হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে কোয়ান্টা ভঙ্গি চমৎকার একটি টেকনিক। যখনই আপনি এই ভঙ্গিযোগে পড়বেন, পড়া মনে থাকবে সহজে। আপনি শিক্ষার্থী হলে টেবিলে যখন বইপত্র নিয়ে বসবেন, প্রথমেই চোখ বন্ধ করে মনের বাড়িতে চলে যান। দরবার কক্ষে গিয়ে বলুন যে, আমি একটু পরেই চোখ মেলবো। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে এই বইয়ের এই অধ্যায়ের এত পৃষ্ঠা থেকে এত পৃষ্ঠা পড়বো। যা পড়বো সব আমার মনে থাকবে। যা পড়বো সব আমি বুঝতে পারবো। যা পড়বো, সাথে সাথে তা আমি সুন্দরভাবে বলতে বা লিখতে পারবো। তারপরে চোখ মেলে বাম হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে রাখুন। ডান হাতে লিখুন, নোট করুন, পড়ুন। যে পড়া তৈরি করতে ছয় ঘণ্টা লাগতো স্রষ্টার রহমতে দেখবেন তা তিন ঘণ্টায় হয়ে গেছে। এত চমৎকার!

তাছাড়া ক্লাস করার সময়ও কোয়ান্টা ভঙ্গি করে রাখতে পারেন। লেকচার মনে থাকবে। সহজে বুঝবেন। নোটও তুলতে পারবেন দ্রুত।

প্রশ্ন : পরীক্ষার হলে বা ইন্টারভিউ বোর্ডে যাওয়ার আগে বাসায় যদি ভঙ্গি বা শব্দ উচ্চারণ করি, তবে তা কাজ করবে কি?

উত্তর : আপনি যাবার আগে মেডিটেশন করে বলবেন যে, আমি যা জানি, ভাইভা বোর্ডে তার মধ্য থেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং আমি অত্যন্ত সাবলীলভাবে তার জবাব দেবো। আমার জবাবে সবাই মুগ্ধ হবে। দেখবেন, আপনি জবাব দেবেন এবং সবাই মুগ্ধ হবে। আর ইন্টারভিউ বোর্ড বা পরীক্ষা-যেখানেই যাচ্ছেন আপনি শুধু বাম হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে রাখবেন তাতে আপনার আর কোনো রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ সংশয়-কিছু থাকবে না। আপনার ভেতরে এমন প্রত্যয় সৃষ্টি হবে যে, দেখেই মনে হবে—আপনাকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : ছাত্ররা কি পরীক্ষার হলে প্রশ্ন লেখার সময় মনে মনে কোয়ান্টা ধ্বনি প্রয়োগ করলে কাজ হবে? পড়া জানা না থাকলেও কি হবে?

উত্তর : প্রশ্নের জবাব সুন্দরভাবে লেখার জন্যে ধ্বনি বা ভঙ্গিতে অবশ্যই কাজ হবে। তবে অবশ্য পড়তে হবে। যদি পড়াই জানা না থাকে, তাহলে কীভাবে লিখবেন। কোয়ান্টা ভঙ্গি জানা জিনিস সুন্দরভাবে মনে রেখে লেখার জন্যে। অতএব আগে মূল কাজটা করতে হবে। এ নিয়ে আমেরিকানদের একটা গল্প আছে। এক ভদ্রলোক খুব পুণ্যাত্মা, নিয়মিত চার্চে যান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। হঠাৎ তিনি আর্থিক অসুবিধায় পড়ে গেলেন। আমেরিকাতে প্রতি সপ্তাহে লটারি হয়। ঐ লটারির প্রথম পুরস্কারটা যদি উনি পান তাহলে তার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সমস্যাও থাকে না, কিছু লাভও হয়ে যায়। উনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন যে, ঈশ্বর আমাকে ঐ লটারির প্রথম পুরস্কারটা পাইয়ে দাও।

একমাস দুমাস পার হয়ে গেল কিন্তু প্রথম পুরস্কার আর উনি কিছুতেই পান না। একদিন উনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন যে, ঈশ্বর আমি যদি জীবনে কোনো পুণ্য করে থাকি সে পুণ্যের বিনিময়ে হলেও আমাকে ঐ প্রথম পুরস্কারটা পাইয়ে দাও। ঈশ্বর তো এমনিতেই দয়ালু। এত কান্নাকাটি করলে তিনি তো নীরব থাকতে পারেন না। তিনি তখন আওয়াজ দিলেন যে, আরে, আমি তো তোমাকে দিতে চাই কিন্তু তুমি তো আমাকে দেয়ার সুযোগ দেবে। অন্তত লটারির একটা টিকেট তো কিনবে। আসল কথা হচ্ছে যে, আপনি যদি লেখাপড়া না করেন—কোনো মন্ত্বেই তখন কাজ হবে না। আপনার কাজটুকু আপনাকে করতে হবে। তারপর কোয়ান্টা ধ্বনি প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টা ধ্বনি বা ভঙ্গি প্রয়োগ করে কি পরীক্ষার হলে পরীক্ষকের মন দুর্বল করে দেয়া সম্ভব?

উত্তর : পরীক্ষকের মন দুর্বল করার প্রয়োজন কি? আপনার জ্ঞান বাড়াইতো হয়। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে পড়াশোনা করলে তো নকলের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন : নার্ভাসনেস কাটানোর জন্যে ভঙ্গি বা শব্দ যদি উচ্চারণ না করে মনে মনে বলি তবে কি কাজ হবে?

উত্তর : অবশ্যই কাজ হবে। আপনি স্বাভাবিকভাবে মনে মনে উচ্চারণ করবেন। শব্দ করে নয়।

প্রশ্ন : কোয়ান্টা ধ্বনি প্রয়োগের ব্যাপারটা কাকতালীয় নয় কি? এটা কতটুকু বিজ্ঞানসম্মত?

উত্তর : মোটেই কাকতালীয় নয়। আমরা অনেকেই শুনেছি অতীতের সাধকরা মন্ত্র, ইসম বা মুদ্রার সাহায্যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করতেন। সুফীরা, দরবেশরা ‘আল্লাহ্’, ‘ইয়াহ্’, ‘ইয়া হক’, ‘হক মওলা’ ইত্যাদি নানা ধ্বনিকে ইসম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঋষিরা ‘ওম’, ‘ওম তৎসৎ’, ‘হরি ওম’, ‘হরে রামা’ ইত্যাদি নানা ধ্বনিকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইহুদী ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ‘আমেন’ শব্দকে, জাপানী বুদ্ধরা ‘নামো আমিদা বাৎসু’ ধ্বনিকে মন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

যারা মার্শাল আর্ট চর্চা করেন তাদেরকে আমরা দেখেছি হাতের আঘাতে ৮/১০টা ইট বা পাথরের স্লাব ভেঙে ফেলতে। লক্ষ্য করে দেখবেন, আঘাত করার আগে তারা একটু পায়তারা করেন, মনোযোগকে একত্র করেন। এর পর ‘কুই..’ ধ্বনি উচ্চারণ করার পর আঘাত করেন।

এই ধ্বনির সাহায্যে অসাধ্য সাধনের ব্যাখ্যা আমরা পাই আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে। আমরা অনেকেই কনডিশন্ড রিফ্লেক্স সম্পর্কে বিজ্ঞানী পাভলভের গবেষণার কথা শুনেছি। এ গবেষণায় পাভলভ একটি কুকুরকে প্রতিবার খাবার দেয়ার সময় ঘণ্টা বাজাতেন। খাবারের সাথে লালার অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। যখনই খাবার দেয়া হতো, কুকুরের মুখ দিয়ে লالا বরতো। কিছুদিন পর শুধু ঘণ্টা বাজানো হলো, কিন্তু খাবার দেয়া হলো না।

কিন্তু দেখা গেল, কুকুরের লালাত্রুষ্টি থেকে লالا নিঃসরণ হচ্ছে। পাভলভ একে বলছেন কন্ডিশনিং। অর্থাৎ কোনো ধ্বনি বা ভঙ্গির সাথে কোনো একটি বিশেষ কাজ বা অবস্থাকে যদি বার বার সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে আপাতভাবে স্বভাব বা নিয়মবহির্ভূত হলেও একটি অবস্থার সাথে আরেকটি অবস্থার যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

দরবেশ ঋষিরা সাধনায় লক্ষ লক্ষ বার তাদের মন্ত্র জপ করতেন। এভাবে অগণিতবার উচ্চারণের ফলে একসময় এই ধ্বনির সাথে গভীর ধ্যানাবস্থার কন্ডিশনিং হয়ে যেত। ফলে এই ধ্বনি উচ্চারণের সাথে সাথে দেহ ও মন মুহূর্তে শক্তির স্তরে চলে যেত। ব্যক্তিমন ও চেতনা সংযুক্ত হতো মহাচেতনা বা কসমিক কনশাসনেসের সাথে। অর্জিত হতো দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনে প্রকৃতির যে নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম ক্রিয়াশীল, তাকে প্রভাবিত করার শক্তি। মার্শাল আর্ট চর্চাকারীদেরও তেমনি ধ্বনি উচ্চারণের সাথে দেহমনের শক্তি

হাতে সমন্বিত হয়। সাধারণভাবে আঘাত করলে যেখানে হাত থেঁতলানোর কথা, সেখানে ইট বা পাথর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।

কোয়ান্টা ধ্বনি বা ভঙ্গিও তা-ই। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আপনি এমনভাবে কন্ডিশনিং হচ্ছেন যেন কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ বা কোয়ান্টা ভঙ্গি করার সাথে সাথে আপনি মনের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্যানাবস্থায় প্রবেশ করেন। আর আপনার মন ও মস্তিষ্ক যেহেতু ধ্যানাবস্থায় সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, কোয়ান্টা ধ্বনি বা ভঙ্গি ব্যবহার করে আপনি যেকোনো সঙ্কট উত্তরণে এ শক্তিকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এটাই কোয়ান্টা ধ্বনির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আর যদি কোয়ান্টা ধ্বনি প্রয়োগকে একান্তই কাকতালীয় মনে করতে চান তাতেও কোনো অসুবিধা নাই। কোয়ান্টা ধ্বনি প্রয়োগ করলে দেখবেন কাকতালীয় ঘটনার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে। আপনার নিজেরই তখন মনে হবে যে, কাকতালের বাইরেও কিছু একটা রয়েছে।

প্রশ্ন : কোয়ান্টা ভঙ্গি হিসেবে এই ভঙ্গিকেই বেছে নিলেন কেন? অন্য কোনো ভঙ্গি কি বেছে নেয়া যেত না?

উত্তর : বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী সংযুক্ত হচ্ছে, স্পর্শ করছে, তিন আঙুল বিচ্ছিন্ন থাকছে—এই হচ্ছে কোয়ান্টা ভঙ্গি। আসলে এ ভঙ্গি হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্য। মহেঞ্জোদারো-হরপ্পাতে আমরা যে নিদর্শনগুলো পাই সেখানে আমরা এ ভঙ্গির প্রচলন দেখি। তারা এটাকে বলতেন জ্ঞান মুদ্রা বা অভয় মুদ্রা। এ ভঙ্গি করলে জ্ঞান অর্জন সহজ হয় তাই জ্ঞান মুদ্রা। আর এ ভঙ্গি করলে ভয় থাকে না এই জন্যে অভয় মুদ্রা। মহামতি বুদ্ধকেও আমরা এ ভঙ্গিমায় পাই। আমরা আমাদের অনেক মুনি-ঋষি সাধককে এ ভঙ্গিমায় পাই। আধুনিককালেও রাষ্ট্রনায়করা, সেলিব্রেটিরা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ ভঙ্গি ব্যবহার করছেন। বহুজাতিক কোম্পানিও বিজ্ঞাপনে এ ভঙ্গি ব্যবহার করছে। আমরা এটাকে বলি কোয়ান্টা ভঙ্গি।

আবার এ ভঙ্গির একটা মজার দিক আছে। আপনি ডান হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে চোখের সামনে ধরুন। দেখুন তো ডান দিক থেকে কিছু পড়তে পারেন কি না। আলিফ, লাম, হা অর্থাৎ আল্লাহ্। যখন আপনি এ ভঙ্গি করছেন আপনার হাতে আল্লাহ্ হয়ে যাচ্ছে। আপনি স্রষ্টাকে স্মরণ করছেন। আর স্রষ্টাকে স্মরণ করলে ভয় থাকে না। স্রষ্টাকে স্মরণ করলে জ্ঞান অর্জন সহজ হয়। এ কারণে আমরা কন্ডিশনিংয়ের জন্যে এ ভঙ্গিকে বেছে নিয়েছি।

কমান্ড সেন্টার ও অন্তর্গুরু

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টার কী? অন্তর্গুরু কে?

উত্তর : কমান্ড সেন্টারকে এক কথায় বলা যায়, মনের বাড়ির মূল শক্তি ও কল্যাণকেন্দ্র। মানব অস্তিত্বের যে অংশ স্থান-কালে (Time and space) আবদ্ধ নয়, সে অংশ কমান্ড লেভেলে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়মের সাথে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করে। আর আপনি জানেন, দৃশ্যমান সবকিছুর পেছনেই সক্রিয় রয়েছে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দন ও নিয়ম। স্থান-কালের সীমানা অতিক্রম করে যোগাযোগ, তথ্যানুসন্ধান এবং নিজের ও মানবতার কল্যাণের সকল প্রক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় সব উপাদানই রয়েছে এখানে। আর সবকিছুই থাকে সদা প্রস্তুত অবস্থায়।

মনের বাড়ির দরবারের বাম দিকের কোণায় অবস্থিত দরজা দিয়ে ১০ থেকে ০ গণনা করে অত্যন্ত সুরক্ষিত কমান্ড সেন্টারে প্রবেশ করবেন। সব সময় ১০ থেকে ০ গণনা করে প্রবেশ করবেন। এটি একটি হলঘর। এখানে আপনার জন্যে একটি বিশেষ কমান্ড চেয়ার, অন্তর্গুরুর জন্যে বিশেষ চেয়ার, তিনটি মনিটরিং স্ক্রিন, ডান দিকের কোণায় ‘রহম বলয়’ বা আশীর্বাদ বলয় বা ‘প্লেস অফ ব্লিস’, ডানে একটা বাথটাব, একটি টাইম মেশিন, একটি মহাশূন্য যান, যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং, নিরাময় ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই আপনি প্রথমবার ঠিকঠাক করে নেবেন। অবশ্য এরপরও আপনি প্রয়োজনমতো যেকোনো জিনিস সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারেন।

রহম বলয় হচ্ছে মনের বাড়ির সবচেয়ে শান্তির জায়গা। রহম বলয়কে একটা ক্রিস্টালের খুব সুন্দর গোল হলঘর হিসেবে কল্পনা করতে পারেন। যেখানে সবসময় একটা নীলাভ চমৎকার প্রশান্তির আলো রয়েছে।

আবার যারা একটু ধার্মিক তারা মনে করতে পারেন যে, দুনিয়াতে রহমতের জায়গা হচ্ছে মসজিদ। তারা ওখানে একটা এক গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানিয়ে নিন। একটা গীর্জা বা মন্দির বা কিয়াং বানিয়ে নিন। অর্থাৎ যার যার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে রহমতের জায়গা বানিয়ে নেবেন।

তারপরে আপনার অন্তর্গুরু, মুর্শিদ বা গাইড বা টিচার-তিনি আসবেন। অন্তর্গুরু হচ্ছেন আপনার অন্তরের পথ প্রদর্শক। তাকে কেউ গুরু বলেন, কেউ পীরে কামেল, কেউ মুর্শিদ, কেউ ওস্তাদ বা কেউ বলেন গাইড। যে নামেই

তাকে ডাকুন তিনি হচ্ছেন আপনার ব্যাপারে আন্তরিক পরামর্শদাতা, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী। কমান্ড সেন্টার নির্মাণ করে সবকিছু ঠিকমতো সাজানোর পর ধ্যানের বিশেষ স্তরে অন্তর্গতর আগমন ঘটে।

প্রশ্ন : অন্তর্গত বা মুর্শিদ কে হতে পারেন?

উত্তর : আপনি যাকে মনে করেন যে, যিনি আপনাকে জীবনের পথে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারবেন, তাকেই অন্তর্গত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

তবে যে ধ্যান বা মেডিটেশন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আপনি অনুসরণ করবেন, সে প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক বা প্রশিক্ষককে অন্তর্গত হিসেবে গ্রহণ করা সবসময়ই বেশি কার্যকরী। বাস্তব জীবনে আপনার বিষয় সম্পর্কে গুরুর কোনো জ্ঞান না-ও থাকতে পারে কিন্তু ওই স্তরে তিনি সে বিষয়ে আপনার চেয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। অন্তর্গত সব সময়ই আপনার প্রতি বাবা/ মায়ের মতো স্নেহশীল এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চেয়েও ঘনিষ্ঠ।

প্রশ্ন : অন্তর্গতর দর্শন লাভ কখন ঘটবে? গুরুকে না দেখতে পেলে কি কাজ হবে?

উত্তর : অন্তর্গতকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যত তীব্র হবে তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। কখনো কখনো এই দর্শন এত স্বতঃস্ফূর্ত হয় যে, তা আগে থেকে ধারণা করা যায় না।

আবার কখনো কখনো গুরুর স্পষ্ট দর্শন লাভে সময় লাগে। এমনও হয়েছে তিন বছর নিয়মিত মেডিটেশন করার পর অন্তর্গতর দর্শন লাভ হয়েছে। কারো এক যুগ পরে হয়েছে। তবে অন্তর্গতকে অবলোকন করণ আর না-ই করণ, তাকে অনুভব করাই আপনার জন্যে যথেষ্ট।

অন্তর্গতর সাক্ষাৎ পেতে দেরি হলেও কমান্ড সেন্টারে অন্যের নিরাময় ও কল্যাণ সাধনের কোনো কাজ পরিচালনায় আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আবার অনেক সময় যাকে গুরু হিসেবে কামনা করছেন তার পরিবর্তে অন্য কারো আগমন ঘটতে পারে গুরু হিসেবে। কিন্তু তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তিনিও যথাযথ পথপ্রদর্শক হিসেবেই আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী হবেন।

প্রশ্ন : অন্তর্গত যেহেতু ধর্মীয় পুরুষ হতে পারেন তাহলে নবীজীকে অন্তর্গত করা যাবে কি না।

উত্তর : নবীজী (স) মানব শ্রেষ্ঠ। সকল নবী-রসুলের নেতা। আল্লাহ ছাড়া তাঁর ওপরে আর কোনো জ্ঞানী নেই। আপনি মাত্র ধ্যানের প্রথম স্তরে ঢুকছেন। আত্মিক উত্তরণের স্তর ও ধাপগুলো ধীরে ধীরে এগুতে হবে।

প্রশ্ন : গুরু জীবিত হলে ভালো না মৃত হলে ভালো?

উত্তর : গুরু জীবিত হলেই ভালো। কারণ গুরু যদি মৃত হন তাহলে উনি সবসময়ের জন্যে আলফা লেভেলে চলে গেছেন। তার কোনো কথার ব্যাপারে যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে তবে তার সাথে বিটা লেভেলে আপনি আলোচনা করতে পারবেন না। কিন্তু গুরু যদি জীবিত থাকেন তাহলে প্রয়োজনে বিটা লেভেলেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : গুরুকে কি যেকোনো প্রশ্ন করা যাবে?

উত্তর : যেকোনো সমস্যা থাকুক, যেকোনো প্রশ্ন থাকুক, কমান্ড সেন্টারে গিয়ে গুরুকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন। গুরু ঐ স্তরে আপনার সাবজেক্ট সম্পর্কে আপনার চেয়ে ভালো জানেন। অতএব নিঃসংকোচে গুরুর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তবে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে হবে।

এক হচ্ছে নিজের ইচ্ছাটাকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি চাচ্ছেন যে, গুরু এটা হ্যাঁ করে দিক। গুরু হ্যাঁ করে দেবেন। নিরপেক্ষভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে। তাহলে আপনি সঠিক জবাব পাবেন।

আপনার যেকোনো প্রশ্ন জাগুক কমান্ড সেন্টারে গিয়ে গুরুকে জিজ্ঞেস করবেন এবং জবাবের জন্যে অপেক্ষা করবেন। জবাবটা স্বাভাবিকভাবে মনে মনেই আসবে।

হয়তো বলবেন কোনটা আমার মনের কথা, কোনটা গুরুর কথা এটা বুঝবো কীভাবে? নিয়মিত চর্চা করার পর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, কোনটা আপনার মনের কথা, কোনটা আপনার গুরুর কথা।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টার কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উত্তর : পরিচিত-অপরিচিত যে কারো রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনার পাশাপাশি নিজের কল্যাণ কামনা, নিজের আত্মিক ও মানসিক উন্নতি, বৈষয়িক ও পেশাগত উন্নতি, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড, পারিবারিক ও

দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়নে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেও কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটরা কমান্ড সেন্টার ব্যবহারে ইতোমধ্যেই ব্যাপক সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আসলে কমান্ড সেন্টারে গভীর আন্তরিকতার সাথে আপনি কারো জন্যে কিছু কামনা করলে তা মূলত একাধ্র প্রার্থনার রূপ নেয়। আর আন্তরিক একাধ্র প্রার্থনা অধিকাংশ সময়েই বাস্তব রূপ লাভ করে।

প্রশ্ন : মাদকাসক্তি দূরীকরণে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : কেন যাবে না? এক তরুণ গ্রাজুয়েট—তখন সে রংপুর মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার ছোট ভাই রংপুর মেডিকেল কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বড় ভাই এটা জানার পর নিয়মিত দুইবেলা ছোট ভাইকে কমান্ড সেন্টারে এনে পাশে বসিয়ে মমতা দিয়ে বোঝাতে লাগলো, ভাই, ড্রাগস খাওয়া ভালো না। এক মাস দুই মাস করে ছয় মাস পার হয়ে গেল। কিন্তু কোনো ফল নেই।

বড় ভাই ধৈর্য ও একাধ্রতার সাথে চর্চা চালিয়ে গেল। সাত মাস পার হওয়ার পর ফল ফলতে শুরু করলো। ছোট ভাই যখনই ড্রাগ নিতে যায় তখনই তার মনে হয়—কে যেন কানে কানে বলছে, ভাই ড্রাগস খাওয়া ভালো না। কিছুদিন এরকম মনে হওয়ার পর ছোট ভাই ড্রাগস খাওয়া ছেড়ে দিলো। পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে নিজেকে ভালো ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলো।

প্রশ্ন : টেন্ডার দাখিলে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে? গেলে প্রক্রিয়া কী হবে?

উত্তর : ব্যবসায়িক টেন্ডার দাখিলের জন্যেও কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যায়। আপনি টেন্ডারের সর্বনিম্ন দর কী হবে এটা জানার জন্যে মাঝের মনিটর (২ নম্বর মনিটর) বা স্ক্রিনের ওপর বাম দিকে একটি লাল বাতি এবং ডান দিকে একটি সবুজ বাতি স্থাপন করুন।

ধরুন, আপনি একটি পণ্যের দর দিতে চাচ্ছেন ৪৮০ টাকা। ৪৮০ টাকার কথা চিন্তা করে মনিটরের দিকে তাকান। লাল বাতি জ্বলে উঠলে বুঝবেন এই দর সর্বনিম্ন নয়। তাহলে আশ্তে আশ্তে দর নিচের দিকে নামাতে থাকুন। ৪৭০ টাকা—আবার লাল বাতি জ্বলে উঠলো। বোঝা গেল এতেও চলবে না।

নামাতে নামাতে ৪৪৫ টাকায় যখন এলেন-সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। অর্থাৎ ৪৪৫ টাকা সর্বনিম্ন দর হবে।

একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এক সময় মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়ার পর ঠিকাদারি ব্যবসায় মনোনিবেশ করলেন। একটা বড় অঙ্কের টেন্ডার দাখিল করবেন। ইঞ্জিনিয়াররা একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক বললো। এতে কাজ পাওয়া যাবে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। তিনি মেডিটেশন করলেন এক ঘণ্টা।

মেডিটেশন থেকে উঠে বললেন, দরপত্রের অঙ্ক আরও এক কোটি টাকা বাড়াতে। ইঞ্জিনিয়াররা হা হা করে উঠলো, তাহলে আমরা টেন্ডার পাবো না। তিনি বললেন, আমরাই পাবো। দরপত্র পুনর্বিদ্যমান হলো সেভাবে। তিনিই সর্বনিম্ন হয়ে টেন্ডার পেলেন। লাভ হলো কোটি টাকার ওপরে।

প্রশ্ন : ইন্টারভিউ/ প্রমোশনের জন্যে কি কমান্ড সেন্টার কাজে লাগানো যাবে?

উত্তর : যাবে। চাকরি বা প্রমোশনের জন্যে ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হওয়ার আগে থেকেই খোঁজ নিন কারা ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবেন। পর পর কয়েকদিন পুরো বোর্ডকেই কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। যেভাবে একজন ইন্টারভিউ দেয়, সেভাবে দিন। আপনার দক্ষতা, যোগ্যতা ও আনুগত্য সম্পর্কে বলুন। দেখুন, আপনার উপস্থিতিই তাদেরকে ইমপ্রেস করছে। তারা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আপনার যথাযথ মূল্যায়ন করে আপনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করছেন।

প্রমোশনের ফাইল বসের কাছে আটকে আছে। বসকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। বসের রুমে ঢুকলে আপনি যেমন সুন্দর বিনয়ী আচরণ করতেন, এখানেও তেমনি সুন্দর ব্যবহার করুন।

আপনাকে প্রমোশন দিলে বসের কী লাভ, প্রতিষ্ঠানের কী লাভ তা সুন্দরভাবে তুলে ধরুন। অবলোকন করুন বস আপনার বক্তব্য উপলব্ধি করছেন। আপনাকে প্রমোশনের ফাইল সই করে যথাযথ নির্দেশ দিচ্ছেন। কয়েকদিন অনুশীলন করে বাস্তবে বসের সাথে দেখা করুন।

বিল/ বদলি বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ফাইলের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। তবে আপনার বিল যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে আটকে রাখা হয়ে থাকে তাহলে এ পদ্ধতি কখনো কার্যকর হবে না। শুধুমাত্র অযৌক্তিকভাবে বিল আটকে রাখা হয়ে থাকলেই এ পদ্ধতি কার্যকর হবে।

প্রশ্ন : ভাইভা বোর্ড বা সফল ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : যাবে। ভাইভা পরীক্ষা দেয়ার আগেও ভাইভা বোর্ডে যারা রয়েছেন তাদেরকে কমান্ড সেন্টারে এনে সম্মানের সাথে বসিয়ে সেখানেই আপনি আপনার ভাইভা পরীক্ষা দিতে পারেন। সেখানে দেখুন সম্মানিত শিক্ষকরা সেখান থেকেই প্রশ্ন করছেন যে বিষয়গুলো আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে পড়েছেন আর আপনি চমৎকার উত্তর দিয়ে তাদেরকে মুগ্ধ করছেন।

আপনি একাত্তচিহ্ন হতে পারলে বাস্তবে ভাইভা বোর্ডের সামনে যখন যাবেন, তখন দেখবেন আপনার সবচেয়ে ভালোভাবে পড়া বিষয়গুলো থেকেই তারা প্রশ্ন করছেন। আর আপনি চমৎকার জবাব দিচ্ছেন। যখন ভাইভা দিতে যাবেন রুমে ঢোকার সময় বাম হাতে কোয়ান্টা ভঙ্গি করে মনে মনে নির্ধারিত প্রশ্নগুলো চিন্তা করতে করতে যাবেন।

প্রশ্ন : পাওনা টাকা আদায়ে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : যাবে। কয়েকদিনের মধ্যে ফেরত দিয়ে দেবে বলে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু আর ফেরত দেয়ার নাম নেই—তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। আপনার টাকার প্রয়োজন এটা তাকে জানান। তার যে দেনা শোধ করে দায়মুক্ত হওয়া দরকার সেটাও তাকে বলুন। এক গ্রাজুয়েট দেনাদারের কাছ থেকে এ প্রক্রিয়ায় পাঁচ বছর পর পাওনা টাকা আদায় করেন। দেনাদার নিজেই তার খোঁজ নিয়ে টাকা দিয়ে যায়।

প্রশ্ন : পারিবারিক মতবিরোধ দূর করতে কি কমান্ড সেন্টার কাজ করবে?

উত্তর : অবশ্যই করবে। স্বামী/ স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন, শ্বশুর/ শাশুড়ি, বন্ধুবান্ধব-কারো সাথে মতবিরোধ বা ভুল-বোঝাবুঝি দূর করার জন্যে তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। আপনি যে তাকে কত ভালবাসেন তা বলুন। আপনাদের মারের আনন্দময় স্মৃতির কথা তাকে বলুন।

তারপর আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করুন। অবলোকন করুন, তিনি তার ভুল বুঝতে পারছেন। মমতা ভালবাসায় আপনারা পারস্পরিক একাত্মতা অনুভব করছেন। ক্রমাগত কয়েকদিন এটির পুনরাবৃত্তি করুন।

বাস্তবে আপনি তার সাথে থ্রো-একটিভ আচরণ করুন। দেখবেন চমৎকার ফল পাবেন। যেকোনো পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : রোগীর চিকিৎসা বা অপারেশনে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : অবশ্যই যাবে। পিজির একজন পেডিয়াট্রিক সার্জন সার্জারির ক্ষেত্রে কমান্ড সেন্টারের চমৎকার ব্যবহার করেছেন। তিনি অপারেশনের আগে রোগীর সকল কাগজপত্র দেখে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে রোগীকে এনে অপারেশনের পুরো প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন।

তারপর বাস্তবে ফিরে এসে অপারেশন থিয়েটারে রোগীকে অপারেশন করতেন। আর এতে করে তিনি অপারেশনের সময় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। আগে যে অপারেশন করতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগতো, সে অপারেশন তিনি ৪৫/৫০ মিনিটেই সম্পন্ন করতে পারছেন। আর রোগীর অপারেশনে সময় যত কম লাগে তত দ্রুত সে নিরাময় লাভ করে।

প্রশ্ন : যান্ত্রিক ক্রটি বা তথ্য জ্ঞানার জন্যে কি কমান্ড সেন্টার কাজ করে?

উত্তর : এক্ষেত্রেও আপনি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করতে পারেন। এক দুরন্ত কিশোর-কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কোনো যন্ত্রপাতি হাতের কাছে পেলে সে তা খুলে সবকিছু দেখতে চাইতো। তার দুরন্তপনায় বাবা/ মা সবসময় তটস্থ।

একবার বাবার কম্পিউটার খারাপ হয়ে গেল। সে ভাবলো-বাবাকে সারপ্রাইজ দেবে। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে অন্তর্গতর কাছে জানতে চাইলো কম্পিউটারের অসুবিধা কোথায়। অন্তর্গতর তাকে বললেন, তেমন কিছু হয় নি। এত নম্বর এত নম্বর পার্টস খারাপ। পার্টস দুটো বদলে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। খরচ পড়বে চার/ পাঁচশ টাকা। বাবা বাসায় আসতেই সে বাবাকে বললো, কম্পিউটারের তেমন কিছু হয় নি। এত নম্বর এত নম্বর পার্টস খারাপ। বদলাতে চার/ পাঁচশ টাকা লাগবে।

কথা শুনে বাবা একেবারে গামা লেভেলে। বাবার ধারণা, ছেলে কম্পিউটার খুলেছে। তা না হলে সে পার্টসের নম্বর জানলো কীভাবে। ছেলের আর কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না তিনি। খুব রাগ করলেন।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে দেখানো হলো, তিনিও একই কথা বললেন।

এবার বাবার বিস্ময়ের পালা। ছেলে না হয় কম্পিউটার খুলে পার্টসের নম্বর দেখেছে, কিন্তু এই পার্টস দুটিই যে খারাপ তা সে বুঝলো কীভাবে?

বাবা ছেলের কাছ থেকে সব শুনলেন। ছেলে মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে মামার সাথে কোর্স করেছিলো। কোর্সে অংশ নিয়ে বাবা নিজেই পুরো ঘটনা বলেছিলেন প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে।

প্রশ্ন : দূর দেশে একজন কী অবস্থায় আছে তা দেখার জন্যে কি কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : অবশ্যই যাবে। এমন বহু ঘটনা রয়েছে। এক ছেলে কলকাতায় গেছে। যাওয়ার পরে দুই দিন কোনো খোঁজ নেই। ছেলে, বাবা ও মেয়ে-পরিবারে তিনজনই কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট। মেয়ে ডাক্তার। ছেলে যাওয়ার পর দু'দিন টেলিফোন না করায় বাবা উদ্ভিগ্ন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় মেয়ে এসে বাবাকে উদ্ভিগ্ন দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলো। বাবা কারণ বললেন। মেয়ে বললো, টেলিফোন করে নি তাতে কী? আপনি কমান্ড সেন্টারে গিয়ে দেখুন, ও কোথায় আছে।

বাবা মাগরিবের নামাজ পড়ে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থান দেখার চেষ্টা করতেই কোলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এলো। ছেলে সিনেমা হলে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন, শিগ্গিরই টেলিফোন করতে।

ওদিকে সিনেমা দেখতে দেখতেই ছেলের মনে পড়লো বাড়িতে টেলিফোন করা হয় নি। হল থেকে বেরিয়েই ছেলে বাবাকে টেলিফোন করলো। বাবা টেলিফোন ধরে ছেলের কণ্ঠস্বর শুনেই জিজ্ঞেস করলেন, সন্ধ্যায় তুই অমুক সিনেমা হলে ছিলা? ছেলে তো বিস্মিত! বাবা জানলো কীভাবে? বাবা তাকে বললেন, কমান্ড সেন্টারে তিনি তাকে সিনেমা হলে ঢুকতে দেখেছেন।

এভাবে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু নিয়ত খারাপ করবেন না। স্ত্রীকে বাসায় রেখে এসেছেন। স্ত্রী বাসায়ই আছে না পাশের বাসায় গিয়ে গল্প করছে একটু দেখে নিই। অথবা স্বামী বলেছে যে, আজকে অফিস আওয়ারের পরে বিজনেস মিটিং আছে। এখন বিজনেস মিটিংই চলছে, না কোনো সিটিং চলছে একটু দেখে নিই। নিয়ত যদি তা-ই থাকে, আপনি কিছুই দেখবেন না।

অর্থাৎ কাউকে ছোট করা, অপদস্থ করা, হেয় করার যদি কোনো চিন্তা

থাকে আপনি কিছুই দেখবেন না। এই জ্ঞানকে, এই শক্তিকে সবসময় কল্যাণে ব্যবহার করবেন। কাউকে হেয় করার জন্যে নয়।

প্রশ্ন : ভিসা লাভের জন্যে কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : অবশ্যই যাবে। হাজার হাজার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ব্যবহার করছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা একটি পশ্চিমা দেশের ভিসা নিতে যাবেন। রাতে কমান্ড সেন্টারে দেখলেন, লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কাউন্টারে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। তাকে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই ভিসা দিয়ে দিচ্ছে। পরদিন সকালে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। কাউন্টারে দেখেন অন্য পুরুষ, অন্য মহিলা কাজ করছেন। তিনি একটু বিব্রতবোধ করলেন। লাইন এগুচ্ছে। শিক্ষিকার সামনে এখন মাত্র একজন। এ সময় পালা বদল হলো। যারা কাজ করছিলেন তাদের বদলে অন্য দুজন এসে কাউন্টারে বসলেন। শিক্ষিকা বিস্মিত হয়ে দেখলেন, কমান্ড সেন্টারে যাদের দেখেছিলেন, এরা তারাই। শিক্ষিকা কাউন্টারে পৌঁছার পর এরা শুধু পাসপোর্ট দেখলেন, মৃদু হাসলেন। পাসপোর্ট রেখে বললেন, বিকেলে ভিসা নিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : আধ্যাত্মিক সাধনায় কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর : অবশ্যই। যারা আত্মিক-আধ্যাত্মিক উন্নতি চান, তাদের সাধনার এক চমৎকার জায়গা কমান্ড সেন্টার। কমান্ড সেন্টারে গিয়ে রহম বলয়ে বসে অন্তর্গুরুর সাথে একাত্ম হয়ে ইসমে আজম বা মহানাম জপ করুন, দোয়া দরুদ পড়ুন, বীজমন্ত্র বা হরিনাম জপ করুন, পরম প্রভুর আরাধনা করুন অর্থাৎ আপনি আপনার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে স্রষ্টায় নিজেকে নিবেদিত করুন, প্রার্থনা করুন। এক আলাদা অনুভূতি ও অনুভবের জগতে প্রবেশ করবেন আপনি। তবে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে হলে একজন আলোকিত গুরু, মুর্শিদ বা গাইডের কাছে বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন। বায়াত বা দীক্ষা গ্রহণ ছাড়া নিজে নিজে আধ্যাত্মিক সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যেকোনো সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে পর্দায় যাকে দেখতে চেয়েছি যদি তাকে স্পষ্ট দেখতে না পাই, তাহলে এটা কি কোনো সমস্যা?

উত্তর : এটা কোনো সমস্যা না। ধীরে ধীরে আপনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন। প্রথমে অনুভব করতে চেষ্টা করুন। তবে জোর করে চেষ্টা করবেন না। মনের ওপর ছেড়ে দিন। মনের পর্দায় ছবি আসতে দিন। সময় নিয়ে অপেক্ষা করুন। ধীরে ধীরে ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একসময় স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন : এমন কখনো হয় কি-তথ্য প্রদানকারী যে ঠিকানা দিলো, সেই ঠিকানায় সে ব্যক্তি উপস্থিত নেই, অন্য কেউ থাকলো। আমি সেই ঠিকানায় অন্য কাউকে দেখলাম, তখন কী হবে?

উত্তর : এরকম হতে পারে যখন লেভেলটা ঠিক হয় না। তবে আপনার লেভেল যদি ঠিক থাকে, আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, এ সেই ব্যক্তি নয়। আপনি তখন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে পারবেন।

প্রশ্ন : দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কি আলফা লেভেল বা মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করতে পারবো?

উত্তর : আসলে ছোটখাটো সিদ্ধান্তের জন্যে কমান্ড সেন্টার ব্যবহারের দরকার নেই। যেমন, আমি ভাত খাবো না রুটি খাবো, মায়ের সাথে কথা বলবো না বাবার সাথে কথা বলবো-এ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কমান্ড সেন্টারকে ব্যবহার করতে হলে এটা মশা মারতে কামান দাগানোর মতোই হাস্যকর হয়ে যাবে।

আসলে ছোটখাটো ব্যাপারেও যদি মেডিটেশন লেভেলে গিয়ে সমাধান পেতে হয়, তাহলে জীবনের জটিলতা বাড়বে বৈ কমবে না। মেডিটেশনকে ব্যবহার করবেন বড় কিছুর জন্যে, বড় প্রাপ্তির জন্যে। ছোটখাটো ব্যাপারে সাহায্য নেবেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্ঞার। আর প্রজ্ঞার এ শক্তি তত শাণিত হবে যত আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করবেন।

প্রশ্ন : নিজের মধ্যে কষ্ট থাকলে শান্তির জন্যে কমান্ড সেন্টারে যাওয়া যাবে?

উত্তর : যখনই কোনো কষ্ট অনুভব করবেন-কমান্ড সেন্টারে চলে যাবেন। গুরুত্ব সাথে রহম বলয়ে গিয়ে বসবেন, আচ্ছামতো কাঁদবেন। কাঁদলে কষ্ট বেরিয়ে যায়। আল্লাহর কাছে কাঁদবেন-আল্লাহ, আমি তো দুনিয়াতে নিজের ইচ্ছায় আসি নি। তুমি পাঠিয়েছো। এখন কষ্ট দূর কর। তুমি সর্বশক্তিমান। রাখলে রাখতে পারো, মারলে মারতে পারো। তুমি কষ্ট দূর করে দাও।

আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন, দেখবেন যে, আলাদা একটা শান্তি পাচ্ছেন। ওখানে বসে একটু দোয়া-দরুদ পড়ুন। হরিনাম জপ করুন। অর্থাৎ যার যার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে ঐখানে গভীর স্তরে গিয়ে প্রভুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন। দেখবেন, আলাদা তৃপ্তি পাচ্ছেন, আলাদা শান্তি পাচ্ছেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টার কি শুধু শারীরিক সমস্যা সমাধানের জন্যে? তাতে কি ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক কোনো সমস্যা সমাধান করা যাবে?

উত্তর : অবশ্যই যাবে। যে সমস্যার ব্যাপারেই আপনি মনে করছেন যে গুরুর কাছে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করবেন। ধরুন, আপনি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না এটা আপনার জন্যে ভালো হবে না খারাপ হবে। আপনি গুরুকে জিজ্ঞেস করুন অথবা আপনার ওখানে যে স্ক্রিন আছে। তার ওপরে দুটো বাব্ব লাগিয়ে নিন। একটা সবুজ, একটা লাল।

প্রশ্ন করুন। যদি লাল বাতি জ্বলে ওঠে তার মানে এর মধ্যে আপনার কোনো মঙ্গল নাই। আর যদি দেখেন যে সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে, তার মানে গ্রিন সিগনাল। অর্থাৎ ইঙ্গিত শুভ।

এটা আপনি নিজের জন্যে ও পারিবারিক যেকোনো সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করতে পারেন। যন্ত্র আপনাকে দিয়ে দেয়া হলো। কীভাবে ব্যবহার করবেন এটা আপনার ওপরে। শুধু খেয়াল রাখবেন সবসময় যে, আপনার উদ্দেশ্য, নিয়ত যেন ঠিক থাকে। নিয়ত যেন মানব কল্যাণের অভিসারী হয়।

প্রশ্ন : যা চাই তা স্পষ্ট। কিন্তু কীভাবে কাজ করতে হবে তা বুঝি না। এক্ষেত্রে আমাকে কী করতে হবে?

উত্তর : কমান্ড সেন্টারে যাবেন এবং অন্তর্গুরুকে জিজ্ঞেস করবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে কি চেনা-অচেনা মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব?

উত্তর : চেনা কারোর অতীত তো আপনি জানেনই। তারটা আর কমান্ড সেন্টারে গিয়ে জানার দরকার কী? কমান্ড সেন্টারে গিয়ে তো আপনি জানবেন যাকে আপনি চেনেন না, যাকে আপনি জানেন না। যার কথা কোনোদিন শোনেন নি। তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ অনেক কিছুই জানা সম্ভব। তবে নিয়ত ঠিক রাখবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-এই তিনটা স্ক্রিন থাকবে। অতীতের ঘটনা অতীতেই থাকবে, বর্তমানের মধ্যে টানা যাবে কি?

উত্তর : ওখানে যখন কোনো ঘটনা দেখবো তখন অতীতেরটা অতীতে, বর্তমানেরটা বর্তমানে, ভবিষ্যতেরটা ভবিষ্যতে দেখবো। কমান্ড সেন্টারে আমরা একেক সময়ের ঘটনা একেক স্ক্রিনে দেখবো। ঘটনার কাল পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে স্ক্রিনটাকে বদলে নেবো।

প্রশ্ন : কোনো প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ জানা ও কল্যাণ কামনার বিষয়টি কীভাবে করবো? আমি কি তার সুন্দর ও মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ চিন্তা করবো, না প্রকৃতই তার ভবিষ্যৎ স্ক্রিনে ভেসে উঠবে?

উত্তর : দুটোই। আপনি যদি শুধু ভবিষ্যৎ জানতে চান তাহলে তার প্রকৃত ভবিষ্যৎ ভেসে উঠবে আর যদি তার মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ চান সেটাও আপনি কমান্ড সেন্টারে কামনা করতে পারেন। আপনি ডান পাশের স্ক্রিনে দেখবেন কল্যাণময় ভবিষ্যতে তার জীবনের অবস্থাকে। দুটোই আপনি করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমার যখন মন চায় তখনই কি কমান্ড সেন্টারে যেতে পারবো?

উত্তর : আপনার কমান্ড সেন্টার, যখন মন চাইবে যাবেন, কে আপনাকে আটকাবে? তবে যেতে হবে নিয়মমতো।

প্রশ্ন : প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশনে একবার কমান্ড সেন্টারের মেডিটেশন করা কি বাঞ্ছনীয়?

উত্তর : দিনে দুবেলা মেডিটেশনের একবার কমান্ড সেন্টারে যাবেন। ইচ্ছে করলে দুবারও যেতে পারেন। শিথিল প্রক্রিয়ায় একবার শিথিলায়ন করণ, মনের বাড়িতে যান, তারপর সেখান থেকে কমান্ড সেন্টারে চলে যান।

যারা ধ্যানের আরো গভীরে যেতে চান তাদের জন্যে দুবেলা মেডিটেশনেই কমান্ড সেন্টারে যাওয়াটা ভালো। তাতে করে গুরুত্ব সাথে আপনার যোগাযোগ ভালো হবে, গুরুত্ব সাথে সম্পর্ক ভালো হবে।

প্রশ্ন : আমি একজনের দোষ দেখতে চেয়েছিলাম কমান্ড সেন্টারে। তারপর কমান্ড সেন্টারে কাউকেই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই না, এখন আমি কী করবো?

উত্তর : এখন তওবা তওবা করা ছাড়া, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া ছাড়া আপনার কিছু করার নেই। আমাদের প্রথম দিন যেদিন কমান্ড সেন্টারের আলোচনা করি, সেদিন আমরা বলে দেই কাউকে অপদস্থ করার জন্যে, হেয় বা ছোট করার জন্যে কিছু দেখতে যাবেন না।

যেহেতু খারাপ নিয়তে দেখতে গিয়েছেন, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। আপনি এখন আল্লাহর কাছে মাফ চান, যার দোষ দেখতে চেয়েছিলেন তার কাছে গিয়েও মাফ চাইবেন।

প্রশ্ন : যাকে ভালবাসি তার সাথে বিয়ে হবে কি না-এটা কি কমান্ড সেন্টারের কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা আমার জন্যে অন্যায় হবে?

উত্তর : অন্যায় কেন হবে? আপনি অন্তর্গতকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। তবে আবেগকে প্রশ্রয় দেবেন না। জোর করে ইতিবাচক জবাব চাইতে যাবেন না।

প্রশ্ন : আমি যদি জানতে চাই-অমুক আমার সম্বন্ধে কী ভাবেন? কী ধারণা করেন? জানতে পারলে আমি তার সাথে চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো। সেটা কি সম্ভব?

উত্তর : অবশ্যই সম্ভব। যদি উদ্দেশ্যটা সৎ হয়। উদ্দেশ্যটা যদি হয় তার সাথে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা-অবশ্যই সম্ভব এবং আপনি তা বুঝতে পারবেন। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি হয় অমুকের ধারণাটা জেনে নিই তারপরে তাকে বেকায়দায় ফেলে দেবো, তাহলে সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটি হবে-অমুকের সাথে আমি সম্পর্ক উন্নয়ন করবো। তাতে আমারও কল্যাণ হবে তারও কল্যাণ হবে, তাহলে এটা সম্ভব।

প্রশ্ন : সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে ব্রেনে মেসেজ পাঠানোর উদাহরণ দিলে ভালো হয়। মুখে বলবো না কাগজে লিখে মগজে রাখবো?

উত্তর : আপনি যদি কম্পিউটারে এক্সপার্ট হন, আপনার কথাগুলো তার মগজে একেবারে কম্পিউটারের মেমোরি কার্ড বানিয়ে ঢুকিয়ে দিন বা কাগজে লিখে ওটা একেবারে ব্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। আর আপনার যদি বলতে ভালো লাগে, তাকে পাশে বসিয়ে সুন্দর করে বলতে থাকুন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে আমার চাওয়া কতদিনে কার্যকরী হবে? কতদিন প্রোগ্রামিং করতে হবে? ভালো চাইতে গিয়ে যদি মন্দ হয় তাহলে কী করবো?

উত্তর : কমান্ড সেন্টারে আপনি আপনার চিন্তা ও কল্পনাকে যত একাগ্রতার সাথে করবেন, তত কার্যকর হবে। কতদিন করতে হবে? দিনের সীমা নির্ধারণ করা যাবে না। যতদিন পর্যন্ত ঠিক না হচ্ছে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধৈর্যটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

একটা ঘটনা—একজন চাচ্ছিলেন যে, তিনি যেন আরেকটা ভালো বাড়িতে যেতে পারেন। ভালো বাড়িতে যাওয়ার কল্পনা করতে করতে যেখানে ছিলেন সে আশ্রয় থেকেও বিচ্যুত হয়ে গেলেন।

তিনি সাংঘাতিকভাবে ভেঙে পড়লেন। বললেন যে, আমি একটা ভালো আশ্রয় চাচ্ছিলাম। আমার বর্তমান আশ্রয় যা-ই থাকুক, একটা ছিলো। সেটাও হারাতে বসলাম! আমি তাকে বললাম, এই বের হওয়াটাই ঐ ভালো জায়গায় যাওয়ার আগের অবস্থা। মেডিটেশন করতে থাকুন।

তা-ই হলো। এরপর তার যেখানে যাওয়ার সুযোগ হলো, সেটা দেখা গেল আরো ভালো জায়গা এবং ওভাবে আশ্রয়চ্যুত না হলে নতুন এই জায়গায় তার হয়তো যাওয়া হতো না।

কাজেই অনেক সময় প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে দেখা যেতে পারে যে, বর্তমান যা ছিলো তা-ও গেল। কিন্তু তাতে চিন্তিত হবেন না। কারণ আমরা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে শিখেছি। আমাদের হৃন্দকে প্রকৃতির হৃন্দে হৃন্দায়িত করতে শিখেছি। এখন যা হবে আমাদের মঙ্গলের জন্যেই হবে।

প্রশ্ন : আমি সবক্ষেত্রেই নিজের মতো করে সম্পর্ক নির্ধারণ করি। কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে না। সে সবক্ষেত্রে আমার চেয়ে আরো বড়। জানি, তার মানসিক শক্তি বা মেডিটেশনের শক্তি আমার চেয়ে বেশি। তার ক্ষেত্রেও যেন আমি নিজের মতো করে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারি তার জন্যে কী করবো?

উত্তর : এই বক্তব্যটাই পাল্টে দিন। এখন থেকে ভাববেন আপনার শক্তি বেশি। আপনার মেডিটেশনের ক্ষমতা বেশি। আপনি তাকে ভালবাসেন, তার মঙ্গল কামনা করেন, অতএব তার ব্যাপারে আপনার চাওয়া বাস্তবায়িত

হওয়ার সুযোগও বেশি। মেডিটেশনে এটাই ভাববেন যে, আমি আমার স্বামীর মধ্যে এই এই পরিবর্তন দেখতে চাই, যদি তা আমাদের জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কল্পনা করবেন যে, আপনার স্বামীর মেডিটেশনের পাওয়ার বেশি বা মনের শক্তি বেশি ততক্ষণ আপনি তাকে প্রভাবিত করতে পারবেন না। কারণ আপনি প্রভাবিত হয়ে বসে আছেন।

আপনি যখন এটাকে পাল্টে দেবেন যে, না, আমার শক্তি বেশি এবং আমি যা চাই এটা আরো বেশি কল্যাণকর। আর স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে সবসময় মেডিটেশন এটাই হওয়া উচিত যে, আমার স্বামীর এই পরিবর্তন আমি চাই যদি তা আমাদের দুজনের জন্যেই মঙ্গলজনক হয়। কারণ আপনি যে পরিবর্তনটা চাচ্ছেন এমনও হতে পারে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না এটা আপনার স্বামীর জন্যে ক্ষতিকরও হতে পারে।

অতএব মেডিটেটিভ লেভেলে যখন যাবেন, সবসময়ই বলবেন আমার স্বামী এবং আমার-দুজনেরই যদি এতে মঙ্গল হয় তাহলে তার মধ্যে এই এই পরিবর্তন চাচ্ছি। তাতে দুজনেরই মঙ্গল হবে। দুজনেই সুখী হবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার পরও আমি চারপাশের সবকিছু অনুভব করি, বিস্তারিত একটু বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : এখন এটা অনুভব করছেন, আস্তে আস্তে অনুভব করবেন না। যত একাগ্রতা বাড়বে ততই মেডিটেশনে বেশি নিমগ্ন হতে পারবেন।

আপনারা জানেন, একবার হযরত আলী (রা)-এর পায়ে তীর বিঁধে গেল। কেউই তীর খুলতে সাহস পাচ্ছিলো না। কাছেও যেতে সাহস পাচ্ছিলো না, তখন রসূল (স) সাহাবীদের বললেন যে, তোমরা অপেক্ষা কর। আলী যখন নামাজে সেজদায় যাবে তখন তীরটা খুলে নিও।

উনি নামাজে দাঁড়ালেন, সেজদায় গেলেন। তীর খুলে নেয়া হলো, উনি টেরই পেলেন না। যখন আমাদের মনোযোগটা সেরকম একাগ্র হবে, তখন দেখবেন যে, আশেপাশের কিছু টের পাচ্ছেন না। এটা আস্তে আস্তে হবে, একদিনে হবে না। আপনি যে কমান্ড সেন্টারে যেতে পারছেন এটাই আপনার বড় অর্জন এবং আস্তে আস্তে আপনি আরো গভীরে যেতে পারবেন।

প্রশ্ন : কেউ আমাকে লিড করলে চলতে সুবিধা হয়। কমান্ড দিতে পারি না। এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত? উত্তরণই বা ঘটবে কীভাবে?

উত্তর : যৌক্তিক যেকোনো কথা-এটা মানা উচিত। কিন্তু কারো অযৌক্তিক কথা মানার প্রয়োজন নাই। সবসময় বিনয়ের সাথে পরিস্থিতিকে সামলে নেবেন। আপনি মনের বাড়িতে যাবেন, দেখবেন যে, কারো যৌক্তিক কমান্ড চমৎকারভাবে অনুসরণ করছেন।

আবার আপনি নিজেও অন্যদেরকে যৌক্তিক কমান্ড করছেন। মনের বাড়িতে কমান্ড করতে করতে অভ্যস্ত হোন, দেখবেন যে, বাইরেও কমান্ড করতে পারবেন। দেখবেন যে, যারা খুব ভালো অভিনেতা বা খেলোয়াড় তারা যে খেলাটা তাদের দরকার বা যে অভিনয়টা করা দরকার, চোখ বন্ধ করে রিহার্সেল করে ফেলেন।

মনের চোখে দেখুন যে, তিনি কীভাবে ডায়লগ থ্রো করছেন, কীভাবে অঙ্গভঙ্গি করছেন, কীভাবে শটটি খেলছেন। আপনিও-কীভাবে কমান্ড করলে সুবিধা হয় সেটা মনছবিতে দেখবেন তারপরে করবেন। অবশ্যই এটা সম্ভব।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার পর কোমর ও পায়ের মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভূত হয়। দুদিন পরে ঠিক হয়ে যায়। এর কারণ ও প্রতিকার কী?

উত্তর : আসলে ব্যথার পুরোটাই হচ্ছে মানসিক। কারণ আপনি বসে আছেন। যদি কমান্ড সেন্টার ছাড়া অন্য সেন্টারে আপনার কোমর ব্যথা, পা ব্যথা না হয় তো কমান্ড সেন্টারে হবে কেন?

আসলে অবচেতন মনে হয়তো এক ধরনের বাধা কাজ করে কমান্ড সেন্টারে যাওয়ার ব্যাপারে। এই বাধাই কোমর ব্যথা এবং পা ব্যথারূপে দেখা দেয়। অবচেতন মনের এই বাধাটাকে দূর করে ফেলুন। কমান্ড সেন্টারে যাওয়া আসলে খুব ভালো একটি কাজ। কমান্ড সেন্টার হচ্ছে আপনার মেডিটেশনের গভীরতর অবস্থা।

ধ্যানের বিভিন্ন স্তর আছে। অনুশীলন চালিয়ে গেলে ধাপে ধাপে তা আরো বুঝতে পারবেন। আর ধাপ অতিক্রম না করে গভীর স্তরে যদি যান, তো ধ্যানের সত্যিকার স্বাদ আপনি কখনো পাবেন না।

যখনই ব্যথা অনুভব করবেন, বুঝতে হবে যে, আপনাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়ার জন্যে আপনার ভেতরের কোনো নেতিবাচকতা কাজ করছে।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব প্রয়োজন আছে কী?

উত্তর : অনেক সময় মনে হবে যে আপনি অনেক কিছু বুঝতে পারছেন না, অথবা একটা বিষয় নিয়ে আপনার ভেতর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে তখন সেটা সমাধানের জন্যেই গুরু প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আমরা তো আপনাকে গুরু মনে করে ক্লাস করছি। আবার কমান্ড সেন্টারে গুরু কেন?

উত্তর : ঐ যে যখন আমি সশরীরে আপনার কাছাকাছি থাকবো না। সবসময় তো আর আমাকে পাচ্ছেন না। এজন্যে কমান্ড সেন্টারে গুরু। রাত্রি বারোটার সময় মনে হলো যে, এই প্রশ্নের তো একটা সলিউশন দরকার। তখন আমাকে পাবেন কোথায়? সেই জন্যেই অন্তর্গুরু।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে আমি যে গুরুকে চেয়েছিলাম তাকে পাই নি। তাকে পেলে আমি এর চেয়েও বেশি লাভবান হতাম বলে আমার ধারণা। তাই প্রথম গুরুকে কি বদলানো যায়?

উত্তর : প্রয়োজন নাই। ঐ গুরুকে পেলে যা পেতেন এই গুরুর কাছ থেকে তা-ই পাবেন। তারপরও আপনি ইচ্ছা করলে বদলাতে পারেন। তবে বদলানোর ব্যাপারেও প্রক্রিয়া রয়েছে। সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে যে গুরুকে চেয়েছিলাম তার ছবি কোনোদিন দেখি নাই। অথচ অন্য এক গুরু বার বার আসছিলো যাকে আমি চাচ্ছিলাম না। ছবিতে দেখেছি শেষে গুরু আবছা অবস্থায় রয়েছে। এখন কী করতে পারি?

উত্তর : গুরুকে সবসময় ওয়েলকাম করা উচিত, যিনিই আসুন। আপনি যে তাকে চাচ্ছেন না, এ জন্যে গুরু একটু অভিমান করেছেন। এরপরে মেডিটেশনে যান। বাবা-মায়ের অভিমান আর কতক্ষণ থাকে। গিয়ে বলুন যে, গুরু, তুমি যখন এসেছো, তোমাকেই আমি চাই। তুমিই আমার গুরু। দেখবেন যে, অভিমান চলে গেছে। তখন আর আবছা অবস্থায় দেখবেন না, স্পষ্টই দেখবেন।

প্রশ্ন : অন্তর্গুরুর চেহারা প্রতিদিন বদলাতে থাকা বা একেক দিন একেক গুরু দেখা কি ভালো লক্ষণ?

উত্তর : একেক দিন একেক গুরুতে কী হবে? গাজন নষ্ট হয়ে যাবে। গুরু একজনই থাকা উচিত। মনের স্থিরতা এলেই গুরুর চেহারা স্থির হবে।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে আপনাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। কী করবো?

উত্তর : বোঝা যাচ্ছে, ভালোভাবে শিথিল হতে পারছেন না। ৪০ দিন নিয়মিত শিথিলায়ন করুন। কোয়ান্টায়ন করুন। ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে গুরু কি সবসময় থাকছেন? না কি যতবার যাবো ততবার তাকে আহ্বান করতে হবে?

উত্তর : আপনি যাওয়ার আগেই অন্তর্গুরু কমান্ড সেন্টারে পৌঁছে যাচ্ছেন। আপনি যখন যাবেন, যতবার যাবেন, দেখবেন যে, গুরু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড বই পড়ে জানতে পারলাম, মেডিটেশনের যিনি উদ্ভাবক, অন্তর্গুরু হিসেবে সবসময় তাকে নির্বাচন করা বেশি কার্যকর। কিন্তু আমি কোর্স করার সময় এটা জানতাম না। তাই অন্তর্গুরু আরেকজনকে নির্বাচন করেছি। তিনি কমান্ড সেন্টারে এসেছেন কিন্তু কোনো কথা বলছেন না। অন্তর্গুরু পরিবর্তন করা যায় কি?

উত্তর : যাবে। কোর্সে যখন অন্তর্গুরুর মেডিটেশন হয়, আপনি এসে অন্তর্গুরু পরিবর্তন করে নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : গ্রাজুয়েশন কোর্স করেছি দুবছর হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কোনো অন্তর্গুরু দেখি না। সাইকি কোর্স করেছি। সেখানেও কিছু দেখতে, শুনতে বা অনুভব করতে পারি নি। এক্ষেত্রে সাকসেসফুল হওয়ার উপায় কী?

উত্তর : দেখা পাবেন, কেন পাবেন না? বিশ্বাসকে প্রবল করুন। ‘একবার না পারিলে দেখ শতবার।’ আপনি লেগে থাকুন, কেন পাবেন না? আরে, গুরু উঠে এসে আপনার সাথে দেখা করবেন।

কিন্তু লেগে থাকতে হবে এবং দেখার জন্যে নিজের মেডিটেশনের

পাওয়ারটাকে বাড়াতে হবে। এজন্যে দরকার নিয়মিত শিথিলায়ন। মনকে যত স্থির করতে পারবেন অন্তর্গুরুর অনুভূতি ততই পরিষ্কার হতে থাকবে। এর পাশাপাশি ভিজুয়ালাইজেশন চর্চা করতে পারেন।

আপনার যিনি গুরু তার একটা ছবি নিন সামনে। চোখ মেলে ছবিটা দেখুন, তারপর চোখ বন্ধ করুন। চোখ বন্ধ করেই ছবিটা দেখুন। আবার চোখ মেলে দেখুন। আবার চোখ বন্ধ করে দেখুন। কেন ভিজুয়ালাইজ হবে না? চর্চা করতে থাকুন। অবশ্যই মেডিটেশনে গুরুকে দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন : অন্তর্গুরুর কথা বলেন না। তার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উপায় কী?

উত্তর : বাস্তব গুরু যখন অন্তর্গুরু হন, তখন গুরুর দিক-নির্দেশনা যত অনুসরণ করবেন, তত গুরুর সাথে সম্পর্ক ভালো হবে। দেখবেন, গুরু গুপ্তু কথাই বলবেন না, জিজ্ঞেস না করলেও বলে যাবেন, গুরুর আশ্রয় বেড়ে যাবে। অনেক সময় ছেলে-মেয়েরা বাবাকে ফোন করে না। বাবা তখন নিজেই খোঁজ নেন। তেমনি গুরুও নিজে আপনার খবর নেবেন। গুরুর নির্দেশ অনুসরণ না করে যত কমান্ড সেন্টারে গিয়ে গুরুকে নজরানা দেন না কেন, কোনো লাভ নেই।

প্রশ্ন : যখন কোনো কাজের ফলাফল সম্পর্কে গুরুকে জিজ্ঞেস করি তখন গুরু যা বলেন বাস্তবতা অনেক সময় সঠিক হয় না। কিন্তু দেখা যায় সে কাজটির ফলাফল সম্পর্কে আমার মন যা বলছে তা প্রায়ই সঠিক হয়। এ নিয়ে আমি কনফিউশনে আছি। এজন্যে কমান্ড সেন্টারে কেউ কিছু দেখতে দিলে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি যদি তা ঠিক না হয়। এক্ষেত্রে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তর : আসলে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তিটা খুব দুর্বল। আপনি নিজেই সংশয়াচ্ছন্ন। এ সংশয় থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে আসতে পারছেন, গুরুর কাছ থেকে সঠিক উত্তর পাবেন না। কারণ আপনি নিজেই গুরুর ব্যাপারে কনফিউজড। বিশ্বাসকে প্রগাঢ় করবেন। কোনো সংশয়কে নিজের মধ্যে আসতে দেবেন না। তাহলেই আপনি সঠিক উত্তর পাবেন।

প্রশ্ন : প্রজ্ঞার মেডিটেশনে অন্তর্গুরুকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় তার যেসব উত্তর পাওয়া যায় সবসময় কি তা-ই সঠিক হয়? কারণ অনেক সময় তার সাথে বাস্তবতার কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

উত্তর : একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন যে, গুরুর কাছ থেকে কী উত্তর পাওয়া যাবে তা সবসময় নির্ভর করবে আপনার মেডিটেটিভ লেভেলের ওপরে। আপনার শিথিলতার স্তরের ওপরে। আপনার লেভেল যত ভালো হবে, গুরুর উত্তর তত সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন।

মনের স্থিরতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, মোবাইলে যখন নটেওয়ার্কে ডিসটার্ব হয়, তখন কী হয়? কিছু কথা আপনি শোনেন, কিছু শোনেন না। এখন না শুনেই, না বুঝেই আপনি যদি হ্যাঁ-হ্যাঁ করতে থাকেন, আর পরে এমন কিছু করে ফেলেন যা করার কোনো কথাই না, তখন এটা কার দায়?

যদি আপনার লেভেল ঠিক থাকে, আপনি অবশ্যই সঠিক উত্তর পাবেন। আর যদি লেভেল ঠিক না হয়—উত্তর তো ঠিক আছে, কিন্তু আপনি হয়তো ভুল শুনলেন বা আংশিক শুনলেন। যত নিয়মিত মেডিটেশন করবেন, যত লেভেল ঠিক হতে থাকবে, তত উত্তর ঠিক শুনতে থাকবেন।

প্রশ্ন : গুরু-দর্শন ঠিকমতো হলো না। দোষ কি আমার? এই মেডিটেশন কি রিপিট করা দরকার?

উত্তর : ঠিকভাবে গুরু-দর্শন না হলেও একটা আবছা রূপ তো দেখেছেন। সেই আবছা রূপটাই আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। অতএব কোনো রিপিটেশন এর দরকার নাই। কমান্ড সেন্টারে যাবেন এবং কামনা করবেন যে, গুরুকে স্পষ্টভাবে দেখতে চাই। দেখবেন যে, গুরুকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন।

প্রশ্ন : গুরুর সান্নিধ্য ভক্তকে গুরুর নির্দেশ অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে। কোনো কোর্স বা অনুষ্ঠান ছাড়া আপনার সান্নিধ্য পাওয়া যায় না। সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যখনই কমান্ড সেন্টারে যাবেন, মেডিটেশনে বসবেন, তখনই গুরুকে অনুভব করবেন। ভেতরে বিশ্বাস ভালবাসা মমতা যত থাকবে, তত গভীরভাবে আপনি গুরুকে অনুভব করতে পারবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে কোনো পরামর্শের জন্যে অন্তর্গুরুর কাছে জানতে চাইলে গুরু কীভাবে বলবেন আর আমি কীভাবে শুনবো—বিষয়টা আমার কাছে একদম পরিষ্কার না। আমি কি কল্পনায় বুঝে নেবো?

উত্তর : আসলে গুরুও মনে মনে বলবেন, আপনিও মনে মনে শুনবেন। অর্থাৎ গুরুর সাথে যে কথা হচ্ছে সেটা ভেতরে কথা হচ্ছে। মনের ভেতরে কথা যেভাবে হয় সেভাবেই হবে।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে কার কমান্ড কার্যকর হবে-আমার না গুরুর?

উত্তর : চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। আপনি যেটা বুঝতে পারছেন না সেটার জন্যেই তো গুরুকে জিজ্ঞেস করছেন। অতএব গুরুকে জিজ্ঞেস করার পরে আপনার আর কোনো কমান্ড বলে কিছু থাকছে না। গুরু যা বলছেন সেটাই হচ্ছে আপনার জন্যে করণীয়।

প্রশ্ন : উত্তর পাওয়ার পরও একই প্রশ্ন কি পর পর দুই বার অর্থাৎ পর পর দুই মাসে প্রজ্ঞার মেডিটেশনে জিজ্ঞেস করা যায়?

উত্তর : আহাম্মক ছাড়া একই প্রশ্ন দুইবার কেউ করে না। কোনো বুদ্ধিমান মানুষই একই প্রশ্ন দুই বার করাকে পছন্দ করেন না। গুরুও স্বাভাবিকভাবেই তা-ই। এক প্রশ্ন, একবার উত্তর হলো। হয়ে গেল।

কিন্তু উত্তর পাওয়ার পর নিজের মনমতো হলো না, অতএব আবার গুরুকে প্রশ্ন করলেন। গুরু আপনার মনমতো উত্তর দিয়ে দিলেন। যে যাহ, তুই যখন এটা শুনতে চাচ্ছিস, যা শোন।

নিজের মনমতো উত্তর চায় শুধুমাত্র বোকারা এবং গুরু সবসময় বোকা থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। কারণ বোকার গুরু কেউ হতে চায় না। ক্লাসে যে ভালো ছাত্র হয়, সবাই কিন্তু তার টিচার হতে চায়-‘আমার ছাত্র অমুক, আমার ছাত্রী অমুক’। কিন্তু ক্লাসে যে লাভু পায় তাকে কোনো টিচারই দাবি করেন না যে, দেখ, সে আমার ছাত্র বা ছাত্রী। অতএব দুইবার কোনো প্রশ্ন করবেন না এবং নিজের মনমতো উত্তর কখনো প্রত্যাশা করবেন না।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে গুরুকে জোর করে উত্তর বের করতে হয়। নিজে থেকে উত্তর দেন না। প্রতিকার কী?

উত্তর : গুরুর সাথে জোরাজুরি করবেন না। তিনি যদি উত্তর না দেন আপনি একটু স্মিত হাসুন। বলুন যে, গুরু, আপনি উত্তর না দেন খুব ভালো।

কতদিন না দেন আমি দেখি। প্রতিদিন প্রশ্ন করতে থাকুন। উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে থাকুন। তবে প্রশ্ন করবেন বিনয়ের সাথে, আন্তরিকতার সাথে। জোর করার প্রয়োজন নেই।

আর যখন আপনি জোর করছেন না তখন দেখবেন তিনিও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আসছেন। কারণ ঐ লেভেলে প্রশ্ন ছেড়ে দিতে হয়। উত্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে যদি আসে ঠিক আছে। কিন্তু যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন—অপেক্ষা করতে থাকুন। দেখবেন যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জবাব পাচ্ছেন। কারণ অপেক্ষা বা সবর ছাড়া অনেক সময়ই অনেক কিছু পাওয়া যায় না। অপেক্ষা এমন এক শক্তি যা সবকিছুকে পরাজিত করতে পারে। তবে গুরু একবার উত্তর দিলে ঐ একই প্রশ্ন আর জিজ্ঞেস করবেন না, উত্তর আপনার পছন্দ হোক আর না হোক।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে গিয়ে আমার অন্তর্গুরুর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব সহজে উত্তর পাই না। কিংবা উত্তর পেলেও আমি যা আশা করি তা-ই উত্তর আসে। এটা কি সঠিক?

উত্তর : আশা করবেন না। আশা করলে হয়তো তিনি সেই উত্তরই দিয়ে দেবেন। কারণ অন্তর্গুরুর মনটা খুব নরম। তিনি কারো আশা ভঙ্গ করতে পারেন না। আপনি যা আশা করবেন তিনি তা-ই উত্তর দেবেন। আপনি একটু শক্ত হোন যে, না, আমার কোনো আশা নেই। গুরু যা বলবেন, সেটাই আমি শুনতে চাই। তাহলে উনি সঠিক উত্তর দেবেন।

প্রশ্ন : কোনো প্রশ্ন করলে অন্তর্গুরু উত্তর দেন না। ফলে অনেক বিষয়ে আমার দ্বিধা থেকে যায়। কী করতে পারি?

উত্তর : কোনো প্রশ্নেরই যদি উত্তর না দেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার সাথে গুরুর একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে। এই গ্যাপ, এই দূরত্বটাকে দূর করতে হবে। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। কোথায় দূরত্ব হচ্ছে এটাকে বের করার চেষ্টা করুন। দেখবেন যে গুরু উত্তর দিচ্ছেন।

আবার কখনো কখনো গুরু কোনো কোনো বিষয়ে উত্তর দেন, কোনো কোনো বিষয়ে চুপ থাকেন। যে বিষয়ে চুপ থাকছেন বুঝতে হবে উত্তরটা

আপনার মনঃপূত হবে না। আপনি যা চাচ্ছেন উত্তরটা তা নয়। উত্তরটা তার বিপরীত। এখানে মৌনং সম্মতি না।

গুরুর কোনো বিষয়ে চুপ থাকা মানে হচ্ছে অসম্মতি। ‘মৌনং অসম্মতি লক্ষণং’। অতএব, সাবধান হয়ে যাবেন সেই কাজ করার ব্যাপারে। কারণ, গুরু সাধারণত ‘না’ বলতে খুব সংকোচ করেন। না বলবো-আচ্ছা যাক চুপ থাকাই তো ভালো।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারের গুরু শুধু উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

উত্তর : খুব ভালো গুরু পেয়েছেন আপনি! জিজ্ঞেস করার আগেই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে। সাধারণত আমাদের আগেকার গুরুরা দশ বছর জিজ্ঞেস করার পর একটার উত্তর দিতেন।

কমান্ড সেন্টারে অন্যকে হিলিং

প্রশ্ন : হিলিংয়ের কার্যকারিতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : আসলে পৃথিবীর বহু কিছুই ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়েছে। আবার অনেক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে নি। কঠিন অবস্থায় সকল বস্তুর আয়তন কমে। কিন্তু পানি কঠিন হয়ে বরফ হলে আয়তন বাড়ে। বিজ্ঞানের সূত্র এর ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। বলেছে এটি ব্যতিক্রম।

বিজ্ঞানের জগতে এ ধরনের ব্যতিক্রম ও বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়েই মনের এই শক্তির ব্যাখ্যা দেয়া যায়।

একশো বছর আগের কথা চিন্তা করুন। আপনাকে কেউ যদি বলতো, ঘরের কোণায় আমার একটি বাস্ক আছে। এখন এই মুহূর্তে ফ্রান্সে যে ফুটবল খেলা হচ্ছে এই বাস্কে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আপনি তাকে কী বলতেন? পাগল! আর এখন ঘরে বসে টেলিভিশনে আপনি ফুটবল খেলা দেখছেন। আপনার এ কথাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাকে আপনি কি বলবেন? বলবেন পাগল।

মস্তিষ্ক যে যন্ত্র তৈরি করেছে তা দিয়ে যদি বিশ্বের অপর প্রান্তের এই

মুহূর্তের ঘটনা দেখা যায়, তাহলে এই মস্তিষ্কে বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যবহার করেও তা দেখা যেতে পারে।

ঘটনাটিকে এভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারেন—প্রতিটি মন হচ্ছে বিশ্বমন নামক এক সুপার সুপার সুপার কম্পিউটাররূপী মহাজাগতিক জ্ঞানভান্ডারের (information super highway) এক একটি টার্মিনাল।

সুপার কম্পিউটারের যতগুলো টার্মিনালই থাকুক না কেন, যেকোনো টার্মিনাল থেকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা সুপার কম্পিউটারের কেন্দ্রের সাথে যেমন যোগাযোগ করা যায়, তেমনি ধ্যানের স্তরে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি সৃষ্টি হলে বিশ্বমনরূপী মহাজাগতিক জ্ঞানভান্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মন কাক্ষিত তথ্য লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি আমার মস্তিষ্কে তথ্য প্রেরণের মাধ্যমে তথ্যমালাকে পরিবর্তিত করে রোগমুক্তি ও কল্যাণ সাধন করতে পারি—এটা বৈজ্ঞানিকভাবেই সত্য। কিন্তু বহুদূরে অবস্থিত আরেকজনকে পাঠানো তথ্যমালা সে পাবে কীভাবে? এর সহজ উত্তর হচ্ছে—টেলিপ্যাথি।

এই টেলিপ্যাথিক ক্ষমতা আমাদের সাধকরা হাজার হাজার বছর ধরে প্রয়োগ করে আসছেন। এর এত অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যে, তা উল্লেখ করতে গেলে এটা একটা বিশ্বকোষ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন করবেন, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ কি টেলিপ্যাথি বিশ্বাস করে? এই শতাব্দীতে টেলিপ্যাথি গবেষণার অগ্রপথিক হচ্ছে ডিউক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জে. বি. রাইন। স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে তিনি ইএসপি গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করেন।

এপোলো-১৪-এর নভোচারী এডগার মিচেল চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূ-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিউস্টনের সাথে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই যোগাযোগ এত সফল হয়েছিলো যে, নভোচারী মিচেল ভূপৃষ্ঠে ফিরে এসে গড়ে তোলেন এক নতুন প্রতিষ্ঠান—ইনস্টিটিউট অফ নোয়েটিক সায়েন্সেস।

টেলিপ্যাথি নিয়ে দুই পরাশক্তির গবেষণার প্রতিযোগিতা বিজ্ঞানীমহল খুব ভালভাবেই জানেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ৬০-এর দশকে এই গবেষণায় এত এগিয়ে গিয়েছিলো যে, কমান্ডার মস্কো থেকে ব্লাডিভস্টকে মোর্স কোডে কমান্ড পাঠাচ্ছেন আর ব্লাডিভস্টকের কমান্ডার তা গ্রহণ করে আবার মোর্স কোডে জবাব পাঠাচ্ছেন।

বিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন কি না এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের পত্রিকা ‘নিউ সায়েন্টিস্ট’ এক জরিপ চালিয়েছিলো। জরিপে দেখা গেল, শতকরা ৭৫

জনই টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের জন্যে টেলিপ্যাথি হচ্ছে এক নতুন বাস্তবতা।

কমান্ড সেন্টারে আপনি আপনার মন ও মস্তিষ্ককে বিশেষ স্তরে নিয়ে গিয়ে সেই বাস্তবতাকেই কাজে লাগাচ্ছেন। আপনার কল্যাণ কামনার তথ্যমালা আপনার মন থেকে অপর ব্যক্তির মনে চলে যাচ্ছে। আর এরপর তা সেই ব্যক্তির মস্তিষ্কের তথ্যভান্ডারকে পুনর্বিন্যস্ত করছে। মস্তিষ্ক তার রোগমুক্তির প্রক্রিয়া সক্রিয় করছে, কল্যাণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করছে। তার জন্যে নতুন বাস্তবতা নির্মাণ করছে।

তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, কমান্ড সেন্টারে আপনি টেলিপ্যাথির এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগাচ্ছেন।

আর প্রত্যেক মানুষের মাঝেই এই ক্ষমতা সুপ্ত রয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত ডা. কার্ল গুস্তব ইয়াং খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন, মানব অস্তিত্বের মধ্যে এমন একটি অংশ রয়েছে, যা স্থান কালের উর্ধ্বে চলে যেতে পারে।’

প্রশ্ন : আমাদের অলি বুজুর্গরা কি এই টেলিপ্যাথি প্রয়োগ করেছেন?

উত্তর : অবশ্যই। আমাদের অলি-বুজুর্গরা, মুনি-ঋষিরা হাজার হাজার বছর ধরে এ পদ্ধতিকে ব্যবহার করে আসছেন। প্রয়োগ করে আসছেন। হযরত ওমরের সময়কার একটা ঘটনা।

আবু ওবায়দা জেরুজালেমে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করছেন। রোমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো ওবায়দার সৈন্য সংখ্যার পাঁচ গুণ। দিনটি ছিলো শুক্রবার। ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছে। হযরত ওমর মদীনায় মসজিদে নববীতে খোতবা দিচ্ছেন। যুদ্ধ হচ্ছে জেরুজালেম-মদীনা থেকে কয়েকশ মাইল দূরে। হঠাৎ খোতবা বন্ধ করে তিনি বসে পড়লেন। বসে বলছেন, ‘আবু ওবায়দা, পাহাড়ের পেছনে দেখ’।

আবু ওবায়দা সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে শুনছেন যে, খলিফা তাকে পাহাড়ের পেছনে দেখতে বলছেন। তিনি কয়েকজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দিলেন-দেখ তো পাহাড়ের পেছনে কী হচ্ছে? তারা পাহাড়ের পেছনে গিয়ে দেখে যে, মারাত্মক অবস্থা। ৫০ হাজার রোমান সৈন্য পাহাড়ের পেছন দিক থেকে আসছে আবু ওবায়দার বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলার জন্যে। আবু ওবায়দা সাথে সাথে তার বাহিনীকে দুই ভাগ করে ফেললেন। একভাগ

পাঠিয়ে দিলেন পাহাড়ের পেছনে মোকাবেলা করার জন্যে। সেই যুদ্ধে আবু ওবায়দা জয়ী হয়েছিলেন।

যদি কমান্ড করতে পারেন তো আপনার কমান্ড মানুষ শুনতে পারে, পশুপাখি শুনতে পারে, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী শুনতে পারে।

হযরত ওমরের সময়কার আরেকটি ঘটনা। আমরা ইবনুল আস মিশর জয় করেছেন। মিশরীয়দের মধ্যে তখন একটা প্রথা ছিলো। এখন যে রকম সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয় তখন সেখানেও সুন্দরী প্রতিযোগিতা হতো। একদম গ্রাম থেকে শুরু হতো। বাছাই হতে হতে সেরা মিশর সুন্দরী যে নির্বাচিত হতো তাকে সবচেয়ে মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত করে একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনা দিয়ে মুড়িয়ে অলংকার পরিয়ে নীলনদে নিয়ে বলি দেয়া হতো। কারণ মিশরীয়রা বিশ্বাস করতো, সবচেয়ে সুন্দরী কুমারীকে বলি দিলে নদী খুশি হবে, ফসল ভালো হবে। আমরা ইবনুল আস ঘোষণা করলেন যে, না, নরবলি মহাপাপ, নরবলি দেয়া যাবে না।

নরবলি বন্ধ, প্লাবনও বন্ধ হয়ে গেল। সময় পার হয়ে যাচ্ছে, প্লাবন হচ্ছে না। প্লাবন না হলে ফসল হবে না। কৃষকরা বিদ্রোহ করবে। বিদ্রোহের রব উঠলো চারদিকে। পাপ-পুণ্য পরে, আগে আমাদের তো খেয়ে বাঁচতে হবে।

আমর দেখলেন যে, কৃষকরা যদি বিদ্রোহ করে, এই বিদ্রোহ দমন করার জন্যে যে সৈন্যদল দরকার সে লোকবল তার নেই। অতএব তিনি খলিফাকে লিখে পাঠালেন। খলিফা দূতের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন, লম্বা চিঠি। তাকে বললেন যে, আমরা বলবে নীল নদে গিয়ে চিঠি পড়ে শুনিয়ে নীল নদে চিঠিটা ছেড়ে দিতে।

আমর চিঠি নিয়ে গেলেন, নীল নদের সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে খলিফার ফরমান পড়ে শোনালেন। অনেক লম্বা চিঠি। শেষ লাইন ‘হে নদী! তুমি যদি আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হয়ে থাকো, আমি আল্লাহর খলিফা ওমর বলছি, আল্লাহর হুকুমে প্লাবিত হও’।

ছেড়ে দেয়া হলো চিঠি পানিতে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, সাত ঘণ্টা-আস্তে আস্তে পানি ফুলতে শুরু করলো, প্লাবন হলো, ফসল হলো। এবং সেই যে মিশরে নরবলি বন্ধ হলো তারপরে আর কোনো কুমারী নারীকে নীলনদে আত্মাহুতি দিতে হয় নি। কমান্ড করতে পারলে মানুষ শুনবে, নদ-নদী শুনবে, পাহাড়-পর্বত শুনবে যদি আপনি কমান্ড করতে জানেন।

প্রশ্ন : একসাথে কতজনকে নিরাময় করা যাবে?

উত্তর : একা যখন মেডিটেশন করবেন একই মেডিটেশনে পর পর চারজনকে এনে আপনি তার নিরাময় ও কল্যাণ কামনা করতে পারেন। পর পর, একসাথে নয়। একজনকে আনবেন, তাকে বিদায় জানাবেন। তারপরে দ্বিতীয় জনকে আনবেন, বিদায় জানাবেন। তারপরে তৃতীয় জনকে আনবেন, বিদায় জানাবেন। তারপরে ৪র্থ জনকে আনবেন।

প্রশ্ন : হিলিং করতে গিয়ে তো অনেক সময় ছবি স্পষ্ট হয় না। তাতে কি হিলিং কার্যকরী হবে?

উত্তর : ছবি অস্পষ্ট হতেই পারে। কারো কারো ছবি পরিষ্কার আসতে পারে। কারো কারো ছবি তিরতির ঝিরঝির করতে পারে। কারো কালার এসেছে, কারো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এসেছে। কারো কিছুই আসে নাই। ছবি এলে ভালো, না এলেও ভালো। ছবি আসাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাবলেই হলো যে, তার ছবি সামনে আছে এবং আপনি আন্তরিকভাবে তার কল্যাণ কামনা করলেন। এই আন্তরিক কল্যাণ কামনাটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : সাইকি পাওয়ারটাকে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পারি?

উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে সাইকি পাওয়ারটাকে যত কম কাজে লাগান, তত ভালো। এটা বড় কাজের জন্যে ব্যবহার করবেন। যেমন এখান থেকে বেরিয়ে রিকশা পাবো কি না একটু দেখে নিই—এটার জন্যে যদি কমান্ড সেন্টারকে ব্যবহার করতে যান তাহলে কী হবে।

ইএসপি-কে বড় কাজের জন্যে ব্যবহার করবেন। যেমন : একটা বিজনেস ডিল, সেখানে কী স্ট্র্যাটেজি নেবেন, সে কী বলতে পারে, আর আপনি তখন কী বলবেন, ইত্যাদি।

প্রশ্ন : আপনি এক আলোচনায় বলেছিলেন, কিছু হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে কোনো সাইকি যেন তা না দেখে। তাহলে বাচ্চা হারিয়ে গেলে বা নিজের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া না গেলে সাইকিরা তা দেখতে পারবেন কি না।

উত্তর : কারো নিজের বাচ্চা হারিয়ে গেলে এবং তার দেখার সে ক্ষমতা থাকলে, দেখা যাবে যে, আমি না বললেও তিনি বসে পড়বেন। আর তিনি যদি সেটা দেখতে পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি এক বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। কারণ নিজের বাচ্চা হারিয়ে গেলে যে টেনশন সৃষ্টি হয়, সেই টেনশনকে অতিক্রম করে কেউ যদি লেভেলে যেতে পারে, তার মানে তিনি ধ্যানের পথে যথেষ্ট অগ্রসরমান।

আসলে এই কথাটা আমরা কেন বলেছিলাম? ধরুন, একজনের গরু হারিয়ে গেছে বা কানের দুল হারিয়ে গেছে। এখন আপনি কি কানের দুলের পেছনে লেগে থাকবেন? সামান্য কানের দুলের জন্যে আপনি যে শক্তি ব্যয় করবেন তা দিয়ে আপনি আরো বড় কোনো কাজ করতে পারতেন। বরং দুল হারিয়ে গেছে, আরেকটা কিনে নিন।

আসলে যে শক্তি একটা বিরাট উপকারে লাগে সেটাকে যদি আপনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে লাগান, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যবহার করেন, তাহলে সে শক্তির অপব্যবহার হবে।

সাইকি পাওয়ারকে আপনি যদি চোর খোঁজার কাজে লাগান, তাহলে আপনি আর চানখারপুলের ‘এলেম দ্বারা চোর’ ধরে যারা, তাদের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য থাকলো না।

প্রশ্ন : সক্রিয় ও নির্লিপ্ত মেডিটেশনের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর : পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট। একটা চাওয়ার, আরেকটা না চাওয়ার। আসলে চাওয়ার মেডিটেশন হচ্ছে কনশাস থেকে সাব-কনশাস লেভেলে যাওয়ার মেডিটেশন। না চাওয়ার মেডিটেশন হচ্ছে সুপার কনশাস থেকে কনশাস লেভেল-এ যাওয়ার মেডিটেশন।

যখনই চাওয়া থাকবে-সেই মেডিটেশনের লেভেল, আর চাওয়াহীন মেডিটেশনের লেভেল-দুটো আলাদা। যখন না চাওয়ার লেভেলে আপনি চলে যেতে পারবেন, তখন এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন বলি বা ইলহামের স্তর বলি বা অতিচেতনার যে বলয় সেখান থেকে ইনফরমেশন সচেতন বলয়ে প্রবেশ করে। আর এই বলয়ই যুক্ত মহাচেতনার সাথে, অর্থাৎ সকল ইনফরমেশন ভান্ডারের সাথে।

তবে প্রথম চাওয়ার মেডিটেশন, তারপরে না চাওয়ার মেডিটেশন। কারণ একেবারে কিছু যদি না থাকে, না চাওয়ার স্টেজে যাওয়া যায় না। কারণ

নবীজী (স) বলেছেন দারিদ্র কুফরের সমান, দরিদ্র মানুষের পক্ষে ঈমান রক্ষা করা খুব কঠিন। কাজেই সবকিছুর মধ্যে পরিমিত বজায় রাখবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে যা দেখবো তার কতটুকু বলতে পারবো আর কতটুকু বলা যাবে না?

উত্তর : যা বললে অন্যে বিড়ম্বিত হতে পারে তা বলবেন না। সব বলা যাবে না। যেটুকু তার জন্যে কল্যাণকর, তার জন্যে মঙ্গলজনক সেটুকু বলবেন। যে ব্যাপারে তাকে সচেতন করে দেয়া উচিত তা কৌশলে বলবেন। যেমন, বলতে পারেন—আপনি এ ব্যাপারে সজাগ থাকুন, সতর্ক থাকুন। অন্যকে হেয় করতে পারে, অন্যের ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু বলবেন না।

আপনি হয়তো দেখলেন ছোটবেলায় সে একটা জায়গা থেকে চুরি করছে। আপনি একথা যদি তাকে বলেন, সে অপ্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। এরপরে আপনার কোনো কথা শোনার মতো অবস্থায় সে না-ও থাকতে পারে। কারণ এটা স্বীকার করার মতো সৎ সাহস খুব কম মানুষের রয়েছে।

একটু হেসে তিনি হয়তো বলতে পারেন, বুঝলাম, আপনি কতটুকু শিখেছেন। তখন আপনার নিজের কাছেই নিজের লেভেল সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। কারণ, সে তো স্বীকার করবে না। যদি চালাক হয়, আপনাকে কনফিউজ করে দেবে, নেতিবাচক কিছু কথা বলবে যা আপনার নিজের বিড়ম্বনার কারণ হবে।

প্রশ্ন : অতিচেতনার প্রকাশটাকে আগেভাগে জানানোয় কি ধর্মীয় কোনো বাধা আছে?

উত্তর : আসলে একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, সুনির্দিষ্টভাবে আপনি যদি কিছু বলতে যান, এমনকি বুঝতে পারলেও, সুনির্দিষ্টভাবে ‘হবে’ বললে আপনি ইসলামের দৃষ্টিতে শির্ক করে ফেললেন।

যেমন, আপনি যদি কাউকে বলেন যে, অমুকদিন তোমার পা ভাঙবে, যদিও এটি জানা সম্ভব, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে তা বললে শির্ক হবে। কারণ ভবিষ্যৎকে সুনির্দিষ্টভাবে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটি আমাদের ঈমানের অংশ।

কিন্তু আপনি যদি বলেন, ভাই অমুকদিন আপনার পায়ে আঘাত পাওয়ার

আশঙ্কা আছে, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আপনি খুব ঠিক কাজটি করলেন। এখানে ধর্মীয় কোনো বাধা নাই। আর যত কম বলেন তত ভালো।

প্রশ্ন : অনেক বুজুর্গের সুনজরের কারণে মেয়েদের সাইকি পাওয়ার থাকে, কিন্তু বিয়ের পরে চলে যায় কেন? এ পাওয়ার কি ছেলেদের নাই?

উত্তর : থাকে, অবশ্যই ছেলেদেরও সাইকি পাওয়ার থাকে। তবে তফাত হলো—সাধারণভাবে মেয়েরা গঠনমুখী, তাই এ পাওয়ারটাকে তারা ধরে রাখতে পারে। কিন্তু ছেলেদের প্রকৃতিজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তারা বহির্মুখী, বাইরের দিকে। তাই তারা পাওয়ারটাকে ধরে রাখতে পারে না। আর মেয়েরা যেহেতু অন্তর্মুখী, তাই এই পাওয়ারটাকে তারা ধরে রাখতে পারে অনেকদিন।

কিন্তু সে যদি চর্চা না করে, একটা সময় আসবে যে তা আর থাকবে না। আবার একজন পুরুষ যদি সাধনা করে, চর্চা করে, তার মধ্যে আমৃত্যু এই পাওয়ার থাকবে। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর, সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু ছেলেদের সংখ্যা বেশি।

অলি-বুজুর্গদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, ছেলেদের সংখ্যা বেশি। কারণ সাধনার একটা স্তরে গিয়ে যে কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন, যে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন, সেটা মেয়েদের পক্ষে মুশকিল হয়। কারণ আবার ঐ অন্তর্মুখিতা। তার সংসারধর্ম পালনে ব্যস্ততা। অর্থাৎ যে অন্তর্মুখিতা প্রথম পর্যায়ে তার জন্যে ছিলো পরিপূরক, সেই অন্তর্মুখিতাই সাধনার একটা কঠিন পর্যায়ে গিয়ে বিপরীত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : সাইকিতে মাঝে মাঝে একজনের চেহারা আসার বদলে অন্যজনের চেহারা চলে আসে। এটি কি ঠিকানা ভুল হওয়ার ফল না অন্য কিছু?

উত্তর : এটা একাধিক কারণে হতে পারে। মূল কারণ হচ্ছে লেভেলের টিউনিং ঠিক হয় নি। রেডিওতে খুব কাছাকাছি ফ্রিকোয়েন্সি হলে একটা ব্যান্ড শুনতে গিয়ে আরেক স্টেশন চলে আসতে পারে। টিউনিং ঠিক না হলে সাইকিতেও এ বিষয়টি চলে আসতে পারে।

সাইকিতে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন না, সেটা নিয়ে কোনো জোর করবেন না। দেখার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন প্রস্তুত হয়ে বসা। যা আসার অটোমেটিকেলি আসবে। যে ব্যক্তিকে আনতে

চেষ্টা করবেন-চাইবেন, কিন্তু জোর করে সে ব্যক্তির ছবি ভাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি যখন স্থির লেভেলে যেতে পারবেন অটোমেটিক সে আসবে।

এজন্যে শিথিলায়ন চর্চা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজন মন এবং দেহকে পুরোপুরি রিলাক্স করা এবং যখন ছবি দেখতে চাচ্ছেন তখন সচেতন প্রচেষ্টা না চালানো। কারণ আপনার ইনফরমেশন আসছে ভেতর থেকে। সচেতন চেষ্টা চালালে সচেতন থেকে তা ভেতরে যাবে। যত আপনি শিথিল হবেন, স্থির হবেন তত ছবিটা সঠিক হবে। এখানে তাড়াহুড়ো করবেন না, সক্রিয় চেষ্টা করবেন না।

প্রশ্ন : ৩, ২, ১, ০ বলার সাথে সাথে ছবি যেরকম দেখি, কিছুক্ষণ পর ছবি আবার অন্যরকম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তার আসল চেহারা কোনটি?

উত্তর : এটি ঘটে তখন, যখন আপনার ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক হচ্ছে না। অর্থাৎ আপনার লেভেলের স্থিরতা নাই। আপনার শরীর মনে যত শিথিলতা থাকবে, যত আপনি প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণহীন না করে স্বতঃস্ফূর্ত হতে দেবেন, ততই আপনি নিখুঁতভাবে দেখতে পাবেন। যা দেখবেন একটিই দেখবেন, যা দেখবেন সঠিক দেখবেন। নিপুণভাবে হিলিং করতে পারবেন।

প্রশ্ন : স্ক্রিনে যার ছবি আছে, ঠিক থাকলে ৯৮% ঠিক হয়, আর ঠিক না থাকলে একদম এলোমেলো।

উত্তর : স্বাভাবিক। এখানে তো গৌজামিলের কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক ছবি এলে আপনি খুব সঠিকভাবেই তা বলতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি সাইকিতে নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির কথা ভাবলে আশেপাশের কাউকে দেখতে পাই। তার অবস্থা অনুযায়ী নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির বর্ণনা দিই। মিলে যায় অনেকটাই। নিরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেখতে চাই, কী করবো?

উত্তর : আশেপাশের কাউকে দেখে নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির বর্ণনা দেবেন না। অনেক সময় কাকতালীয়ভাবে অনেক কিছু মিলে যেতে পারে। কিন্তু কখনো গৌজামিল দেয়ার চেষ্টা করবেন না। ফাঁকি দিতে গেলে নিজেই ফাঁকে পড়ে যাবেন। এ অবস্থায় মনে মনে অটোসাজেশন দেবেন, আমি যাকে দেখতে চাচ্ছি তাকে পুরোপুরি দেখবো। দেখার পর আমি তার সম্পর্কে বলবো।

প্রশ্ন : সাইকিতে বসে মাঝে মাঝে নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির মুখচ্ছবি স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ, দোয়া ও নির্দেশনা চাই।

উত্তর : শিথিলায়ন চর্চা নিয়মিত করবেন, লামার কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়ন করবেন, সাইকির গুণগুলো আয়ত্ত করবেন, মনের বিষ দূর করবেন, তাহলেই নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির মুখচ্ছবি খুব পরিষ্কার দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন : হিলিংয়ের সময় যাকে অবলোকন করতে চাই তার চেহারা, বৈশিষ্ট্য আগের হিলিংয়ের সাথে মিলিয়ে ফেলি। কিছুতেই বর্তমান নিরীক্ষাধীন ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকতে চায় না। ফলে তথ্য অবলোকন ও বলার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যায়। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : নিয়মিত চর্চা করলেই এটি ঠিক হয়ে যাবে। ৩-২-১-০ বলে তাকে আনবেন, কাজ শেষে ০-১-২-৩ বলে সুইচ অফ করে দিলেন। তারপর আবার ৩ থেকে ০ গুণে আনবেন। সম্ভবত আপনার ক্ষেত্রে একসাথে কয়েকজনকে হিলিং করতে গিয়ে একজনের জায়গায় আরেকজন চলে আসে। অর্থাৎ স্কিন আউট করার অভ্যাসটা গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই আর চেহারা দেখা নিয়ে সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন : আমি যখন হিলিং করতে চাই তখন একজনকে করতে গেলে আরেকজন চলে আসে। আমার তখন খুব বিরক্ত লাগে। গুরুজী, এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : আরেকজন আসুক, বিরক্তির কিছু নেই। যে আসবে, বুঝতে হবে তার প্রয়োজন আছে। ধরুন, আপনি খেতে বসেছেন বা টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। একজন চলে এলো। আপনি যদি বিরক্ত হন, তাকে বাদ দিয়ে খেতে বসেন, আপনার রিজিক উঠে যাবে।

অতএব, আপনি একজনের চিকিৎসা না করে যদি বিদায় করে দেন, যদি বিরক্ত হন তাহলে আপনি যে শক্তি অর্জন করেছেন সেটা থাকবে না। রোগী যদি শত্রুও হয়, তবু একজন ডাক্তার তার চিকিৎসা করেন। যারাই এ কাজটা করেছেন, ইতিহাসে তারাই মহৎ হয়েছেন।

সুলতান সালাউদ্দিনের সাথে ক্রুসেডের সময় রাজা রিচার্ডের যুদ্ধ হলো। জীবন-মরণ যুদ্ধ। রিচার্ড অসুস্থ হয়ে গেলেন। সুলতান চিন্তা করলেন, সে তো

বাইরে থেকে এসেছে। সে আমার মেহমান, অসুস্থ মেহমান। শত্রু হোক, তার চিকিৎসা করাটা আমার দায়িত্ব।

তিনি চিকিৎসকের বেশে শিবিরে গেলেন এবং রাজা রিচার্ডের চিকিৎসা করলেন। সুস্থ হওয়ার পর রাজা যখন তাকে চিনে ফেললেন, বললেন—এই লোকই তো আমার জীবন বাঁচিয়েছে, এর সাথে আর কী যুদ্ধ করবো! সন্ধি হলো, রিচার্ড ফিরে গেলেন।

সনাতন ধর্মে বলা হয়, অতিথি হলো নারায়ণ। সাহায্যের হাত বাড়াবেন। এটা শুধু কমান্ড সেন্টারে না, শত্রুও যদি বিপন্ন হয়, তাকে সাহায্য করবেন। তারপর আবার সে শক্তি সঞ্চয় করবে—ঠিক আছে। কিন্তু বিপন্ন অবস্থায় তার সেবার ব্যবস্থা আপনি করবেন।

প্রশ্ন : একজন সাইকির কাছে গুনেছিলাম, তিনি যখন একজন রোগীকে হিলিং করছিলেন তখন তার ভেতরেও সে অসুখটা দেখা দিয়েছিলো। সেক্ষেত্রে করণীয় কি?

উত্তর : এটি একটি অসম্ভব কথা। আপনি কাউকে নিরাময় করবেন আর সে রোগ আপনার দেখা দেবে এটা হয় না। হতে পারে তিনি ভুল করেছিলেন অথবা তার মধ্যে অসুখটা আগেই ছিলো। কিছুদিন পরে তা দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু আরেকজনকে নিরাময় করতে গিয়ে সে অসুখ আপনার হবে এটা কখনোই হতে পারে না। আমাদের সাইকিরা গত ২০ বছরে হাজার হাজার রোগীকে হিলিং করেছেন। এরকম ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেন নি।

প্রশ্ন : কখনো স্বপ্নে দেখি, আবার কখনো খোলা চোখেই অনেক কিছু দেখি যা পরবর্তীতে সত্যি হয়। এটা কি আমার অতীন্দ্রিয় শক্তির জন্যে হয়? কীভাবে আমার সাইকি পাওয়ার বাড়াবে?

উত্তর : কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই কিছু কিছু ক্ষমতা বিকশিত হয়। যেমন কেউ অংক ভালো পারে, কেউ ভাষা খুব ভালো পারে। কাউকে ইংরেজি একবার বলে দিলেই হলো। একেকজনের একেকদিকে প্রতিভা থাকে যা ছোটবেলা থেকেই বিকশিত হয়।

আপনার মধ্যে সাইকি পাওয়ার রয়েছে। একে আরো বাড়াতে পারেন নিয়মিত সাইকি চর্চা ও হিলিং করার মধ্য দিয়ে। যখনই সুযোগ পাবেন,

মেডিটেশনে বসলেই কাউকে না কাউকে হিলিং করবেন। সাপ্তাহিক হিলিংয়ে সবসময় অংশ নেবেন।

কারণ এতগুলো মানুষ যখন একসাথে মেডিটেশনে অংশ নিচ্ছেন তখন এই নিরাময়ের শক্তি খুব সক্রিয় অবস্থায় থাকে। যেহেতু নিরাময় শক্তি সক্রিয় থাকে, ভাইব্রেশন বা আরবিতে যাকে ফায়েজ বলে তা চারদিকে ছড়িয়ে যায়, আপ্লুত হয়, পাওয়ারটা বেড়ে যায়। সেজন্যে যারা এ পাওয়ার বাড়াতে চান তাদের জন্যে হিলিংয়ে অংশ নেয়াটা খুব চমৎকার একটি সুযোগ।

প্রশ্ন : পুরোপুরি আত্মশুদ্ধি ছাড়া সাইকি পাওয়ার অর্জন কতটুকু সম্ভব? অথবা আত্মশুদ্ধির সাথে সাইকি পাওয়ারের কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

উত্তর : আত্মশুদ্ধি সাইকি পাওয়ারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর আত্মশুদ্ধিকে ভয় পাবেন কেন? কারণ যেটুকু শুদ্ধ করবেন সে জিনিসটুকুই তো আপনার। তা নিয়েই আপনি পরিত্রাণের পথে যাবেন। যদি শুদ্ধ করতে না পারেন তাহলে যা কিছু অশুদ্ধ সব আপনার ক্ষতির কারণ হবে।

আসলে আত্মশুদ্ধির যে প্রক্রিয়ায় আমরা রয়েছি তা একটা মালার মতো। একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আরেকটি অচল। তাই আত্মশুদ্ধির জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রক্রিয়াকে পুরোপুরি অনুসরণ করবেন। আবার শুধু আত্মশুদ্ধি অর্জন করলেই আপনার শক্তি আসবে না, যদি না আপনি সে শক্তির চর্চা করেন।

আপনার অনেক টাকা রয়েছে। কিন্তু কালার মনিটর যদি না কেনেন তাহলে কালার ছবিও দেখতে পাবেন না। সেজন্যে শুধু আত্মশুদ্ধি সাইকি পাওয়ারের জন্যে যথেষ্ট নয়। এটি সহায়ক, পরিপূরক। আত্মশুদ্ধি হলে সাইকি পাওয়ার বেড়ে যাবে। আর তাই সাইকি পাওয়ার ধরে রাখার জন্যে যা যা করার কথা বলা হয়েছে তা করতে হবে।

প্রশ্ন : সাইকি পাওয়ার বাড়াতে কোয়ান্টায়ন কি কোনো উপকারে আসবে? মাসে কয়টি কোয়ান্টায়ন প্রয়োজন এ পাওয়ার বাড়াতে?

উত্তর : সাইকি পাওয়ারের জন্যে লামার কোয়ান্টামমে নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করবেন। শুধু সাইকি না, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। বাজার করতে গেলেও কাজে আসবে। বুঝবেন—কবে বাজারে যেতে হবে। মাছ কোনদিন পাওয়া যাবে।

আমি তো সাধারণত বাজারে যেতে পারি না, কিন্তু যেদিন যাই, দেখি-পেয়ে গেছি। কোনো কোনোদিন এত জিনিস চলে আসে যে, দাম কম। কম দামে জিনিস কিনতে পারলে কার না ভালো লাগে। হয়তো যে মাছের কথা ভাবছিলাম, অনেকদিন ঢাকার বাজারে দেখি নাই। দেখা গেল সেই মাছ, একদম ফ্রেশ। তবে মাছ আমি কয় পিস খাবো সেটা আমার ব্যাপার। কিন্তু, আনন্দটা হলো-আমি চিন্তা করেছিলাম, আল্লাহ পাইয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর শোকর।

অতএব, সবসময় সুযোগ পেলেই লামায় কোয়ান্টায়ন করবেন। বাসায় কোনো কাজ নেই। সে সময় শিথিলায়ন করবেন। যখনই সুযোগ পাবেন মেডিটেশন করবেন। মৌন থেকে ভাববেন। অর্থাৎ অহেতুক সময় নষ্ট করার চেয়ে মৌন ভাবনা অনেক ভালো।

প্রশ্ন : সাইকি হওয়ার ব্যাপারে আমার নিজের প্রতি আস্থা খুব কম। মনে হয় আমি সে পর্যায়ে যেতে পারি নি। তাই হিলিং করার সময় যতটা মনোযোগ দিতে পারি, কেউ কিছু দেখতে দিলে আমি তা ততটা আস্থার সাথে দেখতে পারি না। মনে হয় যা দেখছি তা যদি ভুল হয়, যিনি আমাকে দেখতে দিয়েছেন তিনি যদি আমার ব্যাপারে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই ভয় সবসময় আমার ভেতরে কাজ করে। মনে হয় এ যেন আগুন নিয়ে খেলা করা। এ ভয় থেকে বা নিজের ভেতরের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : আপনার সম্পর্কে কে কী ধারণা করলো না করলো তার উর্ধ্বে আপনাকে উঠতে হবে। মূল বিষয় হচ্ছে আপনি আপনার কাজে কতটা আন্তরিক। যদি আপনি আপনার কাজে আন্তরিক হয়ে থাকেন তাহলে কে কী ভাবলো না ভাবলো তাতে আপনার কিছু এসে যায় না।

আসলে আপনার মধ্যে হীনম্মন্যতা কাজ করছে। ইমেজ নষ্ট হতে পারে এ চিন্তা কাজ করছে। একটি বিষয় মনে রাখবেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি কখনো সঠিক হতে পারবেন না। সাইকিতে আপনার সাফল্য হার যদি প্রথম সারির হয় তাহলেও তা ৯০% এর বেশি যাবে না। হয়তো ৯০টি ক্ষেত্রে আপনি সঠিক হবেন, ১০টি ক্ষেত্রে ভুল করবেন।

কেন ভুল হবে? কারণ সব যদি সঠিক হয় আপনার মধ্যে অহংকার চলে আসবে। আপনার মনে হবে, আপনি তো সবই জানেন। এজন্যেই হয়তো প্রকৃতি একটা চেক এন্ড ব্যালেন্স করে দিয়েছে।

তবে আমরা যে ১০ ভাগ ক্ষেত্রে ভুল করি তা স্বীকার করতে চাই না। আপনি বলতে পারেন, আমার মনে হচ্ছে। আমার ভুলও হতে পারে। কারণ একমাত্র আল্লাহ ভুল করেন না, তিনি সব জানেন। তিনি ছাড়া আর কোনো মানুষের পক্ষে ১০০ ভাগ সঠিক হওয়া সম্ভব নয় যদি না সে বিষয় আল্লাহ স্বয়ং তাকে বলে দিয়ে থাকেন।

আপনার প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করবে—সে ভয় দিয়ে আপনি কেন তাড়িত হবেন। আপনি তার উপকারের জন্যে করছেন, আপনার সম্পর্কে তার ধারণা বৃদ্ধির জন্যে করছেন না।

সাইকির ক্ষেত্রে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করা সবচেয়ে বড় পাপ। সবসময় আন্তরিক হবেন। একজন মানুষ সাহায্য চাইতে এসেছে, আপনি যা দেখছেন তা—ই বলুন। সেই সাথে বলুন, আমার ভুল হতে পারে।

এ ব্যাপারে আরো যেখান থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি স্বাধীন। অর্থাৎ সবসময় বিনয়ী হবেন। যত বিনয়ী হবেন তত আপনার এ শক্তি বাড়তে থাকবে। যখন আপনি মনে করবেন, আপনার ভুল হতে পারে, তখন আপনার ভুল করার পরিমাণও কমে যাবে। কারণ তখন আপনি স্রষ্টার প্রতি বেশি নির্ভরশীল হবেন।

প্রশ্ন : বেয়াদবি নেবেন না। কাউকে বিয়ে করতে চাইলে কমান্ড সেন্টারের মাধ্যমে তাকে অবচেতনভাবে জানানো যাবে কী?

উত্তর : তাহলে বিয়েও করতে হবে অবচেতনভাবে। কেননা বাস্তবে না জানিয়ে তো বিয়ে করতে পারবেন না। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবচেতনভাবে কাউকে জানানোর মতো কাপুরুষতা আর নেই। এটা কখনো কাজ করবে না। এত ভয় কেন বিয়ের ব্যাপারে?

সবসময় মনে রাখবেন, পুরুষ বা নারী যে-ই হোন—কাউকে পছন্দ হতেই পারে। আগে তার সামাজিক অবস্থানের সাথে নিজের মিল দেখতে হবে। যদি আপনি পুরুষ হন তাহলে মেয়ের সামাজিক অবস্থান ভালোভাবে চিন্তা করবেন—বিয়ের পরে তার স্ট্যাটাস অনুযায়ী তাকে চালাতে পারবেন কি না। যদি না পারেন, তাহলে সম্ভাবনা হচ্ছে তার বাক্যবাণে আপনাকে জর্জরিত হতে হবে সারাজীবন।

দ্বিতীয় পয়েন্ট, আপনার পরিবার তাকে পছন্দ করবে কি না। আর তৃতীয় বিষয় হচ্ছে তিনি আপনাকে পছন্দ করবেন কি না। অর্থাৎ সম-সামাজিক ও

সম-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল কি না তা নিশ্চিত হতে হবে।

আপনি তাকে বিয়ে করলেন। তিনি মাসে ১০টি করে শাড়ি কিনতে অভ্যস্ত। বিয়ের পরে তিনি হয়তো ১০টি থেকে ৫টিতে নামতে পারেন। কিন্তু তার নিচে যদি নামান তিনি বলতে পারেন যে, এর চেয়ে বিয়ে না করাই ভালো ছিলো। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আবার পাত্রী মাথায় কাপড় দিয়ে অভ্যস্ত নন, আর আপনি পছন্দ করেন নেকাব-চোখ ছাড়া সব কাপড় দিয়ে ঢাকা-তাহলেও হবে না। আপনার পরিবার যদি নেকাবী মেয়ে পছন্দ করে তাহলে সে পরিমন্ডলের কোনো মেয়েকেই আপনাকে খুঁজতে হবে। আপনার মা যদি বউকে নেকাব পরতে বাধ্য করেন যে, তা না হলে পর্দা নষ্ট হবে। অথচ মেয়ে হয়তো পর্দা করে না, তখন সমস্যা তো হবেই।

আবার মেয়ে যদি এমন হয় নেকাবই তার জীবন, কিছুতেই নেকাব ছাড়বে না। আর আপনি মনে করছেন বোরখা, নেকাবের প্রয়োজন নেই, মোটামুটি শালীন পোশাক পরলেই হলো। আপনি ভাবছেন আপাদমস্তক ঢাকা কোনো মেয়েকে নিয়ে আপনি ঘুরতেও পারবেন না। এরকম মেয়েকে বিয়ে করারই কোনো দরকার নেই।

সে তার মতো সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের কাউকে খুঁজে নেবে। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে অবচেতনভাবে কাউকে জানানোর মতো কাপুরুষতা আর নেই। এটা কখনো কাজ করবে না।

শুধু প্রস্তাব দেয়ার সময় নয়, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রেও সাহসী হতে হবে। প্রত্যাখ্যান করলে তাকে স্বাগত জানান। কারণ প্রস্তাব দেয়ার অধিকার যখন কেউ সংরক্ষণ করে, তখন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অধিকারও তাকে সংরক্ষণ করতে হবে।

তবে অপরপক্ষ তখনই প্রত্যাখ্যান করবে যখন তার মানদণ্ডে সে আপনাকে উপযুক্ত মনে করবে না। যদি মনে না করে আপনার রাগ করার, ক্রুদ্ধ হওয়ার কিছু নেই। বরং আনন্দিত হবেন এই ভেবে যে, বড় একটা ফাড়া কেটে গেল।

প্রশ্ন : আগে আমার সাইকি পাওয়ার খুব ভালো ছিলো। কিন্তু একবার ভালো মন না নিয়ে আরেকজনকে কমান্ড সেন্টারে আনার পর আমি আর কিছুই দেখতে পারছি না। তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আরেকজনকে কিছুটা আভাসও দিয়েছি। তারপর অবশ্য আপনার কথামতো তার কাছে এবং আল্লাহর কাছে

ক্ষমাও চেয়েছি। কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। এখন আমার কী করা উচিত। আমার দেখার জন্যে আমি অনুতপ্ত। এসব দেখা ও বলার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে ভালো হয়।

উত্তর : যে পরিমাণ পাপ আপনি করেছেন তার তুলনায় ন্যূনতম একটি শাস্তি আপনি পেয়েছেন যে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এটা কখনোই করা উচিত নয়। কারণ আপনি যা দেখছেন তা হচ্ছে প্রকৃতির আমানত। তার সম্পর্কে জ্ঞান প্রকৃতি আপনাকে দিয়েছে।

যেমন আমরা অনেক কিছুই বুঝি। কিন্তু যার সম্পর্কে বুঝলাম সে কখনোই বুঝতে পারবে না যে তার সম্পর্কে এই তথ্য আমাদের কাছে আছে। অর্থাৎ আপনার জানা দিয়ে যাতে আপনার আচরণ প্রভাবিত না হয়। এমনকি কোনো ইঙ্গিতও করবেন না।

আসলে এ বিষয়গুলোতে খুব সচেতন থাকা প্রয়োজন। কারণ অতীন্দ্রিয় লেভেলে যে তথ্য আপনি পাচ্ছেন তা হচ্ছে আমানত। এ তথ্য অন্য কাউকে বলা এই আমানতেরই খেয়ানত।

অন্যের ক্ষতি হতে পারে, তিনি অপ্রস্তুত হতে পারেন এমন কোনো কিছু কাউকে কখনো বলবেন না। বললে অন্তত এটুকু বলতে পারেন যা শুনলে তিনি আনন্দিত হবেন, খুশি হবেন। অর্থাৎ তার জন্যে কল্যাণকর কিছু আপনি তাকে বলতে পারেন। তাকে বলুন যে, আপনি তার মধ্যে অনেক বড় সম্ভাবনা দেখছেন। কিন্তু তার কোনো দোষ বা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো নেতিবাচক ইঙ্গিত করবেন না।

প্রশ্ন : অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোনো দোয়ায়-যেমন, বিয়ে চাকরি বা অন্যান্য বিষয়ে হিলিং করার জন্যে তাকে হিলিং রুমে নিয়ে যাবো, না সরাসরি রহম বলয়ে যাবো?

উত্তর : অন্যের নিরাময়-কল্যাণের জন্যে আমরা কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করছি। নিরাময় কক্ষ শুধুমাত্র নিজের নিরাময়ের জন্যে। এতে আপনি ছাড়া কারোর জায়গা নেই। কমান্ড সেন্টার হলো অন্যের জন্যে। বিয়ে, চাকরি বা অসুস্থতার জন্যে আমরা অন্য কাউকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে যাবো। সেখানে তাকে নিরাময় করবো। কমান্ড সেন্টার থেকে রহম বলয়ে যেতে পারি। তার জন্যে দোয়া করতে পারি।

প্রশ্ন : আপনাকে আমার একটি সফলতার কথা না বললেই না। আমার শাশুড়ি গত একমাস ধরে কানের টিউমারজনিত কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। ইএনটি ডাক্তাররা বলেছে, অপারেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই। শাশুড়ির এই ৭৫ বছর বয়সে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম অপারেশনে যেতে। গুরুজী, গত বুধবার আমি তাকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসেছি। আপনি আমার মনের বাড়ির ডাক্তার। আপনি চমৎকারভাবে অপারেশন করেছেন এবং আমাকে বলেছেন, ‘ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবে, কোনো খারাপ কিছু নেই’।

উত্তর : আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, এটা তাঁরই মেহেরবানি। যত আন্তরিকভাবে এ শক্তি অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করবেন তত আপনি এর প্রতিদান পাবেন।

একজন অসুস্থ মানুষ, সে আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক, রোগী হিসেবে তার কাছে আপনার পরিচয় হচ্ছে একজন সাইকি, ডাক্তার। ডাক্তার যেমন তেমনি আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে আপনি রোগীর নিরাময় কল্যাণ কামনা করবেন, আপনার সাইকি পাওয়ার আরো বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : একবার এমন হয়েছিলো যে, যার দিকে তাকাতাম, তার শারীরিক মানসিক সমস্যা, সে কী চিন্তা করছে তা-ও বলে দিতে পারতাম। কিন্তু সেটা মাত্র একদিন ছিলো, সকালে এসে রাতে চলে গেল। আর পাওয়ারটা ফিরে আসে নি। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : নিশ্চয়ই পাওয়ারটাকে যথাযথ সম্মান দেয়া হয় নি। শক্তির অপব্যবহার করা হয়েছিলো। অথবা ভেতরে অহংকার চলে এসেছিলো। শক্তি অহংকারীর কাছে থাকে না। একে যত নীরবে এবং শুকরিয়ার সাথে লালন করা যায় এবং অন্যের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়, তত এটা স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন : হিলিং সেশনে মেডিটেশনের সময় চোখ খুলে নাম-ঠিকানা পড়ি। চোখ বন্ধ করার সময় মনে প্রশ্ন জাগে চোখের মণি ওপরের দিকে থাকবে, না নিচের দিকে থাকবে?

উত্তর : চোখের মণি যেদিকেই থাকুক, চোখ বন্ধ করলেই চলবে।

প্রশ্ন : আমি যখন কোনো কেস পাই, নাম পড়ার সাথে সাথে প্রায় সবকিছুই মনে চলে আসে। কিন্তু লেভেলে যাবার পর যে ব্যক্তিকে দেখি তার সাথে বর্ণনা মেলে না। পরে দেখা যায়, নাম শোনার পর যা দেখেছিলাম সেটাই বেশিরভাগ সঠিক। এখন আমি কী করবো?

উত্তর : আসলে, আপনার অডিও আর ভিডিওতে মিল হচ্ছে না। অনেক সময় সিনেমাতে দেখায় মুখ নড়ছে, কথা হচ্ছে না। আপনাকে টিউনিং ঠিক করতে হবে, ছবি আর কথা যাতে একসাথে আসে।

আর শিথিল হতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। হলে ভালো না হলে আরো ভালো-দৃষ্টিভঙ্গি হবে এই। কারণ আমি তো আরেকজনের কাছে প্রদর্শনীর জন্যে করছি না। আর সবসময় যা দেখবেন, বলবেন-‘আমার মনে হয়েছে’। এটা হতেও পারে, না-ও পারে।

নিশ্চিত শুধু আল্লাহ হতে পারেন। ক্রেডিট নেয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। যখনই বলবেন-যা দেখেছি ১০০% কারেক্ট-আপনি পিছিয়ে পড়বেন।

প্রশ্ন : সাইকি চর্চার মাধ্যমে আমি যে মেসেজ পাই, তা প্রায় সবকিছু সত্য হয়। বিশেষ একটি ঘটনার মেসেজ আমি বার বার পাই, যা বাস্তবে ঘটার সময় হলে আনুষঙ্গিক যা ঘটার সবকিছু ঘটে। কিন্তু মূল অংশটির ঘটনা পুরোপুরি উল্টো হয়। এমন কেন হচ্ছে জানতে চাই।

উত্তর : মূল অংশটাই উল্টো হওয়ার অর্থ হচ্ছে-এক, টিউনিং ঠিক হচ্ছে না। দুই, অনেক সময় আমরা সাইকি পাওয়ার আর হেলুসিনেশনের পার্থক্য বুঝি না। যখন হেলুসিনেশন হবে তখন মূল ঘটনা উল্টো হবে।

প্রশ্ন : সাইকি ক্লাসে যখন কাউকে পর্যবেক্ষণ করতে যাই তখন পরিস্কারভাবে কিছু দেখতে পাই না। আবার মাঝে মাঝে খুব ভালো দেখতে পাই। এ সমস্যার উত্তর দিলে খুব উপকৃত হবো।

উত্তর : আপনি যাকে দেখতে চাচ্ছেন অর্থাৎ আপনার যে সাবজেক্ট, তাকে পরিস্কারভাবে দেখাটা সবসময় নির্ভর করে আপনার মনের স্থিরতার ওপরে, আপনার লেভেলের ওপরে। লেভেল যেদিন ভালো হবে সেদিন সবকিছু আপনি সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন।

আপনি যত ক্রমাগত চর্চা করবেন তত ভালো দেখতে পাবেন। এর সাথে যখন যৌথ হিলিংয়ে অংশ নেবেন তখন আপনার এই শক্তিটা আরো বেড়ে যাবে। মঙ্গলবারের হিলিং এবং সাইকি-এটা শুধু অন্যের নিরাময়ের জন্যে নয়। এই অনুশীলন এবং মঙ্গলবারের হিলিং যত করবেন তত আপনার অতিচেতনা বাড়তে থাকবে এবং প্রজ্ঞা বাড়তে থাকবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার কখন কী করা উচিত, কী উচিত নয়।

প্রশ্ন : আমি সাইকি ওরিয়েন্টেশন করার পর এখন অতি অল্প সময়ে অটোসাজেশন, মনছবি, হিলিং-মেডিটেশনের এ বিষয়গুলো হয়ে যায়। আগে সবকিছু করতে ৪৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগতো। আমি শুয়ে বা বসে মেডিটেশন করতাম। এখন পদ্মাসনে বসে করি। এটা কি ঠিক আছে?

উত্তর : আসলে আপনি যখন সাইকি চর্চা করছেন, তখন আপনার অতিচেতনা শাণিত হচ্ছে। মনের অচেতন স্তরের সাথে সচেতন স্তরের নিয়মিত সংযোগ ঘটছে। ফলে আপনার প্রজ্ঞা বাড়ছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বুঝতে পারছেন কখন কী করা প্রয়োজন।

সে জন্যেই আপনার মেডিটেশনের গভীরতা বেড়েছে, গতি বেড়েছে। এটাই সাইকি চর্চার কার্যকর দিক। আসলে সফলদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকতে পারেন। সাইকি চর্চা এ ক্ষমতাকেই বাড়িয়ে দেয়।

প্রশ্ন : ভালো সাইকির গুণাবলি কী? এজন্যে কোন মেডিটেশন বেশি করে করতে হবে?

উত্তর : ভালো সাইকির গুণাবলি হলো : প্রথমত, তার নিয়ত। আরেকজনের ভালো করা, কল্যাণ করাটাই তার উদ্দেশ্য। নিজের ক্ষমতা জাহির করা নয়, নিজেকে জাহির করা নয়। দ্বিতীয়ত, মনের বিষ দূর করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আর মেডিটেশনের বেলায় প্রথমেই শিথিলায়ন। শিথিলায়ন হচ্ছে মেডিটেশনের মা। শুধু ভালো সাইকি হওয়া না, ব্রেনটাকে ব্যবহার করতে হলেও শিথিলায়ন করতে হবে। প্রতিদিন মেডিটেশনে একবার শিথিলায়ন করতে হবে।

অবলোকন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে কল্পনার মেডিটেশন করবেন। আরো ভালো হচ্ছে মায়ের ছবি সামনে নিয়ে আসবেন। ছবির দিকে তাকাবেন, চোখ বন্ধ করে মাকে কল্পনা করুন। আবার তাকান, কল্পনা করুন।

আপনার ভিজুয়ালাইজিং পাওয়ার বাড়তে থাকবে। কারণ, মায়ের সাথে ইমোশনাল সম্পর্ক বেশি। দেখবেন, ছবি তাড়াতাড়ি আসবে। মা না থাকলে মায়ের ছবি দেখবেন আর বাস্তবে থাকলে মাকে সামনে বসিয়ে রাখবেন। এটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশন বাড়ানোর সবচেয়ে চমৎকার পথ।

প্রশ্ন : অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে সত্য বলা, গীবত থেকে দূরে থাকা, আরো কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে হবে?

উত্তর : যদি সত্য বলেন আর গীবত থেকে বিরত থাকেন—আর কিছু লাগবে না। কারণ, এ যুগে সত্য বলার চেয়ে কঠিন কাজ খুব কম। গীবতের যেরকম চর্চা চারপাশে হচ্ছে তাতে গীবত থেকে দূরে থাকা বেশ কষ্টকর। অতএব এদুটো কাজ করতে পারেন। আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। সত্য বলার শক্তি কী রকম—সত্য বলার অভ্যাস যদি একবার হয়ে যায়, যা বলবেন তাই সত্য হবে। মুখ থেকে যদি ভুল কথাও বেরিয়ে যায়, সেটাও সত্য হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ভালো সাইকির জীবনযাত্রা কেমন হওয়া উচিত? জীবনযাত্রা সাইকির ওপর প্রভাব ফেলে কি?

উত্তর : অবশ্যই ফেলে। একজন মানুষ অন্যদিকে অসৎ থাকবে আর জীবনের এদিকে সৎ থাকবে—এটা হয় না। যে সৎ, সে জীবনের সবদিকে সৎ। অতএব, সবসময় নিজের কাছে সৎ থাকবেন। এমন কোনো কাজ করবেন না যেটার জন্যে নিজের কাছে কৈফিয়ত দিতে হতে পারে। আর ভুল হয়ে গেলে অনুশোচনা করবেন। ভুলকে কখনও জাস্টিফাই করবেন না। অনুশোচনা করবেন, প্রতিকার করবেন।

একজন ভালো সাইকি সবসময় একজন ভালো মানুষ। একজন ভালো সাইকি আরেকজনের আশ্রয়স্থল। যদি আরেকজন আপনার ওপর নির্ভর করতে না পারে, আপনি কখনও ভালো সাইকি হতে পারবেন না। অনেকের অনেক তথ্য আপনি জানবেন। কিন্তু সাবধান থাকবেন—গর্ব করার জন্যে যেন কখনো এটা প্রকাশ করে না ফেলেন। অনেকে হয়তো প্রশংসা করবেন যে,

আমার এ ব্যাপারটা আপনি দেখেছেন, আপনার হিলিংয়ের কারণে আমার এ রোগটা নিরাময় হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু আপনি এটা বলেন—এই অনুমতি না দিলে কখনো কারো বিষয়ে অন্যদের কিছু বলবেন না। কারণ, যিনি আপনার সাহায্য চাইতে এসেছেন তার সবকিছু গোপন রাখার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার।

হিলিং সেশনে এসে এমন নাম দেখলেন যাকে আপনি চেনেন। কিন্তু আপনি তার ঐ সমস্যাটা জানতেন না এবং সেও চায় না এটা আপনি জানেন। কখনো আপনাকে জানায় নি। কেয়ামত পর্যন্ত যেন তার সাথে এ বিষয় নিয়ে আপনি আলাপ না করেন, সে না বলা পর্যন্ত। আপনি যে তার কেস পড়েছেন—এটাও তাকে বলবেন না। এই আস্থাটা খুব বড় জিনিস।

আমি সবসময় এই আস্থা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কখনো কাউকে কিছু বলি নি, সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে হয়তো খোলামেলা আলাপ করি। আপনি যে সমস্যা নিয়ে এসেছেন এটা আপনি জানেন, আমি জানি। এমনকি আপনারা যদি না করেন, আমি আপনাদের মা-জীর সাথেও কখনো এ বিষয় নিয়ে আলাপ করি না। এটা হচ্ছে ভালো সাইকির সবচেয়ে বড় গুণ।

অন্যের বিশ্বস্ততা যত রক্ষা করবেন, আল্লাহর রহমত তত আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। কারণ, নবীজীর শিক্ষা হচ্ছে, কারো দোষ বা রোগ যেটা সে প্রকাশ করতে চায় না, সেটা অপ্রকাশিত রাখাটা আপনার দায়িত্ব। আপনি জেনেও যে বিষয়টা গোপন রাখলেন, আল্লাহও আপনার দোষ ওভাবে গোপন রাখবেন।

প্রশ্ন : নিঃস্বার্থ ও একাত্মচিন্তে প্রার্থনা কি অপরকে ভ্রান্তি আর অবিদ্যার জগৎ থেকে আলোকিত পথে আনতে পারে? যদি পারে তবে কীভাবে এবং এক্ষেত্রে কতদিন প্রার্থনা করা উচিত?

উত্তর : আসলে অন্যের জন্যে প্রার্থনা অনেক সময় কাজ করে, অনেক সময় কাজ করে না। আপনার কাজ হচ্ছে একাত্মচিন্তে প্রার্থনা করা। উপকার হলে আপনার দুটো সওয়াব হবে। না হলে আপনার একটা সওয়াব হবে। আপনি তার জন্যে প্রার্থনা করেছেন—এই সওয়াবটা পাবেন। আর সে যদি ভালো হয়ে যেত তাহলে সওয়াবটা আরো বেশি হতো। অতএব, যে কারো ভালো হবার জন্যে একাত্মচিন্তে আমরা প্রার্থনা করতে পারি। ফলাফল কী হবে এটা আমাদের দেখার দরকার নেই।

প্রশ্ন : একজনকে হিলিং করে সুস্থ করার চেষ্টা করছি। যখন রোজ তাকে হিলিং করবো তখন কি আবার তাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখবো না কি সুস্থ অবস্থায় দেখবো?

উত্তর : তাকে বার বার সুস্থ অবস্থায় দেখবেন।

প্রশ্ন : আমি যদি কাউকে নিরাময় করতে চাই তাহলে কমান্ড সেন্টারে তাকে কতবার নিয়ে আসা জরুরি? একবার নিরাময় করার পর অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থ না হন তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : একবারে না হলে বার বার, শতবার—এটা তো আমরা জানি। একবার যদি না হয় তো শতবারই করবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাময় না হচ্ছে কমান্ড সেন্টার তার জন্যে রিজার্ভ রাখবেন। অর্থাৎ যখনই মেডিটেশন করবেন, তখনই হিলিং করবেন। আপনি কমান্ড সেন্টারে নিরাময় করছেন মানে তার জন্যে দোয়া করছেন। একজন অসুস্থ মানুষ বাস্তবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে দোয়া করা ইবাদত।

প্রশ্ন : গুরুতর অসুস্থ আমার এক বোনকে আমি সুস্থ করতে চাই। কীভাবে হিলিং করবো?

উত্তর : কমান্ড সেন্টারে তাকে নিয়ে আসবেন এবং তাকে হিলিং করবেন। তাকে নিরাময় করার জন্যে অন্তর্গুরুর পরামর্শ ও সহযোগিতায় যা যা করা দরকার সেটা করবেন।

প্রশ্ন : কমান্ড সেন্টারে সর্বোচ্চ কতজনকে নিরাময় করা যাবে? বেশি মানুষ হলে নিরাময় করার ক্ষেত্রে কাকে বেশি সময় দেবো?

উত্তর : কমান্ড সেন্টারে একা যখন মেডিটেশন করবেন তখন সর্বোচ্চ ৪ জনকে হিলিং করতে পারবেন। একসাথে একজন, তারপর দ্বিতীয় জন, তারপর তৃতীয়জন—একজন একজন করে আনবেন। একজন আসবে। হিলিং করবেন। সে চলে যাবে। তারপরে আরেকজন আসবে।

আর কমান্ড সেন্টারে যখন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আসবেন, পরিবারের সবাইকে একসাথে নিয়ে আসবেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের

বাইরে যখন আনবেন, তখন একজন একজন করে আনবেন। আর নিরাময় করার ক্ষেত্রে আপনার মন যাকে যতটুকু সময় দেয়ার কথা বলে, ততটুকু সময় তাকে দেবেন। এ ক্ষেত্রে সবসময় অন্তর্গুরুর সাহায্য নেবেন।

প্রশ্ন : একসাথে ১২-১৪ জনকে মিটিং-এর মতো সার্জেশন দিতে হবে সেটা কি সম্ভব? কারণ ১২-১৪ জনকে নিয়ে বার বার screen-এ এনে সার্জেশন দেয়া তো অনেক সময়ের ব্যাপার।

উত্তর : যে কাজটি গুরুত্বপূর্ণ সেটার জন্যে তো সময় আপনাকে দিতে হবে। আর যদি মনে করেন যে, এই কাজের গুরুত্ব নেই, তো সময় কেন দেবেন? আবার মনে করবেন যে, কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সময় নাই-দুটো তো হতে পারে না। কারণ একটি কাজকে যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন তাহলে তা করার সময়ও আপনি বের করতে পারবেন। কারণ পৃথিবীতে ব্যস্ত লোকেরাই কাজ করে।

প্রশ্ন : হিলিং করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। রোগী মারা গেল। এ অবস্থায় সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে, হিলিং-এ কী লাভ? আমার উত্তর কী হবে?

উত্তর : দেশে-বিদেশে এত বড় বড় হাসপাতাল, বড় বড় ডাক্তার, কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। সব রোগী কি ভালো হয়? হাসপাতালে চিকিৎসার পরও প্রতিদিন অনেক রোগী মারা যাচ্ছে। এজন্যে হাসপাতালের দোষ দেয়া যায় না। কারণ হাসপাতাল নিরাময়ের একটি প্রক্রিয়া আর হিলিংও নিরাময়ের একটি প্রক্রিয়া।

মৃত্যু ছাড়া আর সব রোগেরই ওষুধ আছে। যেকোনো নিরাময়ের জন্যে আমরা মেডিটেশনের মাধ্যমে হিলিং করতে পারি। মৃত্যু যখন আসার তখন তা আসবেই। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও যদি হিলিং কাজ করতো, তাহলে কোনো মহামানব মারা যেতেন না। মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো হিলিং কাজ করে না। মৃত্যু ছাড়া আর সব রোগের ওষুধ হিলিং। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, মেডিটেশনে নিরাময় লাভের অপূর্ব ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। যাবতীয় রোগের ৭৫ ভাগই মেডিটেশনের মাধ্যমে নিরাময় করা সম্ভব।

৩০০ তম কোর্স উচ্ছ্বাস-৫ এ অংশগ্রহণকারী এক ভদ্রমহিলা। তিনি হাসপাতালে ছিলেন বেশ কয়েকদিন। তার ফুসফুসে পানি এসেছে। কৃত্রিম

শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছিলো। ডাক্তাররা পর্যন্ত তার আশা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

কোর্সের প্রথম দিন খুব অসুস্থ ছিলেন। তার হাজবেন্ড কোর্সে আসতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন। হাঁটুতে ক্যাপ পরে থাকতেন, রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারতেন না। কোর্সে এসে প্রথম দিন থেকেই তিনি রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছেন।

প্রশ্ন : ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাবে সমস্যাগ্রস্ত হলে কীভাবে নিরাময় করবো?

উত্তর : কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হলে ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাবে আপনার সমস্যাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কোর্সের পর থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক, জাদু-বান-টোনা-এর কোনো প্রভাব আপনার ওপর কখনো পড়বে না। কারণ কোর্সে গুরু আপনাকে সে প্রতিরক্ষা বর্ম দিয়েছেন। অতএব সবসময় বিশ্বাস রাখবেন যে, যে যত ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক করুক বা যা-ই করুক, সেটার কোনো প্রভাব আপনার ওপর পড়বে না।

প্রশ্ন : অন্যেরা যদি বুঝে যায় যে, আমি কোয়ান্টাম মেথড ব্যবহার করে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছি?

উত্তর : নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে কাউকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন না। আর অন্যের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করলে সে কথা তো কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। তার কল্যাণ হলে বাস্তবেই তা দেখতে পাবেন। আর তিনিও তা অনুভব করেছেন বুঝতে পারলে আপনি স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করবেন।

প্রশ্ন : অপর দুইজনের সম্পর্ক খারাপ। সেটা ভালো করবো কী প্রক্রিয়ায়?

উত্তর : এজন্যে তাদের কমান্ড সেন্টারে নিয়ে এসে পরামর্শ দেবেন, ভালোভাবে বোঝাবেন। অবশ্য তারা যদি নিজেরা না চায় তাহলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ ব্যাপারটা আসলে আপনার নয়, তাদের। আর তারা যদি চায় তাহলে তাদের কল্যাণ কামনায় নিয়মিত হিলিং করতে থাকবেন, কমান্ড দিয়ে যাবেন এবং সব ভালো ভালো ধারণা পরস্পর পরস্পর সম্পর্কে দেবেন। দেখবেন যে, সম্পর্ক ভালো হয়ে আসছে।

প্রজ্ঞা

প্রশ্ন : প্রজ্ঞা কী? প্রজ্ঞাহীনতা কী?

উত্তর : এটাকে আমরা একটি গল্প দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। একটি প্রতিযোগিতার গল্প। দুইজন প্রতিযোগী। একজন বাঙালি আরেকজন চীনা।

চীনা মানে হচ্ছে চীন দেশের অধিবাসী। জিনিস দুটো। একদিকে ১০ কেজি ওজনের রুই মাছ। আরেকদিকে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি। শর্ত একটাই, দুটো নেয়া যাবে না। যেকোনো একটা নিতে হবে।

কোনো প্রতিযোগিতা হয় নি। বাঙালি ‘ইয়া আলী’ বা ‘মা কালী’ বলেই মাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর চীনা চেংচুং বা ফেংফুং বলে একেবারে মাছ ধরার যন্ত্র লুফে নিয়েছে।

বাঙালি কেন মাছ লুফে নিলো? সে ভাবলো, আহ! এটাকে এখনই নিয়ে গিয়ে দোপেঁয়াজা করা যাবে। আর চীনা কেন যন্ত্রপাতি নিলো? কারণ চীনা জানে যে, মাছ নিয়ে গেলে সকালবেলা এটা টয়লেটে চলে যাবে। আর যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলে সারা বছর সে মাছ ধরে খেতে পারবে। এটাই হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাহীনতা।

আমরা প্রথম স্বাধীন হলাম ১৯৪৭ সালে। পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার জন্যে আবার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করতে হলো। তারপরে ৪০ বছর পার হয়ে গেল। কোটি কোটি ডলার ঋণ নিয়ে আমরা সুপার পুওর হয়ে গেলাম সুপার পাওয়ার না হয়ে।

আর চীন আমাদের এক বছর পরে স্বাধীন হলো ১৯৪৮ সালে। কোনো ঋণ নিলো না। এই শতাব্দীর অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার এবং পরবর্তী সুপার পাওয়ার হচ্ছে চীন। কেন? এই প্রজ্ঞার জন্যে।

প্রজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞান + অন্তর্দৃষ্টি + দূরদৃষ্টি। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য।

যেকোনো মুহূর্তে আপনি ১০০০টা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ১০০০টা বিকল্প থাকতে পারে আপনার কাছে। কিন্তু একটা সিদ্ধান্তই হবে সঠিক। আর ৯৯৯টা হবে আংশিক ঠিক অথবা ভুল। এই সঠিক সিদ্ধান্তটি যিনি নিতে পারেন তিনিই হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান। এই প্রজ্ঞার নিবাস কোথায়? প্রজ্ঞার নিবাস হচ্ছে আমাদের মনের অতিচেতন বলয়ে। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন অচেতন বলয়। সাধকরা বলেন-অতিচেতন বলয়। সেখানেই হচ্ছে প্রজ্ঞার নিবাস।

প্রশ্ন : প্রজ্ঞাবান কে? প্রজ্ঞার গুরুত্বই বা কী?

উত্তর : যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সিদ্ধান্তটি সঠিক সময়ে নিতে পারেন তিনিই প্রজ্ঞাবান ।

প্রজ্ঞার গুরুত্ব অনেক । সুস্বাস্থ্যের পর স্রষ্টার সবচেয়ে বড় নেয়ামতই হলো এই প্রজ্ঞা । কারণ একজন মানুষের অর্থ, বস্তুগত সম্পত্তি ছিনতাই হতে পারে, বেদখল হতে পারে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে । কিন্তু মানুষটির যদি প্রজ্ঞা থাকে তাহলে ছাই থেকেও তার পুনরুত্থান ঘটতে পারে । আর যদি প্রজ্ঞা না থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক কিছু পাওয়ার পরও সে নেমে যেতে পারে নিঃশ্ব, অসহায়ত্বের নিম্নতম স্তরে ।

ইতিহাসেই রয়েছে এর দৃষ্টান্ত । উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনও হয়েছিলো প্রজ্ঞাহীনতার মধ্য দিয়ে । ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের বিশেষ দূত হয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিলেন ইংরেজ কূটনীতিক টমাস রো ।

উদ্দেশ্য-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যে বাণিজ্য ছাড় আদায় । বছরের পর বছর তিনি সম্রাটের পেছনে ঘুরেছেন, উপহার-উপঢৌকন আর মিষ্টি কথা দিয়ে তার মন জয়ের চেষ্টা করেছেন ।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কন্যা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে হেকিম-কবিরাজ যখন রোগ সারাতে ব্যর্থ হলেন তখন টমাস রো ইংরেজ ডাক্তার নিয়ে গেলেন-যার চিকিৎসায় জাহাঙ্গীরকন্যা সুস্থ হয়ে উঠলেন ।

সম্রাট খুশি হয়ে পুরস্কার দিতে চাইলে টমাস রো নিজের জন্যে কিছু চান নি । তিনি তার স্বজাতির জন্যে শুষ্কমুক্ত ব্যবসার সুযোগ চেয়েছিলেন । দিল্লীশ্বর সে সুযোগ তাকে দিলেন । পরবর্তী সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচ্ছত্র রাজত্ব করলো । ফরাসি, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফিরিঙ্গিরা ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় আর টিকতে পারলো না । বাণিজ্য তো বটেই পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতাও তাদের পদানত হয়েছিলো ।

অর্থাৎ একই ঘটনায় একজনের প্রজ্ঞা এবং আরেকজনের প্রজ্ঞাহীনতার উদাহরণ আমরা দেখি । ইংরেজ টমাস রো যে ঘটনায় তার অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তিন শত বছর ধরে তার জাতিকে সম্পদ-ক্ষমতা ভোগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেই একই ঘটনায় নিজেদের প্রজ্ঞাহীনতার পরিচয় দিয়ে মোঘলরা জাতির স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির বিনাশ করেছিলো ।

আসলে প্রজ্ঞা হলো তা-ই যা দিয়ে একজন মানুষ বুঝতে পারবে তার আজকের একটি সিদ্ধান্তের ফলাফল ৫/১০ বছর বা আরো পরে তার জন্যে কী পরিণতি নিয়ে আসবে-ভালো না মন্দ, কল্যাণ না অকল্যাণ।

যেমন, ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি সাময়িক এক ধরনের মোহে আকৃষ্ট হয়। একটু বাঁকা চাহনি, একটু আবেগপূর্ণ কথা, একটু গুরুত্ব দেয়া-এসব দেখে মোহাবিষ্ট হয়, বাস্তব জ্ঞানশূন্য হয় বা অনৈতিক কাজ করে ফেলে। নষ্ট করে পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, পারিবারিক সম্পর্ক। কিন্তু তখন যদি সে একটু থেমে ভাবতো তার এ আবেগ বা ঝোঁকের মাথায় নেয়া সিদ্ধান্তের পরিণতি কী হবে তাহলেই কিন্তু প্রেম-পাগলামিতে জড়িয়ে নষ্ট করতো না জীবনের সম্ভাবনা।

আবার প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনে জটিলতা বা সংঘাত এড়ানো গেছে এমন ঘটনাও প্রচুর। একটি বাস্তব ঘটনা। সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ ইবনে সউদের সময় যখন সৌদি আরবে টেলিফোন চালু করা হচ্ছিলো, প্রবল বিরোধিতা আসতে লাগলো কিছু ধর্মীয় নেতার কাছ থেকে।

কারণ যারা ধর্মাক্ত তারা তো সবসময় নতুন কিছুকে বেদাত বলে বাতিল করে দিতে চায়। অবশ্য বেদাত শব্দটার মানেই হলো নতুন কিছু। সেই হিসেবে সব নতুন জিনিসকেই বেদাতের দলে ফেলা যায়।

একজন আলেম ক্ষেপে গেলেন যে, না, এটা হচ্ছে ইহুদি-নাসারাদের ব্যবস্থা। এটা সৌদি আরবে চালু করা যাবে না। এখন বাদশাহ দেখলেন যে, মহাবিপদ। এরা যদি কোনো ফতোয়া দিয়ে দেয় তাহলে হয়তো আমার রাজত্বও চলে যেতে পারে।

বাদশা বুদ্ধি ঠিক করে ফেললেন। বললেন যে, এই পদ্ধতি আল্লাহ পছন্দ করবেন কি করবেন না এটা আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার। এজন্যে বাদশাহ প্রস্তাব দিলেন-যারা বিরোধিতা করছেন তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন টেলিফোনের এক প্রান্ত থেকে কোরআন তেলাওয়াত করবেন। আর তাদেরই আরেকজনকে বললেন অপর প্রান্ত থেকে সেটা শুনতে। আর যদি শোনা যায় তাহলে সালাম দিতে। যদি দুজনই পরস্পরের কথা শুনতে পান তাহলে বোঝা যাবে যে, এতে আল্লাহর অনুমতি রয়েছে। কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আল্লাহর কালাম এই তারের মধ্য দিয়ে যাবে না।

তারা সম্মত হলেন। কারণ যারা ফতোয়া দিয়েছেন তাদের তো টেলিফোন সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই। নির্দিষ্ট দিনে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা

হলো। টেলিফোনের মধ্য দিয়ে সফলভাবে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা ও শোনা গেল—তারা মেনে নিলেন যে, এতে আল্লাহর অনুমতি আছে। চালু হয়ে গেল টেলিফোন ব্যবস্থা।

বাদশাহ সউদের যদি প্রজ্ঞা না থাকতো তাহলে উনি কী করতেন? বিরোধে জড়িয়ে পড়তেন। দেখা যেত বিরোধিতার কারণে তাকে বাদশাহীও ছেড়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু উনি বিরোধ এড়ানোর জন্যে প্রজ্ঞার আশ্রয় নিলেন।

আরেকটি ঘটনা। এক লোক খেজুর গাছ থেকে পড়ে গেল। পড়-তো-পড় আরেক লোকের ওপরে। এবং যার ঘাড়ের ওপরে পড়েছে সে মারা গেল।

এখন মৃতের স্ত্রী রাজার দরবারে তার স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে আর্জি জানালো। রাজা দেখলেন, যেহেতু এটা একটা দুর্ঘটনা—হত্যাকারীর কোনো ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, আর বিধবা মহিলাটিও দুস্থ, তাই মৃত্যুর বদলে মৃত্যুর চেয়ে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ হওয়াটাই সবদিক থেকে মঙ্গলজনক।

তিনি রক্তক্ষণ শোধের প্রস্তাব দিলেন। তখন আরবে একটি প্রথা ছিলো রক্তপণ। অর্থাৎ যে মারা গেছে তার নিকট-আত্মীয়রা টাকা পয়সা নিয়ে যদি সম্মুখ হয় তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে যেত।

কিন্তু মহিলা জিদ ধরলো যে, আমার স্বামীকে যেহেতু মেরেছে মৃত্যুর শাস্তি মৃত্যু হতে হবে। রাজা যখন কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলেন না তখন বললেন যে, ঠিক আছে, তুমি যখন জিদ করছো, আইন অনুসারে তোমার স্বামীর যে হত্যাকারী তার মৃত্যু হবে।

তবে তোমার স্বামীকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তুমিও তাকে একই পদ্ধতিতে হত্যা করবে। ঐ লোককে খেজুর গাছের নিচে বেঁধে রাখা হবে। তুমি খেজুর গাছে উঠবে, ওখান থেকে ঐ লোকের ঘাড়ে পড়বে।

মহিলা বললো যে, এটা কীভাবে হবে?

রাজা বললেন যে, দেখ, আইন তো সুবিচার চায়। তোমার স্বামীর যেভাবে মৃত্যু হয়েছে তুমি যেহেতু তোমার স্বামীকে ভালবাসো—তোমার স্বামীর হত্যাকারীকেও সেই একইভাবে হত্যা করতে হবে।

এখন মহিলা তো গাছে উঠতে পারে না। এই রকম লম্বা খেজুর গাছ। শেষে মহিলা যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করছে তখন রাজা বললেন, এখনো তোমার সুযোগ আছে। মহিলা তখন বললো, ঠিক আছে, তাকে মারলে তো আর আমার স্বামী ফেরত আসবে না। আমি রক্তপণই নেবো।

এই যে দূরদৃষ্টি, এই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার

সাথে মোকাবেলা করা—এটাই প্রজ্ঞা। যখন আপনার মধ্যে প্রজ্ঞা আসবে তখন সবসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : ‘এলহামের স্তর’ কথাটা শুনে থাকি। এর মানে কী?

উত্তর : এলহাম হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। আমরা যেটাকে প্রজ্ঞা বলছি, সেটাই এলহামের স্তর। প্রজ্ঞার স্তরে গেলে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞান তার কাছে আসতে থাকে।

আসলে এ দিব্যজ্ঞান সবসময়ই রয়েছে। কিন্তু যদি মন অন্যান্য চিন্তা, টেনশন নিয়ে ব্যস্ত থাকে, উৎকর্ষিত থাকে, তাহলে এই জ্ঞান আসার সুযোগ পায় না। ঠিক বিমান নামার জন্যে যেমন ফাঁকা রানওয়ে দরকার।

রানওয়েতে একটা ইট থাকলেও তা বিমানটির জন্যে বিপজ্জনক। কারণ তাতে দ্রুতগতিতে নামা প্লেন ক্রাশ করার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি মনের যে রানওয়ে সেটা যখন নিস্তরঙ্গ, নীরব হবে, মসৃণ ও শক্ত হবে, প্রশান্ত হবে—তখনই মেসেজ এসে ল্যান্ড করবে। অর্থাৎ তখনই জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞার দুয়ার খুলে যায়। এটাই এলহামের স্তর।

প্রশ্ন : জ্ঞান কী? প্রজ্ঞার সঙ্গে এর মিল-অমিল কী? প্রজ্ঞার মেডিটেশনে আমরা মহাজাগতিক জ্ঞানভান্ডার থেকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান গ্রহণ করি, এই জ্ঞান কোথায় কীভাবে কাজে লাগবে?

উত্তর : জ্ঞান বলতে প্রচলিত ভাষায় আমরা যা বোঝাই তা আসলে তথ্য। যেমন, করলা একটি সবজি যার স্বাদ তেতো, রং সবুজ। এগুলো হলো তথ্য। কিন্তু তথ্যটিকে আমি কীভাবে কাজে লাগাবো সেই বিবেচনার নাম হলো জ্ঞান। যেমন, একটি গাড়ির রং কালো। এটি একটি তথ্য।

কিন্তু গাড়িটি আমি কীভাবে চালাবো, এটা দিয়ে কি কল্যাণ করবো না অকল্যাণ করবো—অর্থাৎ তথ্যকে ব্যবহার করার কল্যাণকর বা অকল্যাণকর দিক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার নাম হচ্ছে জ্ঞান।

আর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কেউ যখন বুঝতে পারে যে, কল্যাণ কী, অকল্যাণ কী, এ কাজটি তার জন্যে কল্যাণকর হবে কি না সেটাই হলো প্রজ্ঞা।

যেমন, একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কেউ যখন বুঝতে পারে কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল; যদিও আপাতদৃষ্টে হয়তো প্রথমটিকে

ততটা লাভজনক মনে না-ও হতে পারে। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সে ক্ষমতাই হলো প্রজ্ঞা। সব জ্ঞানকেই আমরা কাজে লাগাবো আমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্যে।

প্রশ্ন : প্রজ্ঞাবান হওয়ার বাস্তব প্রতিফলন কী? অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : প্রজ্ঞা মানে হলো জ্ঞান + অন্তর্দৃষ্টি + দূরদৃষ্টি। প্রচলিত অর্থে আমরা তাকে জ্ঞানী বলি যার অনেক তথ্য বা ইনফরমেশন আছে। এই তথ্য বা ইনফরমেশনের সাথে যখন অন্তর্দৃষ্টি যোগ হয়, তখনই তিনি প্রাজ্ঞ বা প্রজ্ঞাবান। একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা এটাকে বুঝতে পারি।

একজন এসে একটা তথ্য দিলো যে, অমুকে ব্যবসায় মার খেয়েছে। অর্থাৎ এত বেশি লোকসান করেছে যে, ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। এ তথ্যটি পাওয়ার পর আপনি যদি তা বিশ্লেষণ করতে পারেন যে, কেন এ তথ্য আপনাকে দেয়া হলো? যে দিলো তার উদ্দেশ্য কী-তাহলেই আপনি অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে পারলেন। যেমন, প্রথমত তথ্যটি সত্যও হতে পারে। আবার মিথ্যাও হতে পারে। যদি সত্য হয় তাহলে এ তথ্য সে আপনাকে কেন দিলো?

হতে পারে, যে দিয়েছে সে কথা গোপন রাখতে পারে না। যা সে জানে তার সবকিছুই অন্যদের জানাতে চায়।

আবার হতে পারে সে এতে খুব দুঃখ পেয়েছে এবং তার দুঃখটাকেই সে আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছে।

তৃতীয়ত হতে পারে যে, সে এতে খুব আনন্দিত। সেজন্যে আপনিসহ সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে।

আবার আপনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেও তথ্য দিতে পারে। যেমন যার সম্পর্কে এ তথ্য, আপনি হয়তো তাকে অপছন্দ করেন। অতএব তার বিপদের খবর আপনাকে আনন্দিত করবে-এটা ভেবে সে এ তথ্য আপনাকে দিয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য হলো-এর মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে কোনো আনুকূল্য বা সুবিধা নেয়া। আবার আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেও দিতে পারে।

অর্থাৎ এই বিশ্লেষণ, মোটিভ বুঝতে পারাই হলো অন্তর্দৃষ্টি। আর এই অন্তর্দৃষ্টির আরেক দিক হলো-এ তথ্য বা ঘটনাটি কেন ঘটলো তা বুঝতে পারা। আর দূরদৃষ্টি হলো ঘটনার পরবর্তী প্রক্রিয়া বা প্রভাব কী হবে তা

বুঝতে পারা। ৫ বছর, ১০ বছর বা ৫০ বছর পর আপনার জীবনে এ ঘটনার প্রভাব কী হবে তা যখন বুঝতে পারবেন, আপনি বুঝবেন আপনি প্রজ্ঞাবান।

প্রশ্ন : প্রজ্ঞাবান হওয়ার উপায় কী?

উত্তর : প্রজ্ঞাবান হওয়ার জন্যে প্রয়োজন দৃষ্টির স্বচ্ছতা। এই দৃষ্টি জীবনদৃষ্টি হতে পারে, অন্তর্দৃষ্টি হতে পারে, বোঝার ক্ষমতা হতে পারে, উপলব্ধির ব্যাপ্তি হতে পারে। আর এই দৃষ্টির স্বচ্ছতা তত বাড়বে যত মনের পর্দাগুলো সরিয়ে ফেলা যাবে। যেমন-চোখে যখন ছানি পড়ে তখন একজন মানুষ ‘চোখ থেকেও অন্ধ’। কারণ তার চোখের সামনে রয়েছে এক পর্দা, যা অনেক সময় দেখাও যায় না। তেমনি মানুষের মনরূপ দৃষ্টির সামনে যদি পর্দা থাকে, তখন তার প্রজ্ঞা, তার অন্তর্দৃষ্টিও এমনি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না।

আর মনের একটা বড় পর্দা হচ্ছে আমাদের ভ্রান্ত আবেগ, নেতিবাচক আবেগ। প্রজ্ঞাবান হওয়ার উপায় হলো-অন্তরের পর্দা এই নেতিবাচক আবেগের ময়লাগুলো দূর করা। কারণ অন্তরই হলো প্রজ্ঞার আকর।

যদি আপনি জানেন অন্তরে কীভাবে তাকাতে হয় এবং যদি আপনার অন্তর পরিষ্কার থাকে তাহলে আপনার অন্তরেই সবকিছুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। যেমন, একটা আয়নায় তখনই প্রতিবিম্ব দেখা যায় যখন আয়নাটা স্বচ্ছ থাকে, পরিষ্কার থাকে। যদি ময়লার স্তর থাকে তাহলে আয়না আবছা হয়ে যায়। প্রতিফলন আর হয় না।

ময়লা সবসময় স্তরে স্তরে জমে। যদি একটা আয়না ফেলে রাখেন এবং সেটাকে যদি প্রতিদিন পরিষ্কার না করেন, তাহলে আস্তে আস্তে আয়নায় ময়লা জমতে থাকবে।

যেমন, আমাদের ময়নামতি, পাহাড়পুর-এ জায়গাগুলো খনন করার আগে টিলা ছিলো। আসলে এগুলো ছিলো তখনকার দিনের সুউচ্চ সব ভবন-ঐ জনপদের সভ্যতা সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। একসময় কোনো না কোনো কারণে যখন তা পরিত্যক্ত হলো, আস্তে আস্তে ধুলোবালি জমতে থাকলো। দুশ তিনশ চারশ পাঁচশ ছয়শ বছর পরে এগুলো সব টিলা হয়ে গেল।

আমাদের এই ঢাকা শহরকেও যদি আজ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়, কী হবে? সুউচ্চ ভবনগুলো ধুলোর স্তর পড়ে পড়ে সব বড় বড় টিলা হয়ে যাবে। যেগুলো দোতলা তিনতলা সেগুলো ছোট টিলা, যেগুলো বিশতলা বাইশতলা

সেগুলো বড় টিলা হবে। পাঁচশ বছর পরে যারা আসবে মনে করবে যে, এটা একটা পার্বত্য এলাকা।

আমাদের অন্তরও তা-ই। এটাকে যদি সবসময় পরিষ্কার করা না হয়, তাহলে এর যে প্রতিফলন ক্ষমতা, এর যে স্বচ্ছতা অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্সি তা নষ্ট হতে থাকে। স্তরে স্তরে ধুলো জমতে থাকে, ময়লা জমতে থাকে। আর এ ময়লা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ এই অন্তরে কোনো প্রতিফলন ঘটবে না। প্রতিবিম্বও দেখা যাবে না। তাই প্রজ্ঞাবান হতে হলে নেতিবাচক আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন : প্রধানত কী কী নেতিবাচক আবেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। কীভাবে করবো?

উত্তর : প্রথমত, ক্ষোভ এবং অভিমান। ক্ষোভের একটা ধরন হচ্ছে যে, আমাকে কেউ বুঝলো না। এটা আমরা করি আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষদের সাথে যাদের সাথে আমরা বেশিরভাগ সময় কাটাই। তিনি পরিবারের সদস্য হতে পারেন, কর্মজীবনের সহকর্মী হতে পারেন, বস হতে পারেন বা হতে পারেন অধীনস্থ।

আসলে সমস্যা কিন্তু উনি নন, সমস্যা আপনি। তিনি বুঝলেন না তা নয়, আপনি বুঝলেন না। যদিও আমরা নিজের ভুল কখনো স্বীকার করতে চাই না। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাই। বলতে চাই বা ভাবতে চাই যে, আমি নির্দোষ, আমি নিরপরাধ, আমার কোনো ভুল নেই, কোনো অন্যায় নেই, আমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু অন্যায়টা যে আমি করছি এটা আমি বুঝি না। আমরা সবসময় চাই যে, আরেকজন আমাকে বুঝুক। আমি যে তাকে বুঝতে পারি না সেটা আমি বুঝি না। যেমন, ভাইয়ের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে যে, কেন ভাই বুঝতে পারছে না? এদিকে আমি কিন্তু ভাইকে বুঝতে চেষ্টা করছি না।

তাহলে সমস্যাটিকে আপনি পাল্টে দিন। আপনার ভাইকে তো আপনি বদলাতে পারছেন না। কারণ আপনার ভাই বদলাবেন কি না এটা তার ওপর নির্ভর করছে। আপনি বদলাবেন কি না, আপনি পরিবর্তিত হবেন কি না এটা তো আপনার ওপর নির্ভর করছে। অতএব আপনি যা পারেন সেটা করলেই অনেক সহজ হয়ে যায়।

আবেগ যখনই আসবে, তখন আপনি আর নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে

পারবেন না। আপনার ভাবনাটা হয়ে যাবে পক্ষপাতদুষ্ট। আপনার বিচার ক্ষমতাটা প্রভাবিত হয়ে যাবে। তখন আপনার সিদ্ধান্তটা নিরপেক্ষ হবে না, প্রজ্ঞাসম্মত হবে না এবং সঠিক হবে না।

প্রজ্ঞাবান হতে হলে তাই আপনাকে আবেগের উর্ধ্বে উঠতে হবে আর এটা আপনি তখনই পারবেন যখন যে কারণে আপনার আবেগ সৃষ্টি হলো অর্থাৎ যেটা আপনাকে অস্থির করে তুলছে, আপনার মধ্যে অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি করছে বা ক্ষোভ সৃষ্টি করছে সেই বিষয়টাকে নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারবেন। আপনি তখন অপরপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারবেন এবং আপনার ভুল করার পরিমাণ কমে যাবে।

জীবনে আমাদের ভুলটা হয় কোথায়? আমরা শুধু নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। আশেপাশে যে পাঁচটা মানুষের পাঁচটা দৃষ্টিকোণ রয়েছে সেটা দেখি না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি যদি অন্যের দৃষ্টিকোণকে বুঝতে পারেন তাহলে আপনার দৃষ্টিকোণ তাকে বোঝানো সহজ হয়ে যাবে।

তা না পারলে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে যাবেন। ভেতরের আবেগ-সমুদ্রটা নিস্তরঙ্গ না হয়ে উত্তাল হতে থাকবে। দুঃখ কষ্ট ক্ষোভ ঘৃণা অর্থাৎ আবেগের প্রাবল্য থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না।

প্রজ্ঞার পথে দ্বিতীয় নেতিবাচক উপাদান হচ্ছে দুঃখ। দুঃখ নামের এক ক্ষতিকর আবেগ অনেকভাবে আমাদের সামনে আসে। দুঃখের কোনো শেষ নেই। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতায় দাদীর দুঃখের কথা বলা হয়েছে ‘পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইতো বুক’। সেই মুহূর্তে পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেছে—এটাই তার কাছে বড় দুঃখ।

একেকজনের কাছে দুঃখ একেকরকম। ‘কেউ কোনোদিন আমাকে তো কথা দিলো না’—এটা যেমন দুঃখের কারণ, ‘কেউ কথা রাখে নি’—এটাও দুঃখের কারণ। একজন দুঃখবাদী, বিষণ্ণতায় ভরা মানুষের ভেতরে দুঃখ জমাট বাঁধতে বাঁধতে তার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

কারণ একজন দুঃখবাদী, বিষণ্ণ মানুষের কাছে পৃথিবীর সবকিছুকেই মনে হয় দুঃখ আর বিষণ্ণতায় ভরা। ফলে রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে যেমন বস্তুর স্বাভাবিক রূপটা বোঝা যায় না, তেমনি দুঃখ-বিষণ্ণতার নেতিবাচক আবেগ নিয়ে কেউ যখন আচ্ছন্ন থাকে, তার অন্তর্দৃষ্টিও তখন আর স্বচ্ছ হতে পারে না।

আসলে দুঃখ আসতেই পারে, কষ্ট আসতেই পারে। কিন্তু হাঁস যেমন

বৃষ্টিতে ভিজলেও একটা গা-ঝাড়া দিয়েই ঝরঝরে হয়ে যায়-দুঃখকেও মোকাবেলা করতে হবে সেভাবে। অর্থাৎ প্রভাবিত হওয়া যাবে না। মুরগির মতো ভিজে যাওয়া যাবে না। হাঁসের মতো গা-ঝাড়া দিয়ে মুক্ত হয়ে যেতে হবে।

খুব তুচ্ছ বিষয়ও দুঃখের কারণ হতে পারে। স্কোভ, অভিমান সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, একবার এক টিনেজ মেয়ের সাথে পথে দেখা। আমাদের এই গ্রাজুয়েট মেয়েটিকে আগে প্রোথামে দেখলেও মাঝখানে দেখছিলাম না।

তার সাথে দেখা হওয়ার পর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম-কি মা, কেমন আছো? জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে কান্না। কেন? কারণ একবার কোনো এক প্রোথামে আমার যাওয়ার পথে অন্যান্যদের সাথে মেয়েটিও ছিলো। আমি তার আশেপাশে অনেকের মাথায় হাত রেখেছি, কিন্তু মেয়েটির মাথায় রাখি নি এবং সেটাই তার দুঃখ এবং এই দুঃখ থেকে অভিমান।

সেই কারণে গত ছয় মাস সে ফাউন্ডেশনের কোনো প্রোথামে আসে নি। আমি মেয়েটিকে বললাম, দেখ মা, এটা হয়তো ভিড়ের মধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যদি এটা আমাকে বলতে তাহলে আমি তো কয়েকবার তোমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতাম। মাঝখান থেকে তোমার জীবনের ছয়টি মাস চলে গেল, যে ছয়টি মাস তুমি ভালো কাজে ব্যয় করতে পারতে।

অর্থাৎ আবেগের কারণে ছোট একটা বিষয়ও অনেক বড় মনে হতে পারে। জীবনের আরো গুরুত্বপূর্ণ বা কল্যাণকর পদক্ষেপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। কারণ, যখন আবেগ আসে তখন যুক্তি বা কার্যকারণ আর কাজ করে না।

প্রশ্ন : ইএসপি মানে কী?

উত্তর : ইএসপি মানে হচ্ছে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন, আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আমরা একে বলি এসেনশিয়াল সেনসরি পারসেপশন। তবে এটি এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন নামেই অভিধানে পরিচিত।

এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন মানে হচ্ছে-যে, পারসেপশন আমাদের পাঁচটি সেনসরি অর্গান-এর বাইরে থেকে আসে। যেমন, আমাদের ইনফরমেশনগুলো মূলত পাঁচটি সেনসরি অর্গান অর্থাৎ চোখ কান নাক ত্বক এবং জিহ্বা-এই পাঁচটি অর্গানের মাধ্যমে আসে। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরের জগৎ হচ্ছে ইএসপি।

প্রশ্ন : মানুষের মন সকল জ্ঞানের আকর। তাহলে মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা সমস্ত তথ্যের উত্তর পেতে পারি। তা-ই যদি হয় তাহলে টেকনিকেল জ্ঞানের কি কোনো প্রয়োজন নেই?

উত্তর : টেকনিকেল জ্ঞানের প্রয়োজন কেন থাকবে না। মহামতি বুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা। একবার তার এক শিষ্য এসে বললো, অমুক এক সাধক আছে যে নদীর ওপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারে। বুদ্ধ বললেন, খুব ভালো। কিন্তু এ নদীতে খেয়া পারাপার করতে কত লাগে? শিষ্য বললেন, এক পয়সা। বুদ্ধ তখন বললেন, সামান্য এক পয়সা দিয়ে যে খেয়া পারাপার হওয়া যায়, তার জন্যে এত সাধনা করার তো কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

বুদ্ধ বললেন, অমুক সাধকের অত বছরের সাধনার মূল্যও এক পয়সা!

যেখানে টেকনোলজি প্রয়োগ করা যায় সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করার দরকার কী। যেখানে টেকনোলজি পৌঁছায় না সেখানে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি কতটা প্রজ্ঞাবান তাৎক্ষণিকভাবে বুঝাবো কীভাবে?

উত্তর : আপনি যদি প্রজ্ঞাবান হন তবে তাৎক্ষণিকভাবে বোঝার চেষ্টা করবেন না। কারণ, শটকাটের পরিণতি অনেকক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। আরেকজনকে বোঝা এত সহজ নয়। আপনি বছরের পর বছর এক ছাদের নিচে থাকতে পারেন, তারপরও আপনি তাকে না-ও বুঝতে পারেন। অতএব কাউকে বোঝার জন্যে তাড়াহুড়ো করবেন না। বুঝে ফেলেছেন এমনটাও মনে করবেন না। সবসময়ই সচেতনভাবে বিশ্লেষণ করবেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, আবেগ হলো অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির একটি উপাদান। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার জন্যে এ আবেগকে দূর করতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো—আবেগ ছাড়া কি জীবনে চলা সম্ভব? আবেগহীন মানুষ কি রোবটের মতো নয়? আবেগশূন্য হয়ে গেলে তো আপন-পর কারোরই দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা আমাকে স্পর্শ করবে না।

উত্তর : আসলে আবেগ এবং মমতা—দুটো কিন্তু এক জিনিস নয়। আপনি মমতাকে আবেগের সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন। মমতা হচ্ছে অন্যের প্রতি

সুন্দর অনুভূতি। তার কল্যাণ কামনার অনুভূতির নাম হচ্ছে মমতা। তার ভালো চাওয়ার নাম হচ্ছে মমতা। মমতা সব সময় কল্যাণ করে।

কিন্তু এ মমতাটাই যদি বেশি বেড়ে যায়, তখন এটা হয়ে যায় নেতিবাচক আবেগ। যেমন সন্তানকে লালন করা, আদর করা এবং আল্লাদ দেয়া-এ দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। আদর এবং আল্লাদ কিন্তু এক জিনিস নয়। তাকে সঠিকভাবে লালন করার নাম আদর। আর তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়ার নাম হচ্ছে আল্লাদ।

সেরকমই-মমতা এবং নেতিবাচক আবেগ-এ দুটো আলাদা জিনিস। মমতা আপনাকে মানুষ বানায় আর আবেগ আপনার হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে। আবেগ আপনাকে মুক্তভাবে চিন্তা করতে দেয় না। আপনাকে দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করায়।

আবেগপ্রবণ হলে আপনি মুক্ত চিন্তায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আপনি ভাবতে থাকেন যে, অমুক এ কাজ করতে পারে না। সে যেহেতু আমার আপন, সে যা করছে তা-ই ঠিক। অর্থাৎ একজন ভুল করছে, অথচ ভুলটাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। কেন? আপনি তার ব্যাপারে অন্ধ। এটা হচ্ছে আবেগ। আবেগ আপনার দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে দেয়। আপনাকে অন্ধ করে দেয় এবং আবেগ সবসময় প্রজ্ঞার জন্যে ক্ষতিকর।

প্রকৃতির সাথে একাত্মতা

প্রশ্ন : প্রকৃতির সাথে একাত্মতার মেডিটেশনে কোনো কিছুর মধ্যেই ঢুকতে পারি নাই। কীভাবে ঢোকা যাবে উপায় বলে দিন।

উত্তর : আসলে কল্পনা করলেই তো ঢোকা হয়ে যায়। আপনি কল্পনা করলেই ঢুকে গেলেন। তখন ঢুকতে না পারার মানে হচ্ছে আপনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খেয়ালই করেন নি যে, কি বলছি। এরপরে আর মেডিটেশনে ঘুমাবেন না। তাহলে আপনি ঠিক ঢুকতে পারবেন।

প্রশ্ন : প্রকৃতির সাথে একাত্মতা মেডিটেশনে বলা হয় যে, এখন থেকে কোনো সমস্যাই আপনার সমস্যা নয়। এখন প্রকৃতিই আপনার সমস্যা সমাধান করবে। কিন্তু সকল সমস্যা তো সমাধান করবেন আল্লাহ। প্রকৃতি কীভাবে আমার সমস্যা সমাধান করবে?

উত্তর : এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন। আমরা এখানে যে প্রকৃতির নেপথ্য স্পন্দনের কথা বলছি তা একটু বোঝার চেষ্টা করি। আসলে প্রকৃতি কার সৃষ্টি? কে চালান প্রকৃতি? উত্তর হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ।

তিনি প্রকৃতি যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম; যে নিয়মে প্রতিটি কাজ সম্পাদিত হয়। ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণভাবে এই নিয়ম অনুসারেই সবকিছু হয়, কারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার অনুসরণই আল্লাহর নিয়ম। ব্যতিক্রম যদি হয় তো সেটা ব্যতিক্রমই। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে নব্বই বছরের একজন বৃদ্ধকে এখনই বারো বছরের কিশোর বানিয়ে দিতে পারেন। পারেন, কিন্তু উনি করেন না।

আর এখানে প্রকৃতি মানে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার সাথে যখন আপনি একীভূত হয়ে যাবেন, তখন আপনার প্রতিটি কাজে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াও হয়ে যাবে সহায়ক। প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়ার মেডিটেশনে আপনি এই প্রক্রিয়ার সাথেই একাত্ম হন।

প্রশ্ন : প্রকৃতির সাথে একাকার হলে প্রকৃতি আমাকে কীভাবে মানব কল্যাণে সাহায্য করবে?

উত্তর : একজন সাধকের একটি ঘটনাকে এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। তার সাথে আমার একদিনই দেখা হয়েছিলো। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কথা বলেছি। তারও কথা বলায় কোনো ক্লান্তি ছিলো না, আমারও প্রশ্ন করায় কোনো ক্লান্তি ছিলো না। পৃথিবীর এমন কোনো মেথড নেই যা তিনি করেন নি। তার শখই হচ্ছে—নতুন কোনো কিছুর কথা শুনলে তাকে তা জানতে হবে। তিনি যে আলফা লেভেল-এর মানুষ, তা দেখলেই বোঝা যায়।

তিনি তার জীবনের একটি ঘটনা বলছিলেন। ফিজিক্স নিয়ে পিএইচডি করার এক পর্যায়ে কিছুটা বিক্ষিপ্ত সময় কাটছিলো তার। ম্যাথমেটিক্সের কিছু জটিল সমাধান যেন কিছুতেই হচ্ছিলো না। গবেষণা-পড়াশোনা—কিছুতেই মন বসছে না। কখনো মেডিটেশন করছেন, কখনো সাধুদের কাছে ধর্না দিচ্ছেন, কখনো বা দিনের পর দিন উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এর মধ্যেই একদিন পার্কে বসেছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর খেয়াল হলো—একটু দূরেই পড়ে আছে একখণ্ড কাগজ। কাগজটাতে কিছু অংক কষার চিহ্ন দেখে কৌতূহলী হয়ে হাতে তুলে নিলেন। ভাঁজ খুলে খানিকটা দেখেই তো তার চোখ ছানাবড়া! এ তো দেখি তার সেই বহু

আরাধ্য জটিল অংকটির সমাধান যা নিয়ে তিনি গলদঘর্ম হচ্ছিলেন এতদিন। এটা ছিলো আসলে কোনো একটা রিসার্চ পেপারের ছেঁড়া পাতা এবং ঘটনাচক্রে সে পাতাটাতেই ছিলো তার রিসার্চের সমাধান। এটাকে অনুসরণ করেই তিনি আবার শুরু করলেন তার রিসার্চের কাজ। শেষ করে সাবমিটও করলেন।

অর্থাৎ মনের অতিচেতন স্তরে এই সল্যুশনটা কিন্তু ছিলো। কিন্তু সচেতন স্তরকে বোঝাতে পারছিলো না, মেসেজটা দিতে পারছিলো না। কিন্তু বাস্তব যে ঘটনা-ঐ কাগজটা দেখার সাথে সাথে ক্লিক করে গেল যে, দিস ইজ দি সল্যুশন।

নিউটন যখন আপেল গাছের নিচে বসেছিলেন, ল'জ অফ গ্রাভিটেশন তার অতিচেতন স্তরে ছিলো, কিন্তু অতিচেতন তা কমিউনিকেট করতে পারছিলো না সচেতন স্তরকে। যেই আপেলটা পড়লো, ক্লিক করে গেল, কমিউনিকেশন হয়ে গেল যে, আপেলটা নিচে পড়লো কেন? সাথে সাথে অতিচেতন স্তরের যে ব্যাখ্যা, অতিচেতন স্তরের সূত্র, তা বেরিয়ে গেল।

বস্তুর আয়তন পরিমাপে বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের পদ্ধতি আবিষ্কারের কথাও আমরা জানি। রাজার জন্যে একটা সোনার মুকুট তৈরি করা হয়েছিলো। রাজা চাচ্ছিলেন এর মধ্যে কোনো খাদ আছে কি না তা পরীক্ষা করা হোক।

কিন্তু শর্ত হলো মুকুটটাকে গলানো যাবে না বা এর আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। আর্কিমিডিসকে এ দায়িত্ব দেয়া হলো। তিনি গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন। রাতদিন শুধু এটা নিয়েই ভাবছেন। এর মধ্যে একদিন গোসল করার জন্যে তিনি বাথটাবে নামলেন। সবসময় যা হয় এবারও তা হলো। বাথটাবে ডোবার সাথে সাথে পানি কিছুটা উপচে পড়লো।

মুহূর্তে আর্কিমিডিস সমাধানের সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি বুঝলেন পানির এই ধর্মকে ঘনত্ব পরিমাপে ব্যবহার করা সম্ভব। মুকুটটিকে পানিতে ডোবালে যে পরিমাণ পানি উপচে পড়বে তা থেকেই মুকুটের ঘনত্ব বের করা সম্ভব। আর এর মধ্যে কম ঘনত্বের কোনো সস্তা ধাতু মেশানো আছে কি না তা-ও বোঝা সম্ভব।

বলা হয়, এই আবিষ্কার আর্কিমিডিসকে এতটাই উত্তেজিত করে তুলেছিলো যে, তিনি বাথটাব থেকে বেরিয়ে নগ্ন অবস্থায় শহরের রাস্তায় ইউরেকা! ইউরেকা! (গ্রিক ভাষায়-আমি পেয়েছি!) বলতে বলতে রাজ দরবারে ছুটে এসেছিলেন।

ধ্যানের গভীর স্তর ॥ কোয়ান্টায়ন

প্রশ্ন : ধ্যানের স্তরকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চাই। কী করণীয়? আমি ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন করবেন। কোর্স রিপোর্ট এবং কোয়ান্টায়ন করবেন। লামা কোয়ান্টায়নে যখন আপনি যাবেন, পার্থক্যটা নিজেই বুঝতে পারবেন। আত্মহ এবং আনন্দও পাবেন। আর এখানে আপনি দেখবেন খুব বিরল দৃশ্য। দেখবেন, ২০/৫০/১০০ জন মহিলা এক জায়গায় বসে আছে কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। আসলে এতজন মহিলা একসাথে বসে আছে কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলছে না—এটা যে কতটা বিরল দৃশ্য তা নিয়ে প্রাচীন একটি গল্প আছে।

একবার চীনের এক রাজা এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। যে সবচেয়ে অবাস্তব গল্প বলতে পারবে সে-ই বিজয়ী হবে। অনেকেই অনেক গল্প বলছে। কিন্তু খানিকটা শুনেই রাজা নাকচ করে দিচ্ছেন যে, না, না, এটা বাস্তব, এটা হতে পারে। এভাবে একের পর এক গল্পকার এলো আর গেল।

সবশেষে এলেন খুবই বৃদ্ধ একজন গল্পকার। তিনি তার গল্প শুরু করলেন—মহারাজা, একবার আমার খুব মন খারাপ ছিলো। গিয়ে বসলাম পার্কের বেঞ্চিতে। বসে আছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মাঠের অপর পারে বেঞ্চিতে বসে আছেন দুজন নারী। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। ভাবলাম, এতক্ষণ বোধহয় কথা বলছিলো—এখন বিরতি দিয়েছেন।

কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করলাম অনেকক্ষণ পরও কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। এমনকি দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তারপরও কথা বলছে না। একসময় দুজন উঠে দুদিকে চলে গেল।

গল্পের এটুকু বলা মাত্রই মহারাজা চিৎকার করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য! এ কিছুতেই হতে পারে না যে, দুজন মহিলা সারাদিন পাশাপাশি বসে থাকবে, অথচ কেউ কারো সাথে কথা বলবে না—এ অবিশ্বাস্য। এ কখনো হতে পারে না।

এ অবিশ্বাস্য দৃশ্যই আমাদের এখানে দেখা যায় কোয়ান্টায়ন কার্যক্রমের সময়। দুজন শুধু নয়, ২০/৫০/১০০ জন মহিলা বসে আছেন, কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলছেন না। কারণ, তারা কোয়ান্টায়নে আছেন।

কোয়ান্টায়নে অবশ্য প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগবে। মনে হবে যে, এত কথা ভেতরে কিলবিল করছে, চেপে রাখা মুশকিল। প্রথম দিন এভাবে যাবে। দ্বিতীয় দিন থেকে আপনি আসল মজা পেতে শুরু করবেন, ভালো লাগতে শুরু করবে। প্রথম দিকে যা মনে হয়েছিলো কথার বুদ্ধবুদ্ধ, অস্থিরতা, দ্বিতীয় দিন থেকে তা শান্ত হতে থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত মন একসময় আত্মার সাথে মিলিত হবে, আর আপনি অনুভব করবেন প্রকৃত আনন্দ। যারা প্রজ্ঞার পথে এগুতে চান তাদের জন্যে কোয়ান্টায়ন গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : ফাউন্ডেশনে আমি দুই/ তিনদিন কোয়ান্টায়ন করেছি। কিন্তু আমার খুবই অস্থির লাগে। বসে থাকতে থাকতে বিরক্তও লাগে। কোয়ান্টায়নকে ভালো লাগানোর উপায় কী?

উত্তর : আসলে কোয়ান্টায়নের প্রথম কয়েকদিন অস্থির লাগাটা স্বাভাবিক। যেমন, কেউ যদি প্রথমবারের মতো কোয়ান্টায়নে আসেন, তাহলে প্রথম দিন তার খুবই অস্বস্তি, বিরক্তি লাগবে। মনের ভেতর কথাগুলো বুদ্ধবুদ্ধের মতো ভাসতে থাকবে। মনের ভেতর দুটো সত্তা যেন পরস্পর কথার খই ফোটাতে। দ্বিতীয় দিনও তা-ই হবে। তৃতীয় দিন একটু কমবে এবং কিছু কিছু সময় একেবারে বিশুদ্ধ মৌনতা সৃষ্টি হবে।

আসলে চুপ থাকা আর মৌনতা এক নয়। চুপ থাকলেও আমাদের মনের ভেতর কথার স্রোত বইতে থাকে। কিন্তু মনের এই কথার স্রোতও যখন থেমে যায়, তখন সেটাই হলো বিশুদ্ধ মৌনতা। আর এই মৌনতার পর্যায়ে যখন যাওয়া যাবে, তখনই ভালো লাগতে থাকবে। তখন শুধু আনন্দই আনন্দ। আর সে স্তরে যে মনছবি করবেন তার শক্তি আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

মুনি-ঋষিরা এই বিশুদ্ধ মৌনতাকে আয়ত্ত করেছিলেন। আসলে ‘মুনি’ শব্দটির অর্থই হচ্ছে—যিনি মৌনতার শক্তিকে আয়ত্ত করেছেন। কথার যেমন শক্তি আছে, তেমনি মৌনতার আছে তার চেয়েও বেশি শক্তি। এটাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে।

আমরা জানি ছোট্ট একটা বার্নার পানিকেও যদি বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করা হয়, তাহলে সে পানি দিয়েই জলবিদ্যুৎ তৈরির মতো বড় প্রকল্প চালানো যায়। তেমনি মৌনতার মাধ্যমেও কথাকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মিক শক্তিকে আরো শাণিত করা যায়। আর যারা মৌনতার শক্তিকে আয়ত্ত করেছেন, তাদের কথার শক্তিও বেড়ে যায় বহুগুণ।

নবীজী (স) মৌনতার গুরুত্বকে বোঝাতে গিয়ে সাহাবী হজরত আবু জর গিফারী (রা)-কে বলেছেন, ‘আবু জর, তোমাকে দুটো কাজের কথা বলছি যা মানুষের জন্যে পালন করা তেমন কঠিন নয়, কিন্তু ওজনের দিক থেকে অত্যন্ত ভারী। এর একটি হলো সদাচরণ, আরেকটি হলো অধিক মৌনতা।’

তাই কোয়ান্টায়নের অভিজ্ঞতা প্রথম পর্যায়ে কিছুটা একঘেয়েমিপূর্ণ হলেও কিছুদিন নিয়মিত করলেই তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক।

প্রশ্ন : শারীরিক সুস্থতার জন্যে কোয়ান্টায়নের ভূমিকা কী?

উত্তর : শারীরিক সুস্থতা যেহেতু একটি চাওয়া, তাই কোয়ান্টায়নের মাধ্যমে এ চাওয়ার জন্যে আত্মনিমগ্ন হওয়া অবশ্যই ফলপ্রসূ হতে পারে।

হিলিংয়ের জন্যে কোয়ান্টায়নের প্রক্রিয়া হলো—প্রথমে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় মনকে চিন্তাশূন্য করে যখন আপনি চিন্তার উৎসে পৌঁছাচ্ছেন তখন নিরাময়ের মনছবি দেখা। দেখুন, সমস্যাক্রান্ত অঙ্গগুলো সুন্দরভাবে কাজ করছে। এ মনছবি কোয়ান্টায়নের ঐ স্তরে শক্তি সঞ্চয় করবে, পত্রপুষ্পে পল্লবিত হবে।

আর এ জন্যেই বলা হয়, হিলিং মেডিটেশনের চেয়ে হিলিংয়ের জন্যে কোয়ান্টায়ন অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী। তবে সবকিছুর মতো সুস্থতারও একটা বাস্তবানুগ প্রক্রিয়া আছে এবং সেখানে সম্ভব-অসম্ভবের যৌক্তিকতার সীমারেখাও স্বীকার করতে হবে।

যেমন, হাঁটুর হাড় ক্ষয়ে গেছে এবং প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। এখানে ক্ষয়ে যাওয়া হাড়ের ক্ষয়পূরণ সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যাশা করা যেতে পারে যে, ওষুধ ছাড়াই ব্যথা সেরে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা যাবে। আবার কিছু কিছু রোগ আছে যার সার্জারি প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কোয়ান্টায়ন করলে আপনার অপারেশন পরবর্তী আরোগ্যলাভ ঘটবে সাধারণদের চেয়ে দ্রুত।

প্রশ্ন : আমি একজন বেকার যুবক। হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজেও পাচ্ছি না। আমার ভাই রাতদিন পড়েও লেখাপড়ায় ভালো করতে পারছে না। আমার বাবা তার ব্যবসায় বার বার লস করছেন। আমাদের ক্ষেত্রে কোয়ান্টায়ন কী কাজে আসবে?

উত্তর : আসলে এই যে বলছেন চাকরি খুঁজেও পাচ্ছেন না বা আপনার ভাই রাতদিন পড়েও ভালো করতে পারছে না, আপনার বাবা ব্যবসায় বার বার

লস করছেন—প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে ব্যর্থতার জন্যে দায়ী কারণগুলো বুঝতে না পারা বা বুঝতে পারলেও তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারা।

প্রতিটি ব্যর্থতাকেই সাফল্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব যখন একজন মানুষ তার ভুলগুলোকে শুধরে সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলি আয়ত্ত্ব করতে পারেন। আর এখানেই কোয়ান্টায়নের গুরুত্ব। কারণ কোয়ান্টায়ন বা মৌনসাধনার মাধ্যমে একজন মানুষ গভীরভাবে আত্মপর্যালোচনার সুযোগ পান। স্বাভাবিক জাতিতাবস্থায় যে মন থাকে অস্থির, অশান্ত, তা-ই মৌনতার মাধ্যমে আস্তে আস্তে প্রবেশ করে স্থির, শান্ত, গভীর এক উপলব্ধির স্তরে। দৈনন্দিন জীবনের হতাশা, উদ্বেগ বা ভয়কে ছাপিয়ে ব্যক্তি তখন লাভ করে এক অভূতপূর্ব প্রশান্ত উপলব্ধির আনন্দ। আর সে পর্যায়েই তার পক্ষে সম্ভব হয় সংকীর্ণ আচরণ অভ্যাসগুলোকে শনাক্ত করা এবং তা শুধরে মুক্ত আচরণ অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া।

আসলে বংশ পরম্পরায় বা প্রচলিত সমাজের সংস্কার, বিশ্বাস বা ধারণাকে গ্রহণ করতে গিয়ে অধিকাংশ মানুষই প্রশ্ন করে না যে, এ বিশ্বাসের কোনো কল্যাণকর বা যুক্তিগ্রাহ্য দিক আদৌ আছে কি না। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে। এক খ্রিস্টান পরিবারের ছোট্ট মেয়ে বড়দিনের আগে তার মাকে শুকর ছানার রোস্ট করতে দেখছিলো।

সে দেখছিলো তার মা শুকর ছানার গলা এবং পেছনের দিক থেকে বেশ কিছুটা বাদ দিয়ে বাকিটা ওভেনে ঢেকাচ্ছে। এ নিয়ে তার মাকে প্রশ্ন করলে মা বললো, আমি কারণটা জানি না, তবে আমি আমার মাকে এভাবেই কাটতে দেখেছি। তুমি জানতে চাইলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। মেয়েটি তখন তার নানীমার কাছে গেল।

নানীমা তাকে বললেন, ‘আমিও আমার মা-কে এভাবেই কাটতে দেখতাম, কিন্তু কারণটা আমিও জানি না। তুমি তার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।’ মেয়ে তখন তার নানীর মা অর্থাৎ বড়মার কাছে গেল। তিনি তখন খুবই বৃদ্ধা। দাঁত পড়ে গেছে, কানে কম শোনে।

মেয়েটি তাই জোরে জোরে তাকে এই প্রশ্ন করার পর বড়মা দাঁতহীন মুখে একগাল হেসে বললেন, আমরা যখন সংসার শুরু করি, তখন পয়সার অভাবে আস্ত শুকর ছানা রোস্ট করার মতো বড় কড়াই আমরা কিনতে পারি নি। যে ছোট কড়াইটা আমাদের ছিলো তাতে শুকর ছানার সামনের এবং পেছনের অংশটুকু ওভাবে কেটে ফেললে তাতে আঁটতো এবং আমি তা-ই করতাম। তোমার মা-নানীরা হয়তো সেটা দেখেই ওভাবে করছে, যদিও এখন তাদের

বড় কড়াইয়ের কোনো অভাব নেই।

অর্থাৎ এ গল্প থেকে আমরা দেখি-অধিকাংশ সময়ই আমরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসের অন্ধ অনুকরণ করি এর ভালো-মন্দ বিচার না করেই এবং দেখা যায়, এই সংকীর্ণ আচরণ-অভ্যাস বা ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই আমাদের জীবন ব্যর্থতায় ঘুরপাক খাচ্ছে, হতাশায় তলিয়ে যাচ্ছে বা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

কিন্তু সাফল্যের জন্যে, প্রাচুর্যের জন্যে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ প্রাচুর্য-তা বিত্তের ক্ষেত্রে হোক, চিত্ত বা নৈতিকতা, ধর্ম বা সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে হোক-বাপ-দাদার প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার থেকে বেরিয়ে যারা মুক্ত আচরণ অভ্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তারাই ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়-বরণীয় হিসেবে নিজেদের নাম লিখিয়েছেন।

কোয়ান্টায়ন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের শৃঙ্খলমুক্তিরই এক ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া। কারণ একটা লেখাবোঝাই হোয়াইট বোর্ডে নতুন কিছু লেখার আগে যেমন বোর্ডটাকে পরিষ্কার করে নিতে হয়, তেমনি মুক্ত আচরণ অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যেও ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর অভ্যাসচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হয়।

প্রশ্ন : মেডিটেশনে মন একদিকে নিবদ্ধ থাকে না। সবসময় নানান চিন্তা ভর করে। দীর্ঘদিন যাবৎ এরকম হচ্ছে। করণীয় কী?

উত্তর : মেডিটেশনের সাথে সাথে কোয়ান্টায়ন করতে হবে। সপ্তাহে একদিন করে যখন কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনায় আপনি নিমগ্ন থাকবেন, দেখবেন নীরবতার শক্তি বা হিরন্ময় মৌনতাকে আপনি অনুভব করতে পারছেন।

আসলে আধঘণ্টা মেডিটেশনের মাধ্যমে আমাদের প্রাপ্তিগুলো কিন্তু ছোট; প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য বা সাফল্যের কিছু ছিটেফোঁটা। অনেক সময় নিজেকে স্থির করতে করতেই আধঘণ্টা লেগে যায়। কিন্তু কোয়ান্টায়নের মাধ্যমেই সম্ভব সত্যিকার গভীর মেডিটেশনের স্বাদ উপভোগ করা। আর সেটাই নিজের অন্তরতম সত্তা বা বিশুদ্ধ সম্ভাবনার আকরের সাথে সংযুক্তির প্রকৃত পথ।

তবে তার জন্যে সময় দিতে হবে। কারণ চিন্তাশূন্য অবস্থায় পৌঁছার আগে অনেকটা সময়ই কেটে যাবে হরেকরকম চিন্তার বুদ্ধবুদ্ধলোকে সামাল দিতে গিয়ে। এরপর একটা সময় মনে হবে-আপনি একনিষ্ঠ হতে পারছেন এবং সেটাকে ধরে রাখতে পারছেন।

এটাই সত্যিকার প্রশান্তির স্তর। আর এই স্তরে যে চিন্তা আসে, সেটাই

বিপ্লব ঘটায়, প্রচলিত শৃঙ্খল ভাঙার শক্তি যোগায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত দুঃখ জরা ব্যাধি কুচিন্তা দুশ্চিন্তাকে।

সমুদ্রের তলদেশের শেষ প্রান্ত থেকে যে সুনামির উদ্ভব তা যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায় সবকিছু, কোয়ান্টায়নেও তেমনি উপলব্ধিটা আসে মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে। আর সে উপলব্ধিই যুগে যুগে দেশে দেশে চিন্তার রাজ্যে ঘটিয়েছে বিপ্লব, পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছে নতুন পথের দিশা।

প্রশ্ন : কোয়ান্টায়ন কী? সাফল্য ও প্রাচুর্যের জন্যে এর এত গুরুত্ব কেন?

উত্তর : আত্ম উন্নয়নের একটি ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া কোয়ান্টায়ন। বিশেষ নির্দেশাবলি অনুসরণ করে মৌন সাধনার নামই হলো কোয়ান্টায়ন। তবে মৌনতার এ প্রক্রিয়া নতুন কিছু নয়। যুগে যুগে পৃথিবীর সব জনপদেই ধর্মীয় মহামানব বা আধ্যাত্মিক সাধক বা খ্যাতিমান ব্যক্তির এ মৌনসাধনার মাধ্যমেই সত্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়েছেন; নতুন চিন্তার সূত্র, নতুন ধারণা, বৈজ্ঞানিক সত্য বা বৈপ্লবিক চিন্তার সন্ধান দিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আর ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টায়ন এ মৌনতার শক্তিকে আয়ত্ত করারই এক চর্চার নাম যাতে অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে নির্ধারিত সময়ে কোনো কথা না বলে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে চিন্তা বা ধ্যানমগ্ন থাকেন।

মনকে আমরা যদি একটা উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে মনের বহিরাবরণ হলো এই সমুদ্রের তরঙ্গক্ষুব্ধ উপরিভাগ, সারাক্ষণই যা উথাল-পাথাল করে। স্বাভাবিক জাহাজ অবস্থায় মন ক্রমাগত এক চিন্তা থেকে আরেক চিন্তায় ছোটাছুটি করে; ভয়, আশঙ্কা বা অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়।

কোয়ান্টায়নে এই মনকেই স্থির করার অভ্যাস করা হয়। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো তখন সরে যেতে থাকে। মন প্রবেশ করতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। সমুদ্রের তলদেশ যে রকম শান্ত সমাহিত তেমনি দীর্ঘসময় মৌনতার মাধ্যমে একটা পর্যায়ে মনও প্রবেশ করে এক অভূতপূর্ব প্রশান্ত অনুভূতির জগতে। সংযোগ ঘটে চিন্তার মূল উৎস বা field of pure potentiality-র সঙ্গে। আর চিন্তার এই উৎসমূল থেকে উৎসারিত জ্ঞান, ধারণা বা তথ্য দিয়েই যুগে যুগে মহামানবরা পৃথিবীকে দিয়েছেন নতুন সম্ভাবনার সন্ধান।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়েও বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পদার্থের এক ক্ষুদ্রতম কণা হলো ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনের একটা ডিকোহিয়ারেন্স (Decoherence level) স্তর আছে যেটা পেরলেই ইলেকট্রনটি মুহূর্তে

বদলে যায়। এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে চলে যায় এবং আগের চরিত্র পাল্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র ধারণ করে। এটি তখন নতুন কক্ষপথে নতুন শক্তিসম্পন্ন এক নতুন ইলেকট্রন। আর চিন্তার ক্ষেত্রে এই ডিকোহিয়ারেন্স স্তরে যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো কোয়ান্টায়ন।

মানুষের অন্তর্চেতনা হলো সকল বিশুদ্ধ সম্ভাবনার আকর। কোয়ান্টায়নে এই অন্তর্চেতনার শক্তিকেই কাজে লাগানো হয়, মনকে ভরিয়ে দেয়া হয় এক প্রশান্ত গতিময়তায়। এই প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন মনে যেকোনো সাফল্য বা প্রাচুর্যের মনছবি এত গভীরভাবে প্রক্ষিপ্ত হয় যে, চাওয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাওয়ার প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে যায়। জীবন সাজানো যায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন রঙে।

প্রশ্ন : প্রাচুর্যের সাথে কোয়ান্টায়নের কোনো সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর : প্রাচুর্যের জন্যে প্রয়োজন শক্তির মূল উৎসের সাথে সংযোগ। যেখান থেকে প্রাচুর্য আসে সেই শক্তির মূল উৎসের সাথে আপনাকে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে—শুকরিয়া, প্রশান্ত প্রত্যয়। কোয়ান্টায়ন শুকরিয়া সৃষ্টি করে, সংকীর্ণ আচরণ-অভ্যাস থেকে আপনাকে মুক্ত করে।

যখন আপনি কোয়ান্টায়ন করেন, চিন্তার মূল উৎস বলয়ের সাথে সংযুক্ত হন এবং যখন আপনি field of pure potentiality এর সাথে সংযুক্ত হন তখন অহম বিলীন হয়ে যায় আত্মার মাঝে, আত্মশক্তির মাঝে। অহম বিলীন হলেই সংকীর্ণ আচরণ-অভ্যাস থেকে বেরিয়ে এসে আপনি নতুন আচরণ-অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারবেন, নতুন স্বভাব সৃষ্টি করতে পারবেন। ঠিক তখনই আপনি সত্যিকারভাবে সম্পদ বা প্রাচুর্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

আসলে আমরা মনে করি, শুধু কাজ করলেই প্রাচুর্য আসবে। শুধু কাজ করলেই প্রাচুর্য আসে না কারণ গাধাও প্রচুর কাজ করে, একজন দিনমজুরও প্রচুর কাজ করে কিন্তু প্রাচুর্য আসে না। প্রাচুর্যের জন্যে প্রয়োজন শক্তির মূল উৎসের সাথে সংযুক্ত হওয়া। তাহলেই আপনি মস্তিষ্কের উদ্ভাবনীশক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার ডায়াবেটিস আছে, কোয়ান্টায়ন করার সময় যদি খাবার প্রয়োজন হয়, তাহলে খাওয়া যাবে কি?

উত্তর : খাওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নাই। যাদের ডায়াবেটিস বা অন্য কোনো সমস্যা আছে—কোয়ান্টায়নের সময় প্রয়োজনে তারা খেতে পারবেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন আমরা মৌনও থাকি না, কথাও বলি না। মানে দুটোর মাঝামাঝি। মৌন থাকা মানে তো একেবারে চুপ থাকা, কিন্তু কথা বলা মানে কি সবসময় অনবরত কথা বলা?

উত্তর : আসলে আমরা মৌন থাকি না, কথাও বলি না-এর মানে কিন্তু সবসময় অনবরত কথা বলা এই অর্থে নয়। আমরা যখন কথা বলি, তখন মনোযোগ কি আমাদের কথার দিকে থাকে। আমরা কথা বলি আবার অন্যকিছুও ভাবি। ভাবছি, বলছি। মনটা কিন্তু কথার মধ্যে নয়। যখন আপনি কথার সাথে একাকার হয়ে যাবেন, যে কথা বলছেন সেই কথা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা আপনার মধ্যে থাকবে না, তখন এই কথাটাই শক্তি হয়ে যাবে এবং সেই কথার শক্তি মৌনতার শক্তির চেয়ে কম নয়। সেই জন্যে আমরা বলছিলাম, আমরা কথাও বলি না, মৌনও থাকি না।

প্রশ্ন : কোয়ান্টায়নের চেয়ে নৈশায়ন আমার কাছে বেশি ভালো লাগে, সেক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আসলে খুব ভালো লাগা কিন্তু সাধনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সাধনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যাকরণ অনুসরণ করা। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই কাজটা আপনার জন্যে প্রয়োজনীয় কি না।

প্রশ্ন : ঘুম কোয়ান্টায়নের একটি বড় ব্যাঘাত। শুধু কোয়ান্টায়ন নয় বরং দৈনন্দিন সব কাজেই এটি সমস্যা সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে সমাধান চাই।

উত্তর : যখনই ঘুম ঘুম ভাব আসবে, অর্ধচক্রাসন করে নেবেন। পরে দেখবেন যে, অনেকক্ষণ ঘুম আসছে না। আর কোয়ান্টায়নে বসে যদি ঘুম আসে, তবে পদ্মাসনে বসে থাকুন। হাঁটুতে যখন ব্যথা হতে থাকবে তখন ঘুম আসবে না। বলবেন, কতক্ষণ পরে তো পা শক্ত হয়ে যাবে। হোক পা শক্ত। পরে দুজনে টেনে তুলবে। অর্থাৎ আপনি যদি ঘুমাতে না চান, আপনি যদি সাধনা করতে চান, পথটা আপনাকে বের করে নিতে হবে। আপনি যদি সজাগ থাকার ব্যাপারে সিরিয়াস হন, আপনি দেখবেন যে, আপনি সজাগ থাকতে পারছেন।

প্রশ্ন : ধৈর্য ও মনোযোগ সহকারে সুন্দর কোয়ান্টায়ন কীভাবে করা যায়?

উত্তর : এটা চর্চা এবং অভ্যাসের ব্যাপার। কোয়ান্টায়ন কিন্তু আসলে একটা অভ্যাস। স্বভাবে রূপান্তর করতে হবে কোয়ান্টায়নকে। তখন আপনি যেকোনো জায়গায় যেকোনো অবস্থায় কোয়ান্টায়ন করতে পারবেন। অর্থাৎ অনুশীলন করতে হবে। কোয়ান্টায়নটাকে আপনার second nature-এ রূপান্তরিত করতে হবে। যত অভ্যাস করবেন তত এটি বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই কোয়ান্টায়নের সময় পাবো কোথায়? মৌন থাকতে হলে একা থাকতে হবে আর তা তো সম্ভব নয়। দুমিনিট কথা না বললে বউয়ের খোঁচা খেতে হয়।

উত্তর : খোঁচা খেলে আর কোয়ান্টায়ন করবেন কীভাবে। খোঁচা খেয়েও আপনি খোঁচা খান নাই, কেউ খোঁচা দেয় নাই—এ রকম ভাববেন। যতবার খোঁচা দেবে আপনি প্রো-একটিভ থাকবেন, যেন আপনি খোঁচা খান নি এবং মৌন থাকবেন, তাহলেই হবে। সময় পাবেন। তবে আসল কথা হচ্ছে কোয়ান্টায়ন করার জায়গা ঘর নয়, কোয়ান্টায়ন করার জন্যে সাধারণভাবে ঘরের বাইরে যেতে হবে। যেখানে গেলে বউয়ের খোঁচা খেতে হবে না। আর এখন কোয়ান্টায়নের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে লামার কোয়ান্টামম।

প্রশ্ন : কোয়ান্টায়নের প্রক্রিয়া জানা আছে, সেন্টারে কয়েক বার করেছি। মসজিদে বা নির্জন কোনো কামরা বা নির্জন কোনো স্থানে কোয়ান্টায়ন করা যাবে কি না দয়া করে জানাবেন?

উত্তর : কোয়ান্টায়নের জন্যে কিছুটা নির্জন জায়গা অবশ্যই প্রয়োজন। সেখানে আপনার মনোযোগ আরেকজন বিঘ্নিত করবে না। কিন্তু একবারে যদি অনেকক্ষণ নির্জন সময় কাটাতে চান, তবে আপনি হাঁপিয়ে উঠবেন, আপনি পারবেন না। যে কারণে প্রথমে আমরা বলি—দিনে সাত থেকে আটঘণ্টা মৌন থাকুন।

আর মৌন থাকবেন কীভাবে! মৌন থাকার প্রক্রিয়া আছে। নির্দিষ্ট চিন্তা নিয়ে। কিছু কিছু চিন্তার খোরাক আছে, কিছু কিছু চিন্তার বিষয় আছে। সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আপনি চিন্তাটাকে ক্রমান্বয়ে ঐদিকে পরিচালিত করবেন এবং কী করবেন তার নির্দেশনাও দেয়া আছে। কারণ, আপনি যদি শুধু চুপচাপ বসে থাকেন তবে কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত হয়ে যাবেন।

আবার নিজের সাথে যে নিজে কথা বলবেন, কী কথা বলবেন সেটা যদি আগে থেকে ঠিক করা থাকে তাহলে আজীবনে কথা কম হবে। সে জন্যে যখন কোয়ান্টায়নে বসবেন, আগে শিথিলায়ন করবেন। দেহ-মনকে শিথিল করবেন। দেহটাকে শিথিল করে ফেলুন, মনও আস্তে আস্তে স্থির হতে থাকবে। মনের বহিরাবরণের যে তরঙ্গগুলো, সেগুলো আস্তে আস্তে স্থির হতে থাকবে এবং কোয়ান্টায়ন শুরু হবে নিজের সাথে কথা বলা থেকে। এক মনের ভিতরেই শুধু কথা হচ্ছে। অনেক কথা। কথা বলতে বলতে একটা সময়ে মন ক্লান্ত হয়ে যায়। কথা বলা কমতে থাকে।

কিন্তু প্রথমদিন এটা কঠিন। নানান দিকে চিন্তা চলে যাবে। তারপরে দ্বিতীয় দিন আস্তে আস্তে চুপ থাকতে ভালো লাগবে। আবার, অনেক সময় দ্বিতীয় দিনও ঐ একই অবস্থা। উথাল-পাথাল অবস্থা ভেতরে চলবে। তৃতীয় দিন শয়তান পেছনে খুব বেশি করে লাগবে। কারণ শয়তান বুঝতে পারছে, এদের পেছনে যদি বেশি করে না লাগি এবং এ যদি একবার ভালো মানুষ হয়ে যায় তো আমার খবর আছে!

এ কারণে শয়তান বেশি করে লাগতে পারে। আরো অস্থির লাগবে। যত দিন যাবে আস্তে আস্তে ভেতরটা শান্ত হতে থাকবে। কারণ এখন আপনি দৌড়াচ্ছেন। দৌড়িয়ে হঠাৎ করে শরীরটাকে কী স্থির করা সম্ভব! শরীরটাকে স্থির করতেও তো সময় লাগবে। এজন্যে কোয়ান্টায়নে আপনি চুপচাপ বসে থাকলেই কি মৌন থাকতে পারবেন!

মৌন হতেও সময় লাগে। এরপরে যখন নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করতে শুরু করবেন, আস্তে আস্তে আপনি গভীরে যেতে থাকবেন। আস্তে আস্তে আপনার চিন্তা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে শুরু করবে এবং এমন একটা সময় আসবে যে, এটা সূক্ষ্ম হতে হতে সুচাথ্র হয়ে উঠবে, মুহূর্তে উপলব্ধির জগৎটাই পাঁলে যাবে। এবং এটা যেকোনো সময়ে আসতে পারে।

এটি তিন দিনে আসতে পারে, এটি তিন বছরে আসতে পারে এবং হঠাৎ করেই আপনি অনুভব করবেন, এই হচ্ছে সত্য। আমি জানি সত্য কী। যেভাবে মহামানবরা বোধি লাভ করেছেন, সত্যের সেই স্তরে আপনি উপনীত হবেন, আপনার আচরণ-অভ্যাস বদলে যাবে। আপনি হয়ে যাবেন আলাদা মানুষ। ধ্যান করলেন ঠিকই, কিন্তু আপনি যদি সেই আগের মানুষটিই রয়ে যান, তাহলে বুঝতে হবে আপনার ধ্যান হয় নি।

যেমন, নামাজ পড়ে এসেই শলাপরামর্শ শুরু করলেন-অমুকের মাথায় কীভাবে বাড়ি দেবেন। তিন-চার হাজি সাহেব মিলে আলোচনা শুরু করে

দিলেন-অমুকের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যটা কীভাবে তৈরি করা যায়! খাবারে কীভাবে ভেজাল দেবো! মেডিটেশন করার পরেও যদি আপনার পুরনো আচরণ-অভ্যাসই থেকে যায়, তার মানে হচ্ছে-যে লেভেলে যাওয়া দরকার, সেই লেভেলে যেতে পারেন নি। সেই লেভেলে যখন যাবেন চারপাশের মানুষই বলবে-আপনি আর আগের মানুষটি নেই, আপনি বদলে গেছেন।

প্রশ্ন : প্রাচুর্যবান হওয়ার জন্যে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব কতটুকু? কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত? এর জন্যে কোয়ান্টায়ন কীভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর : জীবনের মূল বিষয় হলো দৃষ্টিভঙ্গি। প্রাচুর্যবান আপনি তখন হতে পারবেন যখন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারবেন। যখন আপনার লক্ষ্যটা অর্থ নয়, লক্ষ্যটা হবে সেবা। সেবা করে কেউ কখনো দরিদ্র থাকে নি, দরিদ্র থাকতে পারে না। সেবা এবং দরিদ্র পরস্পর বিরোধী।

আপনি যদি সেবা দিতে পারেন, প্রাচুর্য আসবেই-ব্যক্তিগতভাবে হোক, সাংগঠনিকভাবে হোক-প্রাচুর্য আসবেই। সেবা যিনি করতে পারেন তার অভাব থাকতে পারে না-যদি কোনো রাগ ছাড়া, কোনো ক্ষোভ ছাড়া আন্তরিকভাবে সেবা দেন। আমাদের জীবনে প্রাচুর্য আসে না কেন, আমরা কাজ করি ক্ষোভ নিয়ে, বিরক্তি নিয়ে।

একজন ডাক্তার। তার সবচেয়ে বড় সুযোগ হচ্ছে সেবা দেয়া। কিন্তু এখন একজন ডাক্তার কি আনন্দিত চিন্তে, কৃতজ্ঞচিন্তে রোগীর সেবা করেন, রোগীকে পরামর্শ দেন? শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দেন না। যে কারণে তাদের জীবনে অর্থ আসে কিন্তু প্রাচুর্য আসে না। কারণ তিনি দেন বিরক্তি সহকারে। কোনো সেবা যদি বিরক্তি সহকারে দেয়া হয় তাহলে সেটার বরকত নষ্ট হয়ে যায়। সেবা দিতে হবে আনন্দিত চিন্তে। সেবার বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে প্রাচুর্য আসবে।

আপনি ভাববেন-আমি এই কাজটি করছি তার কল্যাণের জন্যে, সে যাতে উপকৃত হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, এই ডেভেলপমেন্টটা আসে ধ্যানের স্তরে, এই পরিবর্তনটা আসে কোয়ান্টায়ন লেভেলে। অর্থাৎ পুরনো অভ্যাসটা যখন আপনি ভেঙে বেরিয়ে যাবেন, আপনি দেখবেন আপনার কোনো অভিযোগ থাকবে না।

আপনার জীবনে যদি ক্ষোভ থাকে, অভিযোগ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে আপনি আসলে দৃষ্টিভঙ্গিকাকে পাল্টাতে পারেন নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে

ছিলেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায় নি। অতএব, তখন আপনার প্রাচুর্য আসবে না। দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলুন, ক্ষোভ থেকে মুক্ত হোন, কোনো রকম বিরক্তি ছাড়াই আনন্দিতচিন্তে সেবা দিন, প্রাচুর্য আসবে। তখন অভাব আপনার হতে পারে না। আপনার মেধাটা সেবায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে, প্রাচুর্য আসবে।

আবার আপনি শুধু সেবা করলেন, মেধাকে বিকশিত করলেন না, তাহলেও প্রাচুর্য আসবে না। একবার একজন শিক্ষককে বলা হলো যে, একদিনের জন্যে খাল কাটতে হবে। তিনি বললেন, বহুবছর আমি তো কোদাল চালাই না এবং কবে কোদাল ধরেছিলাম তা-ও খেয়াল নাই। আমি তো খাল কাটতে পারবো না। আমি বরং এটা করতে পারি, আমি একদিন আমার জায়গায় আরেকজন লোককে নিয়োগ করতে পারি যে খাল কাটাতে এক্সপার্ট, যে কোদাল চালাতে এক্সপার্ট, তার সারাদিনের পয়সাটা আমি দিয়ে দিতে পারি। তাতে খালও কাটা হবে, কাজটাও হবে এবং আমার হাতেও ফোস্কা পড়বে না।

এটা হচ্ছে মেধা। আপনি জীবনে কোদাল ধরেন নাই, হঠাৎ করে একদিন একবার যখন মাটি কাটবেন, দ্বিতীয়বার ধরার পরে আপনার হাতে ফোস্কা পড়ে যাবে, এরপরে সাতদিন আপনি হাতের ফোস্কা ঠিক করার জন্যে নষ্ট করলেন। অতএব, সেবা মানে শুধু শ্রম নয়। সেবা মানে হচ্ছে মেধা দিয়ে সেবা করা। তবে নিজের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে মাঝে মাঝেই নিয়ম করে কায়িক শ্রম করা মেধা বিকাশের জন্যেও উপকারী।

যেমন ধরুন, একজন বৃদ্ধা ছাই বিক্রি করছে, কিন্তু এর পেছনে তো কোনো মেধা নেই। অথবা, আপনি শিল-পাটা খোদাইয়ের কাজ করেন। আপনি পরিশ্রম করছেন, সেবা দিচ্ছেন। কিন্তু এটি তো প্রাচুর্য এনে দেবে না। কারণ কিছুদিন পরে শিল-পাটার প্রয়োজন হবে না। কিছুদিন পরে কি হবে—সব গুঁড়া মসলা। কারণ পাটায় মসলা পেশার এনার্জি এবং সময় মহিলাদের এখন নেই। কিছুদিন পরে আরো থাকবে না। আপনি শিল-পাটা খোদাইয়ে যত বড় এক্সপার্ট হোন, আপনি বেকার হয়ে যাবেন। অতএব কী সেবা দিচ্ছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। সেবা দিতে হবে যে সেবার সবসময় চাহিদা বাড়বে।

আপনি যা করেন সেন্টার বিশেষজ্ঞ হতে হবে আপনাকে এবং সেবাটা দিতে হবে আন্তরিকভাবে। আপনি যেখানেই যান—আন্তরিকভাবে সেবা দিন, প্রাচুর্য আসবেই। আপনি আপনার যারা সঙ্গী-সাথী তাদের চেয়ে ওপরে উঠে যাবেন। আর কোয়ান্টায়ন আপনার মেধাকে শনাক্ত করতে এবং মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করতে প্রেরণা যোগাবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, সাফল্য ও প্রাচুর্যের জন্যে কোয়ান্টায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু যারা অতীতে সাফল্য, প্রাচুর্য অর্জন করেছেন, তারা কি কোয়ান্টায়ন করেছিলেন?

উত্তর : না, তারা কোয়ান্টায়ন করেন নি। যাদের উদাহরণ দিই তারা অধিকাংশই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট নন, অতএব তারা কোয়ান্টায়ন কীভাবে করবেন! কিন্তু কোয়ান্টায়নে আমরা যা করি তারা তা করেছেন। তারা হিরণ্ময় মৌনতা, বিশুদ্ধ মৌনতা, যেখানে একজন মানুষ সেই স্তরে পৌঁছে নিজের আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়, ফিল্ড অফ পিওর পটেনশিয়ালিটি-এর সাথে সংযুক্ত হয়েছেন। সে জন্যে তারা প্রচলিত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছেন।

যেমন, দক্ষিণ কোরিয়ার একজন ধনকুবের চুং জু জং। তিনি ছুভাই কর্পোরেশনের মালিক ছিলেন। খুব গরিব, গ্রামে ভূমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু ভূমি শ্রমিক হিসেবে তার ভালো লাগলো না। তার মনে হলো, এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাবাকে বললেন, বাবা রাজি হলেন না।

তার বাড়ি ছিলো উত্তর কোরিয়াতে। বাবার গরু বিক্রি করে দিয়ে সেই গরুর টাকা নিয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যে মানুষটি বাবার গরু বিক্রি করে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন, নিজে থেকে অর্থ সংগ্রহের কোনো উপায় ছিলো না-৫০ বছর পরে উত্তর কোরিয়ায় দুর্ভিক্ষের সময় সেই মানুষটিই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এক হাজার ট্রাক বোঝাই গরু কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অতএব, এই বৃত্ত থেকে বেরতে হবে। অতীতে যারাই সাফল্য অর্জন করেছেন, প্রাচুর্য অর্জন করেছেন তারা বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ‘এ অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট নই, এ অবস্থা থেকে আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে’-এই তাড়না ভেতরে সৃষ্টি হতে হবে।

আর এ তাড়না তখনই সৃষ্টি হয়, যখন আপনি নিজের অন্তর্গত সত্তার সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন। আর সেটার জন্যেই একটা গ্রামার হচ্ছে কোয়ান্টায়ন। গ্রামার সচেতনভাবে ফলো করে সফল হবেন আপনি। আর অতীতে যারা সফল হয়েছেন তারা গ্রামার না জেনে সেই কাজটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে সফল হয়েছেন।

প্রশ্ন : আমি অপ্রয়োজনীয় কথা কম বলতে চাই। তবুও মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এজন্যে আপনার পরামর্শ চাই।

উত্তর : এটা খুব সহজ। যখনই অপ্রয়োজনীয় কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে তারপর একদিন কোয়ান্টায়ন করবেন এবং মাটির ব্যাংকে একশ টাকা রাখবেন। যদি প্রতিটি অপ্রয়োজনীয় কথার জন্যে এ ব্যবস্থা চালু করেন—আমরা নিশ্চিত একমাস পরে আপনার মুখ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বের হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

প্রশ্ন : নৈঃশব্দ থেকে শক্তি রিজার্ভ হয় কিন্তু কীভাবে সেটা অন্য ভালো কাজে ব্যবহৃত হয়? কীভাবে বোঝা যাবে যে, প্রতিদিন আমার শক্তি বাড়ছে?

উত্তর : ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার আগে কি বোঝা যায় যে, এই ডিমটার মধ্যেই বাচ্চাটা ছিলো? বোঝা যায় না। আর বোঝার জন্যে আপনি যদি প্রতিদিন মুরগিকে তা দেয়া থেকে সরিয়ে ডিম দেখতে যান, তাহলে কী হবে? সেই ডিম ফুটে আর কখনো বাচ্চা বেরোবে না। যেমন, রাজহাঁসের ডিমে রোদের আলো পড়লেই ডিম নষ্ট হয়ে যায়, তা থেকে আর বাচ্চা হয় না।

এখানেও আপনি যদি প্রতিদিনই বুঝতে চান যে, আপনার শক্তি বাড়ছে কি না, তাহলে একই অবস্থা হবে। তার চেয়ে নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করুন। সময় দিন। কিছুদিন পর ফল আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

যারা নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করে তাদের কী কী উপকার হয়েছে। উপকার না হলে কেউ দিনের পর দিন কেন কোয়ান্টায়নে সময় ব্যয় করবেন? কারণ সফল মানুষরা কখনো অপ্রয়োজনে সময় ব্যয় করে না। মৌনতায় উপকার না পেলে মহামানবরা কখনো এর পেছনে সময় ব্যয় করতেন না।

প্রশ্ন : একজন খ্রিষ্টান হিসেবে আমি ধর্মীয় দিক দিয়ে কোয়ান্টায়ন থেকে কী কী উপকার লাভ করতে পারবো?

উত্তর : আসলে একজন খ্রিষ্টান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন, মৌন সাধনা করেন তাহলে তিনি একজন ভালো খ্রিষ্টান হবেন, সন্তে রূপান্তরিত হবেন। একজন মুসলমান যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো মুসলমান হবেন, বুজুর্গে রূপান্তরিত হবেন। একজন হিন্দু যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো হিন্দু হবেন, ঋষিতে রূপান্তরিত হবেন। একজন বৌদ্ধ যদি নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে তিনি একজন ভালো বৌদ্ধ হবেন, ভিক্ষুতে রূপান্তরিত হবেন।

অর্থাৎ কোয়ান্টায়ন বা মৌন সাধনা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া বা অনুশীলন। যিনিই অনুশীলন করবেন তিনি এ থেকে সমানভাবে উপকৃত হবেন। অতএব আপনার ধর্ম বিশ্বাস যা-ই হোক, কোয়ান্টায়ন থেকে আপনি সমানভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

প্রশ্ন : General mind discuss people, average mind discuss events, great mind discuss ideas and greatest mind acts in silence. এ কথার মানে কী?

উত্তর : General mind discuss people, average mind discuss events, great mind discuss ideas and greatest mind acts in silence. অর্থাৎ সাধারণেরা লোকজন (অন্যদের) নিয়ে কথা বলে, গড়পড়তা শিক্ষিতরা ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। বুদ্ধিমানরা ধারণা বিনিময় করে, আলোকিতরা হিরন্ময় মৌনতায় হারিয়ে যায়।

অর্থাৎ অমুকে কী পোশাকটা পরলো, অমুকে মুখটা কীরকম করলো, অমুকের দেহভঙ্গি কীরকম হলো—এটা নিয়ে যখন আলোচনা করেন, তখন বোঝা যাবে চিন্তা-চেতনার অত্যন্ত নিম্নস্তরে আপনি বিচরণ করছেন। তার চেয়ে একটু ওপরের স্তর বা গড়পড়তার স্তর হচ্ছে average mind এর স্তর যখন আপনি কোনো ঘটনা নিয়ে আলাপ করবেন।

আপনি যখন বিজ্ঞ তখন আলোচনা করেন ধারণা বা আইডিয়া নিয়ে। আর প্রাজ্ঞরা ডুবে যান হিরন্ময় মৌনতায়। এটাই সত্যিকারের উপলব্ধির স্তর। তাই বলা হয়, greatest mind always acts in silence.

প্রশ্ন : ফিল্ড অফ পিওর পটেনশিয়ালিটি কী?

উত্তর : ফিল্ড অফ পিওর পটেনশিয়ালিটি হচ্ছে বিশুদ্ধ সম্ভাবনার আকর। কোয়ান্টায়নের মাধ্যমে সেই আকরের সাথে যখন আপনি সংযুক্ত হচ্ছেন তখন সবকিছুই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। মানুষ আকৃষ্ট হবে, অর্থ আকৃষ্ট হবে, পরিস্থিতি আকৃষ্ট হবে, খ্যাতি আকৃষ্ট হবে, যশ আকৃষ্ট হবে এবং সেটা সম্পদে পরিণত হবে।

অন্তর্চেতনার এই শক্তিকেই আমরা কাজে লাগাচ্ছি কোয়ান্টায়নের মাধ্যমে। এই গতিময় অন্তর্চেতনার সাথে প্রশান্ত মন এবং দেহের সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমেই চেতনার যেকোনো স্তরে, সম্পদের যেকোনো স্তরে

আপনার উত্তরণ ঘটতে পারে। প্রশান্তি এবং গতিময়তার কারণে পরিস্থিতি, বস্তু, মানুষ-সবকিছুর উর্ধ্ব আপনাকে নিয়ে যাবে, কোনো কিছুরই আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না বরং আপনি সবকিছুকে প্রভাবিত করবেন।

কোয়ান্টাম মেথডের কোয়ান্টায়নের বিশেষত্ব হচ্ছে-এর প্রশান্ত গতিময়তা। আমরা যখন কোয়ান্টায়ন করি বা যখন কোয়ান্টাম লেভেলে প্রবেশ করি, এটিকে বেদের ভাষায় বলা যায়, Do less, accomplish more. কম কাজ কর, বেশি অর্জন কর বা বেশি সম্পাদন কর।

কম কাজে বেশি কর্ম সম্পাদনের পথই হচ্ছে মৌনতা। কোয়ান্টায়ন আমাদের চিন্তা-চেতনা ও শক্তির উৎসমূলে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে যখন পরিবর্তন আসে তখন সুনামির মতোই এক বিশাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যে তরঙ্গ সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

চিন্তার মূল উৎস অর্থাৎ যাকে আমরা বলি field of pure potentiality- সেখান থেকে যখন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, পৃথিবী বদলে গেছে। আমরা তো বাইরেরটা দেখি, ভেতরের শক্তিকে দেখি না।

আপনি দেখুন, যত মহামানব, যাঁরা আজকের পৃথিবীতে স্মরণীয়-বরণীয়, তাঁরা এই কোয়ান্টায়ন বা মৌনতার শক্তিকে অর্জন করেছেন, তাঁদের চিন্তা উৎসারিত হয়েছে চিন্তার উৎসমূল থেকে এবং সারা পৃথিবীকে তাঁরা সেই চিন্তায় আলোড়িত করেছেন। তাঁদের জীবনে খ্যাতির অভাব হয় নি, প্রাচুর্যের অভাব হয় নি, সম্পদের অভাব হয় নি, কোনোকিছুর অভাব হয় নি। প্রচলিত ধারণার শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলেছিলেন মনের সেই গভীর স্তর থেকে, চিন্তার উৎসমূল থেকে।

প্রশ্ন : লামা কোয়ান্টায়ন কী? এর উপকারিতা কী?

উত্তর : লামা কোয়ান্টায়ন এখন তিনদিনের একটি বিশেষ কার্যক্রম। বুধবার রাতে রওনা দিয়ে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার-মোট তিনদিন। অনবদ্য এ প্রোগ্রামটিতে যারাই সুযোগ পান, তাদেরই যাওয়া উচিত। কারণ লামায় মেডিটেশন, মৌনতার স্বাদই আলাদা। এটা শহরে বসে পাওয়া যায় না।

প্রথমদিকে হয়তো কিছুটা একঘেয়ে লাগতে পারে। যেমন, আপনি যখন বসবেন, খুচরা শয়তান হয়তো আপনাকে অস্থির করে তুলবে। তারপর অন্তত শরীরটা যখন স্থির হলো, এরপর শুরু হবে বুদ্ধবুদ্ধের মতো কথার কিলবিল। দুনিয়ার যত কথা। একটা সময় আস্তে আস্তে কথা কমতে থাকবে।

প্রথম দিনটা খুব বিরক্তির মধ্যে যাবে। মনে হবে—এই রে! কিসের মধ্যে পড়লাম। দ্বিতীয় দিন থেকে আপনি স্থির করতে পারবেন যে, মৌনতার মহিমা কী, আনন্দটা কী। আস্তে আস্তে আপনি তা অনুভব করতে পারবেন।

তৃতীয় দিনে আপনি অনুভব করবেন আসলে শান্তি তো পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। শান্তি আছে এখানেই। আপনি আত্মার সাথে তখন সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রশান্তিতে অবগাহন করবেন আপনি। সুনামি যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যায়, দেখবেন যে, আপনার ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা অনেক কিছু ভেসে গেছে স্রোতের মতো।

আসলে সুনামি এত শক্তিশালী হয় কেন? সুনামিও হচ্ছে সমুদ্রের ভেতরের ভূমিকম্প। সমুদ্রের গভীরে যেখানে পানি এবং মাটি গিয়ে মিশেছে, সেইখানে যখন কম্পনটা হয়। নিচে তো অল্প অল্প কাঁপছে কিন্তু এই কাঁপুনিটা যখন ওপরে ওঠে, বিশাল ঢেউ সৃষ্টি করে, তখন সবকিছুকে প্লাবিত করে দেয়।

মৌনতা কিন্তু সুনামির চেয়েও শক্তিশালী। যখন আপনি কোয়ান্টায়ন করবেন আপনার সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, পারিপার্শ্বিকতার যত খারাপ চিন্তা, ক্ষতিকর চিন্তা সব ভেসে যাবে এই ঢেউয়ে। আসলে পরিবর্তন নিজের ভেতর থেকে হতে হয়। অতএব কোয়ান্টায়নের এই সুযোগ গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন : আমি কথা কম বলি। কিন্তু আমার এই কম কথা বলাকে বা মৌনতাকে অনেকে অহংকার বা বেয়াদবের মতো চূপ করে থাকা ভাবে। কিন্তু কিছু কিছু সময় আসে যখন কথা বলার মতো কী আছে বুঝতে পারি না। এটা নিয়ে আমার শ্বশুরবাড়িতে বেশ ভুল বোঝাবুঝি হয়। এর কী সমাধান? ইদানীং কথা বলার পরিমাণ বাধ্য হয়ে বাড়িয়েছি। কিন্তু সেগুলো আমার কাছে শুধুই কথার অপচয় বলে মনে হয়।

উত্তর : এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকরী টেকনিক হলো—আপনি বেশি কথা না বলে অপরপক্ষকে বলতে উৎসাহিত করুন। কেউ কথা বলতে এলেই আপনি খানিকটা বলে তারপর একটা দুটো করে প্রশ্ন তাকে করতে থাকুন। কথা খানিকটা এগিয়ে গেলে আবারও তাকে নতুন কোনো পয়েন্ট দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন তিনি কথা বলতে এত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন যে, তিনিই কথা বলছেন। একদিকে তিনি যেমন তৃপ্ত হচ্ছেন, তেমনি আপনিও বেঁচে যাচ্ছেন কথা বলা থেকে।

কারণ আসলে বেশিরভাগ মানুষই শোনার চেয়ে বলতেই বেশি পছন্দ

করে। কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় দেখবেন স্বপ্নরবাড়িতে আপনার কদর বেড়ে যাবে। কারণ সবাই বলতে চায়, শুনতে চায় খুব কম মানুষ। আর আপনি আপনার এই শোনার গুণটাকেই কাজে লাগান।

প্রশ্ন : প্রার্থনার আগে কোয়ান্টায়ন করলে কি প্রার্থনা একাত্ম হবে?

উত্তর : প্রার্থনা সবচেয়ে সুন্দর হয়, সবচেয়ে চমৎকার হয় যখন আপনি কোয়ান্টায়ন করেন। যখন মৌনতা অবলম্বন করেন, যখন নীরবতা অবলম্বন করেন, যখন বাইরের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন তখন আপনার যোগাযোগ হবে শুধু নিজের সাথে, নিজের অন্তরের সাথে, আত্মার সাথে। কারণ আত্মা হচ্ছে স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। এই দেহ আত্মার মাধ্যম ছাড়া স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। মন যখন আত্মার সাথে সংযুক্ত হয় তখনই আসলে স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের পথ খোলাসা হয়ে যায়। এজন্যেই আত্মনিমগ্নতা এবং এজন্যেই কোয়ান্টায়ন।

প্রশ্ন : অনেকেই বলে কোয়ান্টায়ন করা খুব কঠিন। আসলেই কি তাই?

উত্তর : কিছুটা তা-ই। মৌনতা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ। মানুষের স্বভাবটাই হচ্ছে কথা বলার, শোরগোল করার। সহজাতভাবেই আমরা বলতে চাই। এ জন্যেই ইচ্ছে না থাকলেও কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এ নিয়ে খুব মজার গল্প আছে।

একবার চার ভিক্ষু ধ্যানে নিমগ্ন হলো। চুপচাপ থেকে ধ্যান করবে তারা।

এর মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আশ্রমের একজন সেবক প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে গেল। তখন প্রদীপ জ্বালানো হতো চর্বি দিয়ে। কিন্তু এই প্রদীপটার চর্বির মধ্যে পানি ছিলো।

পানি থাকার ফলে সলতে জ্বলছে আবার পটপট পটপট করে আওয়াজ হচ্ছে। এই আওয়াজে একজন বিরক্ত হয়ে গেল, বললো, ব্যাটা বে-আক্কেল! আমাদের মৌনতাকে বিঘ্নিত করার জন্যে এরকম চর্বি দিয়েছে। সে তার মৌনতা ভেঙে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেললো।

পাশেরজন তখন বললো, সে দিয়েছে-দিয়েছে, তোমার কথা বলার দরকার কী ছিলো? অতএব তার মৌনতাও ভাঙলো।

তৃতীয়জন বললো, ও বলেছিলো-বলেছিলো, তোমার কথা বলার দরকার

কী ছিলো? গেল সে-ও।

চতুর্থজন বললো যে, দেখ, তোমরাই কিন্তু কথা বলেছো, আমি কিন্তু কোনো কথা বলি নি।

অর্থাৎ নয়েজ, কমেণ্টস, আওয়াজ এভাবেই সংক্রমিত হয়। একজন নয়েজ সৃষ্টি করলে শুধু যে তার মনোযোগ নষ্ট হয় তা নয়, আশেপাশে সবার মনোযোগ নষ্ট হয়। অতএব কোয়ান্টায়নের সময় আপনি যদি সতর্ক থাকেন যে, আপনি অসচেতনভাবে কোনো শব্দ সৃষ্টি করবেন না। তাহলেই কোয়ান্টায়ন খুব সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : স্ত্রীর সাথে সেপারেশন চলছে। এসব কারণে মেডিটেশন করতে সমস্যা হচ্ছিলো। লামা কোয়ান্টায়ন করে আসার পর সেটা কেটে গেছে। সমস্যা হলো, স্ত্রী-পক্ষের লোকেরা যখন শোনে এই সংকটের মধ্যেও আমি ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি’ বলছি, তারা মনে করে, যে মেয়েদের সন্দেহ করে আমার স্ত্রী চলে গেছে, আমি বোধ হয় এখন তাদেরকে নিয়ে ভালো আছি! আমি কী উত্তর দেবো?

উত্তর : উত্তর খুব সহজ। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি ভালো আছি। যা সন্দেহ করে করুক। আপনি শুধু একটা কথাই বলবেন যে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি ভালো আছি এবং আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কারণ আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি তিনি যেকোনো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন। আমি মেডিটেশনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনা করছি।

আসলে কে কী মনে করলো বা কে কী সিদ্ধান্ত নিলো, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি তা-ই করবেন যা আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন। যা আপনার জন্যে ও অন্যের জন্যে কল্যাণকর।

দৃষ্টিভঙ্গি



দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব

প্রশ্ন : দৃষ্টিভঙ্গি মানে কী? দৃষ্টিভঙ্গি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে কীভাবে বদলে দেয়? এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : জীবনদৃষ্টি বা দৃষ্টিভঙ্গি কথাটার মানে হচ্ছে জীবনকে আমি কীভাবে দেখছি। জীবন সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত কেমন হওয়া উচিত—এ বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট অভিমত। আর জীবনকে সুন্দর করার জন্যে যে একটি জিনিসের প্রয়োজন, তা হলো সঠিক জীবনদৃষ্টি। বাকি সবকিছু তখন এমনিই চলে আসে। কারণ চাবিটা যদি ঠিক থাকে আপনি তালাটা খুলতে পারবেন। তা না হলে যত চাবি থাকুক আপনার কাছে, এটা যদি ঐ তালায় চাবি না হয়, তাহলে সেই তালা খোলা যাবে না।

জীবনের তালা, জীবনের বন্ধ দরজা খোলার জন্যে যে সঠিক চাবিটির দরকার সেই চাবিটি অর্জন করার জন্যে প্রয়োজন সঠিক জীবনদৃষ্টি।

আসলে সকল বাস্তবতার নির্মাতা মস্তিষ্কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্যে প্রয়োজন সুসংহত মানসিক প্রস্তুতি। আর মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ত বা অভিপ্রায়। কারণ মন পরিচালিত হয় দৃষ্টিভঙ্গি বা নিয়ত দ্বারা। আর মস্তিষ্কে চালায় মন।

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণা করেছেন মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক নিয়ে। ড. এলেন গোল্ডস্টেইন, ড. জন মটিল, ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড ও ড. ই রয় জন দীর্ঘ গবেষণার পর বলেছেন, একজন প্রোগ্রামার যেভাবে কম্পিউটারকে পরিচালিত করে, তেমনি মন মস্তিষ্কে পরিচালিত করে। মস্তিষ্ক হচ্ছে হার্ডওয়ার আর মন হচ্ছে সফটওয়ার।

নতুন তথ্য ও নতুন বিশ্বাস মস্তিষ্কের নিউরোনে নতুন ডেনড্রাইট সৃষ্টি করে। নতুন সিন্যাপসের মাধ্যমে তৈরি হয় সংযোগের নতুন রাস্তা। বদলে যায় মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো। মস্তিষ্ক তখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন বাস্তবতা উপহার দেয়।

নতুন বাস্তবতা ভালো হবে না খারাপ হবে, কল্যাণকর হবে না ক্ষতিকর হবে তা নির্ভর করে মস্তিষ্কে দেয়া তথ্য বা প্রোগ্রাম-এর ভালো-মন্দের ওপর। কল্যাণকর তথ্য ও বিশ্বাস কল্যাণকর বাস্তবতা সৃষ্টি করে আর ক্ষতিকর তথ্য বা বিশ্বাস ক্ষতিকর বাস্তবতা উপহার দেয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, জীবনের নতুন বাস্তবতার চাবিকাঠি হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি বা নিয়ত।

বিজ্ঞানীরা বলেন-দৃষ্টিভঙ্গি দুধরনের।

এক, প্রো-একটিভ। দুই, রি-একটিভ।

প্রো-একটিভ অর্থ হচ্ছে যেকোনো পরিস্থিতিতে উত্তেজিত বা আবেগপ্রবণ না হয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রো-একটিভ অর্থ হচ্ছে অন্যের কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো কাজ বা আচরণ না করা। সর্বাবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আচরণ ও কর্মপন্থা অবলম্বন করা। প্রো-একটিভ অর্থ হচ্ছে কী কী নেই তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে যা আছে তা নিয়েই সুপরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করা। প্রো-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় সাফল্য ও বিজয় ছিনিয়ে আনে।

অপরদিকে রি-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ব্যর্থতা, হতাশা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। রি-একটিভ হলে নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে থাকে না। নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যের হাতে। আপনি যখন অন্যের কথায় কষ্ট পান, অন্যের কথায় রেগে যান, অন্যের আচরণে ক্রোধে ফেটে পড়েন, অন্যের তোষামোদিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, চাটুকারিতায় গলে যান, অন্যের কথায় নাচেন, তখন নিয়ন্ত্রণ আর আপনার হাতে থাকে না। নিয়ন্ত্রণ চলে যায় অন্যের হাতে। রি-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনে নেতিবাচকতা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন : একজন প্রো-একটিভ মানুষের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : একজন প্রো-একটিভ মানুষের বৈশিষ্ট্য তিনটি—

১. তারা উত্তেজিত বা আবেগপ্রবণ না হয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

২. তারা কী কী নেই তা নিয়ে হা-হুতাশ না করে যা আছে তা নিয়েই সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেন।

৩. তারা সাময়িক ব্যর্থতাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেন এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে ধৈর্যের সাথে নিরলসভাবে কাজ করে যান।

প্রশ্ন : আমি জানি যে, আমি প্রো-একটিভ। কিন্তু আমার আশেপাশের মানুষগুলো তো আমার মতো নয়। সেসব মানুষের আচরণে আমি খুব কষ্ট পাই। বেশিরভাগ মানুষ আমার সরলতার সুযোগ নেয়। এর প্রতিকার কী?

উত্তর : যদি প্রো-একটিভ হয়ে থাকেন তাহলে আশেপাশের মানুষের আচরণে আপনি কষ্ট পাবেন কেন? আশেপাশের মানুষের আচরণে কষ্ট পান মানেই

হচ্ছে আপনি রি-একটিভ। প্রো-একটিভ হলে আশেপাশের মানুষের আচরণে আপনার দুঃখ হতো-আহা! এ লোকগুলো কত হতভাগা। এখনো এরকম আচরণ করে। আমাদের যারা মহামানব ছিলেন তারা মানুষের আচরণে কোনোদিন কষ্ট পান নি। বরং আশেপাশের মানুষের খারাপ আচরণে তাদের জন্যেই কষ্ট পেয়েছেন। তাদের মূর্খতা, তাদের দীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন। তাদের সুবুদ্ধি কামনা করেছেন।

প্রশ্ন : কেউ গায়ে হাত তুললে কীভাবে প্রো-একটিভ থাকা যায়?

উত্তর : গায়ে হাত তুললে আপনি কী করতে পারেন? হাতটাকে ধরতে পারেন। যদি হাতটাকে ধরার শক্তি আপনার থাকে। এজন্যে হাত ধরার শক্তি আপনাকে অর্জন করতে হবে। ঠান্ডা মাথায় নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। মনে রাখবেন, দুর্বলের কোনো বন্ধু হয় না এবং দুর্বল প্রতিকার করতে পারে না। প্রতিকার করতে হলে আগে সবল হতে হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত সবল না হচ্ছেন ততক্ষণ গায়ে হাত তুললে চুপচাপ থাকবেন। এক গালে চড় মারলে পারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবেন। কারণ শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত যতই লাফালাফি করেন, কোনো লাভ নেই। প্রথম তো গায়ে হাত তুলেছিলো, পরে গায়ে পা তুলবে। তাই প্রতিবাদ নয়, প্রতিকার কীভাবে করা যায় তার চিন্তা করবেন এবং ঠান্ডা মাথায় সেভাবে পদক্ষেপ নেবেন।

প্রশ্ন : কেউ গালিগালাজ করলে বা জুলুম করলে কি সহজে মেনে নেয়া যায়?

উত্তর : এখানে কয়েকটি ব্যাপার আছে। প্রথম হলো, যখন আপনাকে গালিগালাজ করছে, বকাবকি করছে, এসব ক্ষেত্রে আপনার প্রো-একটিভিটির পরিচয় হচ্ছে পাল্টা জবাব না দিয়ে নীরব থাকা। অর্থাৎ এখানে এটা সহজে মেনে নেয়া। আর এটাই সত্যিকারের বীরত্ব। কারণ আপনাকে খোঁচা দিচ্ছে, আপনার চড় মারার শক্তি আছে, তখনও আপনি সহ্য করছেন-এটা খুব কঠিন। এটাই মহামানবদের বৈশিষ্ট্য। আর কেউ খোঁচা দিচ্ছে-আপনার চড় মারার শক্তি নেই, আপনি তো সহ্য করবেনই। এটা হচ্ছে দুর্বলের কাজ।

আবার সবকিছুই সহজে মেনে নেয়া যায় না। যেমন অন্যায় হচ্ছে, জুলুম হচ্ছে-এটা আপনি মেনে নিতে পারেন না। যদি আপনার শক্তি থাকে তাহলে

অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। আর যদি শক্তি না থাকে তাহলে এটা যে অন্যায় তা বলতে হবে, পারিপার্শ্বিক জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং যার ওপর এ অন্যায় হচ্ছে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নৈতিক এবং আত্মিক সাহস যোগাতে হবে যাতে সে এর প্রতিকারের শক্তি অর্জন করতে পারে এবং আন্তরিকভাবে তার জন্যে দোয়া করতে হবে।

প্রশ্ন : আমি এখন অনেক প্রো-একটিভ ও সাহসী। এখন আমি যদি কোনো সন্ত্রাসীকে পাই, তাহলে কি প্রো-একটিভ থেকে চুপ থাকবো, না মারবো? অত্যাচারিতের প্রতি আমার খুবই সহানুভূতি। সন্ত্রাসীকে মিষ্টি কথা বললে উল্টো মার খেতে পারি। তাই প্রথম সুযোগেই আঘাত করা উচিত-কী বলেন?

উত্তর : প্রো-একটিভ কথাটার অর্থ হচ্ছে, যেকোনো অবস্থায় সে অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নেয়া। সর্বোত্তম করণীয় ঠিক করা। অত্যাচারিতের প্রতি আপনার সহানুভূতি প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রস্তুতি ছাড়া বা ঠেকানোর সামর্থ্য ছাড়া আপনি যখন একজন সন্ত্রাসীকে প্রত্যাঘাত করতে যাবেন, আপনি তখন ভুল করবেন। কারণ এতে আপনিও শিকার হবেন একই পরিণতির। হয়তো দেখা যাবে আপনি শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, প্রতিকারের সমাধানে যেতে হবে। কারণ প্রতিবাদ হলো দুর্বলের কাজ। কিন্তু প্রতিকার করতে হলে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়, প্রস্তুতি নিতে হয়।

ধরুন-ছিনতাই হচ্ছে, আপনারা দুজন বা তিনজন ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলতে পারেন। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ছিনতাই হচ্ছে এবং ছিনতাইকারী ১১ জন, আর আপনি একা। এ অবস্থায় আপনি আবেগের বশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেটা প্রো-একটিভ কোনো সিদ্ধান্ত হবে না। কারণ আবেগ নয়, প্রো-একটিভ সিদ্ধান্তে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিটাই বেশি প্রযোজ্য।

আসলে জীবনে কখনো কখনো আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদপসরণের দরকার হয়। রণনীতির ভাষায় যাকে বলে ‘কৌশলগত পশ্চাদপসরণ’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানবাহিনীর হাতে ইংরেজরা এমন মার খেলো যে, ফ্রান্স বিজয়ের পর জার্মানরা যখন ইংলিশ চ্যানেলের দিকে অগ্রসর হলো তখন ইংরেজ বাহিনীর দুলক্ষ সৈন্য পেছনে হটে যেতে বাধ্য হলো।

সবাই ধরে নিলো ইংরেজ বাহিনী পালিয়েছে। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণকৃত প্রশিক্ষিত সৈন্যরাই চার বছর পর আরো সংগঠিত হয়ে জার্মানি আক্রমণ

করলো এবং বার্লিনে নিজেদের পতাকা ওড়ালো। কাজেই হঠকারিতা নয়, আবেগবশত লাফলাফি নয়, আসলেই আপনি কতটা পারবেন সেটা ভেবে নিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে, প্রতিবাদ নয়।

প্রশ্ন : কারো অন্যায় আচরণ দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। সাথে সাথেই প্রতিবাদ করতে চাই। এ অভ্যাসের জন্যে অনেক ঝামেলায়ও পড়েছি। কী করণীয়?

উত্তর : সাথে সাথে প্রতিবাদ করতে যাওয়া অর্থহীন। কারণ প্রতিবাদ করে কখনো কোনো লাভ হয় না। কিছুদিন খুব চোঁচামেচি হয়, হৈ-হাঙ্গামা হয়। তারপর একসময় উৎসাহে ভাটা পড়ে, গলার স্বর নরম হয়ে যায়। যা করা উচিত তা হলো প্রতিকার।

বুদ্ধিমান মানুষ প্রতিবাদ নয়, প্রতিকার করে। আসলে ক্ষোভ, ঘৃণা আর বিদ্বেষেরই এক ধরনের প্রকাশ হচ্ছে প্রতিবাদ। ফলে সমাধান নয়, সমস্যা বরং আরো জটিলতার দিকেই গড়ায়। ভুল বোঝাবুঝি, শত্রুতা এবং প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। ফলে দুপক্ষই ভোগান্তির শিকার হয়। অন্যদিকে প্রতিকারের মানসিকতা নিয়ে একজন মানুষ যখন কাজ করে, তখন জটিলতা নয়, সমাধানের উদ্যোগই থাকে তার। ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াটা হয় তার জন্যে সহজ।

আর তরুণ বয়সে রাগ-ক্রোধকে মনে করা হয় একটা বীরোচিত ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রাগ-ক্রোধ দিয়ে কেউ কখনো ভালো কিছু করতে পারে নি। বরং ঠান্ডা মাথায় গঠনমূলক কোনো কিছু যখন সে করেছে তখনই সে সফল হয়েছে।

প্রশ্ন : বাস্তব পরিবেশ নেগেটিভ। কোনো প্রকার পরিবর্তনের কোনো পথ নেই। সেইসব পরিস্থিতি কীভাবে অতিক্রম করবো?

উত্তর : আসলে এটা একটা ভুল ধারণা যে, পরিবর্তনের কোনো পথ নেই। পৃথিবীতে কোনো কিছু, কোনো পরিস্থিতিই স্থায়ী নয়। দুঃখও স্থায়ী নয়, সমস্যাও স্থায়ী নয়। সমস্যা স্থায়ী হয় কখন? যখন সমস্যাকে সংকট মনে করেন। কনফুসিয়াস খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, যাকে আপনি সমস্যা মনে করছেন, সেটাকে যদি বিশ্লেষণ করেন তবে তার মধ্য থেকেই সমাধানের

বীজ বেরিয়ে আসবে।

অতএব বুদ্ধিমানরা কখনো বাস্তব পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তারা বাস্তবতা তৈরি করে। পৃথিবীতে প্রতিটি সফল মানুষ বাস্তবতা তৈরি করেছেন। কাজেই পরিবর্তনের কোনো পথ নেই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আপনি বড়জোর এটা বলতে পারেন যে, আমি এ মুহূর্তে ইতিবাচক পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখছি না। আর এখন থেকে সবসময় মনে করবেন, যে কোনো অবস্থাকে পরিবর্তন করা যায়। পরিবর্তনটা ভালোর দিকে যাবে, না মন্দের দিকে যাবে সেটা নির্ভর করবে আপনার ওপর। আপনি ইচ্ছে করলে ভালোর দিকে পরিবর্তন করতে পারেন, আর ইচ্ছে না করলে খারাপের দিকে পরিবর্তন হতে পারে।

প্রশ্ন : আমি এসোসিয়েট প্রফেসর হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দলীয়করণের কারণে হতে পারি নি। এক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে মেনে নিলে প্রতিবাদের বীজ নষ্ট হয়ে যায়। অথচ শোকরের দাবি হলো মেনে নিতে হবে, সীমারেখা কীভাবে টানবো?

উত্তর : আসলে আমাদের এখনকার যে সমাজ-বাস্তবতা তাতে নেটওয়ার্কিং বা সংযোগায়ন অর্থাৎ যোগাযোগ করাটাও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা। এখানে প্রতিবাদ করেও কিছু হবে না। আবার মেনে নেয়ারও কিছু নেই। যেখানে যোগ্যতার যে মাপকাঠি সেখানে অগ্রসর হতে হলে আপনাকে তার সবকিছুই পালন করতে হবে।

প্রশ্ন : জীবনের যেকোনো অবস্থা থেকেই কি জীবনের কার্যক্রম শুরু করা যায়? বয়স হয়ে গেছে এখন আমার দ্বারা হবে না। এটা কি সঠিক?

উত্তর : এটা মোটেই ঠিক নয়। আমরা যদি ইতিহাসের প্রখ্যাত মানুষদের জীবনী দেখি, আমরা দেখবো তাদের অনেকেরই জীবনের প্রথম অংশটা অনেক সাদামাটা। জীবনের অনেক পরে এসে বা অনেকে শেষ পর্যায়ে এসে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা বা যে কাজের জন্যে তারা অমরত্ব লাভ করেছেন সে কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন।

যেমন, সাড়া জাগানো উপন্যাস রুটসের লেখক এলেক্স হ্যালি। ৪০ বছর মার্কিন কোস্ট গার্ডে খুব সাধারণ চাকরি শেষে অবসর গ্রহণের পর তিনি

ভাবলেন, তার পূর্ব-পুরুষ-আফ্রিকা থেকে যাদের দাস হিসেবে জোর করে আমেরিকায় নিয়ে আসা হয়েছে সেই কালো মানুষদের ইতিহাস নিয়ে এখন একটি উপন্যাস লিখবেন। শুরু করলেন গবেষণা, ভ্রমণের কাজ।

সবকিছু শেষ করে ১৯৭৬ সালে ‘রুটস ৯ দ্যা সাগা অফ এন আমেরিকান ফ্যামিলি’ যখন প্রকাশিত হয় তখন তার বয়স ৫০ পেরিয়ে গেছে। সেলিব্রিটির খ্যাতি পেলেন তারও কয়েক বছর পরে যখন তা মিনিসিরিজ হিসেবে টেলিভিশনে প্রচারিত হলো, বিশ্বজুড়ে অনূদিত হলো অনেকগুলো ভাষায়।

আবার ইতিহাসের একজন ক্ষমতাধর মানুষের কথা ধরুন। ২১ বছর যখন তার বয়স তখন তিনি ব্যবসায়ে লস করলেন। ২২ বছর বয়সে আইনসভার নির্বাচনে পরাজিত হলেন। ২৪ বছর বয়সে আবারও ব্যবসায়ে লোকসান হলো। ২৬ বছর বয়সে হারান প্রিয়তমা স্ত্রীকে এবং ২৭ বছর বয়সে নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হন, ৩৪ বছর বয়সে আবারও কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হন, ৪৫ বছর বয়সে সিনেট নির্বাচনে পরাজিত হন এবং এর মাঝখানে ৩৭ বছর বয়সে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হন এবং ৪৯ বছর বয়সে আবারও সিনেট নির্বাচনে পরাজিত হন।

অবশেষে ৫২ বছর বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই মানুষটি হলেন আব্রাহাম লিংকন-গৃহযুদ্ধ এবং দাসপ্রথার অবসানের জন্যে যাকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে খ্যাতিমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। গেটিসবার্গে দেয়া তার বিখ্যাত ভাষণে-‘ডেমোক্রেসি ইজ বাই দি পিপল, অফ দি পিপল, ফর দি পিপল’-এ উক্তিটিকে বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের ব্যাপারে এ যাবৎকালে সবচেয়ে উদ্ধৃত উক্তি।

ইমাম আবু হানিফার কথা ধরুন। বর্তমান বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মুসলিম এখন হানাফী মাজহাবের অনুসারী। তাঁকে বলা হয় ইমামে আজম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ইমাম। অথচ শৈশবে তিনি কোনো পড়াশোনাই করেন নি। বাবার কাপড়ের ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। একদিন তিনি যখন আল্লামা শাবীর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, শাবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার ছাত্র? আবু হানিফা জবাব দিলেন, আমি কারো ছাত্র নই। আমি পড়াশোনা করি নি। শাবী তখন বললেন, কিন্তু তোমার মধ্যে তো আমি বুদ্ধিদীপ্ততা দেখতে পাচ্ছি। তোমার উচিত জ্ঞানী লোকদের সংস্পর্শে থাকা। শাবীর এ বাক্যটিই আবু হানিফার জীবন পাল্টে দিলো। তিনি জ্ঞানসাধনায় ব্রতী হলেন। পরবর্তী জীবনের কথা তো আমরা সবাই জানি।

এঁরা যদি এত পরে জীবন শুরু করেও সফল হতে পারেন, খ্যাতিমান,

অমর হতে পারেন তাহলে আপনি কেন পারবেন না। অতএব জীবনে যেখানে আছেন সেখান থেকে শুরু করুন। যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন। আপনি অবশ্যই যেখানে পৌছতে চান সেখানে যেতে পারবেন।

প্রশ্ন : আপনি সবসময় বলে থাকেন-আপনার যা আছে তা নিয়েই শুরু করুন। এ বক্তব্যটি এখনও বুঝে উঠতে পারি না। শুনতে হাস্যকর কিন্তু এটা সত্য। পরিবার থেকে শিশুকাল থেকেই সম্পূর্ণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমি পঙ্গু; অবলম্বন ছাড়া জীবনে বড় হওয়া যায়-এই আত্ম উপলব্ধি তৈরি করতে ভীষণ বেগ পেতে হয় কিন্তু আমি আন্তরিকভাবেই বড় হতে চাই-যে ভুল করেছি তা থেকে বের হতে এখানে এসেছি। আমি জানি, বড় হতে গেলে অবলম্বন-এর নির্ভরতা ছাড়তে হবে। কিন্তু অনুভব করতে পারি না-মন অবলম্বনকেই আঁকড়ে ধরতে চায়। মুক্তির কার্যকর উপায় কী?

উত্তর : আসলে যা আছে তা দিয়েই শুরু করতে হয়। যা নেই তা দিয়ে কখনো শুরু করা যায় না। আপনি ঠিক বলেছেন, অন্যের ওপর নির্ভরতা ছাড়তে হবে। নিজেকে বিশ্বাস করুন। নিজের ওপর আস্থা রাখুন। নিজের যা আছে তা দিয়েই শুরু করতে পারবেন। তা নিয়েই কাজ করতে পারবেন। ছোট একটা ঘটনা বলি।

১৯৭৮ সালে বিটিভিতে আমার একটা সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার কথা। আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমিও প্রস্তুতি নিছি। অনুষ্ঠানের দিন ঘর থেকে বেরিয়েছি। এমন সময় পা পিছলে রাস্তার পাশের কাঁচা ড্রেনে পড়ে গেলাম। পড়বি তো পড় এমনভাবে যে, আমার পরনের পোশাকটি ময়লা ও পানিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল। এটি পরে আর বেরোনো সম্ভব নয়। বাসায় ফিরে এলাম। কিন্তু আমার আসলে বাইরে পরার মতো একটিই পোশাক ছিলো। ভাবছিলাম-এখন কী করা যায়?

হঠাৎ মনে হলো-আমার ঘরে পরার জন্যে গামছা দিয়ে বানানো যে ফতুয়াটা আছে সেটাও তো পরা যায়। সাথে সাথেই ঘরে পরার পাজামা ও ফতুয়া পরেই রওনা হলাম। মজার ব্যাপার হলো-রামপুরা টিভি স্টেশনে যখন গেলাম তখন ঢোকার জন্যে পাস লাগে যা আমি জানতাম না। কিন্তু আমার ঢুকতে কোনো অসুবিধা হলো না। পরে বুঝলাম আসলে নিরাপত্তা প্রহরী আমার পরনে ঐরকম পোশাক দেখে আমাকে নাটকের একজন শিল্পী মনে করেছিলো। আর এদিকে প্রোথ্রাম তো রেকর্ডিং হয়ে গেল।

তখন ছিলো সাদাকালো টেলিভিশনের যুগ। আর আমার পরনে ছিলো হলুদ কালো চেকের সেই গামছা যা সাদাকালো ক্যামেরায় খুবই ব্রাইট দেখিয়েছিলো। এ অনুষ্ঠান দেখার পর অনেকেই জানতে চাইছিলো—এত স্পেশাল ড্রেস আমি কোথা থেকে জোগাড় করলাম। অর্থাৎ যা ছিলো এক ধরনের সীমাবদ্ধতা, তা-ই হয়ে গেল শক্তি। আসলে যা আছে তা নিয়ে গুরু করলেই প্রভু তাতে বরকত দেন।

বিশ্বাস

প্রশ্ন : আপনি বলেন, আমরা নিজেরাই পারি নিজের সবকিছুকে বদলে দিতে। সত্যিই কি তাই? কীভাবে?

উত্তর : আসলেই আপনি নিজেই পারেন আপনার সবকিছু বদলে দিতে। আর জীবন বদলানোর জন্যে, প্রয়োজন শুধু মুক্ত বিশ্বাস।

আমি পারি, আমি পারবো—ছোট্ট একটি বাক্য। কিন্তু এই ছোট্ট বাক্যটির মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে সেটাই প্রভাবিত করে আপনার সকল কর্মকান্ড। ধরুন, আপনার বাড়ির সামনের রাস্তায় ১০০ ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া ছয় ইঞ্চি পুরু একটি তক্তা বিছিয়ে বলা হলো, এর ওপর দিয়ে হেঁটে যান, আপনি দ্বিতীয় কোনো চিন্তা ছাড়াই হেঁটে যাবেন। কেউ বা হয়তো দৌড়ও দেবেন। কারণ আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি জানেন যে, আপনি পারবেন। আপনার পা ফেলার জন্যে এক ফুট চওড়া জায়গাই যথেষ্ট।

কিন্তু এ তক্তাটাই যদি রাস্তার এপারের বহুতল ভবনের ছাদ থেকে ওপারের বহুতল ভবনের ছাদে লাগিয়ে দেয়া হয়, আপনি এই ১০০ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবেন না। এক পা দুপা এগোনোর পরই হাত-পা কাঁপতে শুরু করবে, মাথা ঘোরাতে শুরু করবে। কাঁপতে কাঁপতে একসময় হয়তো পড়েই যাবেন, একাকার হয়ে যাবে আপনার হাড়-মাংস।

অথচ চোখের সামনেই আপনি দেখছেন একজন রাজমিস্ত্রি বাঁশ বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ৮/১০ তলা ভবনের দেয়াল প্লাস্টার করছে দুই বাঁশের মাঝখানে বিছানো এক ফুট চওড়া তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে। একজন কাঠমিস্ত্রি পাতলা কাঠের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে টিনের চাল বা ছনের ছাউনি লাগাচ্ছে। রাজমিস্ত্রি বা কাঠমিস্ত্রি ৮/১০ তলা ভবনের প্লাস্টার করতে গিয়ে বা টিনের চাল লাগাতে গিয়ে পড়ে গেছে, এমন কথা আপনি কখনো

গুনেছেন? শোনে নি। কেন?

কারণ সে বিশ্বাস করে ৭০/৮০/১০০ ফুট ওপরের কাঠের তক্তায় দাঁড়িয়ে সে দেয়াল প্লাস্টার করতে পারবে, ছাদে উঠেও অনায়াসে টিন লাগাতে পারবে। বিশ্বাসই তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এই স্বতঃস্ফূর্ত কর্মদক্ষতা।

স্বাভাবিকভাবেই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, বিশ্বাস কীভাবে কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করে? এর বৈজ্ঞানিক উত্তর খুব সহজ। বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্ক আপনার পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে।

আবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন—মন কী? নোবেল পুরস্কারবিজয়ী নিউরো সায়েন্টিস্ট রজার স্পেরি 'Mind, Brain and Humanist Values' নিবন্ধে '৫০ কোটি বছরের বিবর্তনের সর্বোচ্চ অর্জন' বলে অভিহিত করেছেন মনকে। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার জন একলস 'Evolution of the Brain : Creation of the Self' গ্রন্থে মনকে বর্ণনা করেছেন আত্মসচেতন, সক্রিয়, অনুসন্ধিৎসু স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ারূপে।

আর বিখ্যাত কানাডীয় নিউরোসার্জন ড. ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড তার 'The Mystery of the Mind' গ্রন্থে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন 'মস্তিষ্ক হচ্ছে কম্পিউটার যা মনের প্রোগ্রাম অনুসারে পরিচালিত হয়'। তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি—মন এক বিশাল স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা পরিচালিত করে মস্তিষ্কে। আর মস্তিষ্ক পরিচালিত করে সকল শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে।

মস্তিষ্কে নিউরোসায়েন্টিস্টরা সবচেয়ে আধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও কমপক্ষে ১০ লক্ষ গুণ শক্তিশালীরূপে বর্ণনা করেছেন। মস্তিষ্ক নিয়ে যত গবেষণা করছেন ততই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন বিশাল সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে তীরে ধেয়ে আসা ঢেউই কেবল তারা গুনছেন।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা সর্বশেষ গবেষণায় দেখেছেন, আপনি যখন আপনার মস্তিষ্কে নতুন বিশ্বাস, নতুন ধারণা, নতুন স্বপ্ন প্রদান করেন, তখন মস্তিষ্কের নিউরোনে নতুন সংযোগপথ রচিত হয়। একই বিশ্বাস, একই স্বপ্ন, একই ধারণা, একই কল্পনার পুনরাবৃত্তি এই সংযোগপথকে রাখে ব্যস্ত ও সক্রিয়। মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। বদলে যায় মস্তিষ্কের কর্মকাঠামো। আপনার সকল মনোদৈহিক প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করে লক্ষ্যের বাস্তবায়নে। সহজ-স্বতঃস্ফূর্ততায় আপনি আপনার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। মুক্ত বিশ্বাসই আপনার সকল কর্মকাণ্ডে এভাবে সূচিত করে এই মৌলিক পরিবর্তন।

প্রশ্ন : মুক্ত বিশ্বাস যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয়, তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজ পথকে গ্রহণ করে না?

উত্তর : কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়। বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে। বিশ্বাস করে অলীকে। বিশ্বাস করে প্রতারকদের। বিশ্বাস করে মূর্খদের। বিশ্বাস করে শয়তানকে। আর তাদের এই বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত। ভালো কোনোকিছুকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। পারে না ইতিবাচক ভালো জিনিসকে গ্রহণ করতে। কল্যাণকর ভালো জিনিস দেখলেই তাদের মনে সন্দেহ জাগে। এত ভালো হয় কীভাবে! এত সহজ!

ধর্মের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। অধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই। সত্যের ব্যাপারে এদের প্রশ্ন আছে। কিন্তু প্রচলিত মূর্খতা বা অবিদ্যার ব্যাপারে এদের কোনো প্রশ্ন নেই। ঈশ্বরের ব্যাপারে এদের মনে প্রশ্ন আছে। শয়তানের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই।

একজন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন। দেখবেন সে ঈশ্বর সম্পর্কে এক হাজারটা প্রশ্ন করছে। তাকে জিজ্ঞেস করুন-শয়তান সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে? দেখবেন তার মুখে কোনো কথা নেই।

দুর্দশাগ্রস্তরা কেন দুর্দশামুক্ত হতে পারে না? কারণ, এরা নেতিবাচক কথায় বিশ্বাস করে বেশি। নেতিবাচক কথায় প্রভাবিত হয়ে যায় সহজে।

কয়েক বছর আগের ঘটনা। কোর্সের শেষদিন সবাই চলে যাওয়ার পরও এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। সুযোগ বুঝে কাছে এসে দুহাত জড়িয়ে ধরলেন। কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। আবেগাপ্ত হয়ে পড়েছেন। চোখেমুখে একধরনের কৃতজ্ঞতা। একটু স্থির হয়ে বললেন, আমার এত বছরের সমস্যা যে এত সহজে সমাধান হয়ে যেতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তার কথায় জানলাম, ভদ্রলোক শান্তিনগর এলাকায় থাকেন ২০ বছর হবে। ফাউন্ডেশন অফিসের সামনের রাস্তা দিয়েই আসা-যাওয়া করেন প্রতিদিন। জিজ্ঞেস করলাম, এত বছর পরে কেন কোর্সে এলেন? আরো আগে এলে তো অনেক আগেই আপনি ভালো থাকতে পারতেন।

একটু ইতস্তত করার পর বললেন, দেখুন নানারকম কথা শুনেছি চারপাশ থেকে। একেকজন একেকরকম কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে কৌতূহল যে একেবারে হয় নি তা-ও না। একবার ভেবেছিলাম নিজে একটু খোঁজ-খবর নেবো, কিন্তু পরে নাপিতের কথা শুনে আর সাহস হয় নি।

বিস্মিত হয়ে তাকালাম তার দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, মেডিটেশনের সাথে

নাপিতের সম্পর্ক কী? তিনি বললেন, দেখুন মহল্লার নাপিত। বছ বছর ধরে চুল কাটাই তার কাছে। একদিন চুল কাটাতে গিয়ে কথায় কথায় বললাম, দেখি একবার কোয়ান্টামে যাবো। সে হা হা করে উঠলো-স্যার! আর যা-ই করেন ঐখানে যাবেন না। শুনছি ঐখানে গেলে সব সন্ধ্যাসী হইয়া যায়। ঈমান আমল সব নষ্ট হইয়া যায়। একেবারে বেদাতি কাজ। নাপিতের কথা শুনে মনে মনে বললাম-এমনিই কষ্টের শেষ নেই। আছে একটা ঈমান। তা-ও যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে আর থাকবে কী?

একটু হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এখন কী মনে হচ্ছে, ঈমান আছে না নাই? ভদ্রলোক বললেন, আর লজ্জা দি়েন না। কোর্সে এসে শিখলাম, শোকরগোজার কীভাবে হতে হয়। গত দুইদিন নামাজে যে তৃপ্তি পেয়েছি তা সারাজীবনেও পাই নি।

স্বাভাবিকভাবেই আমার পরবর্তী প্রশ্ন হলো, তাহলে শেষ পর্যন্ত কোর্সে এলেন কীভাবে? তিনি বললেন, আমার এক বাল্যবন্ধু কিছুদিন আগে কোর্স করেছে। আমার সমস্যা দেখে সে আমাকে একরকম জোর করেই কোর্সে পাঠিয়েছে। বন্ধুর কথা বলতে বলতে তার চোখ আবার ছলছল করে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। বললেন, সে-ই আমাকে বাঁচিয়েছে। মনে হচ্ছে বেহেশতের শান্তি। এত শান্তি আগে কখনো পাই নি।

এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। চারপাশে এ ধরনের ঘটনা অনেক। আসলে দুর্দশার বৃত্তে বন্দিরা ভ্রান্ত বিশ্বাস, নেতিবাচক কথা, সন্দেহ-সংশয় দ্বারাই প্রভাবিত হয় বেশি। এরা ধর্মাবদানের কথা, চালবাজদের কথা, শোষকদের কথা, মূর্খদের কথা, প্রতারকদের কথা, দারোয়ানের কথা, মুদি দোকানির কথা, নাপিতের কথা আরো সংশয়ী হয়ে ওঠে। নিজে অনুসন্ধান করে খোঁজ-খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। আলোকিত আপনজনদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এরা এই শয়তান বা অকল্যাণের বৃত্ত থেকে বেরোতে পারে না। বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের সকল স্বপ্ন অধরা থেকে যায়।

প্রশ্ন : বাঙালি মস্তিষ্ক যে খুব ভালো মস্তিষ্ক এটা বলা হয়েছে সবসময়। একটা সময় তো প্রবাদ ছিলো যে, ‘হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো’-‘বাংলা আজকে যা চিন্তা করে ভারত তা চিন্তা করে আগামী কাল’। তো এই ভালো মস্তিষ্ক থাকার পরেও আমরা কেউ ব্যবহার করতে পারছি, কেউ পারছি না কেন? কারণটা কী?

উত্তর : এই কারণটাকে যদি আপনি বের করতে পারেন, তাহলে আপনি আপনার ব্যর্থতার কারণকে, আপনার অসচ্ছলতার কারণকে, আপনার ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণকে বের করতে পারবেন।

যারা মস্তিষ্কের অফুরন্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারছে না, তারা পারছে না তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এরা নিজের ব্যর্থতার জন্যে অন্যকে দোষারোপ করে—যে, অমুকের কারণে আমি ব্যর্থ। অমুকে আমাকে একটা চাকরি দিতে পারতো, চাকরি দেয় নি, অমুকে আমাকে সহযোগিতা করে নি। অথচ নিজে যে অলস সময় কাটাচ্ছে সেটা যেন কোনো দোষ নয়। সে সবসময় ক্ষুব্ধ থাকে—এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না, এটা হলো না, ওটা হলো না। কিন্তু হওয়ার জন্যে যা দরকার তা-ও করার উদ্যোগ নেয় না। ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে হতাশা ও হীনম্রন্যতায় ভুগতে শুরু করে এবং তাদের জীবনে কোনো গুরুত্ব নেই।

প্রশ্ন : আপনি সবসময় বলেন, নিজেকে সাফল্যের শিখরে দেখতে চাইলে বিশ্বাসের সাথে কাজ করতে হবে। বিশ্বাস কি সৃষ্টিকর্তার ওপরে রাখবো, না কি চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হবে তার ওপরে রাখবো?

উত্তর : আপনি যখন স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস রাখছেন সাথে সাথে কর্মটা আপনার দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে। কারণ সে বিশ্বাস বিশ্বাস নয়, যে বিশ্বাস কর্ম উৎপাদন করে না। আপনি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার বিশ্বাস করলেন। স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস রাখলেন যে, আল্লাহ চাইলে হয়েও যেতে পারে কিন্তু কোনো পড়াশোনা করলেন না। আল্লাহর অত ঠেকা পড়ে নাই। আল্লাহ তাকেই দেন যে পড়ে, যে কাজ করে। অর্থাৎ কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কাজ করতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে স্রষ্টার ওপর।

প্রশ্ন : মন যেখানে আত্মার সাথে মিলিত হয়েছে সেখানে কীভাবে অটল বিশ্বাসকে যেতে দেবো? অটল বিশ্বাস কীভাবে সবসময় লালন করবো? দয়া করে এ ব্যাপারে আরো একটু বলুন।

উত্তর : আসলে, এই অটল বিশ্বাসটাই হচ্ছে সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি। অটল বিশ্বাস যখন আসবে তখনই আপনি শোকর এবং সবরে আসতে পারবেন। অটল বিশ্বাসই মূল। পৃথিবীতে আপনি নিজের ইচ্ছায় আসেন নি। আসাটা

আপনার ইচ্ছাধীন নয়। নিজের ইচ্ছায় যাবেনও না। এটাও আপনার ইচ্ছাধীন নয়। কারণ যদি ইচ্ছা দেয়া যেত পৃথিবী থেকে আপনি নিজের ইচ্ছায় যেতে চান কি না, কেউ যেতে চাইতো না পৃথিবী ছেড়ে, দু'একজন বাদে। পৃথিবীতে তখন এত লোক হয়ে যেত যে, পা ফেলার কোনো জায়গা থাকতো না।

যেহেতু আপনি নিজের ইচ্ছায় আসেন নি, নিজের ইচ্ছায় যাবেনও না, অতএব বিশ্বাস করতে হবে কেউ আমাকে পাঠিয়েছেন। নিজের কল্যাণ এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে। সবসময় বিশ্বাস করুন বড় কিছু করার জন্যে আমি পৃথিবীতে এসেছি। অটোসাজেশন দিন। হাঁটতে চলতে সবসময় মনে মনে আওড়ান বড় কিছু করার জন্যে আমার জন্ম হয়েছে, বড় কিছু করার জন্যে আমি পৃথিবীতে এসেছি। যখন এই অটোসাজেশন সবসময় দিতে থাকবেন, আপনি দেখবেন আপনার বিশ্বাস খুব গভীরে গাঁথে গেছে।

আর বিশ্বাস একবার গভীরে গাঁথে গেলে আপনি কাজ করতে পারবেন। আপনার কাজের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হবে না। বরং প্রতিটি বাধা আপনার কাজকে বাড়িয়ে দেবে। এজন্যে সবসময় মেডিটেশনে মনোবি দেখবেন, অটোসাজেশন দেবেন যে, বড় কিছু করার জন্যেই আমার জন্ম এবং প্রত্যেকটা মানুষ এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখে, শক্তি রাখে।

প্রশ্ন : কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জন যে সম্ভব তা বোঝানোর পরেও মন বিশ্বাস করতে চাইছে না। কী করবো?

উত্তর : আসলে বিশ্বাসটাকে দৃঢ় করতে হবে। কারণ, বিশ্বাসের উল্টোটাই হচ্ছে সংশয়। এবং শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সংশয়। শয়তানের কৌশল হচ্ছে যদি কাউকে অবিশ্বাসী বানাতে না পারো তাহলে তার মনে প্রশ্ন ঢুকিয়ে দাও, যাতে সে পুরোপুরি বিশ্বাস না করতে পারে। কারণ বিশ্বাস করলেই আপনি সাফল্যের পথে থাকবেন। বিশ্বাস করলেই আপনি শোকর গুজারির পথে থাকবেন। বিশ্বাস করলে আপনি নিজের কল্যাণের পাশাপাশি অন্যের কল্যাণ করবেন।

শয়তান চায় না যে, আপনি সেটা করেন। অতএব সে আপনার মনের মধ্যে সংশয় ঢুকিয়ে দেবে। প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেবে। তাহলে আপনার কাজ হবে এই বিশ্বাসকে প্রবল করা। কীভাবে করবেন? নিয়মিত দু'বেলা মেডিটেশন করবেন এবং সবসময় অটোসাজেশন দেবেন যে, আমি বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস আমার নিজের ওপরে, আমার বিশ্বাস

আমার ফাউন্ডেশনের ওপরে, আমার বিশ্বাস আমার প্রভুর ওপরে।

আমার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু আমার প্রভুর কোনো সীমাবদ্ধতা নাই, আমার অক্ষমতা থাকতে পারে, কিন্তু আমার প্রভুর ক্ষমতার কোনো অভাব নাই। এবং তিনি যেকোনো কিছু দিতে পারেন। তিনি আমাকে ফকির থেকে আমার বানাতে পারেন, ক্ষমতাহীন থেকে ক্ষমতাবান করতে পারেন, আবার ক্ষমতা তিনি চাইলে কেড়েও নিতে পারেন।

তিনি সম্মান দিতে পারেন, চাইলে অসম্মানিতও করতে পারেন। অর্থাৎ এগুলোকে সাজিয়ে নেবেন। আমাদের প্রার্থনা কণিকায় কিছু সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা আছে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্যে। সেই প্রার্থনা করবেন এবং আগামী ছয় মাস দুবেলা মেডিটেশন এবং যখনই মনে পড়বে, যখনই মন ফাঁকা থাকবে এই অটোসাজেশন দিতে থাকবেন বা অটোসাজেশনের অডিও শুনতে থাকবেন। আপনার বিশ্বাস বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : যোগ্যতা ও দক্ষতা তৈরির জন্যে সুযোগ আসতে হয়। বিশ্বাস থাকার পরও সুযোগ না এলে কীভাবে তা দেখানো যায়। সুযোগ আসে না কেন? বিশ্বাসের জন্যে আর কত অপেক্ষা? ভালো সাঁতার শিখেছি কি না দেখানোর জন্যে পানির দরকার। পানি না থাকলে কীভাবে দেখাবো?

উত্তর : পানির অভাব বাংলাদেশে নেই। আপনি কর্ণফুলীতে নেমে স্রোতের প্রতিকূলে ২৪ ঘণ্টা স্থির দাঁড়িয়ে থাকার প্রস্তুতি নিয়ে নদীতে নামলে আপনাকে দেখতে আসা লোকের অভাব হবে না। নাচতে না জানলে উঠান সবসময়ই বাঁকা। যোগ্যতা, দক্ষতা তৈরির সুযোগ কেউ কাউকে করে দেয় না। আজ পর্যন্ত দেয় নি। যারা প্রদর্শন করেছে তারা নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রদর্শন করেছে। পালোয়ান নিজে সুযোগ তৈরি করে নিয়েছে।

কলকাতার মাসুদুর রহমানের কথা আমরা কোর্সে বলি—দুই পা কাটা নিয়ে সাঁতারে তিনি নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি কিন্তু পঙ্গু প্রতিযোগী নয় বরং সুস্থ সাঁতার প্রতিযোগীদের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। স্বেচ্ছায় তিনি সুস্থ সবলদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। সুযোগ কাউকে দেয় না, সুযোগ সৃষ্টি করে নিতে হয় নিজেকেই।

আসলে আপনার সম্ভাবনা যেমন আপনি সৃষ্টি করেন তেমনি আপনার সীমাবদ্ধতাও আপনিই তৈরি করেন। তাই আপনি বিশ্বাস করুন। যোগ্যতা সৃষ্টি করুন। সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকুন। সুযোগ আসবেই।

প্রশ্ন : বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাসকে ধরে রাখতে পারছি না। মন সংশয়ী হয়ে ওঠে। বাঁচার উপায় কী?

উত্তর : আসলে বিশ্বাস ধরে রাখাটাও একটু কঠিন ব্যাপার। কারণ শয়তান তো সবসময় লেগেই আছে। শয়তানের কৌশল হচ্ছে if you can't convince, then confuse অর্থাৎ যদি কাউকে convince করতে না পারো তবে তার মধ্যে confusion অর্থাৎ সংশয় ঢুকিয়ে দাও, প্রশ্ন তুলে দাও। ‘কী জানি! হলে হতে পারে, না হলে তো না-ও হতে পারে’ বা ‘এটা সবার জন্যে ঠিক আছে কিন্তু আমার জন্যে বোধ হয় ঠিক না’ ইত্যাদি।

কাজেই যখনই অহেতুক প্রশ্ন আসবে, বুঝবেন শয়তান বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, সংশয় ঢোকাচ্ছে। আর সংশয় এবং অবিশ্বাসের মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। বরং সংশয় অবিশ্বাসের চেয়েও খারাপ। যেমন মোনাফেকি কুফরীর চেয়েও বেশি খারাপ, ক্ষতিকর। আর অবিশ্বাস বা সংশয় জন্ম দেয় নেতিবাচকতা যা আপনার সামনে এগুনোর পথ বন্ধ করে দেয়। ইতিবাচক, বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে আপনাকে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে।

মনছবি ॥ জীবনের লক্ষ্য

প্রশ্ন : জীবনের লক্ষ্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবনের মূল লক্ষ্য হলো পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে আমার আগমনকে অর্থবহ করা। আর তার উপায় হলো নিজেকে জিজ্ঞেস করা যে, কেন এসেছি আমি, কী করতে চাই। একটাই তো জীবন। জীবনটাকে কীভাবে উপভোগ করতে চাই, সময়টাকে কীভাবে ব্যয় করতে চাই, চারপাশের মানুষের কাছ থেকে আমি কী চাই? তাদেরকে কী দিতে চাই? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এর আরো সহজ উপায় হচ্ছে—মিডিয়ায় নিজের মৃত্যু সংবাদ কীভাবে দেখতে চাই, শুনতে চাই সেটাকে অবলোকন করা। কারণ একজন কীর্তিমান মানুষের মৃত্যু সংবাদেই থাকে তার জীবনের সব অবদানের কথা।

প্রশ্ন : আমার এক বোন ল-ইয়ার। লেখাপড়া শেষ করার পর সে কোর্টে প্রাকটিস করে নি, চাকরির চেষ্টাও করে নি। বাসায় বসে শুধু কম্পিউটার গেম খেলে। অনেক বোঝানোর পরও কাজ হয় নি। তাকে কীভাবে বোঝাবো?

উত্তর : আসলে আপনার বোনের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তাই জীবনটাকে তিনি উদ্দেশ্যহীনতায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। ওকালতি পাশ করেও কম্পিউটার গেম খেলার মতো অর্থহীন কাজে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে পারছেন। যতদিন না তার নিজের সচেতনতা তৈরি হয়, জীবনের লক্ষ্য তার সামনে স্পষ্ট হয়, ততদিন পর্যন্ত তার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে বোঝাতে পারেন যাতে তার বোধোদয় হয়। যার জীবনে লক্ষ্য থাকে না, সে কখনো পরিবর্তন আনতে পারে না। যখন লক্ষ্য থাকে তখন পরিবর্তন আনা যায়।

প্রশ্ন : নিজেকে ভালবাসতে পারলে অন্তর্গত শক্তিকে জাগ্রত করা যায়। সকল পরিবর্তনের এই হচ্ছে শুরু। আমার প্রশ্ন নিজেকে ভালবাসবো কীভাবে? কী করলে নিজেকে ভালবাসা যায়।

উত্তর : নিজের গুণগুলোকে চিন্তা করবেন এবং নিজের এই গুণগুলোর জন্যে সবসময় শোকরগোজার হবেন যে, প্রভু, তুমি আমাকে এই গুণ দিয়েছো, তোমার কত দয়া। এখন আমাকে বলে দাও যে, আমি কীভাবে এই গুণগুলোকে কাজে লাগাতে পারি। এই গুণগুলোকে আপনি কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন মেডিটেশনে গিয়ে চিন্তা করবেন। এবং আপনি অবশ্যই নিজেকে ভালবাসতে শুরু করবেন এবং আপনার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হবে।

আসলে একজন মানুষ হতাশায় ভোগে কখন? যখন সে নিজেকে অভাগা মনে করে। যখন সে মনে করে যে, তার কোনো গুণ নেই বা তার গুণের কেউ কোনো কদর করছে না। তারপরে সে হীনম্মন্যতায় ভোগা শুরু করে। হীনম্মন্যতা থেকে হতাশা আসে। কিন্তু যখনই আপনি আপনার গুণের জন্যে শোকরগোজার হবেন তখনই দেখবেন যে, প্রভুর রহমত আপনার ওপরে আসবে এবং আপনি গুণকে বেশি বেশি ব্যবহার করতে পারছেন।

প্রশ্ন : আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত সৃজনশীল। কিন্তু উদ্যমহীনতা বা চুপচাপ থাকা বা অন্যের সঙ্গে এড়িয়ে চলাকে অস্বাভাবিকতা মনে হয়। সমাধান আছে কী?

উত্তর : মস্তিষ্ক সৃজনশীল হলেই যে উদ্যম থাকবে এমন কোনো কথা নেই। উদ্যম সবসময় নির্ভর করে ‘কেন কাজ করবো’—এ বিষয়টি আপনার কাছে পরিস্কার কি না তার ওপর। এ বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে পরিস্কার

না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্যম পাবেন না। কেন আমি অন্যের সাথে মিশবো, কেন আমি অন্যের সাথে কথা বলবো কারণটাকে আগে জানতে হবে। অর্থাৎ জীবনের একটি লক্ষ্য লাগবে। জীবনের লক্ষ্য না থাকলে যত সৃজনশীল মানুষ হোক, যত ব্রিলিয়ান্ট মানুষ হোক সে এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে। সমাধান অবশ্যই আছে, সমাধান হচ্ছে মনছবি।

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষ কেন দুর্দশার বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে না?

উত্তর : সে বৃত্ত ভাঙতে ভয় পায়। সে তার প্রচলিত গন্ডির বাইরে আসতে চায় না। এমনকি তার সন্তান এ বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসুক তা-ও চায় না। আমার নরসুন্দর যিনি ছিলেন, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তার কাছেই আমি চুল কাটাতাম। কয়েক বছর আগে একদিন চুল কাটাতে গিয়ে দেখলাম তার ছেলেকে। ছেলেও নরসুন্দর। সেদিন শুনলাম তার বাবা মারা গেছে। ছেলে এখন দোকানে। চুল কাটতে কাটতে ছেলেটি বলছিলো তার নাপিত হয়ে ওঠার কথা। বাবা তাকে কাজ শিখিয়েছে। দোকানটাও দিয়ে গেছে। এখন এ দোকান দিয়েই সে জীবন চালাচ্ছে। অন্য আর কিছুই কথা ভাবতে পারে না।

এই যে স্বর্ণকাররা-যারা সোনার গয়না বানায় তাদের জীবনে কিন্তু সোনার চাকচিক্য কখনো ধরা দেয় না। বংশানুক্রমিকভাবেই তারা স্বর্ণকার। দোকানে সোনার গয়না বানাচ্ছে। অথচ এদের পারিশ্রমিক সবচেয়ে কম। ভারতের হীরা শ্রমিকদের মজুরি যে কত কম তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। একসময় ধরে নেয়া হতো-মা যে বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করছে, মেয়েও সে বাড়িতে গৃহকর্মী হবে। কারণ অনিশ্চয়তার ভয়। মেয়ে ভাবতো বাইরে কোথায় যাবো, পরিণতি কী হবে ইত্যাদি। তার চেয়ে এ বাড়িই ভালো। মার খেলেও অন্তত দুবেলা তো খেতে পারছি, অত্যাচার করলেও একজনই করছে, বাইরে গিয়ে না জানি কোন ঝামেলায় পড়বো!

অর্থাৎ আমাদের মূল শৃঙ্খল এটাই যে, আমরা নতুন কিছুকে ভয় পাই। শৃঙ্খলগুলো কখনো ধর্মের নামে, কখনো রাষ্ট্রের নামে, কখনো সমাজের নামে, কখনো পিতৃপুরুষের নামে চলে আসছে।

প্রশ্ন : অধিকাংশ মানুষের জীবনে ব্যর্থতা কেন?

উত্তর : কারণ সে তার লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে, সে যাত্রা শুরু করে একদিকে, কিন্তু গিয়ে পৌঁছায় আরেক দিকে। অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং তার দৃষ্টি লক্ষ্যের

দিকে থাকে না, দৃষ্টি চলে যায় চারপাশে।

গালিবের একটি গজলের অংশ হচ্ছে—রওনা করেছিলাম মসজিদে, কিন্তু যখন এসে পৌঁছলাম, দেখলাম যে, এটা একটা পানশালা! দোষটা কি কপালের, না দোষটা গালিবের! অর্থাৎ গিয়েছিলেন মসজিদের দিকে, যেতে যেতে মসজিদ বাদ দিয়ে পানশালায় চলে গেলেন!

এখন আপনি যদি মসজিদেই যাবেন, তাহলে তো আপনার লক্ষ্যটা মসজিদই থাকবে। আর যদি পানশালায় যান, তো সেটাই লক্ষ্য হবে।

আবার রওনা করেছিলাম পানশালায়, চলে এলাম মসজিদে—এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটে না। অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে গিয়ে ভালো কাজ করে ফেলেছিলেন এরকম ঘটনা ঘটে না। ভালো কাজ করতে গিয়ে খারাপ কাজ করে ফেলার ঘটনাটাই সবচেয়ে বেশি ঘটে। মূল কথা হলো লক্ষ্য বিচ্যুত হলে ব্যর্থতা আসাটাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন : আমাদের কাজে আয় উপার্জনে বরকত নেই কেন?

উত্তর : আনন্দ নিয়ে কাজ করি না বলে। উদাহরণস্বরূপ একজন শিক্ষককে দেখুন। যিনি হয়তো দিনে পাঁচটা করে ব্যাচ পড়াচ্ছেন। তিনি কি আনন্দের সাথে পড়ান? দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই না। একরাশ বিরক্তি, মেজাজ তিরিক্ষি। উফ! আবার একটা ব্যাচ পড়াতে হবে! কী ঝামেলা! ইত্যাদি।

একবারও চিন্তা করে দেখেন না—এই ছাত্রগুলো পড়তে আসছে বলেই তার উপার্জনের সুযোগ হয়েছে। স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারছেন। এই ভেবে তার তো শুকরিয়ার সাথে, আনন্দের সাথে পড়ানো উচিত ছিলো। কিন্তু তা কি হয়? আপনাদের নিশ্চয়ই অনেকের অভিজ্ঞতা আছে, অন্তত সন্তানকে পড়াতে নিয়ে যাওয়ার সুবাদে। তারা অধিকাংশই আনন্দ নিয়ে পড়ান না। আর এজন্যেই তাদের জীবনে বরকত নেই। কারণ বিরক্তিসহ যে কাজ করা হয় সে কাজে কখনো বরকত থাকে না।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। ধরুন আপনি মাসে ৫০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। এর মধ্যে একদিন আপনার হঠাৎ পেটে ব্যথা হলো। কিছুতেই কমছে না। শেষে গেলেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের ভিজিট দিলেন ১০০০ টাকা। কিন্তু তাতেও বোঝা গেল না ব্যথার কারণ। বোঝার জন্যে ডাক্তার একগাদা টেস্ট দিলেন।

এই টেস্ট, সেই টেস্ট, আলট্রাসোনো, সুপারসোনো-সেগুলো করতে গিয়ে চলে গেল হয়তো আরো হাজার পনের। এদিকে সংসারের নিয়মিত ব্যয় তো আছেই। আর যেহেতু ৫০ হাজার টাকা আপনার উপার্জন, আপনার জীবন যাপন মানও সেরকম। ফলে ব্যয় সংকোচনের সুযোগ নেই। সব মিলে মাস শেষে নিয়মিত-অনিয়মিত মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ালো ৭০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ২০ হাজার টাকা ঘাটতি, যা হয়তো ঋণ করে যোগাড় করেছিলেন।

আবার আপনি ১৫ হাজার টাকা উপার্জন করছেন। চিন্তে আনন্দ আছে, কোনো রোগ নেই, সমস্যা নেই। সিটি স্ক্যানের দরকার নেই, প্রয়োজন নেই এমআরআইয়ের। আপনার খরচ হলো ১২ হাজার টাকা মাসে। উদ্বৃত্ত হলো তিন হাজার টাকা। তো দুটার মধ্যে কোনটাতে সুখ? উদ্বৃত্ত থাকার না ঋণগ্রস্ত হওয়ার? উদ্বৃত্ত থাকার। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বুঝতে হবে। আসলে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এ জীবনদৃষ্টিকেই বলা হয়েছে নিয়ত।

আসলে জীবনের লক্ষ্য যদি হয় শুধু উপার্জন তাহলে অনেক টাকা হয়তো আপনি করতে পারবেন। কিন্তু শান্তি না-ও পেতে পারেন।

এক ডাক্তার দম্পতির কথা বলি। রাত-দিন শুধু হাসপাতাল, ক্লিনিক আর চেম্বার। এই করতে গিয়ে তাদের একমাত্র ছেলেটিকে দেয়ার মতো আর কোনো সময় ছিলো না তাদের। ফলে বখে গেল ছেলেটি। ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে গেল। একসময় জোর করে ভর্তি করা হলো মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। কিন্তু তাকে চিকিৎসা দেয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। শেষমেশ সে রাজি হলো এই শর্তে যে, প্রতি ইনজেকশন নেয়ার বিনিময়ে তাকে ১০ হাজার করে টাকা দিতে হবে।

সারাজীবন মেশিনের মতো টাকা কামিয়েছেন যে মা-বাবা এছাড়া তাদের দেয়ার আর কিছু ছিলোও না। এদিকে টাকা পেয়ে ছেলের তো পোয়াবারো। টাকা দিয়ে সে ক্লিনিকের কর্মচারীদের কয়েকজনকে হাত করে ফেললো। তাদের মাধ্যমে ড্রাগ আনিয়ে দিবি হাসপাতালের মধ্যেই ড্রাগ নিতে লাগলো।

এই ডাক্তার মা-বাবা যদি শুধু টাকা উপার্জনের কথা চিন্তা না করে রোগীদেরকে ভালবাসতেন, আন্তরিকভাবে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে অন্তত রোগীদের দোয়ার বিনিময়ে হলেও তাদের একমাত্র সন্তানের জীবন এভাবে নষ্ট হতো না।

আসলে এরাও ডাক্তার। আবার ডাক্তার বিধান রায়ও ডাক্তার ছিলেন। সেবাপরায়ণতা আর পেশার প্রতি ভালবাসার জন্যে যিনি আজো স্মরণীয় হয়ে আছেন মানুষের মনে।

ব্যর্থতার পরে দৃষ্টিভঙ্গি ॥

হলে ভালো, না হলে আরো ভালো

প্রশ্ন : সবরকম প্রস্তুতি নেয়ার পর ফলাফল খারাপ হলে কী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবো? আল্লাহ ভালোর জন্যে করেছেন—এ দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময় নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারে না। বিশেষ করে যখন দেখি সরাসরি দৃশ্যমান বা বেশ কজন একসাথে সমান প্রস্তুতি নেয়ার পরে ফলাফল বিভিন্ন হয়।

উত্তর : বেশ কজন যদি একসাথে প্রস্তুতি নেয় তাহলে ফলাফল এক কীভাবে হবে? ধরুন একটা দৌড় প্রতিযোগিতায় ১৬ জন দৌড়াচ্ছে। প্রস্তুতি তো সবার একটি লক্ষ্যই—ফাস্ট হওয়া। কিন্তু ১৬ জন তো আর ফাস্ট হতে পারবে না। কেউ ফাস্ট হবে, কেউ সেকেন্ড হবে, কেউ থার্ড হবে, কেউ ফোর্থ হবে। কেউ আবার এত পেছনে থাকবে যে, মনে হবে সে অন্যদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যরা তার ভয়ে দৌড়াচ্ছে। অতএব এটা তো হবেই এবং এ অবস্থাতেও বলতে হবে—শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি!

অনেক সময় প্রস্তুতি নিয়েও কিন্তু না হলে ভালো হয়। কীভাবে? ছোট ঘটনা বলি, কোয়ান্টামের ইতিহাস থেকে বলি—১৯৯৩ সালের পহেলা জানুয়ারি আমরা কোয়ান্টামের প্রথম প্রোথাম করার সিদ্ধান্ত নিলাম। উপলক্ষ হলো কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের প্রকাশনা উৎসব। ছয় মাস আগে প্রোথাম সেট করা। এদিকে বই আর শেষ হচ্ছে না।

রাতের পর রাত জাগছি, আশ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু তারপরও পারলাম না। যখন ১৫ ডিসেম্বরও পার হয়ে গেল, বুঝলাম—এ সময়ের মধ্যে এ বই আর প্রকাশ করা সম্ভব না। এদিকে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর ডা. নুরুল ইসলামকে আমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে। তিনি আসার সম্মতিও জ্ঞাপন করেছেন। ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। সমাধান বেরিয়ে এলো। শিথিলায়ন মেডিটেশনের ক্যাসেট করা।

মেডিটেশনের স্ক্রিপ্ট তো তৈরিই ছিলো। স্টুডিওতে গিয়ে রেকর্ডিং করে প্রচ্ছদসহ এটাকে এক তারিখের আগেই করে ফেলা গেল। বই প্রকাশনা অনুষ্ঠান বদলে হয়ে গেল ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। পাবলিক লাইব্রেরিতে ক্যাসেট প্রকাশনা হলো। আলোচনা হলো শিথিলায়নের ওপরে। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকরা বললেন—ক্যাসেটে আসলেই মেডিটেশন হয় কি না এটা তো দেখতে হবে। ব্যস, ক্যাসেট বাজিয়ে দেয়া হলো।

বিকেলবেলা দুই ঘণ্টা আলোচনার পর যখন এ মেডিটেশন ক্যাসেট চালিয়ে দেয়া হলো তখন হলের অধিকাংশ দর্শকই নাক ডাকিয়ে ঘুম। সবাই মনে করলেন—এ-তো মহা মেডিটেশন হয়ে গেছে! কেউ মনে করলেন—এ-তো এক অদ্ভুত ব্যাপার। একজন ক্যাসেট শুনিয়ে হলভর্তি মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এমন দৃশ্যে সাংবাদিকরাও খুব আপ্ত হয়ে গেলেন। পর দিন তখনকার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স আইটেম নিউজ হলো ‘আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাক ডাকা প্রশান্তি’। আমাদের অফিসে একের পর এক ফোন আসতে লাগলো। সবাই জানতে চাইলো—কী নাকি একটা মেডিটেশনের ক্যাসেট বেরিয়েছে। এটি আমাদের চাই। আলোচনা গুঞ্জন সব মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড। যদি এটা বইয়ের প্রকাশনা হতো তাহলে এরকম ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটতো না, খবরটা প্রথম পাতায় আসতো না। বড়জোর ভেতর পাতায় ছোট করে একটা নিউজ হতো।

তার মানে যখন সবরকম প্রস্তুতি নেয়ার পরও ব্যর্থ হবেন, মনে করবেন এটা না হওয়ার মধ্যেই আপনার কল্যাণ আছে। আপনি সচেতনভাবে চাইলেও আপনার অতিচেতন মন চাইছে না এবং হয়তো কোনো অসুবিধা আছে বা নতুন ভালো সম্ভাবনা আছে, তাই বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

দ্বিতীয়ত, তখন বইটি বেরোলে এতে বড় রকমের একটা ভুল থেকে যেত। কারণ ঐ বইয়ে আমরা মনের বাড়ির দরবার কক্ষ বা ড্রয়িংরুমকে লিখেছিলাম ‘রেস্টরুম’। পরে আমাদের প্রথম কোর্সটি যখন হোটেল সোনারগাঁয়ে হচ্ছিলো তখন একদিন ওখানকার টয়লেটে গিয়ে দেখি লেখা ‘রেস্টরুম’! কী হাস্যকর ভুল করতে যাচ্ছিলাম বোঝার সাথে সাথে শুকরিয়া আদায় করলাম। কারণ যে বইটি বের করার এত চেষ্টা করেও করতে পারছিলাম না তা যদি তখন বেরোতো তাহলে তাতে এই হাস্যকর ভুলটি থেকে যেত। আর তখন কী অবস্থা হতো তা সহজেই অনুমেয়। ছাপা হয়ে যাওয়া বইগুলো তুলে আনার আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও ভাবমূর্তির যে ক্ষতি হতো তা তো অপূরণীয়।

কাজেই সবরকম প্রস্তুতি নেয়ার পর ফলাফল খারাপ হলে আল্লাহ ভালোর জন্যে করেছেন—এ দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সঠিক আর কিছু নেই। কারণ আপনি কাজ করতে পারেন। ফলাফল দেয়ার মালিক তো আল্লাহ। কিসে আপনার মঙ্গল সেটা তো আপনার চেয়ে আল্লাহ ভালো জানেন। আর সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যে কাজ করছেন এই কাজের তাৎক্ষণিক ফল আপনি না-ও পেতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনার কাজ বৃথা গেছে।

কর্মজীবনে এটা সবসময় অনুসরণ করবেন। আপনি আপনার কাজ করে যান, আপনার এখনকার প্রতিষ্ঠান যদি আপনাকে মূল্যায়ন করতে না পারে বা না করে, আপনি এমন জায়গায় যাবেন যেখানে আপনি মূল্যায়ন পাবেন। কাজ আপনার কখনো বৃথা যাবে না, চেষ্টা কখনো বৃথা যাবে না, পরিশ্রম কখনো বৃথা যাবে না এবং আল্লাহ তায়ালা ফল নিয়ে চিন্তা করতে বলেন নি। বলেছেন, তুমি কাজ নিয়ে চিন্তা কর। আপনি কাজ করুন। ফল যিনি দেয়ার তিনি দেবেন এবং তিনি ফল দেবেনই। কারণ তিনি ফল দেয়ার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ। কখনো আগে, কখনো পরে।

প্রশ্ন : পরিশ্রমের পর সাফল্য না পেলে কী বুঝাবো? আমার জন্যে আল্লাহ আরো ভালো কিছু রেখেছেন। আমি কোর্স করার পর যা চেয়েছি তা আলহামদুলিল্লাহ সব পেয়েছি।

উত্তর : সবকিছুতেই সবাই সাফল্য না-ও পেতে পারেন। অনেক পরিশ্রম, অনেক যোগ্যতা থাকার পরও একজন মানুষ সবক্ষেত্রে একই রকম সাফল্য না-ও পেতে পারেন। যেমন, প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো হবেন একজন। যদি পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাদের একজন হবেন। বাকি চার জন হতে পারবেন না। কারণ চেয়ারের সীমাবদ্ধতা আছে। সেক্ষেত্রে শোকর আলহামদুলিল্লাহ-হলে খুব ভালো, না হলে ঝামেলা গেল। অর্থাৎ সবসময় মনে রাখবেন, কাজটা আপনার। ফল দেয়ার মালিক কিন্তু আল্লাহ এবং আপনি যদি আন্তরিক নিয়তে ও কল্যাণের জন্যে কোনো কাজ করেন, সেই কাজের ফলাফল সবসময় আল্লাহ তায়ালা ভালো করবেন। ফল তিনি অন্য দিক থেকে দেবেন।

প্রশ্ন : জীবনে কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সে অবস্থানে প্রাচুর্যের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : ব্যর্থতার মাঝে সুপ্ত আছে সাফল্যের বীজ। যত বড় ব্যর্থতা হবে তত আনন্দ করবেন, তত শুকরিয়া করবেন, দেখবেন সাফল্য আসছে। আসলে এটা কিন্তু খুব বাস্তব যে, যত বড় ব্যর্থতা, সাফল্য তত বড় হয়।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক একটি ঘটনা আছে। গজনির সুলতান ছিলেন মাহমুদ। তার একজন দাস ছিলেন, নাম আয়াজ। আয়াজকে সুলতান মাহমুদ

খুব পছন্দ করতেন তার বিশ্বস্ততার জন্যে, সুলতানের প্রতি তার আনুগত্যের জন্যে। এতই পছন্দ করতেন যে, এটা আবার সুলতান মাহমুদের দরবারের কোনো কোনো মন্ত্রী-সভাসদের খুব গা-জ্বলুনির কারণ ছিলো।

আনুগত্য কীরকম ছিলো? একবার আয়াজ সুলতানের সাথে যাচ্ছে। পথে এক তরমুজ ক্ষেত দেখে সুলতানের তরমুজ খেতে ইচ্ছে হলো। কাফেলা থামিয়ে ক্ষেত থেকে তরমুজ আনা হলো। কাটা হলো। কাটা তরমুজের একটুকরো সুলতান আয়াজকে তুলে দিলেন। বললেন, খাও। আয়াজ খেলো। সুলতান আয়াজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগলো? আয়াজ বললেন, জাঁহাপনা, এত স্বাদের এত মিষ্টি তরমুজ বহুদিন খাই নি। বলে তরমুজের টুকরোটার সবকিছু চেটেপুটে খেতে লাগলেন।

দেখে সুলতানের খুব মায়া লাগলো। বললেন, ঠিক আছে, এতই যখন তৃপ্তি পাচ্ছে, তাহলে একে গোটা তরমুজটাই কেটে দাও। তা-ই করা হলো। একের পর এক তরমুজের টুকরো আসছে, আর আয়াজ চেটেপুটে খাচ্ছেন। সুলতানও উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন-খাও খাও, আরো খাও।

শেষ পর্যন্ত একটা টুকরা বেঁচে গেল। এই শেষ টুকরাটা সুলতান মুখে তুললেন। আর সাথে সাথে ওয়াক থু করে ফেলে দিলেন। প্রচণ্ড তেতো আর কষ। এই তরমুজ আয়াজ কী করে এত অম্লান বদনে খেয়ে গেল তা ভেবে সুলতান বিস্মিত হলেন। আয়াজকে জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে এ তরমুজ তুমি খেলে? একটু তো বলতে পারতে। আয়াজ তখন বললেন, জাঁহাপনা, যে তরমুজ আপনার হাত থেকে এসেছে তা আদপে যত তেতোই হোক আমার কাছে তা মিছরির চেয়েও মিষ্টি।

কিন্তু একসময় সুলতান মাহমুদের কয়েকজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন আয়াজ। সুলতানের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করলো তারা। সুলতান আয়াজকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন। আয়াজ ধৈর্য ধরলেন। কারণ সেসময় তার আর কিছুই করার ছিলো না।

জেলখানায় বন্দিদশায় কাটতে লাগলো তার দিন। কিন্তু আয়াজ তার বিশ্বাসে অটল-যে, সুলতান একদিন তার ভুল বুঝতে পারবেন। এবং আজ হোক কাল হোক তিনি মুক্তি পাবেনই। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। এখন তো কারাবন্দিদের জন্যে কিছু নিয়ম আছে। তখন এসব কিছু ছিলো না। এক টুকরো রুটি-এই হয়তো এক সপ্তাহের বরাদ্দ। বন্দিরা একটু একটু করে জমিয়ে রেখে তা-ই খেতো। আয়াজও তা-ই করতেন। এরকমই একবার আয়াজ এক টুকরো রুটির খানিকটা খেয়ে বাকিটা তুলে রেখে ঘুমাতে

গেলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন তিন দিনের খাবার সেই রুটির টুকরোটা নিয়ে এক হুঁদুর দৌড়ে পালালো।

দেখে আয়াজ হেসে উঠলেন। যাক! তাহলে আমার এখানকার রিজিক শেষ হয়ে আসছে। আমি এখন মুক্তি পাবো। অর্থাৎ বিশ্বাস এবং আশাবাদটা কত! সে সময় তার মনে হয়েছে যে-না, এর চেয়ে খারাপ তো আর কিছু হতে পারে না এবং এরপরে আমার মুক্তি ছাড়া আর কোনো কিছু নাই। এবং সত্যি সত্যিই তার কিছুক্ষণ পরই তিনি খবর পেলেন যে, সুলতান মাহমুদ তার মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাকে দরবারে ডেকে পাঠিয়েছেন।

এই যে বিশ্বাস অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শোকর আলহামদুলিল্লাহ এবং সর্বাবস্থায় আশাবাদী হওয়া-এটাই হচ্ছে প্রাচুর্যের জন্যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন : আমাদের জীবন দিন দিন অনেক কঠিন হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় নামলেই জ্যাম, সময় নষ্ট। চারদিকে মানুষের শঠতা, অসদাচরণ, মাঝে মাঝেই হতাশা চলে আসে, এই সময়টাতে কী করা উচিত?

উত্তর : যা করা উচিত তা-ই আমরা করছি। এই যে চারদিকে সমস্যা, এ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্যে আমরা আমাদের মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় ব্যবহার করতে শিখছি। নিঃসন্দেহে আমাদের জীবনে সমস্যা এখন আগের চেয়ে অনেক কম। কারণ, আমরা জানি সমস্যাকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হয়। তা শারীরিক-মানসিক যেকোনো সমস্যাই হোক। সমস্যা সৃষ্টিই হয় নেতিবাচক চিন্তা দিয়ে। নেতিবাচক চিন্তা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। যখন আপনি আপনার মস্তিষ্কে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করছেন তখন আপনার সমস্যা এমনিতেই কমে যাবে। সমস্যা সম্ভাবনার রূপ নেবে।

নিয়তি ॥ ভাঙতে হবে নেতিবাচকতার বৃত্ত

প্রশ্ন : আমি যা কিছুই শুরু করতে চাই, তাতেই নিয়তির সকল বাধা-বিপত্তি আমাকে ঘিরে ধরে। আমি কী করলে এ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবো?

উত্তর : আসল সমস্যাটি হচ্ছে আপনি কিছুই শুরু করতে চান না। সেজন্যেই বাধা-বিপত্তি আপনাকে ঘিরে ধরে। আপনি হয়তো বলবেন, আমি তো শুরু করি বা শুরু করেছিলাম। আসলে সচেতনভাবে হয়তো শুরু করেন, কিন্তু

অবচেতনে এমন প্রোথামিং হয়তো কোথাও রয়ে গেছে যে, আপনি আর সফলকাম হতে পারেন না।

যেমন, কেউ কেউ গত ১০ বছর ধরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু যখন উনি আসতে চান-প্রতিবারই দেখা যায়, কোনো না কোনো বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়। কখনো বাচ্চার অসুখ, কখনো ছুটি পান না, কখনো নিজে অসুস্থ, কখনো বা টাকা খরচ হয়ে যায় ইত্যাদি। আসল বিষয়টি হচ্ছে-কোর্স করার ব্যাপারে তার অবচেতনে কোনো অনীহা রয়েছে যার বাস্তব প্রকাশ ঘটে এ ধরনের কোনো না কোনো ঝামেলায়।

কাজেই কোনো কাজ শুরু করতে গেলে যদি বাধা আসে বুঝতে হবে যে, আপনার পদক্ষেপে বা চিন্তায় কোনো দ্বিধা আছে। আপনি বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, নেতিবাচকতার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এজন্যে সবসময় অটোসাজেশন দিন যে, ‘আমি যা করবো, আন্তরিকভাবে করবো। প্রতিটি কাজ নিজের ও অন্যের কল্যাণে সুষ্ঠু, সুন্দর ও চমৎকারভাবে করবো।’

প্রশ্ন : শুনেছি স্রষ্টা কিছু কিছু জিনিস মানুষের জন্যে আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর : ভাগ্য কী এটাকে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি। যেমন, আল্লাহ মানুষের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তার মাথায় কোনোদিন শিং গজাবে না। কিন্তু গরু বা গভারের মাথায় শিং গজাবে। মানুষের মাথায় শিং থাকবে না, কিন্তু গরু বা গভারের মাথায় থাকবে-এটা হচ্ছে ভাগ্য। আবার আমাদেরকে খেতে হয় মুখ দিয়ে। আমাদের হাত দুটো-তিনটা বা চারটা নয়, এটা হচ্ছে ভাগ্য। এটা হচ্ছে ডিএনএ প্রোথামিং, এটাই কিতাবে লিখে রাখা হয়েছে। বাকি সবটাই হচ্ছে কর্ম।

বাকি সবকিছু করার জন্যে আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। যে বিষয়গুলোতে আমাদের জবাবদিহি করতে হয় সে পুরো জিনিসটাই হলো কর্ম। কারণ যদি আমি কী করবো এটা পূর্ব নির্ধারিতই হয়ে থাকে তাহলে আমার তো প্রতিদান-প্রতিফলের কিছু থাকতে পারে না।

যেখানে আমার স্বাধীনতা রয়েছে সেটা নিয়েই আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। যেখানে আমার স্বাধীনতা নেই সেটা জবাবদিহিতার বিষয় হতে পারে না। অতএব আপনাকে আপনার কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে মানেই হচ্ছে, কাজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে আপনি স্বাধীন।

যেমন, আপনি প্রতারণিত হচ্ছেন। শেয়ার বাজার নামক জুয়াবাজারে বিনা পরিশ্রমে লাভের লোভে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। এমএলএম নামক প্রতারণার খপ্পরে পড়েছেন। এটা কি ভাগ্য! এটা তো ভাগ্য না। শ্রষ্টা আপনাকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। তা দিয়ে আপনাকে যাচাই-বাছাই করতে হবে। এরা যে চটকদার মুনাফার কথাগুলো বলছে তা কতটুকু বাস্তবসম্মত সেটা বুঝতে হবে। তা না করে ফোকটে পাওয়ার লোভের ফাঁদে আপনি পা দিলেন—এটা কি নিয়তি! না আপনার নির্বুদ্ধিতা, আপনার আহাম্মকি!

এমনকি আপনার জেনেটিক কোনো বৈশিষ্ট্য যদি থেকেও থাকে যাকে ‘নিয়তি’ বলা যেতে পারে, তাকেও পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বা ইতিবাচকতা দ্বারা প্রভাবিত করা যায়। এ সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল নিয়ে ‘হোয়াই ইউর ডিএনএ ইজন্ট ইউর ডেসটিনি’ শিরোনামে টাইম ম্যাগাজিনের জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যায় একটি নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিলো। তাতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে—জেনেটিক বৈশিষ্ট্যকেও প্রভাবিত করা যায়।

প্রশ্ন : একজন মজলুম কি আলোকিত হওয়ার মাধ্যমে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে?

উত্তর : মজলুমরাই ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যারা ভাগ্যবান তাদের তো আর ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর দরকার হয় না। যারা বিভবান তাদের তো বিত্তের প্রয়োজন নেই। যাদের বিত্ত নেই তাদের বিত্তের প্রয়োজন এবং এই মজলুমরাই নিজেদেরকে আলোকিত করেছে ও বদলে দিয়েছে তাদের জীবন।

যত সফল মানুষ আছে তাকান তাদের দিকে, তারা অধিকাংশই একসময় মজলুম ছিলেন। প্রচলিত বৃত্তকে যখন ছিন্ন করতে পেরেছেন তখনই তিনি আলোকিত হয়েছেন। নিজের জীবনে যেমন তিনি পরিবর্তন এনেছেন তেমনি ঘটিয়েছেন ইতিহাসেরও বাঁকবদল।

ব্রাজিলের জনপ্রিয় নেতা লুলা ডি সিলভার জীবন দেখুন। মাত্র ১২ বছর বয়সেই পরিবারকে সাহায্য করার জন্যে তাকে কাজে নেমে পড়তে হয়। এবং তিনি জীবন শুরু করেন ‘শু-পলিশ বয়’ হিসেবে। এরপরে কাজ নেন কপার প্রসেসিং ফ্যাক্টরির লেদ অপারেটর হিসেবে। অর্থাৎ একজন শ্রমিক হিসেবে।

১৯ বছর যখন তার বয়স তখন এক গাড়ি তৈরির কারখানায় কাজ করতে গিয়ে তার বাম হাতের একটা আঙুল কেটে যায়। হাসপাতালের পর

হাসপাতাল ঘুরেছেন একটু ভালো চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু পান নি। এ ঘটনাটিই তাকে উদ্বুদ্ধ করে শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে জড়াতে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় হতে।

লুলা ডি সিলভা পর পর দুবার ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তৃতীয় বারের নির্বাচনে তার মনোনীত প্রার্থীই জয়লাভ করে। রাজনৈতিক হিসেবে ব্রাজিলেই শুধু নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতাদের একজন তিনি।

প্রশ্ন : আমাকে সবসময় একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে বন্দি রাখতে চান আমার বাবা। তিনি বলেন, যার মধ্যে তুমি রয়েছো তাকেই নিয়তি মনে কর। এর বাইরে যেতে চেয়ো না। আমি তাকে কীভাবে বোঝাবো যে, বৃত্ত ভাঙার চেষ্টা করা উচিত? দয়া করে বলবেন?

উত্তর : তাকে বোঝানোর চেষ্টা না করে আপনি যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করুন। যোগ্যতা অর্জন করলেই আপনি বৃত্ত ভাঙতে পারবেন। কারণ বৃত্ত ভাঙার জন্যে যোগ্যতা লাগে। আর সঙ্গে থাকুন। তাহলেই এক এক করে বৃত্ত ভাঙার পথ পাবেন আপনি।

তাবিজ/ জাদু/ বান-টোনা/ গণক/ রত্নপাথর

প্রশ্ন : একজন হাত দেখে বলেছেন আমাকে তাবিজ করা হয়েছে এবং তাবিজ দ্বারা আমার বিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এরপর আমার মা তার কাছ থেকে তাবিজ এনে আমার হাতে বেঁধে দেন।

উত্তর : এই তাবিজ-কবচগুলো হচ্ছে তথাকথিত পীরদের পয়সা কামাই করার একটা বুদ্ধি। আর এদের সবচেয়ে সহজ শিকার হয় দুর্বলচিত্ত পুরুষ ও মহিলারা। হযরত মওলানা আশরাফ আলী খানভী (র) সুন্দরভাবে বলেছেন, এখন মুরীদ পীর খোঁজে আখেরাতের জন্যে আর পীর মুরীদ খোঁজে দুনিয়ার জন্যে। দুনিয়াতে তার কী লাভ হবে, এজন্যে পীর মুরিদ খোঁজে।

তথাকথিত পীররা মুরিদের আত্মিক উন্নতির পরিবর্তে, তাদের আত্মশক্তি জাগ্রত করার পরিবর্তে তাদেরকে তাবিজ-কবচ-ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে নির্ভরশীল করে তোলে। যেমন, কোনো বিবাহিতা মহিলাকে যদি অস্থির মনে হয় তাহলে তাকে বললেই হয় যে, আপনার স্বামী কি আপনার দিকে একটু

কম নজর দিচ্ছে? মহিলা তখন খুঁজে খুঁজে সাম্প্রতিক সময়ে তার স্বামীর সেই আচরণগুলোকেই মনে করার চেষ্টা করবে, যেখানে তার স্বামীকে তার ব্যাপারে একটু অমনোযোগী মনে হয়েছে।

সে তখন এই বাস্তবতার কথা মাথায় রাখবে না যে, বিয়ের পরের কয়েক মাস একজন স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে যেভাবে ব্যস্ত থাকে সারা বছর তো আর তা থাকবে না। আর এরপর ভদ্ভপীর যখন বলবে, আপনার স্বামীর নজর তো মনে হচ্ছে অন্যদিকে। খুব একটা ভালো আলামত পাচ্ছি না।

ব্যস, কোনো মহিলাকে কারু করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। তিনি তখন তার সঞ্চয়ের সবকিছুই ঐ ভদ্ভপীরকে দিয়ে দিতে রাজি থাকবেন তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাসের বিনিময়ে। আর পীর সাহেবও তখন ‘তে-মাথার মাটি লাগবে, চার নদীর পানি লাগবে, জোড়া খাসি লাগবে, পাঁঠা লাগবে’ ইত্যাদি নানা অজুহাতে পয়সা হাতাতে গুরু করেন। সঞ্চয় তো বটেই, নিজেদের স্বর্ণালংকার পর্যন্ত মহিলারা এভাবে তুলে দেন তাদের হাতে।

কাজেই এই তাবিজ-কবচগুলো হলো মানুষের অসহায় অবস্থাকে পুঁজি করে একশ্রেণীর প্রতারকের ব্যবসাবুদ্ধি। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বিয়ে যদি না হয় তার বাস্তব কারণ কী সেটা খুঁজে বের করুন। যেমন, অনেক সময় দেখা যায়-পাত্রীপক্ষ বেশি বাছবিচার করছেন। চেহারা, পেশা, আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা-সবকিছু নিয়েই এত উচ্চমাত্রার প্রত্যাশা করেন যে, প্রথমদিকে অনেক প্রস্তাবকে হেলায় ফিরিয়ে দেন।

এদিকে তো পাত্রীর বয়স বাড়ছে। বাড়ছে তার যোগ্যতাও। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে হয়তো সে ভালো ক্যারিয়ারে ঢুকে গেছে। এখন যোগ্য পাত্র পেতে তো তাকে আরো অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ বাস্তব কারণ না খুঁজে যদি তাবিজ-কবচের পেছনে ছোটেন তখন সমস্যার সমাধান তো হবেই না, উল্টো টাকাপয়সা খোয়াবেন।

প্রশ্ন : আমরা যারা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট-আমাদের তো সাইকিক বর্ম দেয়া আছে। তারপরও কোনো প্রকারের কু-নজর, জাদু, বান-টোনা এগুলো লাগবে কি না? আমরা অনেক কারণে তাবিজ পরে থাকি, এ তাবিজ পরার আর প্রয়োজন আছে কি?

উত্তর : যারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছেন, কোর্সের তৃতীয় দিনই কমান্ড সেন্টারে গুরু আপনাদের সাইকিক বর্ম দিয়েছেন। আপনার চিন্তা

করার কোনো কারণ নেই। অতএব এসব তাবিজ-কবচ নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামাবেন না।

প্রশ্ন : আমি জীবনে যতই কষ্ট করি, একসময় নিজেকে শূন্যের মধ্যে আবিষ্কার করি, আবার শূন্য থেকে আমাকে শুরু করতে হয়। সারাজীবন এ ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, কী করে এ বলয় থেকে মুক্তি পাবো? যতই সুখের মনছবি দেখি পরিস্থিতি আমাকে চরম দুর্দশায় ফেলে দেয়। আমি কুম্ভরাশির জাতিকা। নীলা ও পান্না ব্যবহার করছি। অনুগ্রহ করে যদি পরামর্শ দেন।

উত্তর : এই নীলা ও পান্না পরে যে পয়সা খরচ করেছেন তা অর্থহীন। যদি পারেন এটা বিক্রি করে দিন। নইলে ফেলে দিন। পাথর যদি দুর্দশার বৃত্ত ভাঙতে পারতো তাহলে এস্ট্রলজাররা হতেন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

আমি যখন এস্ট্রলজি পেশায় ছিলাম তখন এক ক্লায়েন্ট এসে বললেন, ‘আমাকে এমন একটা পাথর দিন, যাতে ছয় মাসের মধ্যে আমি কোটিপতি হয়ে যাই’। শুনে আমি হেসে বললাম, ওরকম পাথরের খোঁজ যদি আমি পেতাম তাহলে তো ঐ পাথর আগে নিজে পরতাম। আসলে পাথর কারো ভাগ্য বদলায় না। পাথর ব্যবহার করা হয় শারীরিক কারণে। রোগ-ব্যাপি নিরাময়ে কোনো কোনো পাথর উপকারী।

ভাগ্যসংক্রান্ত আমাদের এই যে বিভ্রান্তি, ‘এটা আমার ভাগ্য! আমার কপাল’! এগুলো আসলে কুসংস্কার-হাজার বছর ধরে আমাদের সামাজিক বঞ্চনা ও বর্ণবাদী চিন্তারই ফসল। যেমন, আগে নিম্নবর্ণের লোকদের দাস বানিয়ে রাখা হতো। বলা হতো, তুমি আগের জন্মে পাপ করেছিলে, তাই নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করেছো। এখন যদি উচ্চবর্ণের লোকদের ঠিকভাবে সেবা না কর তো পরের জন্মে পায়খানার কীট হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

এখন কে পায়খানার কীট হয়ে জন্মগ্রহণ করতে চায়? তখন সে ভয় পেয়ে ভাবে যে, যা-ই হোক, মানুষ আছি তো ঠিক আছি, কীট হতে চাই না। অতএব এই জন্মে যদি উচ্চবর্ণের লোকদের সেবায়ত্ন করি তাহলে পরের জন্মে আমিও উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করবো।

এই ভাগ্য বিশ্বাসটা হচ্ছে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। কোরআন শরীফে সূরা রাদ-এর ১১ নং আয়াতে রয়েছে, ‘নিজেদের ভেতর থেকে পরিবর্তনের সূচনা না করলে (অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে) আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না’। ‘আনফুসিকুম’ অর্থাৎ নিজের ভেতরের যে দৃষ্টিভঙ্গি, এই

দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন না করলে ভাগ্য পরিবর্তিত হবে না। ভাগ্য পরিবর্তন সবসময় নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। যে কারণে আমরা বলি, ‘দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে’।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হওয়াটা ভাগ্য হতে পারে কিন্তু খ্যাতিমান হওয়া নির্ভর করে নিজের ওপর। যেভাবে মহাকবি হোমার খ্যাতিমান হয়েছেন। হেলের কেলার মহীয়ান হয়েছেন। আসলে যা কিছুকে আমরা সুখ মনে করি, তা নির্ভর করে নিজের ওপরে, আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর, আপনার মুক্ত বিশ্বাসের ওপর।

সাফল্যও নির্ভর করে আপনার মুক্ত বিশ্বাসের ওপর, আপনার কর্মের ওপর। যিনি যত পরিশ্রম করবেন তিনি তত সফল হবেন। পরিশ্রম করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক পথ পেয়ে যান, তাদেরকে আমরা বলি ভাগ্যবান। আর যদি কেউ ভুল পথে ঘোরাঘুরি করেন, তাদেরকে আমরা সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলি, এর ভাগ্য খারাপ।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, সে ভুল পথে চলছে। আর যিনি সফল, তিনি সঠিক পথটা বেছে নিতে পেরেছেন, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। অতএব এই ব্যাপারটি আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার থাকতে হবে যে, আপনার প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম, মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগ, আপনার পরিশ্রমই আপনার সৌভাগ্য সৃষ্টি করবে।

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু এবার হজ থেকে এসে আমাকে একটি আকিক পাথর দিয়েছে। এটি আংটি হিসেবে ব্যবহারে আপত্তি আছে কি? কারণ, রসুলুল্লাহ (স) নাকি এ পাথর ব্যবহার করতেন।

উত্তর : আকিক পাথর ব্যবহার করা ওয়াজিব/ ফরজ হলে আমরা অবশ্যই জানতাম। তখন আর এই ‘না কি’ কথাটা থাকতো না। আর রসুলুল্লাহ (স) আকিক পাথর ব্যবহার করতেন—এটা কোনো প্রামাণ্য হাদীস নয়।

দ্বিতীয়ত, আকিক পাথর বলে হজ থেকে যা আসে সেটা নেপালে গেলে আপনি বস্তা বস্তা পাবেন এবং ওখানে এগুলো মণদরে বিক্রি হয়। সমুদ্রের পাড়ে যেমন বিনুক পড়ে থাকে এবং যে কেউ তা কুড়িয়ে নিতে পারে। আকিক পাথর হচ্ছে এরকম। অতএব, আকিক মূল্যবান পাথর, এটা পরলে অনেক সওয়াব হবে—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। শখ হিসেবে আংটি ব্যবহার করতে পারেন। সেটা একরকম। কিন্তু একে সুনত বলার সুযোগ আছে কি না এ ব্যাপারে ফকিহরা আরো ভালো মত দিতে পারবেন।

প্রশ্ন : ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেলে দেখাচ্ছিলো যে, এক ধরনের আর্মলেট, লকেট ও ব্রেসলেট বিক্রি করছে। তারা একে সুরক্ষা কবজ বলছে—অন্যের নজর লাগা বা কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে। একটি আর্মলেট বা ব্রেসলেটের দাম ২,৫০০ রুপি। টিভি চ্যানেলটি এটি তৈরির পদ্ধতিও দেখিয়েছে। এই জিনিস কি বিশ্বাস করা উচিত হবে—মেহেরবানি করে জানাবেন।

উত্তর : আসলে তাবিজ-কবচের দিকে নজর গেলে, বুঝতে হবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ায়ই গলদ রয়ে গেছে। আসলে এসব তাবিজ-কবচ যে কী তা নিয়ে একটি বাস্তব ঘটনা বলি।

ঘটনাটা একজন তরুণ এস্ট্রলজার এবং তার এক পুরনো ক্লাসমেটের। তরুণ এস্ট্রলজারটি সবে সৌখিন এস্ট্রলজার হিসেবে খ্যাতি পেতে শুরু করেছেন। এমনি একদিন তার কাছে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো তার সেই পুরনো ক্লাসমেট। কোথেকে সে খবর পেয়েছে—সম্প্রতি এস্ট্রলজার হয়ে ওঠা তার সেই সহপাঠী এখন মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারে, পারে মুশকিল আসান করতে।

তার সমস্যাটা ছিলো এরকম—সে তার বড় ভাইয়ের এক শ্যালিকাকে খুব পছন্দ করে। মেয়েটিও তাকে পছন্দ করে। যোগ্যতা, সামাজিক সমতা সবই ঠিক আছে। কিন্তু একই পরিবারে দুই বিয়ে করানোর ব্যাপারে রাজি হচ্ছিলেন না মুরুব্বীরা। শেষমেশ অন্য জায়গায় মেয়েটির বিয়েও ঠিক হয়ে গেল।

খবর শুনে তো ছেলেটির অবস্থা দিশেহারা। আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে সে ছুটে এসেছে তার এস্ট্রলজার বন্ধুর কাছে। আশা—যদি অলৌকিক কোনো ক্ষমতাবলে সে কিছু করতে পারে। সব ঘটনা বর্ণনা করে সে বললো, আচ্ছা, এমন কি কোনো তাবিজ তুমি আমাকে দিতে পারো যা দিয়ে সব কিছুকে আমি আমার ইচ্ছেমতো করাতে পারবো?

শুনে এস্ট্রলজার বন্ধুটি বললো, দেখ আমি তো তাবিজ-কবচ দিই না। আমি একজন এস্ট্রলজার। বৈজ্ঞানিক-গাণিতিক হিসেবনিকেশ করে আমি মানুষের সম্পর্কে বলি। তাদের পরামর্শ দিই।

সে বললো, ‘দোস্ত, আমি এসব বুঝি না। আমি শুনেছি তুমি অনেক কামেলিয়াত অর্জন করেছে। আমার জন্যে তোমাকে একটা কিছু করতে হবেই যাতে ঐ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারি।’

সে একেবারে নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলো এস্ট্রলজারের পেছনে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে হয় তাকে, রাতে বাসায় যাওয়ার সময়ও আছে সে। অগত্যা এস্ট্রলজার তার উৎসাহ কমানোর জন্যে তাকে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, যাও, এত বড় একটা কবচ নিয়ে আসো (বলে এমন একটা সাইজ দেখালেন, যে সাইজের কবচ বাজারে পাওয়া যায় না)।

কিন্তু সেই বন্ধুর উৎসাহে তাতে ভাটা তো পড়লোই না, বরং আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে সে ফরমাশ দিয়ে বানিয়ে আনলো বড় এক লোহার কবচ। দেখে এস্ট্রলজার কিছুক্ষণ আর কথা বললেন না। এত নাছোড়বান্দা মানুষকে তো আর কিছু বলার নেই। বন্ধুকে বললেন, একদিন পরে আসতে। বন্ধু চলে গেলে তিনি কবচটাতে ঠেসে ঠেসে মাটি ভরে ওপরে মোমের আস্তর লাগিয়ে দিলেন। এছাড়া তার আর কিছু জানাও ছিলো না। উদ্দেশ্য-কোনোভাবে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া।

পর দিন সে এলে তাবিজটি তাকে দিয়ে বললেন, এটাকে ভালো করে কোমরে বাঁধতে হবে (কোমর ছাড়া এত বড় তাবিজ আর কোথাও বাঁধার জায়গাও ছিলো না)। আর বললেন, এক্ষুণি গ্রামের বাড়ি রওনা হয়ে যেতে। কারণ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি না গেলে এই তাবিজ কাজ করবে না।

আসলে এস্ট্রলজারের মূল উদ্দেশ্য ছিলো তাকে ঢাকা থেকে বিদায় করা। কারণ ঢাকায় থাকলে সে প্রতিদিন তাকে বিরক্ত করবে। সে মুহূর্ত দেরি না করে রওনা হয়ে গেল তার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

এদিকে এস্ট্রলজার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, এতদিনে মুক্তি পাওয়া গেল। পরের এক মাস সেই বন্ধুর আর কোনো খোঁজ-খবর নেই। এস্ট্রলজার ভাবলেন, নিশ্চয়ই মেয়েটির অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। আর সেই শোকের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে বন্ধুর এই নীরবতা।

কিন্তু এস্ট্রলজারকে চমকে দিয়ে একদিন সেই বন্ধুটি নতুন বৌয়ের সাজে এক মেয়েকে নিয়ে হাজির। মেয়েটিকে জোরে জোরে বলতে লাগলো, ‘সালাম কর, সালাম কর। আমার বন্ধু হলে কী হবে? বহুত কামেল মানুষ। ওর জন্যেই তো তোমাকে পেলাম আমি’।

বিস্ময়ে বাকহারা এস্ট্রলজারকে এরপর যে ঘটনা সে শোনালো তা যেকোনো সিনেমার কাহিনীকেও হার মানায়। ঘটনা হলো, ঐ তাবিজ পরে তখনই তো সে চলে এসেছিলো গ্রামের বাড়িতে। গিয়ে দেখলো, ভাবীর বোনের বিয়ের সব জোগাড়যন্ত্র তৈরি। তখনকার দিনে গ্রামে বিয়ের এক সপ্তাহ আগে থেকেই লোকজন এসে বিয়ের কাজে নেমে পড়তো (ঘটনাটি

১৯৭৪/৭৫ সালের)। ছেলে ব্যাংক ম্যানেজার।

এদিকে সেসময় ১০০ টাকার নোট ডিমনিটাইজড করা হয়েছিলো। ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে এই ব্যাপারে কিছু বেআইনি লেনদেনের সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিলো পাত্রটি। যার ফলে ঠিক বিয়ের আগের দিন পুলিশ এসে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল তাকে।

সে সময় গ্রাম এলাকায় কোনো বিয়ে এভাবে ভেঙে গেলে মেয়ে এবং তার পরিবারের প্রতি লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কোনো শেষ থাকতো না। মেয়েটির পরিবার তাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো যা হবার হয়েছে। কিন্তু এখন বিয়ে হবে এবং তা হবে নির্ধারিত দিনেই। তবে পাত্র এবার তাদের বড় মেয়ের দেবর যাকে নিয়ে এর আগেও কথা হয়েছে। ছেলের বাবা-মা অর্থাৎ তাদের বেয়াই-বেয়াইনেরও এখন আর কোনো আপত্তি নেই। অতএব হয়ে গেল বিয়ে।

সব ঘটনা বর্ণনা করে সে আবারও বললো, ‘দোস্ত, তোমার তাবিজের গুণেই এ সবকিছু হয়েছে’। এস্ট্রলজার যতই বলেন, তাবিজ কিছু না, যা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়েছে। সে ততই বলে তা ঠিক আছে কিন্তু তাবিজ থাকাতাই তা হয়েছে। শেষে তিনি বললেন, ঠিক আছে, এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আর তাবিজ দিয়ে কী করবে? পানিতে ফেলে দাও।

অর্থাৎ এই তাবিজ-কবচ এগুলো সব অর্থহীন। যেকোনো নজর থেকে বাঁচার জন্যে আপনার ইচ্ছাটাই যথেষ্ট। আল্লাহর কাছে প্রার্থনাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের তথাকথিত পীর সাহেবরা তো এভাবেই বিখ্যাত হয়ে যান। অনেকটা ‘ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে’র মতো। হয়তো কাকতালীয়ভাবে একটা ঘটনা ঘটলো। ব্যস! সে খবরটা চারপাশে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো বা ছড়ানো হলো যে, তিনি কামেল পীর হয়ে গেলেন। গুরু হয়ে গেল তাবিজ-কবচের রমরমা ব্যবসা।

অবশ্য কিছু কিছু পাথর আছে স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী। সেটার কেমিকেল কম্পোজিশনের জন্যে, সেটার লাইট রিফ্লেকশন এবং রিফ্রেক্টিং এঙ্গেলের জন্যে। কিন্তু পাথর কারো ভাগ্য বদলায় না, পাথর কাউকে কোটিপতি-লাখপতি বানায় না। তাহলে সমস্ত এস্ট্রলজাররা কোটিপতি হয়ে যেত এবং তাদেরকে আপনি পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যে পেতেন না। কারণ কোটিপতি হওয়ার এই সহজ রাস্তা ছেড়ে সে কেন বসে থাকবে আপনার ফি-র জন্যে।

এস্ট্রলজি

প্রশ্ন : আমি যে পেশাকে মনছবিতে নিতে চাই আমার রাশিতে সে পেশাতে সফলতা লাভের কোনো উল্লেখ নেই। এ অবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : যারা আহাম্মক তারা রাশি দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর যারা বুদ্ধিমান তারা রাশিকে প্রভাবিত করে। আসলে রাশি কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলে। গুণ আর দোষের কথা বলে। গুণগুলোকে কাজে লাগিয়ে দোষগুলো দূর করে আপনি রাশিকে অতিক্রম করতে পারবেন।

কীভাবে? একজন ভালো এডভোকেট কি আইন অনুসরণ করেন, না কি আইনের ফাঁক দিয়ে তার মক্কেলকে বাঁচিয়ে নিয়ে যান? আহাম্মক উকিল আইন অনুসরণ করে আর বুদ্ধিমান উকিল আইনের ফাঁক দিয়ে তার মক্কেলকে বাঁচিয়ে নিয়ে যায়। রাশিও তা-ই।

আপনি আপনার সত্তাকে, আপনার চেষ্টাকে, আপনার বুদ্ধিকে এমনভাবে শক্তিশালী করুন; আপনার আগ্রহকে, মনছবিকে জোরালো করুন-দেখবেন যে, রাশিকে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের এস্ট্রলজার-এর পরামর্শ নেয়া কি উচিত হবে? সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তির জন্যে এস্ট্রলজারের পরামর্শ নিয়ে ভালো ফল পেয়েছে। তাহলে আমাদের কি পরামর্শ নেয়া ঠিক হবে?

উত্তর : একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট যদি দুইবেলা নিয়মিত মেডিটেশন এবং কোয়ান্টায়ন করেন তাহলে পরামর্শ নেয়ার জন্যে তাকে আর কারো কাছে যেতে হবে না। অতিচেতন মনই তাকে বলে দেবে কখন কী করতে হবে।

প্রশ্ন : ‘আইচিং’ করে সিদ্ধান্ত নেয়া কতটা প্রযোজ্য?

উত্তর : আইচিং হচ্ছে পরিস্থিতি বোঝার জন্যে। এরপর সিদ্ধান্ত কীভাবে নেবেন বা না নেবেন এটা আপনার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু যেসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা আছে সেসব ব্যাপারে আইচিংয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন-নামাজ পড়বেন কি না এটা নিয়ে আইচিং করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, ওয়াক্তমতো নামাজ পড়তে হবে।

পোশাক

প্রশ্ন : ব্র্যান্ডেড পোশাক ও অন্যান্য জিনিস কি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়? না কি নাম জাহির না করে ব্যবহার করা যায়। এই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : যদি নাম জাহির না করতে চান তাহলে ব্র্যান্ডেড জিনিস কেনার দরকার কী? একই জিনিস বা একই শার্ট ব্র্যান্ডেড হলে আপনি কিনছেন তিন হাজার টাকা বা তারও বেশি দিয়ে আর ব্র্যান্ডেড না হলে সেটা কিনছেন দেড়শ টাকা দিয়ে, দুশ টাকা দিয়ে। যদি ব্র্যান্ডটা খুলে ফেলেনই তাহলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আপনি কেন ৫০০ টাকার জিনিস কিনবেন?

আসলে ব্র্যান্ড পরার মানে হচ্ছে যে, দেখ, আমার কত পয়সা আছে! আমার কত ক্রয়ক্ষমতা আছে, আমি ওয়াক ব্র্যান্ডের জামা-জুতা ছাড়া পরি না। অথচ জুতা সাত হাজার টাকা বা সত্তর হাজার টাকা হলেও ওটা পায়েই থাকবে। সেটা আপনি ইচ্ছা করলেও টুপির মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারবেন না। কাজেই ব্র্যান্ড কেনা হচ্ছে একটা বাতিল এবং সেটা হয় হীনম্মন্যতার কারণে, নিজের ওপরে আস্থা না থাকলে।

প্রশ্ন : আমাদের কি সাজসজ্জা করা উচিত? যদি উচিত হয় তবে কেমন ধরনের সাজসজ্জা আমরা মেয়েরা ও ছেলেরা করবো সে সম্পর্কে বললে ভালো হয়। সত্যিকারের স্মার্টনেস কী?

উত্তর : সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করবেন, রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করবেন। এটাই হচ্ছে সাজসজ্জা। আর ছেলেদের সাজসজ্জার কী প্রয়োজন আমি এটা বুঝি না। মেয়েদের বুঝলাম যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের একটু সাজসজ্জা বেশি দিয়ে পাঠিয়েছেন অতএব তারা একটু সাজসজ্জা করুক।

আর টিভিতে তো দেখি ছেলেদের পাঞ্জাবী আর মেয়েদের পাঞ্জাবীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ছেলেরাও কী পরিমাণ হীনম্মন্যতায় ভুগছে আজকাল। আর সত্যিকারের স্মার্টনেস হলো, আপনি যেখানেই যাবেন দেখে মনে হবে যে, একজন মানুষ আসছে। আপনার উপস্থিতিই বলে দেবে যে, আপনি একজন মানুষ। আপনাকে সম্মান করা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়, আপনাকে সালাম দিয়ে বসানো যায়। স্মার্টনেস পোশাকে নয়। স্মার্টনেস হচ্ছে অন্তর্গত সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে।

প্রশ্ন : দামী পোশাক ও বেশি বেশি কেনার প্রতি ঝাঁক থেকে চেষ্টা করে আমি বিরত হয়েছি। কিন্তু পোশাকে তথাকথিত স্মার্ট ডিজাইন আমাকে এখনও আকৃষ্ট করে। এ নিয়ে মাঝে মাঝেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগি। আমার করণীয় কী?

উত্তর : তিনটি বিবেচনায় পোশাক নির্বাচন বাঞ্ছনীয়। এক, পোশাক তার উদ্দেশ্য পূরণ করছে কি না অর্থাৎ দেহের আব্রু বজায় রাখা এবং গরম বা ঠান্ডার প্রকোপ থেকে দেহকে রক্ষা করা। দুই, যিনি পরছেন তার কাছে এটি দৃষ্টিানন্দন কি না এবং তিন, তিনি পরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন কি না।

এই তিনটি বিবেচনাকে সামনে রেখেই যেকোনো পোশাক বাছাই করা উচিত। যেমন, পোশাকের উদ্দেশ্য দেহের আব্রু রক্ষা করা। এখন বাজারে হাল ফ্যাশনের এমন এক পোশাক এলো যা পরলে লজ্জা নিবারণের বদলে দেহকে আরো আবরণহীন মনে হয়। তাহলে সেটা কি পোশাক? আবার শীতের সময় এমন এক ফ্যাশন এলো যে, ফিনফিনে কাপড়ের তৈরি বুক খোলা শার্ট। সেটাও কি পোশাক?

আবার বলা হয় ‘আপ রুচি খানা, পর রুচি পেহেননা’। অর্থাৎ খাও নিজের পছন্দমতো, কিন্তু পোশাক পর অন্যের পছন্দে। সেটাও পোশাক পরার ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। বরং পোশাকও পরা উচিত নিজের পছন্দে, নিজের ভালো লাগার ওপর ভিত্তি করে।

আর সবশেষ বিবেচনা হলো, আরামদায়ক কি না, যিনি পরছেন তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন কি না। এখন স্মার্ট ডিজাইনের নামে এমন এক পোশাক আপনি পরলেন যা এমনভাবে আপনার গায়ের সাথে সঁটে থাকে, যা পরে আপনি বসতে পারছেন না, বাথরুমে যেতে পারছেন না, এমনকি সহজে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারছেন না। তাহলেও কি এটা পোশাক? না, তা নয়। অর্থাৎ প্রচলিত স্মার্ট ডিজাইন বা হাল ফ্যাশন ইত্যাদি বিবেচনার চেয়ে এ তিনটি বিবেচনাতেই কেবল পোশাক কেনা উচিত, পরা উচিত।

অবিদ্যা

প্রশ্ন : অবিদ্যা কি? অবিদ্যায় আক্রান্ত হলে এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : অবিদ্যাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি-স্মৃতিকর তথ্য, জ্ঞান, ধারণা, বিশ্বাস এবং সংস্কার (সংস্কার বংশগত হোক, আঞ্চলিক হোক বা ব্যক্তিগত হোক)।

মহামতি বুদ্ধ সমস্ত দুঃখের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অবিদ্যাকে। তাঁর জন্মের হাজার বছর পরে মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (স) একটি হাদীসে চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ক্ষতিকর ইলম অর্থাৎ অবিদ্যা। লালসা কামনা বাসনা আসক্তি লোভ দ্বেষ মোহের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।

সত্যিকারের স্বাধীনতার পথে, কল্যাণের পথে, মুক্তির পথে, এক কল্যাণময় জাতিসত্তা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে অবিদ্যা। সকল অশান্তির মূল যেমন অবিদ্যা, সকল অকল্যাণের মূলও অবিদ্যা। সত্যিকারের সমৃদ্ধির পথে মূল অন্তরায় অবিদ্যা।

বিদ্যা বা জ্ঞান মানুষের মানবিকতার বিকাশ ঘটায়। আর অবিদ্যা মানুষকে দানব বানায় অথবা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, কাপুরুষ বা দাসে রূপান্তরিত করে। হয় সে দানব হবে নয়তো দানবের হাতে শোষিত মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, কাপুরুষ বা দাসে পরিণত হবে। আর যুগ যুগ ধরে বেশিরভাগ মানুষই প্রধানত অবিদ্যার দাসে পরিণত হয়। এ কারণে পৃথিবীতে এত অশান্তি।

অবিদ্যা থেকে মুক্তির জন্যে আগে কী কী অবিদ্যায় আপনি আক্রান্ত তা শনাক্ত করতে হবে। তারপরে একটি একটি করে দূর করতে হবে ওগুলো।

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিদারী একজন মেধাবী সরকারি আমলা। কিন্তু তিনি ফাইল আটকে ঘুষ নেন, ব্যক্তিগত কাজে সরকারি সম্পদ ব্যবহার করেন এবং বাড়িতে স্ত্রীকে মারধর করেন। কিন্তু নিজেকে তিনি একজন শিক্ষিত, চৌকস ব্যক্তি মনে করে গর্ব করে থাকেন। তাকে কি শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যায়?

উত্তর : সাম্প্রতিককালে কেউ যদি ইংরেজি ভালো বলতে পারেন তাকে আমরা ‘খুব জ্ঞানী লোক’ বলি। অথবা কোনো প্রযুক্তির ওপরে খুব ভালো বলতে পারেন, তাকে জ্ঞানী বলি।

সত্যিকারের জ্ঞানী এবং শিক্ষিত তিনিই যিনি জানেন এবং মানেন। অর্থাৎ যিনি শিক্ষাকে শুধু জানা পর্যন্ত সীমিত না রেখে নিজের জীবনেও তা বাস্তবায়িত করেন। কারণ শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রভাব যদি কারো জীবনে না থাকে তাহলে তাকে কখনো শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যায় না।

একজন ডাক্তার যদি শুধু পয়সার জন্যেই রোগী দেখেন এবং যে পয়সা

দিতে পারে না তাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে দেন, তিনি আর যা-ই হোন, শিক্ষিত নন।

একজন ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা যদি ঘুষ খাওয়ার জন্যে ফাইল আটকে রাখেন, টাকা খেয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে টেন্ডার দেন, তার অবস্থানও তখন একজন ধূর্ত, প্রতারক বা শোষকের চেয়ে আলাদা কিছু নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যদি প্রভাবশালী মহলকে খুশি করার জন্যে অন্যায্য কাজে সহযোগিতা করেন, তার মেধা ও বুদ্ধিও তখন হয়ে যায় অর্থহীন। একজন পেশাদার বক্তা ধূমপানের কুফল নিয়ে বক্তৃতা করার পর পরই যখন নিজে একটা সিগারেট ধরান তখন ধূমপানের বিরুদ্ধে বলার অধিকার নীতিগতভাবে তার আর থাকে না।

কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হলেই আর মেধাবী, চৌকস বুদ্ধিজীবী হলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, যদি না তার আচরণে মানবিকতার বিকাশ ঘটে, যদি না তিনি তার জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন। তাকে বড়জোর ধূর্ত, প্রতারক বা শোষক বলা যায়। অবিদ্যা বা অপবিদ্যার প্রভাবেই মানুষ এরকম শোষকে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক নামি-দামি, গুণী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ তথা বিজ্ঞানীর দেখা পাই। কিন্তু তারা কেউই জীবনের ব্যাখ্যা, জীবনের প্রতিটি বিষয় সুন্দর করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে কেন বুঝিয়ে দেন না। এটাকে কি অবিদ্যার প্রভাব বলা যায়? যদি তা-ই হয় তবে এর শেষ কোথায়?

উত্তর : জ্ঞানী, নামি-দামি, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানীরা বিশেষ জ্ঞান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাবার সময় খুব কম পান। সাধারণ মানুষের সমস্যা তাই তারা তেমন বুঝতে পারেন না।

জীবনে চলতে গিয়ে যারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাস্তবতাকে যারা মোকাবেলা করে তাদের পক্ষে জীবনের সমস্যা বোঝা সহজ। অনেক সময় বিশেষজ্ঞরা তা পারে না। সাধারণ জিনিসে তারা ভুল করে বেশি। এটা নিয়ে বিখ্যাত গল্প আছে।

বিজ্ঞানী নিউটন তার কুকুরের জন্যে ঘর বানাবেন। কিন্তু কুকুর দুটো-একটা বড় আরেকটা ছোট। নিউটন মিস্ত্রিকে বললেন, ঘরে দুটো দরজা বানাতে। বড় কুকুরের জন্যে বড় দরজা, ছোট কুকুরের জন্যে ছোট দরজা।

মিস্ত্রি তখন অবাক হয়ে বললো, স্যার, দুটো দরজার দরকার কী? একটা

বড় দরজা বানাতে তো দুটো কুকুরই তা দিয়ে ঢুকতে পারে। নিউটন এ সহজ সমাধানের কথা শুনে নিজেও খুব অবাক হলেন।

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে আমিই একমাত্র কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট। পরিবারে আর কেউই এ ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে না। বাবা-মা প্রচুর অবিদ্যাক্রান্ত। তাদেরকে কিছু বোঝাতে চাইলেও বোঝেন না। তারা মনে করেন, জীবনটা শুধু পড়ালেখা করে উপার্জন করার জন্যেই। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর : অনেক সময়ই মা-বাবাকে বোঝাতে সময় লাগে। কারণ তারা আজন্ম লালিত পরিবেশেই অভ্যস্ত। বেশিরভাগ মানুষই প্রচলিত এই ভ্রান্ত ধারণার শৃঙ্খল ভেঙে বেরোতে পারেন না। কিন্তু আপনি যেহেতু এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, তাই আপনার দায়িত্ব হলো অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন আপনার পরিবারের সদস্যসহ আরো অনেক মানুষকে জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে পারবেন যার প্রভাব তাদের ওপর পড়বে।

পাশ্চাত্য ও অবিদ্যা

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যে অবিদ্যার প্রভাব বেশি, ভোজন ও মৈথুনেই তারা ব্যস্ত। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটাও সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে এখন তারাই অগ্রসর। সেখানে বিদ্যা এবং অবিদ্যার এই সহাবস্থানকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

উত্তর : আসলে জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা এবং তথ্য ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ—দুটো আলাদা বিষয়। তথ্য ও প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের মাধ্যমে দক্ষতা সৃষ্টির ফলেই পাশ্চাত্য এখন অগ্রসর হয়ে আছে। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞান বা বিদ্যার চর্চা, যা মানবিকতাকে স্থান দেয় সবচেয়ে ওপরে সেটার প্রভাব পাশ্চাত্যে নেই। বরং তার কিছুটা হলেও আছে প্রাচ্যে। কারণ পাশ্চাত্যের দর্শনই হচ্ছে ‘জোর যার মুল্লুক তার’ এবং এর উৎস হলো গ্রিক দর্শন। এরিস্টটল ও প্লেটোর এই দর্শনের মূল কথা হলো, সমাজকে শাসন করবে মুষ্টিমেয় অভিজাতগোষ্ঠী আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাজ হলো এই গোষ্ঠীর সেবাদাসত্ব করা।

অথচ বর্ণবাদী দর্শন যে সময় পাশ্চাত্যকে গ্রাস করছে, আড়াই হাজার

বছর আগের ঠিক সেসময়ই প্রাচ্যে মহামতি বুদ্ধ প্রচার করেছেন অহিংসা ও সাম্যের বাণী। ঘোষণা করেছেন—জন্মের দ্বারা নয়, কর্ম দ্বারাই নির্ধারিত হয় একজন মানুষ ব্রাহ্মণ বা মর্যাদাশীল হবে, না কি অচ্ছুৎ বা অপাংক্তেয় হবে। এমনকি সভ্যতার বিকাশ পাশ্চাত্যে হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অথচ সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রথম চর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান গ্রিস বা রোম নয়, তা হলো ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া এবং আমাদের উপমহাদেশ।

কিন্তু এখন পাশ্চাত্য অগ্রসর হয়ে আছে তথ্য ও প্রযুক্তিতে তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর কারণে। সেখানে বিদ্যা নেই। কারণ অবিদ্যা ও বিদ্যা কখনো সহাবস্থান করতে পারে না। সেজন্যে পাশ্চাত্যে মানবিকতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটে নি। শুধু শক্তি ও দম্ভের প্রকাশ ঘটেছে। তারা সুপার পাওয়ার হয়েছে। কোনো সুপারম্যান বা অনন্য মানুষ উপহার দিতে পারে নি।

প্রশ্ন : গত পাঁচশত বছর ধরে ইউরোপিয়ানরা অভাবের তাড়নায় বা নতুন জীবনের খোঁজে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তারা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ তিনটি বৃহৎ সম্পদশালী মহাদেশ দখল করে নেয়। এসব স্থানে স্থানীয় অধিবাসীদের জমিজমা লুট করে নেয়ার দীর্ঘ ও মর্মান্তিক ইতিহাস রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও তাদের উত্তরসূরিদের যে আচরণ আমরা গত একশ বছর ধরে দেখছি, তা তাদের পূর্বসূরিদের চেয়েও জঘন্য। তাদের জীবনের সবটাই নিমজ্জিত অবিদ্যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এত দীর্ঘসময় অবিদ্যার চর্চা করেও এরা কীভাবে বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর জাতি হয়ে আছে?

উত্তর : যেহেতু আমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে আছি তাই তারা অগ্রসর হয়ে আছে। আমরা যেহেতু প্রযুক্তির চর্চা করি নি, আবার নৈতিক শক্তিকেও বিকশিত করি নি, তাই আমরা অগ্রসর হই নি। শুধু সততা দিয়ে কিছু হয় না যদি না সততার সাথে মেধা ও দক্ষতা যুক্ত হয়। পাশ্চাত্যের নৈতিকতা নেই, প্রযুক্তি আছে। আর আমাদের নৈতিকতাও নেই, প্রযুক্তিও নেই। আমরাই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবো যখন আমরা নৈতিক শক্তি ও প্রযুক্তি—দুটোতেই বলীয়ান হতে পারবো। অতএব তাদের এই বিজয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি টমাস রো কুর্নিশ করেছিলো। কিন্তু তার মাত্র দেড়শ বছরের মাথায় একই কোম্পানি থেকে ক্লাইভ যখন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছে

এসেছিলো সে কিন্তু কুর্নিশ করে নি। আজ থেকে সাড়ে চারশ বছর আগে তুরস্কের ওসমানীয় খলিফা সোলেমান দ্য ম্যাগনিফিশিয়েন্ট-এর দরবারে ইউরোপিয়রা আসতো নতজানু হয়ে।

আড়াইশ বছর আগে ক্লাইভ যখন মুর্শিদাবাদে এসেছিলো, মুর্শিদাবাদের শান-শওকত দেখে সে থমকে গিয়েছিলো। মুর্শিদাবাদ তখন লন্ডনের চেয়ে বড় শহর ছিলো।

আসলে, একটি জাতির দুটো শক্তি। এক হচ্ছে তার নৈতিক শক্তি, দুই তার বৈষয়িক শক্তি বা প্রযুক্তি। আমরা যেদিন আবার আমাদের নৈতিক শক্তি ও প্রযুক্তিকে একত্রিত করতে পারবো আমরাও নেতৃত্ব দেবো। কেন পারবো না? বর্তমান অবস্থা ভালো নেই বলেই তো বেশি কিছু আশা করবো। বর্তমান অবস্থা ভালো থাকলে তো বেশি কিছু আশা করার প্রয়োজন হতো না। প্রতিটি অবস্থা মানুষ বদলেছে মনছবি করে।

প্রশ্ন : প্রাচ্য থেকে সভ্যতা গ্রিসে গেল। গ্রিস থেকে সভ্যতার বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়ে আজকের এই আধুনিক সভ্যতার জন্ম। প্রাচ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো। কিন্তু সভ্যতার উৎস হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য কেন ওদের মতো বিস্তার লাভ করতে পারলো না?

উত্তর : ইউরোপের আজকের সভ্যতা মাত্র গত আড়াইশ বছরের। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে ‘ডার্ক এজ’ বলা হতো ইউরোপকে। মধ্যযুগ হচ্ছে ইউরোপের জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। আর সে সময়টা ছিলো প্রাচ্যের জন্যে সভ্যতা আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো প্রাচ্যে।

আজ থেকে তিনশ বছর আগে তুরস্কের ওসমানিয়া খেলাফতের সফলতম সম্রাট সোলেমান দ্য ম্যাগনিফিশিয়েন্ট-এর রাজ্য ছিলো হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, গ্রিস হয়ে জার্মানি পর্যন্ত। তখনকার দিনে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত হওয়াটা ছিলো যেকোনো ইউরোপিয়ান কূটনীতিকের সবচেয়ে সম্মানজনক এসাইনমেন্ট। এখন যেরকম আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত হতে পারলে অনেকে মনে করেন কূটনৈতিক জীবন সার্থক হলো।

কিন্তু তারপরই আমরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে গেলাম, যোগ্যতা-দক্ষতাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলাম, আমাদের পতন হলো। এখন তারা বিলাসে মত্ত, ধাবিত হচ্ছে পতনের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যেই। যদি আমরা নৈতিক শক্তিকে জাগ্রত করি আর প্রযুক্তিতে দক্ষ হই।

প্রশ্ন : আপনি একাধারে পাশ্চাত্যের কটাক্ষ করেন, তাদের Materialistic life বা পণ্যদাসত্ব নিয়ে। আবার কোনো তথ্যের সত্যতা বা গবেষণার কথা বলতে গিয়ে তাদের রেফারেন্স ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্যের কালচার যদি এত খারাপ হয় তাহলে তাদের রিসার্চকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে?

উত্তর : কারণ তারা রিসার্চ করছে। অর্থাৎ ভালো-খারাপ সব বিষয় নিয়েই তাদের রয়েছে নানান ধরনের গবেষণা। আর এসব গবেষণায় তারা প্রমাণ পাচ্ছে সেসব শাস্ত্র সত্যের, যার কথা মহামানবরা বলে গেছেন যুগে যুগে। প্রমাণ করছে তাদের অবিদ্যাক্রান্ত জীবনের অসারত্বের। পরিসংখ্যান দিয়ে দেখছে নৈতিকতা আর অধর্মাচারের পরিণতি। ফলে তাদের উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা বোঝাচ্ছি তারা কত অসার, অন্তঃসারশূন্য। নইলে বলতেন আমরা বানিয়ে বলছি। কারণ আমাদের প্রাচ্যে এখনো অনেক মানুষ আছেন যারা মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাদের কাছে এখনো পাশ্চাত্যের রেফারেন্স, পাশ্চাত্যের গবেষণালব্ধ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাই বেশি, তা আমরা যতভাবেই বলি না কেন।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের দেশসমূহ অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু মেধার বিকাশের জন্যে আমাদের দেশে সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে আমাদের পাশ্চাত্যমুখী হতেই হচ্ছে। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে, জনকল্যাণকর, অকল্যাণকর যাই হোক পাশ্চাত্য এগিয়ে আছে। আমাদের প্রাচ্যে যেসব বিজ্ঞানী তারাও পাশ্চাত্যে গিয়ে গবেষণা করছেন। তাহলে আমাদের পাশ্চাত্যে গিয়ে জ্ঞান সাধনার চেষ্টা কি অবিদ্যাপ্রসূত? আবার পাশ্চাত্যে যাওয়ার সুযোগ অনেকেরই থাকে না। সেক্ষেত্রে নিজের ক্ষমতার চেয়ে ঈশ্বরের করুণার দরকার সবচেয়ে বেশি। কী করবো?

উত্তর : প্রথমত, বিদ্যা এবং প্রযুক্তি এ দুটোকে আলাদা করতে হবে। কারণ প্রযুক্তি আপনি ভালো কাজে ব্যবহার করবেন না খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করবে আপনার বিদ্যা বা অবিদ্যার ওপরে। আপনি যদি অবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হন তাহলে প্রযুক্তিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন।

দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করতে হলে অবশ্যই পাশ্চাত্যে যাবেন।

কিন্তু আমরা কয়জন সেজন্যে যাচ্ছি? প্রতি বছর যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশে যায় তাদের একটা বড় অংশই আর পড়াশোনা করতে পারে না। কারণ তাদের অনেকেরই প্রত্যাশা থাকে, ‘আগে তো যাই। তারপর কোনোরকমে একটা কাজ জুটিয়ে পড়ার খরচ চালাবো’। কিন্তু সেটা যে এত সহজ ব্যাপার নয় তা বুঝতে শুরু করে যাওয়ার পর। কারণ এ সময়ে যেখানে তাদের লোকজনই চাকরি হারাচ্ছে সেখানে ভিনদেশি কালো চামড়ার ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে কাজ পেয়ে যাবে তা ভাবাটাও অস্বাভাবিক। আর পেলেও সে বেতন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার খরচ যোগানো সম্ভব নয়। থাকা-খাওয়ার খরচ তো বাদই গেল। ফলে তাদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত হয় দেশে ফিরে আসে, নয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে কোনোরকম একটা অড জব করে জীবন চালায়। আর পাশ্চাত্যের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচারে অভ্যস্ত হয়ে বখে যাওয়া তো আছেই। বিশেষত যারা টিন-এজে বিদেশে যায়।

এসব কারণে আমরা বলি, ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পোস্ট গ্রাজুয়েশন লেভেলে বাইরে যাওয়াটাই ভালো। তখন এ সমস্যাগুলো হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

অতএব প্রযুক্তির জন্যে যদি হয় অবশ্যই যাবেন তা আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান যেখানে হোক। কারণ আপনাকে প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে। আপনি যখন প্রযুক্তিতে দক্ষ হবেন তখন আপনার সততা শক্তি অর্জন করবে। আর একজন মানুষ যখন নিজের দক্ষতাকে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আন্তরিক হয় তখন স্রষ্টা তার কল্যাণ করেন। আপনি ঘরে বসে স্রষ্টার করুণা চাইবেন, আর স্রষ্টা এসে প্রযুক্তির জন্যে আপনাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবেন তা কখনো হবে না। আপনাকে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন : অবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। এটা কি আমাদের ত্যাগ করতে হবে? অবিদ্যা কি মানুষের জৈবিক চেতনাবোধকে বোঝায়? তাহলে নারী-পুরুষের যে স্বাভাবিক সম্পর্ক সেটা কি বর্জনীয়?

উত্তর : আসলে অবিদ্যা সম্পর্কিত এই যে ধারণা এটাও একটা অবিদ্যা। নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক যদি বর্জনীয় হতো, তাহলে এতগুলো নারী, পুরুষ একত্রে এখানে বসে আছি কীভাবে, সারাদিন কাটাচ্ছি কীভাবে। আবার মানুষের জৈবিক চেতনাকেও অবিদ্যা বোঝায় না। অবিদ্যা বোঝায় বাড়াবাড়িকে। অবিদ্যা বোঝায় পরিমিতি অতিক্রম করাকে।

অবিদ্যা পরিত্যাগ করা কষ্টকর। কারণ অবিদ্যা ছাড়তে গেলে নিজেদের

অনেক কিছু ছাড়তে হয়, আর অনেক কিছু ছাড়তে না পারলে অর্থাৎ জায়গা যদি খালি না করেন তাহলে নতুন সম্পদ ঢোকাবেন কোথায়? নতুন সম্পদ ঢোকাতে হলে আগে তো আবর্জনাগুলোকে দূর করতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ এখনও গ্রামসর্বস্ব একটি দেশ। গ্রামেও অনেক অবিদ্যা। গ্রাম নিয়ে কোয়ান্টাম কী ভাবছে?

উত্তর : আমাদের আগে নিজেদের নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা ঠিক হলে তার প্রভাব গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-ঘাটে, অফিস-আদালত, শহরে-রাজধানীতে অর্থাৎ সবজায়গায় পড়বে।

প্রশ্ন : চারদিকে যা দেখি সব অহম এবং অবিদ্যা। স্ফোভ প্রকাশ করতে পারছি না। মাঝে মাঝে নিজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ছি। এ থেকে বাঁচার বা সামনে এগিয়ে যাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : চারপাশে অবিদ্যা আছে বলেই বিদ্যার প্রয়োজন। এই বিদ্যা অনুশীলন করেই আমরা ধৈর্যের সাথে এগিয়ে যাবো।

প্রশ্ন : এই অবিদ্যার যুগে যারা একটু বিদ্যার চর্চা করেন বা বিদ্যার বাণী মেনে চলার চেষ্টা করেন তারা ঘরে এবং বাইরে কোণঠাসা হয়ে পড়ার অবস্থায়। এ অবস্থায় সমাজের প্রতি আমাদের কী করণীয়?

উত্তর : সত্য প্রথমদিকে সবসময় কোণঠাসা অবস্থায় থাকে। কিন্তু সত্যের যে কল্যাণকর গুণ তার কারণেই সত্য আস্তে আস্তে বিকশিত হয়। কোণঠাসা না হয়ে কোণা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এবং সংখ্যা সবসময় বাড়তে থাকে। কারণ সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি রয়েছে।

মিডিয়া ও অবিদ্যা

প্রশ্ন : আমরা মিডিয়ায় পাশ্চাত্যের সাফল্যের কথা দেখছি। অতএব তা অনুসরণ করতে অসুবিধা কোথায়?

উত্তর : আমরা দুইশত বছর ইউরোপিয়ানদের গোলাম ছিলাম। সে কারণেই সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যম যা ভাবায়, আমরা তা-ই ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ

করি, যা খাওয়ায়, যা পরাতে চায় তাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। যেন টিভিতে বললে বা পত্রিকায় লিখলেই সব অশুদ্ধ শুদ্ধ হয়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো যে কীরকম মিথ্যাচার করতে পারে তার একটি উদাহরণ হলো, গত শতাব্দীর খুব বড় একজন দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রে যার দ্বারা ষাটের দশকের তরুণরা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলো। তিনি মানবতাবাদী দার্শনিক ছিলেন। তার ব্যক্তিত্ব এই মাত্রার ছিলো যে, যেখানে নোবেল পুরস্কার পাওয়াটাকে অনেকে এত বড় কিছু মনে করেন, তা পাওয়ার জন্যে সবকিছু, এমনকি নিজেকে বিক্রিও করতে পারেন, সেখানে জঁ পল সার্ত্রে এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নিজের দর্শনের ওপর এরকমই ছিলো তার বিশ্বাস। তাকেই সিআইএ পৃথিবীর একনম্বর সন্ত্রাসী চিহ্নিত করেছিলো। অথচ তিনি জীবনে কখনো অস্ত্র ধরেন নি, বোমা ফাটান নি, এমনকি কাউকে কখনো চড়ও মারেন নি।

ষাটের দশকে তার একটি বই আমার হাতে এলো 'Being in nothingness' যেটিকে বলা হতো Existentialism এর বাইবেল। অর্থাৎ Existentialism-কে বুঝতে হলে এটিকে বুঝতে হবে। বইটি পড়লাম, কিন্তু বুঝলাম না। পরবর্তী কয়েক বছরে আরও দেড়শর বেশি বই পড়লাম ঐ বইটাকে বোঝার জন্যে। তারপরও কতটা বুঝতে পেরেছি তা আমার নিজের কাছে পরিষ্কার নয়। কেন? কারণ আমি আমার নিজের জ্ঞানের আলোকে তাকে বিচার করতে চাই নি। আমি চেয়েছি, তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, তা বুঝতে। মুক্ত মন নিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং তার বক্তব্য বোঝার জন্যে Existentialism-এর ওপর বই সংগ্রহ করে পড়েছি।

পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া সবসময় এটাই হতে দিতে চায় না যে, আপনি মুক্ত মন নিয়ে কিছু শুনতে পারেন, সবসময় একটা preconceived idea আপনার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

আসলে পাশ্চাত্যের দর্শন বা মিডিয়াকে অবিদ্যা প্রভাবিত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। যেমন, পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তি হলো গ্রিক, রোমান সভ্যতা। এই গ্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ। এরিস্টটলের সমাজ চিন্তাটা কী? তার রাষ্ট্রভাবনাটাই এক অবিদ্যা।

প্লেটো ও এরিস্টটলের রাষ্ট্রভাবনায় রয়েছে দুটি শ্রেণীর উপস্থিতি। এক, অভিজাত, দুই দাস। আর দাসদের অস্তিত্ব হলো অভিজাতদের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করার জন্যে। এই দর্শনকে এখনো পড়ানো হয় এবং দর্শনের ভিত্তি বলা হয়। তাদের এই দর্শনকে বোঝাবার জন্যে কার্টুন

ইলাস্ট্রেশনে দেখানো হয়েছিলো—একটি পাহাড়, যার চূড়াটা সমতল। সেখানে বসে আছেন আট দশজন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। আর পাহাড়ের নিচে আছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যারা কোনোরকমে কুঁজো হয়ে পাহাড়ের বোঝাটাকে বহন করে চলেছে। গ্রিক সভ্যতায় যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়, সে গণতন্ত্র হচ্ছে অভিজাত কিছু মানুষের গণতন্ত্র। সাধারণ মানুষের নয়। এটাকে অবিদ্যা ছাড়া আর কী বলা যায়।

রোমান সভ্যতারও একই ব্যাপার। সেখানে গ্লাডিয়েটরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ করানো হতো এবং একজনকে দিয়ে আরেকজনকে হত্যা করানো হতো যা দেখে অভিজাত শ্রেণীর নারীরা পর্যন্ত উল্লসিত হতো।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও আমরা দেখেছি গণতন্ত্রের নমুনা। ভোট বেশি পায় একজন আর প্রেসিডেন্ট হয় আরেকজন। একে গণতন্ত্রের পরিহাস বা অবিদ্যা ছাড়া আর কী বলা যায়?

আবার পাশ্চাত্য বলে, ‘মুক্ত বাজার অর্থনীতি’। এই মুক্ত বাজার অর্থনীতির পরিহাস আমরা বুঝতে পারি কবিগুরু ‘দুই বিঘা জমি’ কবিতাটি দিয়ে। যেখানে একটি ছত্র আছে, ‘বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন’—এখানে উপেন হলো দরিদ্র, শোষিতের প্রতীক যার জমিটুকুর জন্যেই তার অশান্তি।

জমিদার বাবু তাকে বোঝালেন—যেহেতু এই জমিটুকুই তার অশান্তির কারণ, অতএব তা দিয়ে দিলেই বামেলা চুকে যায়। সে তা-ই করলো। পরবর্তীতে তার নিজের লাগানো আমগাছ থেকে একটি আম ঝড়ে নিচে পড়লো। আর সেই আম কুড়িয়ে খাওয়ার অপরাধে তাকে চোর সাব্যস্ত করা হলো। তখন উপেন বলেছিলো, ‘তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে’।

অতএব আমাদের অবস্থা এই উপেনদের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তারা আমাদেরকে যা বোঝায় আমরা তা-ই বুঝি আমাদের অবিদ্যার কারণে। দরিদ্র হয়ে থাকি যেমন অবিদ্যার কারণে, তেমনি দরিদ্রকে ভাগ্য বলে মনে করি সেটাও অবিদ্যার কারণে।

প্রশ্ন : আমরা কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা বিগত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ থেকে জেনেছি যে, বর্তমান বিশ্ব বিভিন্ন মিডিয়া বা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত। আর তা জানা সত্ত্বেও টিভির আকর্ষণ থেকে আমরাই পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছি না। টিভি থেকে মুক্ত কীভাবে হবো দয়া করে বলবেন।

উত্তর : টিভির জন্যে যারা প্রোগ্রাম তৈরি করে তারা সবসময় মানুষের স্বভাবের দুর্বল দিকগুলোতে সুঁড়সুঁড়ি দেয়। একটি মানুষ, তরুণ-তরুণী কী চায়? যা চায় সেভাবে তৈরি করলেই সে দেখবে। সাধারণ মানুষ যে জৈবিক জীবনযাপন করে তার চাওয়াটাকে উসকে দেয়। বাস্তবে কখনো যা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কাহিনীর কল্পনায় তাকে তা দেখিয়ে মোহমুগ্ধ করে রাখে।

যেমন, অধিকাংশ সিনেমায় কী থাকে? নায়ক রিকশাওয়ালা। আর নায়িকা বিরাট বড়লোকের মেয়ে। নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেম হলো। নায়িকা একটা রিকশাওয়ালাকে স্বামী বানিয়ে ঘর ছেড়ে পালালো। এবং নায়ক বাবার পাঠানো ১০ গুন্ডাকে একাই ধরাশায়ী করে পুলিশের কাছ থেকে ধন্যবাদ পেলো। আপনারা কয়জন বাস্তবে এরকম ঘটনা দেখেছেন। অথচ এরকম কাহিনীকে উপজীব্য করেই তৈরি হচ্ছে অধিকাংশ সিনেমা। কেন? কারণ রিকশাওয়ালারা, গার্মেন্টস শ্রমিকরা এ অলৌকিক কল্পনায় ডুবে থাকতে চায়। মিডিয়াই তাতে এদেরকে অভ্যস্ত করেছে।

অতএব, আপনি ঠিক করুন, টিভিতে আপনি কী কী দেখতে চান? ঠিক করুন, আপনি কি মিডিয়ার গড্ডালিকায় গা ভাসাবেন, না নিজের পছন্দে দেখবেন? যদি নিজের পছন্দে দেখতে চান তাহলে আপনি তা-ই দেখবেন যা আপনার দেখা প্রয়োজন এবং কল্যাণকর। যা দেখার প্রয়োজন নেই—দেখা বন্ধ করে দিন। তারা এসে তো আর জোর করছে না।

আপনি ঠিক করে রাখুন যে কী কী দেখবেন, কোনটা দেখার মধ্যে আপনার উপকার রয়েছে। কারণ টিভির সবই খারাপ নয়, অনেক কিছুই আছে যা আপনার জানা প্রয়োজন। সেটা যখন জানবেন তখন আপনি উপকৃত হবেন। সেভাবে আপনি প্রোগ্রাম এবং নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নেবেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদের ঘুমের সমস্যা তারা রাত জেগে টিভি দেখে। এখন চ্যানেলগুলোতে যে সিরিজগুলো হয় সবগুলোতেই গীবত চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ক্যাচাল আর পরকীয়া। আর এগুলো হলিউডের সোপ অপেরার হিন্দি নকল, পরিবেশ পাল্টে তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ ভোজন, ষড়যন্ত্র, প্রেমের নামে নষ্টামি ছাড়া আর কিছু নেই। গীবত ষড়যন্ত্র মারামারি দেখার ফলে আপনার নার্ভ স্ট্রেন হচ্ছে। আপনি ঘুমাতে পারছেন না, শান্তিতে থাকতে পারছেন না। কারণ হিউম্যান নার্ভ এগুলোকে বাস্তবতা মনে করছে।

সেজন্যে আপনি নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম দেখবেন। আমরা অভ্যাসবশত টিভি দেখতে বসে পড়ি। অথচ সে সময়টা সন্তানের সাথে, স্ত্রীর সাথে কাটালে আপনি উপকৃত হবেন, শান্তি পাবেন।

প্রশ্ন : টিভি দেখাটা একটা নেশা হয়ে গেছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানার পরও এ আসক্তি থেকে বেরোতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : আপনি যে টিভি দেখাটাকে নেশার সঙ্গে তুলনা করেছেন তাতেই বোঝা যায় এর ক্ষতি সম্পর্কে আপনি সচেতন। কিন্তু এ সচেতনতা সার্থক হবে যখন আপনি বাস্তবেও এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারবেন। কারণ টিভিকে বলা হয় ‘বোকার বাক্স’ অর্থাৎ দর্শককে এটা বোকার মতোই মোহমুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু অনেকক্ষণ দেখার পর ক্লান্ত হয়ে টিভি বন্ধ করে বুঝতে পারেন এতক্ষণের নিট ফলাফল শূন্য। বরং সেক্স, সাসপেন্স আর ভায়োলেন্সে ভরা এসব প্রোগ্রাম আপনার স্নায়বিক উত্তেজনাই বাড়িয়ে দেয়।

আসলে এই টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণচক্র তাদের দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রকেই বাস্তবায়িত করছে। কারণ মানুষকে যদি কামনা-বাসনা-লালসায় উস্কে দেয়া যায়, মানবিক মূল্যবোধ যদি ধ্বংস করে দেয়া যায় তাহলে তারা কখনো শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। ভোজন, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং অন্যকে পীড়ন করাকে যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ পরিণত হবে চিরস্থায়ী দাসে, ভোগের জন্যে সে শুধু কিনবে আর কেনার অর্থ যোগাড়ের জন্যে সে গাধার মতো কাজ করে যাবে। আর সেটাই এই শোষণ চক্রের চক্রান্ত, যে উদ্দেশ্যে তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করছে।

প্রশ্ন : টিভি দেখলে অবিদ্যা, বাইরে গেলে অবিদ্যা। এই অবিদ্যা থেকে নিজেদেরকে কীভাবে রক্ষা করবো?

উত্তর : সবসময় নিজেদের মনকে জিজ্ঞেস করবেন, যে কাজটি আমি করছি তা নিজের জন্যে কল্যাণকর কি না, সমাজের জন্যে কল্যাণকর কি না। আমি যে ছবিটা দেখছি, যে নাচটা দেখছি এতে আমার কী মঙ্গল হচ্ছে? এ রকম নাচ কি আগে দেখি নি? একবার তো দেখলাম আর কয়বার দেখবো? নিজেকে জিজ্ঞেস করুন দেখলে কী হয়। এতে দেখবেন আপনার আকর্ষণ কমে যাবে। আমরা তো প্রশ্ন করি না, আহাম্মকের মতো তাকিয়ে থাকি, যেন জীবনে এটা প্রথম দেখছি।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে টিভি প্রোগ্রামের আরেকটি নতুন ধারা হলো বিভিন্ন সংগীত বা অন্যান্য প্রতিভার অধিকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। এতে

দর্শকদের এসএমএস ব্যবহার করে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়। এটা কতটা উপকারী?

উত্তর : বিজয়ী হওয়ার প্রক্রিয়ায় এসএমএস ভোটিংয়ের নামে যে সাধারণ দর্শকরা সম্পৃক্ত হয় তা বিনোদন ব্যবসার সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বাস্তবায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন, একজন তরুণ তার পছন্দের কোনো গায়িকাকে বিজয়ী করার জন্যে ৯০০০ এসএমএস পাঠালো। এতে লাভবান হলো ঐ মোবাইল কোম্পানি, টিভি চ্যানেল, বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো এবং মধ্যবর্তী দালালগোষ্ঠী।

তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য হলো সাধারণ দর্শকদের ভোটের মাধ্যমে কখনোই নির্ধারিত হয় না যে, কে ১ম ২য় বা ৩য় হবে। তা সবসময়ই নির্ধারিত হয় ঐ ব্যবসায়ী চক্রের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে। আর এর সবকিছুরই পরিণতি হচ্ছে অশান্তি, টেনশন, হতাশা এবং সময় নষ্ট।

বাঙালির কথা বলার প্রবণতা এবং আড্ডাপ্রিয়তা মোবাইল কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের কাজে খুব ভালোভাবে লাগছে। যে কারণে দরিদ্র বলে যে দেশ পরিচিত তার ১৫ কোটি মানুষের সাত কোটিরও বেশি মানুষের কাছে এখন মোবাইল। আর এ সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।

আমরা খুব তৃপ্তি নিয়ে দেখি যে, মোবাইল ফোন এখন কত সুলভ। কিন্তু এটা চিন্তা করি না যে, এই হলো গুরু। এরপর প্রতি মাসেই যে কথা বলা, মেসেজ দেয়ার জন্যে শত শত টাকার কার্ড কিনছি সেটা কি আমরা খেয়াল করি? বলা হবে যে, আধুনিক সময়ে দ্রুত যোগাযোগের জন্যে মোবাইল ফোন এক অনন্য সুযোগ। সেটা ঠিক। কিন্তু এর কতটা প্রয়োজনে আর কতটা অপ্রয়োজনে ব্যবহার করি তার হিসেব নিলে দেখবো অপ্রয়োজনীয় খরচটাই বেশি।

আসলে এই মোবাইল আসক্তি আলস্যেরই এক রূপ। কারণ আলস্য মানে পরিকল্পনামাফিক সুনির্দিষ্ট কল্যাণকর ফলপ্রসূ কাজ না করে সময়ের অপচয় করা। আর বিশ্ব পুঁজিবাদী চক্র এক সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই এই আলস্যপ্রবণতায় আমাদের ঠেলে দিয়েছে বিনোদনের নামে বা অগ্রগতির নামে। কারণ একটি জাতি যখন আলস্য আড্ডা আর ভোগের প্রবণতায় মত্ত হয়, তখনই তার পতন আসে।

যেমন রোম যখন পুড়ছিলো, তখন সম্রাট নীরো রাজপ্রাসাদে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। সিপাহী বিপ্লবের সময় সারা ভারত যখন জ্বলছিলো অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ তখন দাবা খেলছিলেন। তাই শোষক বা

পরানুভববাদীদের কৌশল হলো শোষিতকে আলস্য, আড্ডা আর ভোগ প্রবণতায় মত্ত রাখা। এতে তার কর্মস্পৃহা থাকবে না এবং বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী হবে না। জীবনকে নিয়ে সে বড় কিছু ভাবতে পারবে না।

চা শ্রমিকদের জীবন এর খুব করুণ উদাহরণ। সারা সপ্তাহ অমানুষিক খাটুনির পর যে উপার্জন সে করে, ঘরে ফেরার আগেই তার প্রায় পুরোটাই সে উড়িয়ে দেয় মদ-তাড়ির দোকানে। তারপর কষ্টেস্টে চলে তার বাকি সময়। পরের সপ্তাহে আবার একই ঘটনা।

এভাবেই বংশপরম্পরায় চলছে চা শ্রমিকদের জীবন-মদের নেশা, রোগ-শোক আর অভাবে ধুকতে ধুকতে। এ অবস্থাটা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয় না ইচ্ছে করেই। কারণ তাহলে আর তাদেরকে দমিয়ে রাখা যাবে না, যেভাবে খুশি সেভাবে শোষণ করা যাবে না।

কাজেই একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমাকেই সচেতন হতে হবে যে, মিডিয়া আর বিজ্ঞাপনে প্রভাবিত হয়ে আমি কি প্রকারান্তরে শোষকদেরই স্বার্থ রক্ষা করছি না? আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো মানুষ নয়, আপনাকে ব্যতিক্রমী হতে হবে।

প্রশ্ন : বিনোদনের জন্যে কি টিভির প্রয়োজন নেই? যদি থাকে তাহলে কতটুকু? কীভাবে বুঝবো?

উত্তর : আমরা কখনো বলি নি যে, টিভি দেখবেন না। আমরা যা বলছি তা হলো-টিভির প্রতি আপনি যদি আসক্ত হয়ে যান সেটা আপনার জন্যে ক্ষতিকর হবে।

আসল বিষয় হচ্ছে-আমরা কখনো টিভির বিপক্ষে নই। কিন্তু টিভি যেন আপনাকে পেয়ে না বসে। সুপ্রভাত থেকে আমার সোনার বাংলা পর্যন্ত যেন টিভি না দেখি। টিভি কতক্ষণ দেখবেন, কয়েক ঘণ্টা না এক ঘণ্টা সেটা আপনি ঠিক করে নেবেন। কী প্রোগ্রাম দেখবেন তা-ও ঠিক করে রাখবেন। আর সে প্রোগ্রামই দেখবেন যা আপনাকে প্রশান্তি দেবে।

আমরা এমন সব প্রোগ্রাম দেখি যা নার্ভকে অস্থির করে দেয়, উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়। হিন্দি সিরিয়ালের নায়িকা কুসুমের আগামীকাল কী হবে তা আপনি যদি চিন্তা করেন আর এদিকে আপনার পেশা, পরিবার, পড়াশোনা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই তাহলে বুঝতে হবে আপনি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন : আমি ইডিয়টের বাস্তব নিয়ে কাজ করতে চাই। কিন্তু দর্শকদের ইডিয়ট নয়, জ্ঞানী বানাতে চাই। কী করে সম্ভব?

উত্তর : এটাও সম্ভব। মিডিয়াকে জ্ঞান বিতরণের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। মিডিয়াতে ভালো প্রোগ্রাম হতে পারে। ভালো প্রোগ্রাম বানাতে পারেন, মানুষকে জ্ঞান দিতে পারেন, সেটাও ইবাদত হবে যদি আপনার প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে একজন মানুষকে আলোকিত করতে পারেন।

কুসংস্কার

প্রশ্ন : বাস্তবে ভূত বা অপশক্তি বলে কিছু আছে কি না যা নির্জনে ধ্যান করার সময় ক্ষতি করবে?

উত্তর : একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট নির্জনে বা জনসমাবেশে ধ্যান করতে পারেন। ভূত বা অপশক্তি কখনো তার কিছু করতে পারবে না। আসলে ভূত বলে কিছু নেই।

প্রশ্ন : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেউ যদি হাঁচট খায়, হাঁচি আসে বা কোনো বাধা আসে তাহলে কি উদ্দেশ্য সফল হয় না?

উত্তর : এটাও একটা কুসংস্কার। হজে যাওয়ার সময় আমার চশমা ভেঙে গেল। হজের যাত্রা অত্যন্ত সফল হয়েছে।

প্রশ্ন : ঘর ঝাড়ু দেয়ার ঝাড়ু বা পানির খালি কলস দেখলে, ডিম খেয়ে বের হলে কি অমঙ্গল হয়?

উত্তর : প্রতিদিন সকালে একটা ডিম খেয়ে আমি বাসা থেকে বের হই। কারণ সকালের নাশতায় আর কিছু থাকুক না থাকুক ডিম থাকবেই। এগুলোর সাথে অমঙ্গলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো সবই কুসংস্কার। ঘর ঝাড়ু দেয়ার ঝাড়ু পবিত্র জিনিস। এটা যদি ব্যবহৃত না হতো তাহলে পবিত্রতাই থাকতো না। যে কারণে রথযাত্রার সময় রথী মহারথীরা ঝাড়ু দিতে দিতে পথ চলেন। ঝাড়ুকে খারাপ মনে করা উচিত নয়। পানির কলস খালি না হলে ভরবেন কী করে? অতএব এগুলোর সাথে অমঙ্গলের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : যেদিন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম থাকে সেদিন কাজ বেড়ে যায়। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, নয়তো প্রোগ্রামে যাওয়া হয় না।

উত্তর : একবার প্রোগ্রামে যাবো। আপনাদের মা-জীকে তার সেন্টের বোতল দিতে গিয়ে বোতলটা আমার হাত থেকে পড়ে গেল। পড়-তো-পড়, আমার পায়ের ওপরে। পড়ে ওটা ভেঙে গেল। স্বাভাবিকভাবে পা একটু কেটেও গেল। বিদেশে যাবো। সব প্রস্তুতি শেষ। বুঝলাম, এটা শয়তানের কাজ। অন্য কেউ হলে কী মনে করতো-অশুভ লক্ষণ। আমি বললাম, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! অঘটন যা আগেই ঘটে গেল। যাত্রা শুভ। তেমন বেশি কাটে নি। পায়ের ওপরে ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে জুতা পরে যাত্রা করলাম। অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভ্রমণ ছিলো এটি।

প্রশ্ন : ঝাড়ুর মার খেলে চিকন হয় একথাটি কতখানি সত্য?

উত্তর : ঝাড়ুর মার খেলে যদি চিকন হয় তাহলে যারা ওজন কমাতে চান, যারা মোটা হয়ে গেছেন তারা তো নিজে নিজে কোনো চেষ্টা না করে শুধু ঝাড়ুর মার খেয়েই চিকন হয়ে যেতেন। আসলে এগুলো হলো কুসংস্কার। ঝাড়ু দিয়ে মারলে যদি চিকনই হওয়া যেতো তাহলে মোটা স্বামী বা স্ত্রীরা স্ত্রী বা স্বামীকে বলতো-তুমি একটু ঝাড়ু দিয়ে পিটাও, আমি চিকন হই।

প্রশ্ন : সবাই বলে সকালে দুই শালিক দেখলে দিন ভালো কাটবে, এক শালিক দেখলে কপালে খারাপ কিছু জোটে। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : এটা অবিদ্যা না, বাজে কুসংস্কার।

প্রশ্ন : প্রায়ই দেখা যায় যে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় অনেকে খাওয়া-দাওয়া করতে নিষেধ করে। বিশেষ করে গর্ভবতী মহিলাদের বেলায় এ নিয়ম মানা অতি জরুরি হয়ে পড়ে। এমনকি শিশুদেরও খাবার থেকে বিরত রাখা হয়। বিষয়টি কতটুকু প্রাসঙ্গিক।

উত্তর : সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় আমাদের দেহের মেটাবলিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন আসে। সে সময় শক্ত খাবার আপনার দেহের মেটাবলিক অবস্থার জন্যেই ক্ষতিকর হতে পারে এবং তখন খাবার খেলে ফুড পয়জনিং

হতে পারে। সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের প্রভাব শুধু দেহের ওপরে না পুরো প্রকৃতির ওপরে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। আর অতটুকু সময় শক্ত খাবার না খাওয়া কোনো কঠিন কিছু না। ক্ষতি হওয়ার চেয়ে না খাওয়া ভালো।

কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি ॥ দি সায়েন্স অফ লিভিং

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি কী? কোয়ান্টাম জীবনদৃষ্টি দিয়ে কি জীবনকে সুন্দর করা সম্ভব?

উত্তর : সফল ও পরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ জীবনদৃষ্টি। সমকালীন মানুষের সমস্যাটা এখানেই। যে যেখানে আছে সে মনে করে তার এটা দিয়েই সবকিছুর সমাধান করে ফেলা যাবে। যেমন, একজন একাউন্টেন্ট মনে করেন হিসাববিজ্ঞানই সব। একজন ইঞ্জিনিয়ার মনে করেন প্রযুক্তিবিজ্ঞানই আসল। একজন ডাক্তার মনে করে ওষুধ খেলে বা অপারেশন করলে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আবার পিএইচডি করে আসার পর, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মনে করেন পৃথিবীর সকল জ্ঞান তার আয়ত্তে চলে এসেছে।

অথচ সবকিছু মিলিয়েই হচ্ছে জীবন। শুধু গুহাতে বসে ধ্যান জপ করে যদি প্রশান্তি পাওয়া যেত তাহলে মুনি ঋষি দরবেশরা লোকালয়ে আসতেন না, কাজ করতেন না, মানুষের কল্যাণ করার কথা ভাবতেন না। যদি শুধু ব্যায়াম করেই প্রশান্তি পাওয়া যেত, তাহলে গামার মতো ব্যায়ামবীর চল্লিশ বছর বয়সে লিভার পচে মারা যেতেন না। যদি শুধু অর্থ প্রশান্তি দিতে পারতো, তাহলে ধনকুবেরদের জীবনে এত অশান্তি থাকতো না। শুধু মনের জ্ঞানই যদি প্রশান্তি দিতে পারতো, তাহলে মনোবিজ্ঞানীরা আত্মহত্যা করতেন না।

কোয়ান্টাম আসলে আমাদেরকে এ কথাই বলে। জীবনকে দেখতে হবে পরিপূর্ণভাবে। সঠিক জীবনদৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে জীবনযাপনের বিজ্ঞান।

জীবনযাপনের বিজ্ঞান—দি সায়েন্স অফ লিভিং কথাটি এসেছে অমর কথাশিল্পী লিও টলস্টয়ের একটি উদ্ধৃতি থেকে, যেখানে তিনি এর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন খুব সুন্দরভাবে। Most important of all the sciences one can and must have to learn is the Science

of Living, so as to do the least evil and the greatest possible good. অর্থাৎ সকল বিজ্ঞানের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান যা মানুষের জানা প্রয়োজন ও জরুরি তা হচ্ছে সায়েন্স অফ লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়, আর ভালো বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়।

রুশ মনীষী লিও টলস্টয়-সর্বকালের সেরা লেখক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক। বিশ্বের সর্বকালের সেরা দশটি বইয়ের ১ম ও ৩য়টি তার লেখা। জন্মেছিলেন জমিদার পরিবারে, উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হয়েছিলেন চার হাজার একর জমির। কিন্তু সাধারণ জীবনযাপন করতেন, পরতেন সাধারণ কৃষকদের পোশাক। ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতায় গভীর জ্ঞানের কারণে তার লেখাগুলোতে ফুটে উঠেছে মহৎ জীবনবোধের কথা। অবশ্য এজন্যে অর্থডক্স চার্চ তাকে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করে।

ইসলামের ব্যাপারেও তিনি গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন। মৃত্যুর সময় তার পকেটে যে বইটি পাওয়া যায়, তা হলো ‘দি সেয়িংস অফ মোহাম্মদ’-একজন বাঙালি আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর লেখা হাদীস সংকলনের একটি পুস্তিকা।

সায়েন্স অফ লিভিং পরিভাষাটি আমরা তার কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি নিজেও বলে গেছেন ছোট ছোট কিছু জীবনচারের কথা। যেমন, তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া, সকালে ওঠা, পরিমিত আহার, নিজের কাজ নিজে করার শিক্ষা ইত্যাদি।

কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অফ লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়, ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়, পাপ কত কম করা যায়, আর ভালো বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়।

কোয়ান্টামের শিক্ষা এক্ষেত্রে নবী-রসুলদের যে শিক্ষা, অলি-বুজুর্গদের যে শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা, তা থেকে আলাদা কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তাঁরা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলছে। শুধু ভাষাটা আধুনিক।

আর এর সূচনা হয় মানসিক প্রস্তুতি অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। নবীজী (স) বলেছেন, ‘ইনামাল আ’মালু বিন-নিয়াত’। নিয়ত সকল কর্মের অঙ্গুর। ধম্মপদে আছে-‘চিন্তা বা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে সুখ তাকে ছায়ার

মতো অনুসরণ করে।' [যমকবগ্গো : ১-২]

অর্থাৎ জীবনদৃষ্টি যদি সঠিক হয় তাহলে আপনি সুখের পথে অগ্রসর হবেন। যদি জীবনদৃষ্টি ঠিক না হয় তাহলে আপনি দুঃখের পথে অগ্রসর হবেন। কোয়ান্টাম সেই নিয়তটাকে গঠন করে-সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গঠন করে যাতে করে আপনি জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করতে পারেন। জীবনকে সফল করতে পারেন, আনন্দময় করতে পারেন।

অতএব, জীবনকে আপনি যখন খন্ডিতভাবে গ্রহণ করবেন জীবন আপনাকে খন্ডিত সাফল্য দেবে। আর যখন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করবেন, জীবন আপনাকে পরিপূর্ণ সাফল্য দেবে।

কোয়ান্টাম হচ্ছে-শাস্ত্রত ধর্মীয় চেতনার নির্যাসে সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ জীবন নির্মাণের প্রক্রিয়া। এ চেতনার আলোয় আমরা নিজেরা আলোকিত হচ্ছি, আলোকিত করছি সাধারণ মানুষকে।

প্রশ্ন : আমি তো অনেক কিছু জানি। অনেক কিছু চাই কিন্তু জীবনটা সুন্দর হচ্ছে না কেন?

উত্তর : আসলে জীবনকে সুন্দর করার জন্যে শুধু তথ্য যথেষ্ট নয়। আপনি অনেক কিছু জানতে পারেন। অনেক তথ্য আপনার থাকতে পারে। কিন্তু সেটা কখনো আপনার জীবনকে সুন্দর করতে পারবে না যদি সে তথ্যকে আপনার জীবনে বাস্তবায়িত করার প্রক্রিয়া আপনি না জানেন। তথ্যটাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া আপনাকে জানতে হবে।

শুকরিয়া আদায় করি যে, এ প্রক্রিয়াটা আমরা জানি। শুধু 'বদলে যাও' বললে সব বদলে যাবে-বিষয়টা তো এরকম না। কীভাবে বদলাবো, বদলানোর প্রক্রিয়াটা তো জানতে হবে। আমরা এ প্রক্রিয়াটা জানি। যে কারণে আমাদের লাঞ্ছিত জীবন বদলে গেছে। শুধু ভালো কথা পড়লে হবে না, শুধু ভালো কথা শুনলে হবে না। শুধু ভালো কথা বললে হবে না। এটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার প্রক্রিয়া আত্মস্থ করতে হবে।



প্রশান্তি



কেন টেনশন

প্রশ্ন : স্ট্রেস বা টেনশনের আসল কার্যকারণ কী?

উত্তর : স্ট্রেস বা টেনশনের জৈব-রাসায়নিক কার্যকারণটি যদি আমরা বুঝি তাহলে স্ট্রেস থেকে মুক্ত থাকাও সহজ হবে। আসলে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রাণী-দেহের এক জৈবিক প্রক্রিয়ার নাম স্ট্রেস। আদিকালে মানুষ যখন গুহায় বা জঙ্গলে বাস করতো, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বা শত্রুর মোকাবেলায় এই স্ট্রেস রেসপন্সই তাকে লড়তে অথবা পালাতে শক্তি যোগাতো।

কী হয় এই স্ট্রেস রেসপন্সে? আমরা যখন কোনো বিপদ অনুভব করি তখন হাইপোথ্যালামাস নামে ব্রেনের একটা ছোট অঙ্গে রাসায়নিক সংকেত প্রেরিত হয়। সিম্পেথটিক নার্ভাস সিস্টেম তখন নানা ধরনের স্ট্রেস হরমোন তৈরি করে। যেমন-এড্রিনালিন, নোরিপাইনফ্রাইন, কর্টিসল ইত্যাদি। এই স্ট্রেস হরমোনগুলো তখন রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে আমাদেরকে পালিয়ে যেতে অথবা লড়াই করতে সাহায্য করে। তখন হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় এবং বৃহৎ পেশিগুলোতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। চামড়ার নিচে রক্তকণিকাগুলো সংকুচিত হয় যাতে এক্সিডেন্ট হলে বেশি রক্তপাত না হয়। চোখের মণি বড় হয়ে যায় ফলে আমরা ভালো দেখতে পাই। ব্লাডসুগার বেড়ে যায় দেহে শক্তির যোগান দেবার জন্যে। হজম এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। শ্বোথ হরমোন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আর এই সবগুলো প্রক্রিয়াই হয় যাতে আমরা জোরে দৌড়ে পালাতে পারি বা লড়াই করতে পারি।

প্রশ্ন হলো, এখন তো আর বন্য জন্তু-জানোয়ার নেই, তার সাথে লড়াই করা বা পালাবারও প্রয়োজন নেই। তাহলে এখন কেন আমরা স্ট্রেস ভরাক্রান্ত হই? এখনকার স্ট্রেসের কারণ আপনার বিপদ নয়, বিপদের কল্পনা; বনের বাঘ নয়, মনের বাঘ; বাস্তবতা নয়, আপনার মানসিকতা। হয়তো আপনার বাচ্চাটি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ, নানারকম টেস্ট করিয়েও কিছু ধরা পড়ছে না। অফিসে আগামীকাল অডিট টিম আসবে হিসেবপত্র সব ঠিক আছে কি না দেখার জন্যে বা সহকর্মীর সাথে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে-এ অবস্থাগুলোয় আপনার কোনো বাস্তব বিপদ না থাকলেও আপনার ব্রেনে বেজেই চলেছে নিরন্তর এক ডেঞ্জার এলার্ম যা আসলে ১০০%-ই ফলস এলার্ম। কারণ আপনার ব্রেনের সমস্যা বা সম্ভাবনা যেটাই বলুন তা হলো,

ব্রেন বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বাস্তব বিপদে ব্রেন যে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, কাল্পনিক বিপদেও সেই একই প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

ধরুন, আপনার ব্রেনে একটা ফায়ার এলার্ম আছে। আগুন লেগেছে বুঝলেই তা বেজে ওঠে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, আগুনের কল্পনা করলেও তা বেজে ওঠে এবং দেহকে তৎপর করে তোলে তা মোকাবেলার জন্যে, তখন? আমরা যখন স্ট্রেসে আক্রান্ত হই, তখন এ ব্যাপারটিই ঘটে। বাস্তব বিপদ না হলে বা তা কেটে যাওয়ার পরও ব্রেনের স্ট্রেস রেসপন্স হতেই থাকে। ফলে প্রত্যেকবার জ্যামে পড়লেই আপনার মেজাজ খিঁচে ওঠে, মোবাইল খুলে বসের মিসড কল দেখলে টেনশন করেন বা সন্ধ্যাবেলায় টিভির খবর দেখতে বসলেই অনিশ্চয়তায় ভরাক্রান্ত হন।

এখন এই স্ট্রেসের পরিণতি কী? ছোট ছোট রক্তক্ষরণ থেকে যেমন মৃত্যুও হতে পারে তেমনি ছোটখাটো স্ট্রেসগুলোই যদি সবসময় আপনাকে ভরাক্রান্ত করতে থাকে, আপনি মারাত্মক শারীরিক এবং মানসিক অসুখের শিকার হতে পারেন।

চট করে তৈরি করে ফেলা যায়—স্ট্রেসজনিত এমন অসুখের তালিকায় রয়েছে : হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, স্ট্রোক, আইবিএস, আলসার, ডায়াবেটিস, মাসুল ও জয়েন্ট পেইন, এলার্জি, মিসক্যারেজ, এমনকি হাস্যকর শোণালেও—অকালে দাঁত পড়া।

অনেক উৎস থেকে স্ট্রেস আসতে পারে—বাইরের পরিবেশ, পরিবার, বন্ধু বা পরিচিত গন্ডি, পেশাগত ক্ষেত্র, সামাজিক ক্ষেত্র। তবে উৎস যা-ই হোক, স্ট্রেসের কারণ মূলত চারটি : পণ্যদাসত্ব, পণ্যঋণ, বিপদের কল্পনা এবং ব্যয়ে বেড়ানো।

প্রথমেই আসা যাক পণ্যদাসত্বের কথায়। আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতায় পণ্য বা ক্রয়ক্ষমতাকেই আমরা মনে করি সাফল্যের মাপকাঠি। কে কত দামি জিনিস কিনতে পারে, কে কত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে তা দিয়েই আমরা মানুষের গুরুত্ব মাপতে চেষ্টা করি। ফলে সম্পদ আহরণ বা পণ্য কেনার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অধিকাংশ মানুষ। কিন্তু পণ্যের প্রকৃতি হচ্ছে—যতই কেনা হোক, আরো কেনার অভাববোধ কখনো ফুরায় না।

আমেরিকার ধনকুবের জন ডি রকফেলারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, What is enough? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, Just one more. অর্থাৎ পণ্য বা সম্পত্তি বা ভোগের উপকরণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এক অনন্ত অভাববোধের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হওয়া। আর এর ফলে তৈরি হয়

প্রতিযোগিতা/ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা। যার পরিণাম স্ট্রেস। কারণ পণ্য আরাম দিতে পারে, কিন্তু প্রশান্তি দিতে পারে না। টাকা দিয়ে বিছানা কেনা যায়, ঘুম নয়। টাকা দিয়ে খাবার কেনা যায় কিন্তু ক্ষুধা বা খেতে পারার সামর্থ্যকে নয়। টাকা দিয়ে প্রাসাদ কেনা যায়, কিন্তু শান্ত-সুখের নীড় নয়।

অশান্তির দুই নম্বর কারণ হলো ঋণ। পণ্যঋণ। আধুনিককালে ব্যাংকগুলো ভোক্তাদের নানা ধরনের পণ্যঋণের অফার দিচ্ছে। টিভি, ফ্রিজ থেকে শুরু করে ছেলে-মেয়ের বিয়েও যাতে তাদের কাছ থেকে ঋণ করে দিতে হয় সেজন্যে তাদের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের শেষ নেই। সাধারণ মানুষও আধুনিক (!) লাইফ স্টাইলের আকর্ষণে পা দিচ্ছে ঋণ নামক এসব দুষ্ট চক্রের ফাঁদে। আর পরিণামে নিয়ে আসছে নিজের ওপর এক অপরিমেয় অশান্তি, টেনশন আর অস্থিরতার খড়গ। ঋণের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, একবার যদি আপনি ঋণগ্রস্ত হন তবে ক্রমাগত তা বাড়তেই থাকবে। প্রথমে হয়তো টিভি কেনার জন্যে ঋণ নিলেন, তারপর এসি, তারপর গাড়ি, তারপর বাড়ি, তারপর ছেলে-মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঋণ থেকে যে টেনশন তা থেকে যে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, মাইকেল জ্যাকসনই তার প্রমাণ। ২০০৯ সালে আকস্মিক এক কার্ডিয়াক এরেস্টে যখন তিনি মারা যান তখন তার অপরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ ছিলো ৫০০ মিলিয়ন ডলার যা পরিশোধের চেষ্টা করতেই তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও লন্ডনে কনসার্ট আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু টেনশন কমাতে দীর্ঘদিন ধরে তিনি যে পেইনকিলারে আসক্ত ছিলেন তা-ই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলো।

আর ঋণজনিত টেনশনের ফলে মানুষ তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে নিজেকে কত বিব্রতকর অবস্থায় ঠেলে দেয় তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো ব্রুটেনের রাজপুত্র এন্ড্রুর সাবেক স্ত্রী সারা ফার্গুসন। সম্প্রতি ব্রুটেনের একটি ট্যাবলয়েডে প্রকাশিত হয় যে, ডাচেস অফ ইয়র্ক সারা ফার্গুসন তার সাবেক স্বামী প্রিন্স এন্ড্রুর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ পাউন্ড দাবি করছেন। এবং গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবিতে দেখা যাচ্ছে, যে রিপোর্টার ব্যবসায়ী সেজে ফার্গুসনের সাথে এ কথোপকথন করছেন তিনি তার হাতে আগাম ৪০ হাজার ডলার তুলে দিচ্ছেন।

তিন নম্বর হলো, স্ট্রেসের কারণ ঘটনা নয়, ঘটনার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট মানসিক প্রতিক্রিয়া। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। দুজন মহিলা মুখোমুখি দুটি রিকশায় যাচ্ছিলেন। প্রথম রিকশায় একজন মহিলা একাই ছিলেন। উল্টোদিকের

রিকশায় ছিলেন এক মহিলা এবং তার চার বছর বয়সী মেয়ে।

প্লে-গ্রুপে পড়া মেয়েটিকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছিলেন তিনি। দুটি রিকশা যখন মুখোমুখি তখন ঘটলো একটা ছোট্ট ঘটনা। মা-মেয়ের রিকশা দ্রুত আসতে গিয়ে চলন্ত এক বাসের সাথে ধাক্কা লেগে খানিকটা কাৎ হয়ে আবার সোজা হয়ে গেল। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মা শক্ত করে রিকশার হুড ধরে ফেললেন। রিকশা আবার চলতে শুরু করলো।

ঘটনাটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু হলো না। কারণ পাশের রিকশায় যিনি ছিলেন তিনি দূর থেকে পুরো ঘটনাটা দেখলেন এবং এরপর নিজের কল্পনাশক্তিকে প্রয়োগ করে ভাবতে লাগলেন যদি রিকশাটা কাৎ হয়ে পড়ে যেত, তাহলে কী হতো? যদি মেয়েটি ছিটকে পড়তো তাহলে কী হতো? মেয়েটির ওপর দিয়ে যদি বাসটা চলে যেত, তাহলে কী হতো? এত ছোট্ট মেয়ে-মারা গেলে মায়ের কী অবস্থা হতো? অথবা মা-ও তো পড়ে আহত হতে পারতেন বা মারা যেতে পারতেন। তখন মেয়েটির কী হতো? এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে মহিলা নিজেই অসুস্থ হয়ে গেলেন। অথচ বাস্তব ঘটনা কিছুই না, এমনকি যাদের নিয়ে এত উদ্বেগ তাদেরও কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না, মাঝখান থেকে বিপদের কল্পনা করতে করতে অসুস্থ হয়ে গেলেন তৃতীয় একজন ব্যক্তি।

আর চার নম্বর কারণ হলো, বয়ে বেড়ানো। আমরা অধিকাংশ সময় ছোটখাটো ঘটনা বা প্রতিক্রিয়াগুলোকে বয়ে বেড়াই। ফলে যে বিষয়গুলোকে সহজেই ক্ষমা করে দিতে পারতাম বা এড়িয়ে যেতে পারতাম তা করতে পারি না এবং পরিণামে স্ট্রেসড হই।

দুই ভিক্ষুর গল্পে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। বয়সে নবীন এবং প্রবীণ দুই ভিক্ষু জঙ্গলের পথ দিয়ে আশ্রমে ফিরছিলেন। প্রায় যখন সন্ধ্যা, হঠাৎ দুজনই দেখলেন, নির্জন জঙ্গলের পাশে খরস্রোতা এক নদী, তার সাঁকোর গোড়ায় একা বসে আছে এক তরুণী। মেয়েটি জানালো, আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজের গ্রামে ফিরছে সে। কিন্তু ভরা জোয়ারের এই সময় একা এই সাঁকো পেরোতে সে ভয় পাচ্ছে। এজন্যে বসে আছে।

প্রবীণ ভিক্ষু কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। ভিক্ষুদের আচরণবিধি অনুসারে কোনো ভিক্ষুর পক্ষে নারী স্পর্শ মহাপাপ। কিন্তু এই তরুণীকে যদি একলা এখানে রেখে তারা চলে যান তাহলে এই রাতে মেয়েটির জীবন বা সম্ভব বিপন্ন হওয়ার যে ঝুঁকির মধ্যে তাকে ফেলে যাওয়া হবে সেই পাপ হবে আরো বড়। প্রবীণ ভিক্ষু সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হাত ধরে তাকে পার করে দিলেন।

সাঁকো পেরিয়ে আবার দুই ভিক্ষু পথ চলতে লাগলেন। এবার নবীন ভিক্ষু মুখ খুললেন, গুরু, এ আপনি কী করলেন? নারী স্পর্শের মতো মহাপাপ করে ফেললেন? আপনার এখন কী হবে গুরু? এভাবে সারাপথই সে বকতে লাগলো। প্রবীণ ভিক্ষু কিছুই বলছেন না।

অবশেষে যখন আশ্রমের দরজায় এসে থামলেন, প্রবীণ ভিক্ষু তখন বললেন, দেখ, আমি তো ঐ তরুণীকে ঐ সাঁকোর পারেই রেখে এসেছি। কিন্তু তুমি তো তাকে এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে। পাপ তাহলে কার বেশি হবে, আমার না তোমার?

আমরাও আমাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখবো—এরকম অনেক বিষয়ই আছে যা আমরা ওভারলুক করতে পারলে আমাদের জীবন অনেক বেশি সহজ, স্ট্রেসমুক্ত হতে পারতো।

প্রশ্ন : প্রশান্তি, তৃপ্তির উৎস আসলে কী? কখনো মনে হয় টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ক্ষমতা—এসবই মানসিক প্রশান্তির উৎস। কিন্তু এসব প্রচুর পরিমাণে আছে এমন অনেককে যখন হতাশায় ভুগতে দেখি তখন আবার বিভ্রান্ত হই।

উত্তর : আসলে টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ক্ষমতা অর্থাৎ বস্তুগত প্রাপ্তি কখনো প্রশান্তি, তৃপ্তি দিতে পারে না। বস্তু হলো এমন কিছু যা পাওয়ার জন্যে যেমন অস্থিরতা অশান্তি কাজ করে তেমনি পেলেও শুরু হয় নতুন অস্থিরতা, অশান্তি। আর সেটা হলো—আরো পাওয়ার অস্থিরতা এবং যা পেয়েছি তা থাকবে কি না সেই অনিশ্চয়তা।

আধুনিক মানুষের টেনশনের সবচেয়ে বড় কারণই হলো বস্তুগত প্রাপ্তির জন্যে তাদের আসক্তি, প্রতিযোগিতা। কারণ বস্তুর চাহিদার কোনো শেষ নেই। যত পাওয়া যায়, ততই বাড়তে থাকে আরো পাওয়ার চাহিদা। এজন্যেই হয়তো কবি বলেছেন—‘এ জগতে হায়, সে-ই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি’।

আসলে বস্তুগত প্রাপ্তি যদি প্রশান্তি দিতে পারতো, আনন্দ দিতে পারতো তাহলে যাদের জীবনে বস্তুগত কোনো অভাব নেই তারাই হতো সবচেয়ে সুখী মানুষ। বিশ্বখ্যাত পপস্টার মাইকেল জ্যাকসনের কথা আমরা আগেই বলেছি। এত সম্পদ, এত খ্যাতি, এত ভক্ত-অনুরক্তের দল—তারা কি তাকে শান্তি দিতে পেরেছিলো? যদি দিতে পারতো তাহলে কি তিনি পেইনকিলার ড্রাগসে আসক্ত হতেন? মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগেও তিনি ড্রাগ নিয়েছিলেন। পোস্টমর্টেম

রিপোর্টে তার পেটে কিছু পিল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি।

আমাদের সমাজে ‘কিছুই ভালো লাগে না’ জাতীয় অকারণ বিষণ্ণতায় সে মানুষরাই সবচেয়ে বেশি ভোগে যাদের বস্তুগত কোনো কিছুর অভাব নেই। অন্যদিকে বস্তুগত প্রাপ্তি তো দূরের কথা, দুবেলা খাবার যোগাড় করতেই যাদের হিমশিম খেতে হয়, তাদের এই অকারণ বিষণ্ণতায় ভোগার কোনো সময়ই নেই।

বস্তু কেন তৃপ্তি দিতে পারে না, প্রশান্তি দিতে পারে না তার একটি কার্যকারণ আছে। সেটি হলো—বস্তু যত দামি আর নয়নাভিরামই হোক, বস্তুর অধিকারী ব্যক্তিটির সাথে তার ভাব বিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই। একজন প্রিয় সঙ্গীর মতো সে অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারে না।

ধরুন নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যে আপনি টিভি দেখছেন। কিন্তু আপনি যতক্ষণ ধরেই টিভি দেখেন না কেন, নিঃসঙ্গতা ঘুচবে না। কারণ টিভি আপনার সাথে কথা বলতে পারছে না। ভাব বিনিময় করতে পারছে না। আপনার মমতার আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না।

বস্তু কখনোই তা পারে না। আর বস্তুগত প্রাপ্তির একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো অস্থিরতা। কারণ বস্তুগত প্রাপ্তি মানেই আপনার সামনে রয়েছে একাধিক অপশন। তার মানে সারাক্ষণই আপনি ভাবছেন, এর চেয়ে ভালো কিছু বোধ হয় আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা, অশান্তি।

তাই প্রশান্তির জন্যে, তৃপ্তির জন্যে অনেক বস্তু নয়, প্রয়োজন একটু সুস্থির হয়ে নিজের মধ্যে ডুব দেয়া। যা সম্ভব মেডিটেশনের মাধ্যমে।

সবচেয়ে বড় কথা—বস্তু কখনো আপন হয় না। যত দামি অলঙ্কারই হোক ছিনতাইকারী ছিনিয়ে নিয়ে গেলে অলঙ্কার কখনো বলে না, আমাকে জোর করে আনলে কেন। আমি তোমার নই। বরং অলঙ্কার মুহূর্তেই তার হয়ে যায়। টাকা বা সম্পদ কেউ জবর দখল করতে পারলে তারই ভোগ্য হয়।

অথচ প্রাণ আপন হয়। এটা একজন হুজুরের সত্য ঘটনা। উনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় নিখোঁজ হয়ে যেতেন। তাকে পাগলা পীর বলা হতো। তার স্ত্রী তাকে খুব ভালবাসতেন। একবার নিখোঁজ হলেন, ১২ বছর পার হয়ে গেছে কোনো খবর নেই। মহিলার নিজের অর্থনৈতিক কোনো অবলম্বন ছিলো না। আশেপাশের লোকজন বললো—দেখ, ও পাগল হয়তো মরে গেছে। তা না হলে তো আসতো। এসব বলে সবাই মিলে তাকে আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলো। সে আর কী করবে? অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না, তাকে তো খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

বিয়ে হলো, বছর দুয়েক তার সাথে ঘর-সংসার করেছে। এর মধ্যে খবর পেলো পাগল চলে এসেছে। শোনামাত্রই সে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল—‘আমার পাগল আসছে! আমার পাগল আসছে’ বলে। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে বস্তু আর প্রাণের পার্থক্য। মানুষ মমতাকে রিসিপ্ৰোকেট করতে পারে। প্রাণ মমতার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু বস্তু কখনো সাড়া দেয় না।

প্রশ্ন : প্রিয় দল আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি এবং খেলা দেখি। খেলা দেখার সময় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেসব ক্ষেত্রে কীভাবে নিজেকে উত্তেজনার হাত থেকে দূরে রেখে টেনশনমুক্ত থাকবো?

উত্তর : টেনশনের কারণগুলোর মধ্যে চার নম্বর কারণ হলো, বহন করে বেড়ানো—এটা তার একটা উদাহরণ। কোথায় কোন মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা, তার একটি দেশ আর্জেন্টিনা, আর আপনি এদিকে সেই খেলা দেখে উত্তেজনা ভুগছেন। রাত জেগে খেলা দেখছেন। ঘরে ঘরে পতাকা বুলাচ্ছেন। দেখতে দেখতে টেন্সড হচ্ছেন। এমনকি খেলা দেখতে দেখতে কেউ কেউ আবার হার্টফেলও করছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে—আপনি সবসময়ই অশান্তিতে ভুগবেন।

হ্যাঁ, যদি এমন হতো যে, বিশ্বকাপের এ খেলায় আমরাও খেলছি বা এ খেলার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান আমরা ক্রমাগত শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তাহলেও একটা কথা ছিলো। কিন্তু তা তো না। আপনি কী করছেন, খেলা দেখছেন, কিছু সময় নষ্ট করছেন, বিনিময়ে উত্তেজিত হচ্ছেন। পরদিন ক্লাস বা অফিসে মনোযোগ দিয়ে আর কাজ করতে পারছেন না। এটা ছাগলের তৃতীয় বাচ্চার লাফানোর মতো হলো। সেই সময়টা যদি আপনি নিজেদের উন্নয়নের জন্যে, অন্যের কল্যাণের জন্যে ব্যয় করতেন, তাহলে অনেক বেশি উপকৃত হতে পারতেন।

প্রশ্ন : আমার ছোট দুটি অতি আদরের মেয়ে, তারা রাতে একটি কাশি দিলেও অতি টেনশন হয়। ঘুম ভেঙে যায়। টেনশনের কারণে রাতে আর ঘুম আসে না। মনে হয় ওদের কত না কষ্ট হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তর : বাচ্চা কাশি দিলে ঘুম ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই টেনশনে যদি ঘুম না আসে তবে তা স্বাভাবিক নয়। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। এই অহেতুক টেনশন চলে যাবে।

প্রশ্ন : টেনশনের কারণ কি চারটাই? না আরো আছে?

উত্তর : আরো অনেক বিষয় আছে। আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কত যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে আমরা উৎকর্ষায় ভুগি তার ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো যতটা না প্রয়োজনীয় তার চেয়ে বেশি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে। কখনো এটা সন্তান নিয়ে, কখনো স্বামীকে নিয়ে, কখনো স্ত্রীকে নিয়ে। এমনকি সন্তান বড় হয়ে গেলেও উৎকর্ষার শেষ নাই। সন্তানের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক কী সেটা নিয়েও উৎকর্ষায় ভুগি।

কারো প্রেম নিয়ে উৎকর্ষা। আমি যাকে পছন্দ করেছি, সে থাকবে, না কি আমাকে ছেড়ে আরেকজনের সাথে পালিয়ে যাবে? কারণ আজকাল তো প্রেম কেউ একজনের সাথে করে না, একসাথে অনেকজনের সাথে করে। আবার সবাইকেই বলছে তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না। অতএব, কাকে সে সত্যি বলছে—এটা নিয়ে আমাদের উৎকর্ষা। এমনও হয়েছে যে, এক ছেলে একসাথে তিনজনের সাথে প্রেম করছে এবং তিনজনই আবার একজন আরেকজনের পরিচিত। তিনজনই মনে করছে, না, ও অন্য দুজনের সাথে অভিনয় করছে, আমার সাথে আসল।

আবার কারো বিয়ে নিয়ে উৎকর্ষা। ছেলে হলে পছন্দসই মেয়ে পাচ্ছে না, মেয়ে হলে পছন্দসই ছেলে পাচ্ছে না। একটি মেয়ের চিঠি এরকম, ‘আমি মাস্টার্স পাশ করেছি। উচ্চতা ৫-৪’ এবং আমার সমস্যা হলো বিয়ে। মাস্টার্স পাশ করার পরে এখন আমি বাসায় আছি। দুইবার বিসিএস পরীক্ষা দিয়েছি, কিন্তু পাশ করতে পারি নি। বর্তমানে কোনোকিছু করছি না। সারাক্ষণ প্রায় বাসায় থাকি। আমার মা-বাবা-ভাই আমার বিয়ের জন্যে অনেক দৌড়াদৌড়ি করছে, কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। পাত্রপক্ষ আমাকে দেখে পছন্দ করে কিন্তু বিয়ে হয় না। কারণ আমাদের বাসার আশেপাশে আমাদের অনেক শত্রু আছে, তারা বিভিন্ন রকম কথা বলে বিয়ে ভেঙে দেয়।

অনেকে বলে বাসায় শত্রুরা তাবিজ পুঁতেছে। আবার অনেকে বলে—শিং মাছের কাঁটার সঙ্গে তাবিজ বেঁধে নদীতে ছেড়ে দিয়েছে, যার জন্যেই বিয়ে হচ্ছে না। এইভাবে কত কবিরাজ কত কথা বলে যে কত টাকা নিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। এদিকে আমার মা-বাবা-ভাইয়েরা একেবারে ভেঙে পড়েছে। এজন্যে আমি খুব হতাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, অমুক তারিখের মধ্যে যদি আমার বিয়ে না হয় তাহলে আর বিয়ে করবো না। পাত্র হিসেবে আমার পছন্দ প্রথমে আর্মি

অফিসার, তারপর পুলিশের এএসপি, কাস্টমস অফিসার, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার পাঁচ নম্বর হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট । ...’

এই যে মেয়েটি এর অশান্তির কারণটা কী? তার চাওয়াকে সে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে নি। একটা বিয়ের জন্যে যে অস্থিরতায় সে ভুগছে তার একাংশও যদি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করার জন্যে অনুভব করতো তাহলে তার জীবন অনেক প্রশান্ত আর অর্থপূর্ণ হতো।

আসলে সে জিনিসটিই আমাকে চাইতে হবে যা আমার জন্যে কল্যাণকর। আসলে আমরা অনেক সময় বাহ্যিক চাকচিক্য বা চমক থেকে প্রলুব্ধ হই। নিজের জন্যে সেটা চাইতে গিয়ে হাস্যকর অনুকরণপ্রবণতায় লিপ্ত হই বা অস্থিরতায় ভুগি। কিন্তু যদি শান্ত হয়ে শুধু এটুকু ভাবতে পারি যে, এই চাওয়াটা কি আমার জন্যে কল্যাণকর না অকল্যাণকর—তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব, সঠিক চাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন : যে জিনিসগুলো আমাকে সুখ এনে দেবে ভেবেছিলাম, তা পেয়েও এখন আমার তৃপ্তি নেই। কেন?

উত্তর : আসলে অতৃপ্তি বা অশান্তির এটাই প্রথম কারণ। কোনো কিছু পাওয়ার পর আমরা তার জন্যে শুকরিয়া প্রকাশ করি না। বরং আমরা ‘কী নাই’ সেটা নিয়েই চিন্তা শুরু করি। কী নাই, সেই চিন্তাটা আমাদেরকে ব্যস্ত করে রাখে। যদি এভাবে শুরু করি যে, কী আছে—তাহলে কিন্তু অশান্তি অনেক কমে যায়। কারণ, যা আছে তা দিয়ে শুরু করতে হবে যা নেই তা অর্জন করার প্রচেষ্টায়। কী আছে আমার?

আসলে একজন মানুষের শান্তি পাওয়ার জন্যে যা যা প্রয়োজন আপনি দেখবেন—অন্য অনেকের তুলনায় তা আপনার অনেক বেশি আছে। দুচোখ দিয়ে দেখতে পারছেন, মুখ দিয়ে কথা বলতে পারছেন, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পারছেন। তারপরে মুখ দিয়ে খেতে পারছেন, দাঁত দিয়ে চিবুতে পারছেন, হাত দিয়ে কাজ করতে পারছেন, হাতটাকে ইচ্ছামতো নাড়াতে পারছেন।

আপনি চিন্তা করুন একটা রোবটের কথা। রোবটের একটা হাত নাড়াতে হলে তাকে কত কসরত করাতে হয়। তারপরও তার হাত নাড়ানো কখনোই মানুষের নাড়ানোর মতো সুন্দর নয়, স্বচ্ছন্দ নয়। পায়ের কথা চিন্তা করুন, আপনি দৌড়াতে পারছেন, হাঁটতে পারছেন, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন। আপনি ইচ্ছা হলে হাসতে পারছেন। হাসির কথায় হাসতে পারছেন, কাঁদতে

পারছেন, কী নেই আপনার? যে সফল মানুষগুলোর দিকে আপনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকেন, তাদের যা আছে, আপনারও ঠিক একই জিনিস আছে এবং এই জিনিসগুলো আপনি পেয়েছেন বিনামূল্যে। আমরা এগুলোর দিকে তাকাই না। আমরা গুরু করি যা নেই, সেটা দিয়ে। ফলে আমরা টেনশনে আক্রান্ত হই। সবসময় চিন্তা করতে হবে—কী আছে এবং এর সবচেয়ে ভালো ব্যবহার আমি কীভাবে করতে পারি!

তথাকথিত বিনোদন এবং প্রশান্তি

প্রশ্ন : আমরা তো মনে করি সারাদিন কাজ করার পর ঘরে এসে টিভি দেখে একটু রিল্যাক্স করবো। আসলে কি তা-ই?

উত্তর : অশান্তি বা টেনশনের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে টিভি আসক্তি। আসক্তি যে শুধু মদ বা ড্রাগসেই হবে, তা নয়। তা আপাত বিনোদনের নামেও হতে পারে। হতে পারে ক্রেজ বা উন্মাদনার নামে। টিভি কীভাবে বিনোদনের নামে টেনশন বাড়ায় সে কথা আমরা বলবো।

আসলে এখন বিনোদন একটা বিজনেস মেশিন হয়ে গেছে। আর আপনি এই বিজনেস মেশিনের একজন কনজিউমার ছাড়া আর কেউ নন। যেমন, আমেরিকান আইডলের নকলে ইন্ডিয়ান আইডল হলো। আর তার অনুকরণে আমাদের দেশেও গুরু হলো নানা ধরনের রিয়েলিটি শো। তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ, সুপার স্টার, সেরা কণ্ঠ, স্কুদে গানরাজ ইত্যাদি। এই প্রতিযোগিতাগুলোতে যারা অংশ নিচ্ছে তারা কিছুদিন মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে। প্রতিদিন বিভিন্ন চ্যানেলে হয়তো তাদের দেখাচ্ছে। বিশাল সব বিলবোর্ড টাঙানো হচ্ছে তাদের ছবি দিয়ে।

তারপর যারা বিজয়ী হচ্ছে তাদেরকে নিয়ে কিছুদিন খুব হৈ চৈ হচ্ছে। আমেরিকা, দুবাই, ইউরোপ সফরে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর? অধিকাংশকেই আর এরপরে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ লাইম লাইটে থাকার জন্যে মেধা-প্রতিভার যে অনুশীলন তা যথাযথভাবে না করেই তারা শোবিজ স্টার হওয়ার মোহে আক্রান্ত হয়েছিলো। আর এদের একটা বড় অংশ বারে পড়ে—মিডিয়ায় টিকে থাকার জন্যে যে খোলামেলা জীবনে অভ্যস্ত হতে হয়, গড ফাদারদের মনোরঞ্জন করতে হয় তা করতে না পারে।

প্রশ্ন : টিভিতে শুধু সিরিয়ালই দেখানো হয় না, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে খারাপ খবরগুলো হয় তা-ও তো দেখানো হয় ।

উত্তর : মিডিয়ার কল্যাণে আমরা বিশ্বের ভালো-খারাপ-সবরকম খবরাখবর পাচ্ছি, এটা ঠিক । কিন্তু তাতে কি আসলে কোনো লাভ হয়েছে; দশ বছর আগের অপরাধপ্রবণতার হারের তুলনায় এখনকার হার বেড়েছে বৈ কমে নি ।

হিন্দি সিনেমায় একসময় অশ্লীল দৃশ্যে ‘ভ্যাম্প’রা অভিনয় করতো । কারণ এসব দৃশ্যে নায়ক-নায়িকারা অভিনয় করতে চাইতেন না । দর্শকরাও মনে করতো এগুলো খারাপ । কিন্তু এখন আর এ মানসিকতা নেই । এখন অশ্লীল দৃশ্যে অভিনয় না করলে খ্যাতি পাওয়াই কঠিন ।

অনেক সময় নামের কারণে অশ্লীল জিনিসকেও শ্লীল বলে চালিয়ে দিতে চান কিছু গোষ্ঠী । একবার সিনেমা হলে একটি সিনেমা এলো-ডন অফ ইসলাম । যেহেতু সিনেমার নামে ‘ইসলাম’ শব্দটি রয়েছে, অতএব সিনেমা গুরুত্ব আগে ঝাড়পোছ করে গোলাপজল ছিটিয়ে সিনেমা হলকে পাক-পবিত্র করা হলো । তারপর মিলাদ পড়িয়ে গুরু হলো প্রিমিয়ার শো । সেই সিনেমায় জাহেলি যুগের কাহিনী বর্ণনার সময় তাতে অর্ধ-উলঙ্গ নর্তকীদের নাচ-গান অবলীলায় দেখানো হলো ।

এখানে হয়তো যুক্তি দেয়া হবে, কাহিনীর প্রয়োজনে । এরকম কাহিনীর প্রয়োজনে নির্দোষ দাবি করে মিডিয়াতে এমন অনেক কিছুই দেখানো হয় যা অশ্লীল, উত্তেজনা ও মারদাঙ্গায় ভরপুর এবং দর্শকদের ওপর যার প্রভাব নিষিদ্ধ দৃশ্যের মতোই ক্ষতিকর ।

তবে কেউ এটা মনে করবেন না যে, আমরা টিভির বিপক্ষে । আমরা সবসময়ই টিভির পক্ষে । কারণ টিভিতে এমন অনেক কিছুই দেখানো হয় যা টিভি না থাকলে আমরা দেখতে পারতাম না । তবে এক্ষেত্রে আপনাকে নিজে থেকেই একটা ভারসাম্য অবলম্বন করতে হবে যে, কতটুকু আপনি দেখবেন এবং কতটুকু দেখবেন না ।

প্রশ্ন : আমাদের বাসার প্রতিটি মানুষ টিভির প্রতি আসক্ত । তারা বলে বিনোদন বা জ্ঞানার্জনের উপায় হলো টেলিভিশন । আসলে কি তাই?

উত্তর : আসলে একসময় আলস্য বলতে বোঝানো হতো আকাশ-কুসুম কল্পনা বা ফালতু আড্ডাবাজিকে । কিন্তু এখন তথাকথিত বিনোদনের নামে আলস্য

গ্রাস করছে আমাদেরকে। অবশ্য এর একটা পটভূমিও আছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের টেনশন, অস্থিরতা বাড়লেও দৈহিক পরিশ্রমের পরিমাণ কমে গেছে অনেক। যেমন সাইকেলের জায়গায় এসেছে মোটর সাইকেল বা গাড়ি। গাড়ির প্রযুক্তিতেও ঘটছে নিত্যনতুন উৎকর্ষ। যেমন গাড়ি আগে ছিলো ম্যানুয়াল, হাতে ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে হতো। এখন পাওয়ার স্টিয়ারিং। আগে ঘুরিয়ে উইন্ডো গ্লাস ওঠাতে হতো। এখন ড্রাইভার সুইচ টিপেই চারটা গ্লাস তুলে দিতে পারে। আগেকার মতো রিয়ার ভিউ মিররে ঊঁকি দিয়ে আর গাড়ির অবস্থান দেখার দরকার নেই, সামনের কম্পিউটার আইয়ে চোখ রাখলেই তা দেখা যায়।

অর্থাৎ শারীরিক শ্রমকে কতভাবে কমানো যায় সে চেষ্টাই হলো বিজ্ঞানের গবেষণার মূল টার্গেট। অনেকটা সময় এতে সাশ্রয় হচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান তারা এ সময়টার সদ্ব্যবহার করেই নিজের বুলিতে জমা করেন কীর্তির ভান্ডার। কিন্তু যারা আহাম্মক, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান, তারা বিনোদনের নামে এসব টিভির ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

এটা কী ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তা একটা পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে দর্শক সপ্তাহে গড়ে কত ঘণ্টা করে টিভির সামনে কাটায় তার একটা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে—ইংল্যান্ডে সপ্তাহে গড়ে ২৮ ঘণ্টা মানুষ টিভির সামনে কাটায়, আমেরিকাতে ৩৮ ঘণ্টা এবং বাংলাদেশে মহিলারা ৪৫ ঘণ্টা, পুরুষরা ৩৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন যে, অফিস বা কাজ থেকে ফিরেই ঘুমাবার আগ পর্যন্ত টিভির সামনে বসে থাকাই তাদের নিত্যদিনের রুটিন।

এই টিভি চ্যানেলগুলোর মূল আকর্ষণ কী? হরেক রকম সিরিয়াল যার মূল উপজীব্য হলো চক্রান্ত ষড়যন্ত্র সেক্স এবং ভায়োলেন্স। পরকীয়া আর লাম্পটের কাহিনীই সর্বত্র ছড়ানো। হয়তো এক ছেলে তিন বোনের সাথে প্রেম করছে বা স্ত্রী প্রেম করছে স্বামীর ভাইয়ের সাথে। আর আমরা আহাম্মকের মতো এগুলো দেখেই ভাবছি ভারি জ্ঞানার্জন করছি বা বিনোদন করছি। এজন্যেই টিভিকে বলা হয় ‘ইডিয়ট বক্স’ বা ‘আহাম্মকের বাক্স’।

এই আহাম্মকি যে কতটা তার একটা ঘটনা হলো—একবার এক মহিলাকে পাওয়া গেল যিনি দুরাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন এজন্যে যে, ‘কুসুমের স্বামী যেন মারা না যায়’। এই কুসুম বাস্তব কোনো বিপন্ন, অসহায় রক্তমাংসের নারী নয় বরং টেলিভিশনের হিন্দি মেগাসিরিয়ালের একটি চরিত্র। অর্থাৎ আমাদের ইবাদত বন্দেগিতেও ঢুকে

গেছে এখন এই টিভি নামক আলস্য-আসক্তি। শুধু তা-ই নয়, একসময় মডেল বলতে আমরা মনে করতাম জীবনাদর্শ, অর্থাৎ যাকে অনুসরণ করে একজন মানুষ সফলতার পথ খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু পরিহাস হচ্ছে মিডিয়ার কল্যাণে আমাদের তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীদের মডেল এখনকার শোবিজ স্টাররা। এরা যা করে, যা বলে সেটাকেই এরা ভাবে আগুবাধ্য। এর মধ্যে কোনো একটা সফট ড্রিংকসের বিজ্ঞাপন চিত্রে অভিনয় করছিলো এখনকার দুজন খ্যাতিমান নায়ক-নায়িকা। বিজ্ঞাপনে দেখাচ্ছিলো যে, সফট ড্রিংকস খাওয়ার জন্যে তারা চুরি করছে। এটা দেখে কী শিখবে আমাদের শিশুরা, তরুণ-তরুণীরা? সফট ড্রিংকস খাওয়ার জন্যে চুরিও করা যায়। ফলে এসব প্রভাব পড়েছে আমাদের স্বভাবে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে।

মিডিয়াতে মধ্যরাত অবধি এ সমস্ত নানারকম সমস্যা, চক্রান্ত, উত্তেজনার কাহিনী টিভির পর্দায় দেখার পর অবচেতনভাবেই আমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। অস্থিরতা, উত্তেজনা অশান্তিতে ভুগি এবং সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমাদের ঘুম। ইদানীং কালের ইনসমনিয়া বা ঘুমের সমস্যার প্রধান কারণই হলো গভীর রাত পর্যন্ত টিভি দেখার প্রবণতা।

প্রশ্ন : অনেকক্ষণ কাজের পর আমাদের বিনোদনের প্রয়োজন, এতে কাজের প্রতি একঘেঁয়েমি দূর হয়। ক্লান্তি চলে যায়। আপনি কী বলেন?

উত্তর : বিনোদনের জন্যে টিভি সিরিয়াল-এ ধারণা ভুল। একমাত্র হাসির সিরিয়াল ছাড়া বাকি সবকিছু চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ভায়োলেস এবং সাসপেন্স যা নার্ভাস সিস্টেমকে টেনসড করে দেয়। এগুলো দিয়ে বিনোদন তো হয়ই না, নষ্ট হয় সময়, উত্তেজিত হয় নার্ভ। বরং সে সময়টুকু আপনি পরিবারের সাথে কাটান, অনেক ভালো বোধ করবেন।

আর কাজকে যদি ভালবাসেন তাহলে বিনোদনের জন্যে আলাদা সময়ের প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের জীবনে দেখেছি, কাজের চেয়ে ভালো বিনোদন আর কিছু হয় না। আমি তো ক্লান্তই হই না। কেন? কারণ আমি আমার কাজটাকে ভালবাসি। আপনিও আপনার কাজটাকে ভালবাসুন। দেখবেন আপনারও কোনো ক্লান্তি নেই, একঘেঁয়েমি নেই। যেমন, আমাদের ফাউন্ডেশনে কাজ শুরু হয় সকাল নয়টায়। চলে রাত নয়টা, ১০টা, ১১টা পর্যন্ত। কেউ আবার কাজ করতে করতে দেখা যায় যে, অফিসেই থেকে যাচ্ছে। তারপরও কারো ক্লান্তি নেই। কেন? কারণ এই কাজটা হচ্ছে নিজের

কল্যাণের জন্যে, আত্ম উন্নয়ন ও সৃষ্টির সেবার জন্যে।

আর ‘বিনোদন’ ধারণাটা পশ্চিমাদের বা পুঁজিবাদীদের স্বার্থ হাসিলের। আপনার পকেট থেকে পয়সা হাতিয়ে নেয়ার জন্যে তারা তথাকথিত বিনোদনের এই ধারণা তৈরি করেছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে সারাদিন সবাই নিজের স্বার্থে কাজ করে। সেখানে অন্যের ও নিজের জন্যে কল্যাণকর কোনো কাজ তারা করে না। নিজের স্বার্থে কাজ করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়। সপ্তাহ শেষে সেই ক্লান্তি মেটাবার অজুহাতে তারা মেতে ওঠে খরচ আর ভোগ-বিলাসিতার বিকৃতিতে। কিন্তু একজন মানুষ যখন নিজের এবং অন্যের কল্যাণে কাজ করে তখন তার ক্লান্তি থাকে না। যার ক্লান্তি নেই তার তথাকথিত বিনোদনেরও প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : টিভির ক্ষতিকারক দিকের তুলনায় উপকারিতা সামান্য। আমি গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে টিভি দেখা একদম বন্ধ করে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি এবং এতে উপকার পাচ্ছি। এখানে এসে প্রতিজ্ঞা বজায় রাখার জন্যে মন দৃঢ় হলো। আশা করি কোয়ান্টাম পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই ক্যাম্পার থেকে নিজেদের বাঁচানোর উদ্যোগ নেবেন।

উত্তর : আসলে কখনো extreme point এ যাবেন না। কারণ extreme জিনিস কখনো sustain করে না। তার চেয়ে বরং আপনি সেন্সর করণ কী দেখবেন, কী দেখবেন না। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ এটা বোঝার মতো বয়স, জ্ঞান সবারই আছে। অতএব আপনি যা দেখার তা-ই দেখবেন, যা দেখার নয় তা দেখবেন না।

আসলে বিনোদন কোনটা? এক মওলানা সাহেব ওয়াজ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, যখন দাদ হয় তখন চুলকানি লাগে। চুলকানির সময় বেশ একটু আরাম লাগে। কিন্তু চুলকানি শেষ হয়ে গেলেই জ্বালাপোড়া শুরু হয়।

আমাদের জীবনে বিনোদনের ভূমিকাও এরকম। যখন দেখি তখন কিছুটা আরাম লাগে। কিন্তু দেখা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ব্যারাম শুরু হয়। আবার জ্বলুনি শুরু হয়, স্ট্রেস, টেনশন শুরু হয়। অতএব সত্যিকার বিনোদন হচ্ছে অন্যের কল্যাণে সময় ব্যয়। এতে প্রশান্তি আসে হৃদয়ের গভীর থেকে।

প্রশ্ন : সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ যদি উল্লেখ করে দেন তাহলে অবসর সময়ে টিভি না দেখে তা আমরা করতে পারি। মেডিটেশন ছাড়া/সহ অন্যান্য কিছু কাজ।

উত্তর : আপনি যদি পেশাজীবী হয়ে থাকেন তাহলে অফিস থেকে বাসায় এসে আপনার কর্তব্য হচ্ছে পরিবারে সময় দেয়া। পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞেস করুন, কে কেমন আছে। আপনি যদি ঘরের কর্তা হন ঘরের সবার খোঁজ নিন। মাথায় একটু হাত বোলান-বাবা কেমন আছো তুমি? সাধারণত এখনকার বাবারা ঘরে এসে স্ত্রী-সন্তানকে খুব একটা সময় দেন না। ঘরে এসে একটু ফ্রেশ হয়েই হয়তো টিভি নিয়ে বসে পড়েন।

আবার অনেক স্ত্রীরও সময় নেই হাজবেন্ডের সাথে কথা বলার। হয়তো পছন্দের কোনো সিরিয়াল দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। এটা তো নেশা, আসক্তি। অতএব নিজের সন্তানের খবর নিন। এরপর সময় থাকলে আরেকজন গ্রাজুয়েটের খবর নিন। সে মেডিটেশন করেছে কি না খবর নিন। মাটির ব্যাংক জমা দিয়েছে কি না খবর নিন। অমুক রক্তদাতা রক্ত দিয়েছে কি না খবর নিন। নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কাজ করুন। একটি নতুন ভাষা শিখুন। আরেকজনকে আলোকিত করার জন্যে কোয়ান্টামের বাণী তার কাছে পৌঁছে দিন।

অতএব কল্যাণমূলক কাজে আপনি সময়গুলোকে ব্যয় করুন। দেখবেন, আপনি একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হচ্ছেন না। আমরা সকাল থেকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত কাজই করি। আমরা কিন্তু একঘেয়েমিতে ভুগি না। কারণ, এক তো হচ্ছে ভালবেসে কাজ করি। আর দুই-বৈচিত্র্যময় কাজ করি। এক কাজে যদি মনে হয় অনেকদিন সময় দিয়েছি তখন অন্য কাজ করি।

প্রশ্ন : আমি তিনদিন ৩০ মিনিট সিরিয়াল দেখি। যখনই পড়তে বসি সিরিয়ালের কথা মনে পড়ে। সিরিয়ালটি না দেখার চেষ্টা করছি কিন্তু পারি না। এখন আমি কী করবো?

উত্তর : খুব সহজ। যখন সিরিয়াল চলবে তখন মেডিটেশনে বসে যান। তখন মনে সিরিয়ালের চিন্তাই আর আসবে না।

প্রশ্ন : সিরিয়াল থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়েছি কোর্স করে। কিন্তু এখন আমার মা-বোনোরা সিরিয়ালের পেছনে লেগে আছে। যা দেখে আমার কষ্ট লাগে। অনেক বুঝিয়েও এ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আপনার কথামতো এখন চুপচাপ থাকি। কিন্তু আমার খুব কষ্ট লাগে যে, তারা দিন দিন ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছে। আমার কষ্ট, মন খারাপ কী করে দূর করতে পারি?

উত্তর : আপনার পরিবারের লোকেরা আপনার কথা শুনছে না এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। আপনার কথা শোনার জন্যে হাজার হাজার পরিবার আছে। পরিবারের বাইরে বেরিয়ে পড়ুন। অন্যদের উদ্ধুদ্ধ করুন। তারা আপনার কথা শুনবে। আর যখনই মেডিটেশন করেন কমান্ড সেন্টারে পরিবারের লোকদের নিয়ে আসুন। মমতা দিয়ে তাদের বোঝান। সময় লাগতে পারে কিন্তু কেউ না কেউ বুঝবেই।

প্রশ্ন : টিভি আসক্তি থেকে বাঁচার জন্যে আজকে সকালেই আমার বাসার ডিশের লাইন খুলে ফেলেছি।

উত্তর : খুলে ফেলেছেন ভালো। খুলে ফেলাটাই কিন্তু সমস্যার সমাধান না। এটা খুলে ফেলতেও সময় লাগে না। আবার লাগাতেও সময় লাগে না। আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ডিশের লাইন থাকবে কিন্তু আপনি দেখবেন না। আপনার কোনো আগ্রহ হবে না।

কীভাবে? যত মেডিটেশন করবেন, যত অটোসাজেশন দেবেন, মনছবি দেখবেন এবং জীবনের লক্ষ্যকে যত সামনে রাখবেন, তত আপনার সময় সচেতনতা বাড়বে। যে, আমার এই যে সময়টুকু, এই সময়টুকু অপচয় করার আমার সুযোগ আছে কি না? এই সময়ের কাছ থেকে আমি লাভবান হচ্ছি কি না? এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : আমার টিভি সিরিয়াল দেখার নেশা আছে। আমি কীভাবে এটাকে দূর করতে পারি?

উত্তর : প্রথমেই চিন্তা করুন যে, সিরিয়াল দেখে কি আপনার তৃপ্তি হচ্ছে? এই সিরিয়ালগুলোর প্রতিটা পর্বকে এমনভাবে শেষ করা হয় যে, আপনি এরপরে কী হবে এটা নিয়ে চিন্তা না করে পারবেন না। এমন জায়গায় এটা শেষ হবে যে, মরলোও না, বাঁচলোও না। মরা-বাঁচার মাঝামাঝি বুলছে। নরকেও যাবে না স্বর্গেও যাবে না। মাঝখানে বুলে আছে এবং আপনিও বুলে আছেন। ঐটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। চিন্তা আর মুক্ত হতে পারছে না, স্বচ্ছ হতে পারছে না। শুধু ঐ সময়টুকুই নয়, পর দিন আসার আগ পর্যন্ত।

এগুলো আমাদেরকে এমনভাবেই মোহান্বিত করে রেখেছে যে, এসব সিরিয়াল একেকটা হাজার খণ্ড হলেও, প্রতিদিন দেখালেও আমাদের দেখার

কোনো ক্লান্তি নেই। যখনই মনে হচ্ছে এগুলো দেখায় ক্লান্তি আসবে, সাথে সাথে অফ, নতুন সিরিয়াল আবার চালু হচ্ছে। নতুন সিরিয়ালেও পুরনো জিনিস। শুধু চেহারা আলাদা, ডায়ালগ এক। এবং যেকোনো সিরিয়াল দেখলে বোঝা যায় এরপরে কী হবে। আপনারা অনেকেই বুঝতে পারেন এরপরে কী হবে। তারপরও দেখছেন। যত দেখছেন, নিজের অজান্তেই স্নায়ুকে অবসন্ন করছেন।

আসলে আপনার চিন্তার মুক্তি, আপনার প্রজ্ঞার পথের একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে এই টিভি আসক্তি।

শুকরিয়া-টেনশনের সমাধান

প্রশ্ন : আমার সবকিছুতেই টেনশন। এমনকি কোনোদিন টেনশন না হলে মনে হয় কেন টেনশন হলো না। ‘প্রশান্তি’ কথাটা বলতে চাই। কিন্তু কেমন যেন খটমট লাগে। সবসময় মানসিক অস্বস্তিতে ভুগি।

উত্তর : আসলে মানুষ যখন একটি ধারায় অভ্যস্ত হয়ে যায় সেটা ভালো অভ্যাস বা বদভ্যাস হোক, কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হোক-তার ব্রেনের কর্মকাঠামো তখন সে অনুসারেই কাজ করতে থাকে। অন্যকিছু বা নতুন কিছুকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এর জন্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে হবে।

আপনি ভেবে দেখুন, টেনশন করে আপনার কি কোনো লাভ হয়েছে? সমস্যার কি সমাধান পেয়েছেন? পান নি। কারণ টেনশন সমস্যাকে বাড়ায় বৈ কমায় না। আর যত টেনশন করবেন তত তা বাড়তেই থাকবে। এজন্যে যখনই কোনো কাজ না থাকে তখনই মনে মনে বলুন, ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’। প্রতিদিন কমপক্ষে শতবার উচ্চারণ করুন। দেখবেন আপনার টেনশন চলে গেছে।

প্রশ্ন : পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক প্রভাব বা বাইরের কথা, অভাব-অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইলেও বার বার তাতে প্রভাবিত হই। মেডিটেশন করে কিছুক্ষণ ভালো থাকলেও আবারো আক্রান্ত হই দুঃখ-হতাশায়। কীভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো?

উত্তর : সবসময় বলবেন, ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ থ্যাংকস্ গড বা প্রভু ধন্যবাদ, বেশ ভালো আছি’। অর্থাৎ সবসময় কৃতজ্ঞ থাকবেন, স্রষ্টাকে শুকরিয়া জানাবেন ভালো রাখার জন্যে, সুস্থ রাখার জন্যে। কারণ আপনি যত খারাপই থাকুন না কেন সবসময় মনে রাখবেন আপনার চেয়ে খারাপ অবস্থায় কেউ আছে।

অর্থাৎ স্রষ্টা যতটুকু দিয়েছেন সেটার জন্যে তাঁর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং তারপর তিনি যাতে আরো দেন সেজন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা—এটাই হচ্ছে সফল জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি।

আর সেই সঙ্গে কাজে ডুবে যান। কারণ, সময় এবং কাজের যোগফলই জীবন। আর অলস মস্তিষ্ক হলো সমস্ত নেতিবাচক চিন্তার আখড়া। যারা ব্যস্ত, একের পর এক কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন তাদের জীবনে হতাশা বা বিষণ্ণতা থাকে না। সহজে দুঃখ-কষ্টে আচ্ছন্ন হন না। তাই নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করুন আর যতটা বেশি সময় সম্ভব গঠনমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন : চারপাশে টেনশন। এত প্রতিকূল পরিবেশে কি আমাদের পক্ষে সবসময় প্রশান্ত থাকা সম্ভব?

উত্তর : আপনি যদি শোকরগোজার হন তাহলে প্রশান্ত থাকতে পারবেন। চারপাশে টেনশনের বড় কারণ সারাক্ষণ ‘নাই নাই’ মনোভাব। ৩০ বছর আগে কারো মোবাইল ছিলো না। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল, সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে, খোঁজ-খবর নিতে পারছে, তাতে নাই নাই ভাবটা আরো বেড়েছে বৈ কমে নি। যা আছে তা নিয়ে শোকরগোজার থাকুন, যা নেই তার জন্যে মনছবি করুন।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই বলুন, ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ! প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ সুন্দর একটা দিনের জন্যে’। যখনই সময় পান অটোসাজেশন দিন—‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’। দেখবেন আপনার জীবন প্রশান্তিময় হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন : আমার সমস্যা হচ্ছে, কোনোকিছুতেই পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারি না। শুকরিয়া আদায় করি, কিন্তু মনে হয় অন্যদের তুলনায় কিছুই করি নি। এই অসন্তুষ্টি থেকে হীনম্মন্যতাও আসে। তাহলে কীভাবে শোকরগোজার হবো?

উত্তর : সত্যিকার শুকরিয়া হলো, যে সাফল্য বা অর্জনের জন্যে এই শুকরিয়া সেই কাজটাকে আরো বাড়িয়ে দেয়া। যেমন আমাদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্স যখন শততম ব্যাচ সম্পন্ন করলো, তার শুকরিয়া হিসেবে পরবর্তী ৩০ দিনে আমরা সারাদেশে চারটি কোর্স, তিনটি ওয়ার্কশপ করলাম।

১৫০ তম কোর্স থেকে আমরা একটানা চার দিনের কোর্স শুরু করলাম। আর এর ফলে গত বছরগুলোতে আমরা অনেক বেশি কোর্স এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম করার সুযোগ পেয়েছি। এখনও ফাউন্ডেশনের কর্মপদ্ধতির দিকে তাকালে দেখবেন, একের পর এক কার্যক্রম আসছে। কোনো সাফল্য বা অর্জনের আনন্দকে ফাউন্ডেশন উপভোগ করছে আরেকটি নতুন কাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে।

কাজেই অন্যদের ভালো করতে দেখে হতাশ বা হীনম্মন্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার কাজটাকেই আরো বাড়িয়ে দিন, নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ ও উদ্যোগ গ্রহণ করুন। আপনি শোকরগোজার ও আনন্দময় জীবনের অধিকারী হতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক প্রভাব বা বাইরের কথা, অভাব-অভিযোগ থেকে নিজেকে, নিজের মনকে মুক্ত রাখতে চাই কিন্তু পারছি না। কিছুক্ষণ ভালো থাকি এরপর আবার ঐসব কথা আমার মাথায় আসে। আমার মন খুব খারাপ থাকে। মেডিটেশন করে এটা দূর করতে চেষ্টা করছি। কিছুক্ষণ পর আবার আক্রান্ত হই দুঃখ-হতাশা দ্বারা। আমি ধ্যানের স্তরে পৌঁছাতে পারছি না। এসব সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্ত হতে পারি?

উত্তর : আপনাকে সবসময় বলতে হবে, আমি ভালো আছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি বা সনাতন ধর্মালবম্বী হলে বলবেন, হরি ওম বা ঈশ্বরের কৃপায় আমি ভালো আছি। খুব ভালো আছি।

আমাদের এত টেনশন কেন? আমরা শুধু ওপরের দিকে তাকাই, নিচের দিকে তাকাই না। ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, চারপাশে তাকাই না। আমার টেনশন নাই কেন? আমি ওপরের দিকে তাকাই, নিচের দিকেও তাকাই। ভবিষ্যতের দিকে তাকাই, চারপাশেও তাকাই। যার কারণে আমাদের কোনো হতাশা নেই। সবসময় সকালে উঠেই বলবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! একটি সুন্দর দিন পেয়েছি। একটি নতুন দিন এসেছে। এই দিনটাকে আমি কাজে লাগাতে পারবো।

আপনি যদি ঘুম থেকে না উঠতে পারতেন, আপনি যদি প্যারালাইজড হয়ে বাসায় পড়ে থাকতেন, ঘর থেকে বেরোতে না পারতেন তাহলে কী হতো? আমাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এখানেই। যেটুকু আমার আছে সেটুকুর জন্যে শুকরিয়া আদায় করতে পারি না।

আপনি এগুতে পারবেন তখনই যখন যেটুকু আছে সেটুকুর জন্যে শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন—‘প্রভু যেটুকু দিয়েছে সেটুকুর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ’। আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। এখন আমার এই এই জিনিস আরো লাগবে, আমাকে দাও। তোমার তো অভাব নেই কিছুই। আর আমি তো নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসি নি। তাহলে দেবে না কেন?

প্রশ্ন : সবসময় মনের অন্তঃস্থল থেকে স্রষ্টার শুকরিয়া করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ঠিক ঐ অবস্থায় করণীয় কী এবং দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : আসলে সবসময় যে মন থেকে শুকরিয়া আসে তা না, কিন্তু যখন আপনি মুখে বলছেন এবং বার বার বলছেন, এই মুখে বলারও প্রভাব রয়েছে। আপনি মুখে বলছেন, আপনার কান শুনছে। আপনার ব্রেনে গিয়ে এটা আবার প্রোথাম হচ্ছে। আবার আপনি বলছেন। আবার আপনার ব্রেনে যাচ্ছে, ব্রেন থেকে এটা আপনার অন্তরে যাচ্ছে।

কাজেই সবসময় অন্তর থেকে শুকরিয়া না এলেও শুকরিয়াটাকে অভ্যাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করুন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ, থ্যাংকস গড, হরি ওম বা প্রভু ধন্যবাদ বলাকে অভ্যাসে রূপান্তর করে ফেলুন। যত অভ্যাসে রূপান্তরিত করবেন, তত এটা আপনার অন্তরে ঢুকে যাবে। তখন শুকরিয়াটা আপনার অস্তিত্বের অংশ হয়ে যাবে এবং শুকরিয়া ভেতর থেকে আসবে।

প্রশ্ন : যে জিনিসগুলোকে ভেবেছিলাম যে সুখ এনে দেবে, ছয় বছর পর সেই জিনিসগুলো পেয়েও এখনো আমি সেই আগের অবস্থায় আছি একা। কী করবো, আবার নতুন করে শুরু করতেও ইচ্ছা করছে না। একই বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছি। কীভাবে সুখী হবো—জীবনের অর্থই বুঝতে পারছি না।

উত্তর : আসলে অশান্তির আপাত উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর পেছনের কারণকে আমরা যদি দেখি, আমরা দেখবো একটা সহজ সত্য। সহজ সত্য হচ্ছে—স্রষ্টা আমাদেরকে কিছু মানবীয় গুণাবলি দিয়ে পাঠিয়েছেন। দিয়েছেন কল্যাণকর গুণাবলি, সৃজনশীল শক্তি এবং মমতার অনুভূতি। যাতে আমরা মানুষের

কল্যাণ করতে পারি, নতুন নতুন সৃষ্টি করতে পারি। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আমাদের কর্মের যে স্বাধীনতা, সৃজনশীল মানুষের কর্মের যে স্বাধীনতা—এই স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে দেয়া আছে।

সেই মানুষকে যখন রোবট বানিয়ে ফেলতে চান, পণ্য বানিয়ে ফেলতে চান, কনজুমার বানিয়ে ফেলতে চান সে কখনো শাস্তিতে থাকতে পারবে না। এখনকার প্রজন্মের কিছু জনপ্রিয় সিনেমার নাম কী? ‘অ্যাভাটার’, ‘মেট্রিক্স’, কিংবা আরো কিছুদিন আগেকার মুভি ছিলো ‘সিঙ্ক মিলিয়ন ডলার ম্যান’, ‘ইনক্রেডিবল হাল্ক’ বা ‘রোবোকপ’। এ সিনেমাগুলোতে কী করা হয়েছে?

এ সিনেমাগুলোতে মানুষ, মৃতপ্রায় মানুষ বা মরে গেছে এমন মানুষের স্নায়ুতে কিছু ইলেক্ট্রিক ডিভাইস দিয়ে তার ব্রেনের মধ্যে নতুন প্রোগ্রাম দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সে আর নতুন কিছু করতে পারছে না। অর্থাৎ একটা সেনসিবল মানুষ, স্পর্শকাতর মানুষ, অনুভূতিপরায়ণ মানুষ হয়ে গেল ইনসেনসিবল একটা ক্রিয়েচার, একটা প্রাণী। নির্দিষ্ট কাজের বাইরে যার কোনো সেন্স নেই, তার মায়া নেই, মমতা নেই, কিছু নেই। আমরা কিন্তু প্রকারান্তরে এখন তা-ই হচ্ছি।

যেমন আমাদের দেশে আগেকার দিনে অধিকাংশ মানুষ বাড়িতে বাগান করতো। বাগানে ফল হচ্ছে—আম হচ্ছে, পেয়ারা হচ্ছে। কিছু নিজে খাচ্ছে, কিছু পাড়া প্রতিবেশীকে দিচ্ছে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠাচ্ছে, পাশের গরিবকে দিচ্ছে। এখন আম গাছের আম কোনো আত্মীয়ের বাসায় যায় না, পাড়া প্রতিবেশীর কাছে যায় না, গরিবের কাছে যায় না। আমগাছ থেকে আম আমরা নিজেরাও খাই না। এখন আম গাছসহ বিক্রি হয়ে যায়, পাইকারের কাছে নয়তো বহুজাতিক ড্রিংকস কোম্পানির কাছে। আপনি খেতে চাইলে আপনাকে পাইকারের কাছ থেকে কিনে খেতে হবে।

অর্থাৎ সবকিছুই এখন পণ্য হয়ে গেছে। পণ্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সবকিছুকেই যদি পণ্য বানিয়ে ফেলি, অর্থাৎ যদি ব্যালেন্স করতে না পারি, যদি জীবনে পরিমিতি না থাকে, তাহলে সীমালঙ্ঘনের শাস্তি তো হবেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘খাও, পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত করো না’। আমরা খাই, পান করি এবং অতিরিক্ত করি। আজকে ইউরোপ আমেরিকার এক তৃতীয়াংশ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত। প্রতি তিনজনে একজনের ক্যান্সার। মানুষকে যদি আপনি পণ্যে রূপান্তরিত করেন, মানুষ যদি কনজুমার হয়ে যায়, শুধু ভোজ্য হয়ে যায়, মানুষ যদি ইনসেনসিবল, অনুভূতিহীন, মায়ামমতাহীন প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে এ পরিণতিই হবে।

অনেক আগে এইচ জি ওয়েলসের উপন্যাস ‘টাইম মেশিন’ অবলম্বনে তৈরি মুভি দেখছিলাম। কাহিনীতে নায়ক টাইম মেশিন বানিয়ে অতীতে এমন একটি জায়গায় চলে যায় যেখানে পরমাণুযুদ্ধ করে একটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। দেশজয়ী পক্ষ খাবারের খোঁজে শেষমেশ বিজিত পক্ষের মানুষদেরই খেতে শুরু করলো। তারা দেখলো—সব যদি একসাথে খেয়ে ফেলে তাহলে এরপরে খাবে কী। অতএব তারা মানুষের ফার্ম করলো।

সেখানে যারা থাকে তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো সেন্স নাই। ওখানে একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে—তারা একটা ঝর্নার ধারে—খরস্রোতা ঝর্নার ধারে রয়েছে। একটি মেয়ে পড়ে গেছে, ভেসে চলে যাচ্ছে। চিৎকার করছে কিন্তু কেউ বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে আসছে না। যেমন একটা মুরগিকে ধরে নিয়ে গেলে আরেকটা মুরগি দ্রুতক্ষপ করে না, অনেকটা সেরকম। তখন নায়ক লাফ দিয়ে পড়ে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলো এবং অন্য পুরুষদের ধিক্কার দিতে লাগলো। তারপরও কেউ কোনো কথাই বলছে না।

এর মধ্যে সাইরেন বাজলো। মানুষগুলো তখন কাজটাজ ফেলে লাইনে গিয়ে দাঁড়ালো। এক এক করে ঢোকানো হচ্ছে একটা ঘের দেয়া জায়গার ভেতর। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ ঢোকার পর গেট বন্ধ করে দেয়া হবে এবং এরাই হবে আগামী কিছুদিনের জন্যে ওদের খাবার। বাকিরা ঐ যাত্রায় বেঁচে গেল। তারা ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করবে। যারা গেল তাদের নিয়ে একবারও ভাববে না।

আমরা যদি আমাদের এখনকার লাইফস্টাইলের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো আমরাও কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের মানবীয় গুণাবলিকে ত্যাগ করে পণ্যদাসে পরিণত হচ্ছি, কনজুমারে পরিণত হচ্ছি। যেমন, অতীতে আমরা যখন বাসায় যেতাম, আমরা বাসার লোকদের সাথে কথা বলতাম। বাসার লোকদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ছিলো।

আমরা এখন বাসায় যাই, কিন্তু বাসার লোকজনের সাথে কি আমরা কথা বলি? অধিকাংশ সময়ই আমরা কী করি? হয় টিভি, মোবাইল নয়তো কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকি। এমনও হয়, একই বাসায় আছি, অথচ দিনের পর দিন দেখা নেই বা কথা নেই। কারণ আমাদেরকে সেইরকম প্রোথাম দেয়া হয়েছে। আমার জীবন আমার। তোমার জীবন তোমার।

স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেলে ‘হাম দো, হামারা দো’—এর বাইরে কোনো জীবন নেই। এই স্বামী-স্ত্রীর যখন সন্তান হয়, সে-ও তখন বড় হয়ে বলে, ‘হাম দো, হামারা দো’। আগের যারা আছে সব বাদ হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি যখন

কমাতে থাকবেন, ‘হাম দো’ আর থাকবেন না। ‘হাম-হাম’ ‘তুম-তুম’ হয়ে যাবেন। অর্থাৎ আমরা না, ‘আমি আমি’, ‘তুমি তুমি’ হয়ে যাবেন।

আজকে ইউরোপ-আমেরিকাতে কী হচ্ছে? এখন সিঙ্গেল প্যারেন্ট সিস্টেম শুরু হয়েছে। এখন মা হলে বাবা নেই, বাবা হলে মা নেই। এর কারণ হয় বিয়ে বিচ্ছেদ, নয়তো বিয়েহীন বাবা-মায়ের সম্ভাবন হওয়া।

এই যে মানবীয় অবস্থান থেকে আমাদের বিচ্যুতি, অনুভূতিহীন প্রাণীতে পরিণত হওয়া-এটা তো আমাদের অন্তর্গত সম্ভার বিপরীত। যে সম্ভা ভালবাসতে চায়, অনুভব করতে চায়, মমতা পেতে চায় বা দিতে চায়। কিন্তু আমরা কী করছি? বাইরের ব্যস্ততা দিয়ে, বাইরের মুখোশ দিয়ে আমরা সেই মানবীয় গুণাবলিটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছি এবং এটা করছি আমাদের চারপাশের প্রভাবের কারণে।

আমাদের মিডিয়াগুলো এখন নিয়ন্ত্রণ করছে কারা? টিভি বলেন, সংবাদপত্র বলেন-সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা। তারা বিজ্ঞাপন দিলে টিভি চলবে, তারা যে ধরনের প্রোগ্রাম চায় সে ধরনের প্রোগ্রামেই আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। সিলেটে বন্যা হচ্ছে-এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু জার্মানিতে খেলায় কে জিতেছে-এটা নিয়ে রাতে ঘুম নেই।

এই যে খেলা নিয়ে এত ক্রেজ কেন? ইউরোপে এত ক্রেজ কেন? কারণ ইউরোপে খেলাটা হচ্ছে জুয়া, ওখানে এগুলোকে বলে বুকার। ইংল্যান্ডে মহল্লায় মহল্লায়, প্রত্যেক অলিতে গলিতে বুকারস ক্লাব, যেখানে কে জিতবে এর ওপর আপনি বাজি ধরবেন। যদি আপনার দল জিতে যায় তো আপনি কিছু পাবেন। আর হেরে গেলে আপনাকে দিতে হবে। কিন্তু আসলে লাভবান হবে এসব বাজির উদ্যোক্তারা। যেমন, লটারিতে সবচেয়ে লাভবান কারা হয়? উদ্যোক্তারা। আর এসব বাজি তত জমবে যত খেলা নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করা যাবে। আর তার মাধ্যম হলো মিডিয়া। এখন তো আমাদের উপমহাদেশেও এসব শুরু হয়ে গেছে। এই যে আইপিএল নিয়ে এত শোরগোল, এর পেছনেও রয়েছে এই জুয়াবাজির খেলা।

কিন্তু একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে আপনি কী করছেন? মিডিয়ার উন্মাদনায় মেতে উঠে নিজের অজান্তেই স্বার্থান্বেষী চক্রের ফাঁদে পা দিচ্ছেন, অশান্তিকে নিজেই ডেকে আনছেন।

এটা শুধু আমাদের দেশে না, সারা পৃথিবীতেই সাধারণ মানুষ পরিণত হয়েছে মাল্টিন্যাশনাল চক্রের ক্রীড়নকে। বড় বড় মাল্টিন্যাশনালগুলো সব

মার্জ করছে। অর্থাৎ এদের সংখ্যা কমছে। কিন্তু আয়তন বাড়ছে। কারণ তারা দেখছে যে, তারা যদি সম্ভবদ্বাৰা থাকে তাহলে পৃথিবীজুড়ে তারা একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবে। কাজেই প্রতিযোগিতা করে অন্যকে লাভ দেয়ার দরকারটা কী? ভাগ-যোগ করে বরং নিজেরাই খাওয়া যাবে।

ফলে অত্যন্ত সুপারিকল্পিতভাবে তারা সৃষ্টি করেছে তাদের পণ্য কেনার প্রতিযোগিতা, যাদেরকে তারা আইডল হিসেবে উপস্থাপন করেছে, তাদের অনুসরণ করার প্রতিযোগিতা। আর নিজের মানবীয় সত্তাকে বিকশিত না করে কেনা বা অনুকরণের যে প্রতিযোগিতা, এ প্রতিযোগিতাই হচ্ছে সমস্ত অশান্তির মূল কারণ। আমরা সত্যিকার অর্থে এই অশান্তি থেকে তখনই মুক্তি পাবো, যখন আমরা নিজের ভেতরে তাকাবো, যখন আমরা আমাদের ভেতরে যে মানবীয় সত্তা, যে সৃজনশীল সত্তা রয়েছে—এই সত্তাকে বিকশিত করবো।

কারণ, এই যে পাংকু বলেন, হিন্সি বলেন, ডিজুস বলেন—এই জেনারেশন কি মানুষকে কিছু দিতে পারছে? তাদের গান কি মানুষকে প্রশান্তি দেয়? গান তো হবে এরকম, সেটা যে উদ্দেশ্যে রচিত সেটা দেবে। হয় গান প্রশান্তি দেবে, না হয় গান উদ্ভুদ্ধ করবে। যেমন, মুক্তিযুদ্ধের সময় গান আমাদেরকে উদ্ভুদ্ধ করেছিলো। কিন্তু এখন? গানও গাইলাম, কতক্ষণ লাফালামও, কিন্তু শান্তি পেলাম না, উদ্ভুদ্ধও হলো না, আরো অশান্ত হয়ে গেলো। তাহলে লাভ কী হলো? মজার ব্যাপার হলো, যাদেরকে আমরা আইডল মনে করছি, তারা কি শান্তি পেয়েছে যে, আপনাকে শান্তি দেবে? তারা যেহেতু শান্তি পায় নি, তাদের যদি আইডল মনে করেন—আপনিও কখনো শান্তি পাবেন না।

যেমন—এই যে মাল্টিমিডিয়া কোম্পানিতে যারা চাকরি করছে, বড় বড় চাকরি করছে, তারা কি শান্তিতে আছে? আমাদের দেশের কথা বাদ দিন। সাইকোলজি টুডে পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, আমেরিকান মাল্টিমিডিয়া কোম্পানিগুলোর ৮০% সিইও ডিপ্রেসনে ভোগেন। তার মানেটা কী? তিনি যে কাজ করছেন সেই কাজ তার অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করতে পারছে না।

শান্তির জন্যে তাই অন্তরের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আসলে যার প্রতি আপনি মনোযোগ দেবেন, তা-ই আপনার দিকে আকৃষ্ট হবে। আপনি ফুটবলের প্রতি মনোযোগ দিন, আপনি স্পোর্টসের মধ্যেও ফুটবল দেখবেন। আপনি ক্রিকেটে মনোযোগ দিন, স্পোর্টসে ক্রিকেট দেখবেন। আপনি অন্তরের দিকে মনোযোগ দিন, স্পোর্টসে আপনি অন্তরই দেখবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার অন্তরের দিকে না তাকাচ্ছেন, দৃষ্টিটা অন্তরের দিকে না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্রশান্তি পাবেন না।

প্রশ্ন : আমি যে পরিমন্ডলে থাকি সেখানে ব্র্যান্ড পোশাক, ব্র্যান্ড খাবার বা ব্র্যান্ড টেকনোলজি ব্যবহার করাকেই মনে করা হয় স্ট্যাটাস সিম্বল বা আধুনিকতার প্রতীক। পাশ্চাত্যের স্টাইলে খোলামেলা নারী-পুরুষ সম্পর্ক কিংবা হাল ফ্যাশনের নামে উদ্ভট সাজপোশাকে চলতে না পারলে তাকে মনে করা হয় ‘খ্যাত’। কিন্তু এসব আমার ভালো লাগে না। আমি জানি এই মানুষগুলোর কেউ শান্তিতে নেই। বুকভরা অশান্তি আর অস্থিরতা নিয়ে সারাক্ষণ শুধু সুখী মানুষের ভান করে বেড়ায়।

উত্তর : আপনার পর্যবেক্ষণ সঠিক। আসলে অশান্তির একটা মৌলিক কারণ হচ্ছে সঠিক চাওয়া কী হবে তা যখন আমরা বুঝতে না পারি। আমরা আপাত চাকচিক্যময় জীবনের মোহে আসক্ত হই এবং বাঁদরের মতো অনুকরণ করতে চাই। একদিকে আমরা তো অশান্তিতে ভুগিই, সেইসাথে নিজের অজান্তেই এ অনুকরণপ্রবণতার সুযোগ নিতে দেই স্বার্থান্বেষীদের।

এ নিয়ে মজার এক গল্প আছে। এক লোক নারকেল গাছে চড়তে পারতো না। নারকেল পেড়েও খেতে পারতো না। একবার এক বাঁদরকে নারকেল গাছে চড়তে দেখে সে বুদ্ধি ঠিক করে ফেললো। নিচ থেকে একের পর এক টিল ছুঁড়তে লাগলো। কারণ সে জানতো—বাঁদর হচ্ছে অনুকরণপ্রবণ প্রাণী। তাকে টিল ছুঁড়তে দেখলে বাঁদরও টিল ছুঁড়বে। আর ওপর থেকে ছুঁড়বার জন্যে বাঁদরের একটা জিনিসই আছে। তা হলো নারকেল। আর লোকটি তো তা-ই চায়। কারণ তাতে গাছে চড়ে নারকেল পাড়ার কষ্টসাধ্য কাজটা আর তাকে করতে হচ্ছে না।

সত্যি সত্যি তা-ই হলো। লোকটির মাটির ঢেলার একেকটি টিলের জবাবে বাঁদর প্রাণপণে নারকেল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছুঁড়তে লাগলো। বাঁদর বুঝলোও না যে, তার অনুকরণপ্রবণতাকে আরেকজন কত সুকৌশলে তার স্বার্থ আদায়ে ব্যবহার করলো।

আপনি যাদের কথা বলছেন তারা এই বাঁদরেরই মতো। এখন যারা ডিজুস জেনারেশন তারা তো এ কাজটিই করছে। এর মধ্যে একটা ম্যাগাজিনে তাদের নিয়ে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনও বেরিয়েছে। তাদের পোশাক, ভাষা, আচরণ ইত্যাদি নিয়ে। এদের আবার গাড়ি চালানোর স্টাইল দেখেও না কি বোঝা যায়। গাড়ির বডি চেঞ্জ করে এটাকে তারা স্পোর্টস্ কারের মতো বানিয়ে ফেলে। গাড়ি বেশি জোরে স্পিড দিলে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পার্টস খুলে পড়ে যায়—আলগা লাগানো কি না!

এরা কারা? এদের অধিকাংশই অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ওঠা শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি। এটাও অবশ্য নতুন কোনো প্রবণতা নয়। নব্বইয়ের দশকে এদের বলা হতো পাংকু জেনারেশন, তার আগে ছিলো হিপ্পি জেনারেশন। '৭০-এ জিপসি জেনারেশন। এই জিপসি, হিপ্পি, পাংকু বা ডিজুস এরা তো বাঁদরের কাজটিই করছে। এদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে, এদের কোনো শান্তি নেই। বাঁদর হয়েও এদের শান্তি নেই। আর তাদের দেখাদেখি যারা ডিজুস হতে পারছে না বাবার অত অর্থের জোর নেই বলে, তাদেরও শান্তি নেই, কারণ তারা বাঁদর হতে পারছে না।

প্রশ্ন : কোর্স করার সময় শুনেছি হতাশ ও না-শোকর মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হয়। কিন্তু যার বাবা স্বয়ং এমন একজন, তার ক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : শুধু আমরা না, সব চিন্তাশীল মানুষই একথা বলছেন। জাতীয় কবি নজরুল-এর একটি চমৎকার কবিতার লাইন হচ্ছে 'বিশ্বাস আর আশা নাই যার যেওনা তাহার কাছে/ নড়াচড়া করে তবুও সে মরা? জ্যাস্ত সে মরিয়াছে। শয়তান তারে শেষ করিয়াছে, ঈমান লয়েছে কেড়ে/ পরান গিয়াছে মৃত্যুপুরীতে ভয়ে তার দেহ ছেড়ে'।

অতএব আপনার করণীয় হলো আপনার শুকরিয়া আরো বাড়িয়ে দেয়া। কারণ বাবা নিজে না-শোকর হলেও শোকরগোজার সন্তানকে তিনি পছন্দ করবেন। বাবার সামনে সবসময় শোকরভাব প্রকাশ করতে হবে। যা তিনি দেবেন, তাতেই শোকর আলহামদুলিল্লাহ বা থ্যাংকস বাবা বলতে হবে। এক পর্যায়ে বাবা হয়তো জিজ্ঞেসও করবে, তোমার আর কিছু চাওয়ার নেই? তখন বলবেন, তোমার কাছে কী চাইবো? না চাইতেই তো তুমি সব দাও। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! দেখবেন বাবা আরো বেশি বেশি দিচ্ছেন।

আর আপনার বাবার ওপর কখনো রাগ করবেন না। ক্ষুদ্র হবেন না।

অর্থাৎ আপনার আচরণ যাতে এমন হয় যে, বাবা নিজেই লজ্জিত হয়ে ভাবেন, আরে! আমার ছেলে অল্লেই এত শুকরিয়া আদায় করছে! তিনি তার অন্যান্য সন্তানের সঙ্গে আপনার পার্থক্যকে খেয়াল করবেন। এক পর্যায়ে বিস্মিত হয়ে তিনি অনুসন্ধান করতে চাইবেন যে, আমার ছেলে এত ভালো হলো কীভাবে। এবং সম্ভাবনা প্রবল যে, তিনিও ফাউন্ডেশনে আসবেন।

কারণ আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, আমাদের কোর্সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েরা আগে আসে। পরে তাদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের

মা-বাবারা আসেন। এই মা-বাবারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। কারণ ছেলে-মেয়েরা বদসঙ্গে জড়ালো কি না, ড্রাগ এডিষ্টেড হয়ে পড়লো কি না, প্রেমের নামে প্রতারণা বা সময় নষ্টের ফাঁদে পড়লো কি না এসব টেনশনে যখন সাধারণ মা-বাবারা সারাক্ষণ অস্থির থাকেন তখন আমাদের মা-বাবারা সন্তান ভালো কিছু করুক এটা নিয়ে ভাববেন দূরে থাক, সন্তানই তাকে ভালোর পথে, আলোর পথে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে থ্যাংক ইউ-এর জবাবে থ্যাংকস গড বা থ্যাংকস আল্লাহ বলা হয়। কেন?

উত্তর : সাধারণভাবে ধন্যবাদ বা ‘থ্যাংক ইউ’ এর জবাবে ‘ওয়েলকাম’ বলা হয়। কোয়ান্টামে আমরা বলি-‘থ্যাংক গড’ বা আল্লাহর শোকর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অর্থাৎ সব ধন্যবাদের প্রাপক হচ্ছেন স্রষ্টা। যখনই আপনি ‘থ্যাংক ইউ’ এর জবাবে থ্যাংক গড বলছেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, তখনই আপনি স্রষ্টাকে স্মরণ করছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

কাজেই যখনই কারো জন্যে কিছু করতে পারবেন, বিনয় প্রকাশ করবেন। আপনি যে করতে পেরেছেন এর জন্যে স্রষ্টার শুকরিয়া আদায় করবেন। আসলে যত শুকরিয়া আদায় করবেন, তত দেখবেন যে, প্রভুর করুণা আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। অসুবিধাগুলো কমে যাবে। বালা-মুসিবত কমে যাবে। রোগ-শোক কমে যাবে। দুঃখ-বিষাদ কমে যাবে।

রাগ-ক্ষোভ-অভিমান

প্রশ্ন : আমার এক নিকটাত্মীয়ের কারণে আমার বাবা একটি দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই আত্মীয় এখনো আমাদের ওপর বিরূপ ভাব পোষণ করেন। আমি কি এর প্রতিশোধ নেবো, না তার সঙ্গে সন্তাব বজায় রাখবো? আমি তার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করি। মন্তব্য করবেন কী? খুব উপকৃত হবো।

উত্তর : প্রথমত, যদি দুর্ঘটনায় মারা গিয়ে থাকেন, তবে তো কোনো আত্মীয়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না। দুর্ঘটনা তো সবসময় দুর্ঘটনাই। অতএব আপনি যদি মনে করেন আপনার বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তবে

এজন্যে আত্মীয় দায়ী নন, দায়ী দুর্ঘটনা। আর যদি মনে করেন যে, এটা কোনো চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের ফল-সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কারো কারণেই কেউ দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে না। দুর্ঘটনা এমনই ঘটে থাকে।

আর সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়ার কী আছে? তবে আপনি যদি মনে করেন তিনি এখনো আপনার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন-আপনি তার প্রতি সুন্দরভাব পোষণ করুন। তার বিরূপ ভাব কেটেও যেতে পারে।

আর দ্বিতীয়ত, কারো প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করে আপনার নিজের কোনো লাভ নেই। তাতে নিজের ক্ষতিই হয়। সেজন্যে ঘৃণা ও ক্ষোভ বাদ দিন। তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাটা যদি আপনি বিপজ্জনক মনে করেন, সম্পর্ক রাখবেন না। কিন্তু তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না। আর যদি মনে করেন যে, তিনি আপনার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী তবে সে প্রতিশোধের ভার প্রকৃতির ওপর ছেড়ে দিন, কারণ প্রকৃতি সবচেয়ে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

প্রশ্ন : সবসময় কি রাগ দমন করা যায়? কেউ যখন খারাপ ব্যবহার করে বা অন্যায় সুযোগ নিতে চায়, তখন কি শান্ত থাকা সম্ভব?

উত্তর : অবশ্যই সম্ভব। কারণ খারাপ ব্যবহার বা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের প্রতিবাদে আপনিও যদি খারাপ ব্যবহার করেন বা রাগারাগি করেন তাহলে আপনি নিজেকে তার স্তরেই নামিয়ে নিলেন। আর ক্রোধ দিয়ে বা উন্মত্ততা দিয়ে কখনো অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না।

কারণ ক্রোধ বা উত্তেজনা একজন মানুষের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। সে তখন ভুল সিদ্ধান্ত নেয় বা ভুল কাজ করে এবং হয়তো শত্রুর পাতা ফাঁদেই পা দেয়। কারণ রাগ এমন এক বিধ্বংসী আবেগ যা সুনামির মতো সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই কেউ খারাপ ব্যবহার করলে বা অন্যায় সুযোগ নিতে চাইলে প্রথমত শান্ত থাকতে হবে এবং ঠান্ডা মাথায় কৌশল ভাবতে হবে। আর এ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে তা এড়ানো যায়।

এমনকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলেও যে শান্ত থাকা যায় সে উদাহরণ ধর্মীয় মহামানবরা দিয়ে গেছেন। মহামতি বুদ্ধ, যীশুখ্রিষ্ট বা নবীজী (স) কখনো বিরুদ্ধবাদীদের অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হন নি। নবীজী (স) যখন তায়েফে ধর্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন, তখন তায়েফবাসীরা পাথরের

পর পাথর মেরে তাঁকে রক্তাক্ত করেছিলো। কিন্তু তারপরও তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, তাদের কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করেছেন। অন্যের উপাস্যকে গালি দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। কারণ তখন আমার উপাস্যকে পাণ্টা গালির জন্যে দায়ী হবো আমিই। কাজেই ধর্মীয় দৃষ্টিতেও রাগ নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়। তাই রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

সবসময় মনে রাখতে হবে যে, ‘রেগে গেলাম তো হেরে গেলাম’। কারণ যুগে যুগে দেশে দেশে যে ব্যক্তি বা জাতি রেগে গেছে তারাই পরাজিত হয়েছে। যারা ঠান্ডা মাথায় কাজ করেছে তারাই জয়ী হয়েছে।

প্রশ্ন : ‘রেগে গেলাম তো হেরে গেলাম’ জেনেও রাগ দমন করতে পারি না। রাগের কারণ যখন ঘটে, তখন সবকিছু ভুলে যাই। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে এমন কথা বলি বা আচরণ করি যা পরে অনুশোচনার কারণ হয়। কী করা যায়?

উত্তর : এটি একটি বাস্তব সমস্যা। কারণ হঠাৎ করে এই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিজের এবং প্রিয়জনদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। যেমন, হয়তো মা-বাবা সন্তানকে অভিশাপ দিয়ে দেন। ভাঙচুর করেন। রাগের মাথায় এমন কথা বলে ফেলেন যে, ২০ বছরের সম্পর্ক একটা কথায় নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি রাগের কারণে প্রেশার হাই হয়ে গুরুতর অসুস্থ বা মৃত্যু হতে পারে।

অতএব মুহূর্তের এই রাগকে দমন করতে হবে। এজন্যে যখনই রেগে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, এক মুহূর্ত থেমে লম্বা একটা দম নিয়ে কোয়ান্টা ভঙ্গি করবেন। মনকে জিজ্ঞেস করবেন যে, মন, এই মুহূর্তে আমার জন্যে সর্বোত্তম করণীয় কী? কারণ যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন, কোয়ান্টা ভঙ্গির সাথে আলফা লেভেল বা প্রশান্ত অবস্থা অনুভব করাটা তাদের কন্ডিশনিং হয়ে যায়। ফলে দেখবেন চমৎকারভাবে আপনি ঐ পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারছেন।

আর যে আপনাকে রাগাতে চেয়েছিলো সে বিস্মিত হয়ে যাবে যে, এটা কী হলো! আমি তো চাচ্ছিলাম তার সাথে ঝগড়া করতে, এখন দেখি উল্টো তার কথাই আমাকে শুনতে হচ্ছে। কারণ যখন আপনি রেগে কথা বলেন, তখন সে কথার কোনো প্রভাব শ্রোতার ওপরে পড়ে না। তার ওপরে তখনই প্রভাব পড়বে যখন আপনি ঠান্ডাভাবে বলবেন, মমতার সাথে বলবেন, তার সেন্টিমেন্টকে আঘাত না করে বলবেন।

আসলে রেগে যাওয়াটা পৌরুষ না, শক্তিমত্তা না। এটা হলো আহাম্মকি। যে কারণে জার্মান দার্শনিক নীটশে বলেছিলেন, সত্যিকারের যোদ্ধা সে-ই যে জানে কখন অস্ত্র সংবরণ করতে হয়। অর্থাৎ অস্ত্র থাকলেই অস্ত্র ব্যবহার করা যায়। কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার করাটা সত্যিকারের যোদ্ধার পরিচয় নয়। অস্ত্র কখন সামলে রাখতে হবে সেটা যে জানে, সে-ই হচ্ছে সত্যিকারের যোদ্ধা। অতএব আপনার শক্তি রয়েছে। সেই শক্তিকে সংহত করা, নিয়ন্ত্রণ করতে পারাটাই হচ্ছে আপনার মহত্ব।

আসলে রাগলে যে মানুষ সবসময় হেরে যায় তার অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে এবং আমাদের চারপাশে আছে। এমনকি এখনকার বিশ্ব পরিস্থিতিও সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দুঃখজনক ঘটনার পর বিশ্বে যে উত্তেজনা এবং সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে তার মূলেও এই রাগ-ক্রোধ এবং এর পাল্টাপাল্টি আক্রমণ।

ক্রোধের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে একটি সহজ টেকনিক অবলম্বন করতে পারেন। তা হলো-যখনই রেগে যাবেন, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার প্রকাশ ঘটাতে যাবেন, এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে ঐ রাগের দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করা যায়। আজকাল মোবাইলে ক্যামেরা বা ভিডিও করার ব্যবস্থা থাকায় এটা সহজ একটা সুযোগ। পরে যখন শান্ত হবেন, তখন ঐ ছবি বা দৃশ্যগুলো দেখুন। দেখবেন আপনার ধীর-স্থির শান্ত চেহারার চেয়ে ঐ চেহারা কত আলাদা। ক্রোধে উন্মত্ত একটা দানবের মতো এমন হিংস্র এবং কুৎসিত চেহারা দেখে আপনি নিজেই ভীষণ লজ্জা পাবেন। তখন নিজেই দেখবেন যে, প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন, ভবিষ্যতে আর কখনো রেগে গিয়ে ঐ চেহারার পুনরাবৃত্তি করবো না। প্রয়োজনে বার বার ঐ রাগান্বিত কুৎসিত চেহারা দেখুন। রাগ-ক্রোধমুক্ত হওয়ার এটা একটা কার্যকর পদ্ধতি।

প্রশ্ন : আমার একটি বদভ্যাস হচ্ছে আমি রাগের মাথায় অনেক কিছুই বলে ফেলি। পরে অনুতপ্ত হই। কিন্তু যাদেরকে বলেছিলাম পরবর্তীতে তাদের ক্ষোভ বিদ্বেষ বা প্রতিশোধপরায়ণতার শিকার হই।

উত্তর : এটাই স্বাভাবিক। কারণ আপনি আবেগের মাথায় বলেছেন, অন্যদের ক্ষোভ-বিদ্বেষকে উসকে দিয়েছেন। সে-তো কটু কথাটাই মনে রাখবে, আপনি কী প্রেক্ষিতে বলেছেন সেটা নয়। আসলে এটাই প্রজ্ঞা-সবসময় মাথা ঠান্ডা

রেখে কথা, কাজ ও আচরণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া। কখনো এমন কিছু বলা বা করা উচিত নয় যার জন্যে পরে দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হতে হয়। এর জন্যে নিয়মিত মেডিটেশনে অটোসাজেশন দিতে পারেন, প্রার্থনা করতে পারেন। আর সবচেয়ে কার্যকর হলো আত্মপর্যালোচনা।

প্রতিদিন যদি দিনের কথা, কাজ ও আচরণগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করেন, নিজেই নিজেকে বলতে পারেন—কেন এটা করেছেন; এটা না করে বা এভাবে না করে আর কী কী ভাবে করতে পারতেন, দেখবেন আপনার ভুলের পরিমাণ কমে আসছে। আপনি অনেক সংযত, সহনশীল এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করতে পারছেন। নিজেকে নিয়ে তখন আপনি তৃপ্ত হতে পারবেন।

আর মুহূর্তের এ রাগ বা ক্রোধ থেকে মুক্তির জন্যে কয়েকটি টেকনিক অবলম্বন করতে পারেন। আয়নায় দেখুন যে, রাগলে আপনাকে কেমন দেখায়, আয়নার সামনে রাগের অভিনয় করুন। প্রয়োজনে ছবিও তুলে রাখুন। পরে যখন রাগ আসতে নেবে তখন ছবিটা বের করে দেখুন। কারণ রেগে গিয়ে আপনি পরিস্থিতিকে জটিল করতে পারবেন। কিন্তু পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারবেন না।

তবে যদি কখনো রাগের ভান করতে হয় সেটা আলাদা। রাগের ভান আলফা লেভেলে করতে হয়। রাগের ভান এবং রাগের মধ্যে তফাত হচ্ছে—রাগ গামা লেভেলে এবং রাগের ভান আলফা লেভেলে। তখন আপনার ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে এই ভানটাও যেন অটোমেশন না হয়ে যায়। কারণ তাহলে আপনি ভুল করবেন। অতএব রাগ করবেন না আর রাগের ভান যত না করেন, তত ভালো।

প্রশ্ন : প্রো-একটিভ থাকলে স্বামী মনে করে আমার দুর্বলতা। ছেলে-মেয়েরাও আমাকে গুরুত্বহীন ভাবে। কিন্তু মুখরা হলে সবার কাছ থেকে দাম যেমন পাই, স্বামীও ঠিকমতো সবকিছু দেয়। তাহলে আমার করণীয় কী? বিদেশে যাওয়ার ভিসা হয়ে গেছে। যেতে ৭৫ হাজার টাকা লাগবে। স্বামীকে এক মাস ধরে ধীরে-স্থিরে রাজি করাতে চাইছি। কিন্তু উনি আমার শান্ত স্থির অবস্থাকে ভয় পান। ভাবেন আবারও টাকা চাইবে। এদিকে যদি রাগারাগি করি তাহলে ছেলে টিকেট করে দেবে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : আসলে আপনার বিষয়টা একেবারেই আলাদা। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী বা ছেলে-মেয়ের মধ্যকার সম্পর্কে যে নিজস্ব একটা ধরন থাকে

এটা তারই একটা উদাহরণ। অর্থাৎ আপনার ক্ষেত্রে রাগ বা রাগের ভান করলে স্বামী বা ছেলের কাছে আপনি গুরুত্ব পান এবং তারা আপনার চাহিদা পূরণে উদ্যোগী হয়।

তবে মনে রাখবেন, রাগের ভান সবসময় আলফা লেভেলে করবেন। পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে আপনার ক্ষেত্রে যেহেতু এটা কাজ করছে সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়া যে সবার ক্ষেত্রেই কাজ করবে তা নয়। কারণ রাগ করলে কেউ হার স্বীকার করে নিতে পারে, কেউ আবার আরো রেগে যেতে পারে।

আর রাগের অভিনয় করে কোনোকিছু আদায় করার ক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকবেন। কারণ এটা হচ্ছে একধরনের ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল। আপনি যে রাগের অভিনয় করেছেন সে তা বুঝতে পারে নি। সে ভেবেছে আপনি হয়তো সত্যিই রেগে গেছেন। এবং সে হচ্ছে এমন একজন যে ইমোশনালি আপনার প্রতি দুর্বল, আপনার রাগ তাকে কষ্ট দেয়, উদ্ভিগ্ন করে। আপনি তার এই দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছেন।

সবসময়ই যদি তা করতে যান তাহলে তার এই আবেগ হয়তো নষ্টও হয়ে যেতে পারে। আর মনে রাখবেন, প্রকৃতি খুব নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আপনি সুযোগ নেবেন আজকে, অন্যদিন এই সুযোগ আপনার ওপর কেউ না কেউ নেবেই।

অতএব কখনো ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করবেন না। বিশেষত কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে। কারণ বস্তুর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক।

প্রশ্ন : অন্যরা যখন একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের প্রো-একটিভনেসের অপব্যবহার করে, তখন এর প্রতিকার কী? যেমন, কাজের বুয়া/ ড্রাইভার সময়মতো না আসায় কাজে যেতে দেরি হলো। কিন্তু কিছু বললাম না। দেখা গেল, আবারও সে তা-ই করছে। অথচ যে মালিকরা রাগারাগি চিৎকার-চ্যাচামেচি করে, তাদের কথা ঠিকই শুনছে। প্রায়ই বাচ্চার বাসায় এত বিরক্ত এবং ভাংচুর করে যে, রাগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আবার নিজে শান্ত থাকলেও অন্যদের বা স্বামীর চ্যাচামেচিতে ঘরের পরিবেশ ঠিকই ভারী হয়ে উঠছে। অনেক সময় অনেকবার কোয়ান্টা ধ্বনি করেও পরিস্থিতি ঠান্ডা করতে পারি না। এসব ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর : প্রথমত, বুয়া/ ড্রাইভারের সাথে চ্যাচামেচি করে লাভ নেই। কারণ বকাবকি শুনেই তারা অভ্যস্ত। এক্ষেত্রে আপনি অন্য কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যেমন, ড্রাইভার কথা শুনছে না। রাগারাগি না করে শান্তভাবে তাকে বলুন, দেখ, এরপরে যদি এই কাজটা ভুল কর তাহলে তোমার বেতন থেকে এই টাকাটা কাটা যাবে। বা সে দেরি করে আসছে। একদিন দেরি করলে তার দিনের বেতন থেকে এক-চতুর্থাংশ কাটুন। আরেকদিন দেরি করলে আবারও এক চতুর্থাংশ। এরপরও যদি দেরি করে, তাহলে ছুটি দিয়ে দিন যে, সেদিন আর তার কাজ করার দরকার নেই। দেখবেন দেরি করে আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

অফিসে অধীনস্থদের ব্যাপারেও যেটা করতে পারেন, কেউ ভুল করলে, অন্যায় করলে তাকে শো-কজ করুন। কারণ একজন পিয়নের সাথে চিৎকার করলে একদিকে আপনার প্রশান্তি নষ্ট হবে। অন্যদিকে সেটা খুব কার্যকরী না-ও হতে পারে। দেখা যাবে, সে আবারও হয়তো একই ভুল করছে। এখানে আপনাকে সেই পদক্ষেপ নিতে হবে যা তাকে শোধরাতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, বাচ্চাকে নিয়ে যে সমস্যার কথা বললেন, এর মূলে রয়েছে আমাদের এখনকার এক বা দুই সন্তানকেন্দ্রিক পরিবারব্যবস্থার প্রভাব। মা-বাবার প্রশ্রয় এবং আল্লাদের পুরোটাই খুব সহজে পেয়ে যাওয়ার ফলে এদের অনেকেই হয়ে ওঠে ভীষণ জেদি, একগুঁয়ে আর অবাধ্য। কারণ আর কোনো ভাই-বোন না থাকায় সে যে মা-বাবার সন্তান বাৎসল্যের একমাত্র সম্বল— এটা সে বোঝে এবং এর সুযোগও সে নেয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

অতএব সন্তানকে শুধু আদর নয়, শাসনেও রাখবেন এবং ভুল/ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতে দেবেন। এক্ষেত্রে চিৎকার-চ্যাচামেচি বা বকাবকি না করে ঠান্ডা মাথায় তাকে ধরিয়ে দেবেন যে, তার ঐ অন্যায়ের জন্যে এ শাস্তি পেতে হচ্ছে তাকে। আবার সুযোগমতো আদরও করবেন, প্রশংসা করে উৎসাহ দেবেন। অর্থাৎ শুধু আল্লাদ নয় বা শুধু শাসন নয়। আদর আর শাসনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স। সেই সাথে সন্তানকে এটা বুঝাতে দেবেন যে, সে-ই আপনার আশা-ভরসা-আবেগ-নির্ভরতার একমাত্র উৎস—এটা আপনি মনে করেন না। আর সত্যও তা-ই। কারণ মা-বাবা হিসেবে সন্তানকে একজন সৎ মানুষ, অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আপনার দায়িত্ব। এর বাইরে আপনাদের জীবন ও কর্ম আলাদা আলাদা। সেখানে কেউ কারো জন্যে দায়ী নয়। পৃথিবীতে আপনি যেমন একা এসেছেন, একা চলে যাবেন, সে-ও তেমনি একা এসেছে এবং একা চলে যাবে।

আর আপনার প্রশ্নের শেষ অংশ-অর্থাৎ কোয়ান্টা ধ্বনি করেও পরিস্থিতি শান্ত করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, কোয়ান্টা ধ্বনি মূলত নিজেকে শান্ত রাখার জন্যে। অর্থাৎ উত্তেজনার পরিস্থিতি যেন আপনার উত্তেজনার কারণে আরো জটিল না হয় সেটাকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে। কারণ আপনি যদি শান্ত না থাকেন, প্রো-একটিভ না থাকেন-আপনি কখনো পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এমনকি স্বামীর চ্যাচামেচির মুখেও আপনার প্রশান্তচিত্ততা কাজে দেবে। আর তাকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে হবে মমতা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে।

প্রশ্ন : আমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের ওপরে আমার অনেক রাগ। তাদের সাথে কী রকম ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের প্রতি এই রাগ-ক্ষোভ বা প্রতিশোধস্পৃহা তাদের যতটা না ক্ষতি করছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে আপনার। মানসিক শুধু নয়, শারীরিকও। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের রাগ-ক্ষোভ বেশি তাদের হার্ট এটাক হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে বেশি। আরেকটি গবেষণায় অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ বা প্রতিশোধপরায়ণ মনোভাব যারা পোষণ করেন তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি সিগারেট, মাদক, কোলেস্টেরল বা অতিরিক্ত ওজনের মতোই ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া রাগ স্ট্রমাক এবং পরিপাকতন্ত্রের জন্যেও ক্ষতিকর এবং ক্রমান্বয়ে তা আলসারের রূপ নিতে পারে। এমনকি বদমেজাজী এবং রাগ-ক্ষোভপ্রবণ মানুষদের ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার যোগসূত্রও খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

আর এই রাগ-ক্ষোভের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে প্রজ্ঞার ওপর অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর। অর্থাৎ আপনার রাগ-ক্ষোভ যদি বেশি থাকে, প্রতিহিংসা যদি বেশি থাকে, তাহলে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

ধরুন, একটা টিনের ঘর। তাতে একটা ছিদ্র আছে। ছিদ্র দিয়ে বাইরের আলো আসছে। ছিদ্র থেকে আপনি যত দূরে থাকবেন, বাইরের আলো তত কম পাবেন। কিন্তু আপনি যদি ঐ ছিদ্রটার সাথে চোখ লাগাতে পারেন, তাহলে বাইরের পৃথিবীটাকে অনেক বেশি দেখতে পাবেন।

রাগ এবং ক্ষোভ কী করে? ঐ যে ছিদ্র দিয়ে আলো ঢুকছে, যে ছিদ্র দিয়ে

আপনি বাইরের পৃথিবীকে দেখতে পারতেন, রাগ এবং ক্ষোভ এ ছিদ্র থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর যখন আপনি প্রশান্ত হন, আত্মনিমগ্ন হন তখন ঐ ছিদ্রের কাছে যেতে থাকেন।

প্রশ্ন : আমি মোটামুটি প্রায় সর্বাবস্থায় রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কিন্তু কেউ বিশেষ করে শুধু শুধু অপমান করলে সহ্য করতে পারি না। ভয়াবহ রেগে যাই। আমার প্রশ্ন হলো, রাগ কি সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য? অপমানিত হলেও? আত্মসম্মান কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়? এই ব্যাপারে দয়া করে একটু আলোকপাত করুন।

উত্তর : আপনাকে কারো পক্ষে অপমানিত করা সম্ভব নয় যদি আপনি নিজে অপমানিত বোধ না করেন। আর তখনই আপনি অপমানিত বোধ করবেন যখন আসলে আপনার আত্মসম্মানবোধ বলে কিছু নেই।

আপনি দেখুন-নবীজী (স)-এর পথের ওপর কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে। কাবা শরীফে যখন তিনি নামাজে দাঁড়াতেন, নাড়ি-ভুঁড়ি এনে সব তাঁর মাথার ওপরে ফেলা হতো। এমন কোনো গালি-গালাজ ছিলো না যা তাকে করা হয় নি। তায়েফে তাঁকে পাথরের পর পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে, তিনি অপমানিত বোধ করেন নি। কারণ তাঁর আত্মসম্মানবোধ প্রবল ছিলো।

যে অপমান বোধ করে, তার আসলে কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই। আরেকজন গালি দিলেই আপনি অপমানিত হলেন না। গালি দিয়েছে সে, মুখ খারাপ করেছে সে। এটা তার সমস্যা। আপনার নয়।

সবসময় মনে রাখবেন সম্মানটা আপনার নিজের, আরেকজন যা কেড়ে নিতে পারে, তা কি আপনার? সেটা আপনার নয়। অতএব কারো সম্মান কেউ কখনো কেড়ে নিতে পারে না। কাউকে কেউ অপমানিত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে অপমানিত বোধ না করে। তা সে গালিগালাজ, অশ্লীল কথা বা অপমানকর কথা-যা-ই হোক। যেমন, একটা কুকুর এসে ঘেউ ঘেউ করলে আপনি কি অপমানিত হন? তাহলে আরেকজন চিল্লাচিল্লি করলে আপনি কেন অপমানিত হবেন?

এখন থেকে মনে রাখবেন, একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কখনো অপমানিত বোধ করে না। কারণ সে সবসময় সত্য-ন্যায়ের পথে চলতে চায়। সে সবসময় অন্যের কল্যাণ করে, অন্যের উপকার করে এবং সঠিক নিয়ত নিয়ে সঠিক কাজটা করে। অতএব অপমানিত বোধ করার কিছু নেই।

প্রশ্ন : জীবনে দরকার জয়, রাগকে করতে চাই জয়, কিন্তু বার বার হয়ে যায় পরাজয়, কীভাবে পাবো জয়? বলে দিলে মনে পাবো অভয়।

উত্তর : নিয়মিত সুখী জীবনের মেডিটেশন করবেন আর আপনার চারপাশে স্টিকার লাগিয়ে রাখবেন এবং নিজের আয়নার সামনে স্টিকারটা ভালো করে লাগিয়ে রাখবেন, যখনই চেহারা দেখতে চাইবেন যেন ‘রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন’ মনে হয়।

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করি। তারপরও আমি রেগে যাই। আমার করণীয় কী?

উত্তর : ঐ যে দুঃস্থচক্র। কী করবেন? এখন থেকে যতবার রাগ করবেন প্রতিবার রাগের জন্যে ১০০ টাকা মাটির ব্যাংকে রাখবেন। ছয় মাস রাখুন। দেখুন রাগ কীরকম কমে যায়। টাকার মায়া বড় মায়া, টাকা যদি রাগ কমানোর পেছনে ব্যয় করতে হয়, রাগ এমনিতেই থাকবে না।

প্রশ্ন : রাগের কী মোটেও প্রয়োজন নেই? যদি থাকে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে?

উত্তর : রাগ আসলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। যদি বলেন, ‘অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে’? অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে রাগ নয়, অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। আর সেটাও করতে হবে ঠান্ডা মাথায়। ব্রেনটাকে কাজে লাগাবেন। প্রতিকার করার জন্যে শক্তি, যোগ্যতা অর্জন করবেন।

প্রশ্ন : আমি যেখানে অপমানিত, প্রতারণিত হই সেখানেও কি রাগ দমন করবো। ক্ষমা করে দিলে কি আমারই ক্ষতি হবে না? সে তো আবার একই কাজ করতে পারে।

উত্তর : অপমানের কী আছে! আপনি নিজে অপমানিত হতে না চাইলে কেউ অপমান করতে পারবে না।

আর প্রতারণিত-আপনি যদি মনে করেন কেউ আপনাকে প্রতারণিত করেছে আপনি তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। এটা আপনার অধিকার। ঠান্ডা মাথায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিন। কিন্তু রাগ করাটা

আপনার জন্যে ক্ষতিকর। কারণ প্রতারণিত যা হওয়ার তা হয়ে গেছেন। এখন আপনার রাগ আপনাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সেটা নিয়ে যত আফসোস করবেন আপনি তত পিছিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : আমি একজন বীমা প্রতিনিধি। আমাকে প্রতিদিন অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। যারা অনেকেই অপরিচিত। আমি যখন তাদেরকে বিভিন্ন প্ল্যান বোঝাই, তারা বিভিন্ন রকম নেতিবাচক মন্তব্য করে। ফলে কোম্পানির শর্ত বোঝাতে অথবা তাদেরকে বোঝাতে আমাকে কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে কথা বলতে হয়। এটা তখন গামা লেভেল হলো কি না জানতে চাই।

উত্তর : আসলে কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে কাউকে বোঝানো যায় না। কণ্ঠস্বর বাড়িয়ে আপনি আরেকজনকে চুপ করিয়ে দিতে পারেন, বোঝাতে পারবেন না। বোঝাতে গেলে কণ্ঠস্বরকে আরো নামাতে হবে। যত কণ্ঠস্বর নামাবেন, তত কথাটা তার ভেতরে ঢুকবে।

আর কণ্ঠস্বর বাড়ালে কথাটা তার কানে ঢুকবে, ভেতরে নয়। অতএব যেকোনো কিছু বোঝানোর সময় কণ্ঠস্বর বাড়াবেন না। একজন বীমা প্রতিনিধি হিসেবে আরেকজনকে বোঝানোর জন্যে আপনাকে আরো কুশলী, আরো মোলায়েম এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। কারণ আরেকজনের পকেট থেকে পয়সা বের করা খুব কঠিন। যাকে বোঝাতে চাচ্ছেন তার সাথে কণ্ঠস্বর যত মোলায়েম করবেন, তত তার পকেট থেকে আপনি পয়সাটা বের করতে পারবেন। কণ্ঠস্বর চড়ালে আর তাকে বোঝাতে পারবেন না। সে বোঝার ভান করবে কিন্তু আপনি যা করতে চাচ্ছেন সে কাজে সে সায়্য দেবে না। অতএব, কণ্ঠস্বর সবসময় মোলায়েম করবেন।

আর যাকে বোঝাতে চান তার কাছ থেকে শুনতে হবে বেশি। আপনি খুব কম বলবেন। মাঝে মাঝে শুধু বলতে পারেন যে হ্যাঁ আপনার কথায় যুক্তি আছে বটে। এভাবে বলতে বলতে তাকে ক্লান্ত হয়ে যেতে দিন। যখন তার আর কিছু বলার নেই তখন আপনি বলুন, আপনার কথায় যুক্তি আছে বটে; কিন্তু এই এই ব্যাপারগুলো নিয়েও ভাবতে পারেন। এসময় আপনি তার দুর্বল কোনো পয়েন্ট ধরে বলার চেষ্টা করুন। কারণ প্রত্যেকেরই একটা দুর্বল জায়গা আছে। সে পয়েন্ট ধরে যদি তাকে বলেন, তাহলে আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন। তাকে বলার সুযোগ বেশি দেবেন। তাহলে আপনি তাকে বোঝাতে পারবেন।

প্রশ্ন : সন্তান যদি ভুল করে সেক্ষেত্রে রাগ করা কি মা-বাবার জন্যে অপরাধ?

উত্তর : রাগ প্রত্যেকের জন্যেই ক্ষতিকর। সন্তান যদি ভুল করে এবং বয়স থাকে তাহলে শাসন করতে পারেন। শাসন করা আর রাগ করা এক জিনিস নয়। তাকে বোঝাতে পারেন বা শক্তভাবেও বলতে পারেন। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় মমতার সাথে। আর সন্তানের যদি শাসনের বয়স পেরিয়ে যায়, তাহলে তো মা হিসেবে আপনাকে বুঝতে হবে, সন্তানকে আপনি কীভাবে শাসন করবেন।

একবার এক মা এসে বললেন, তার ছেলে তার গায়ে হাত তুলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছেলের বয়স কত। মা বললেন, ২৮ বছর।

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনি কী করতে গিয়েছিলেন? মা বললেন, আমি তাকে মারতে গিয়েছিলাম।

তখন তাকে বললাম, এটা তো আপনি ভুল করেছেন। ২৮ বছর বয়সী ছেলেকে আপনি মেরে শাসন করতে গেছেন, ছোটবেলা থেকে তাকে আপনি বড়দের মানতে শেখান নি। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। আপনি রাগের মাথায় মারতে গেছেন, ছেলেও রাগের মাথায় আপনার হাত ধরে ধাক্কা দিয়েছে। নিঃসন্দেহে ছেলে অন্যায় করেছে, মা যা-ই করুন। কিন্তু মা হিসেবে আপনাকে তো বুঝতে হবে কতদূর আপনি যেতে পারেন।

আবার মা যদি হন অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং মওলানা শওকত আলীর মা বি আন্নি বেগমের মতো, তাহলে ভিন্ন কথা। খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার সময় বৃটিশবিরোধী বক্তব্য দেয়ার জন্যে দুভাই যখন গ্রেফতার হলেন, তখন ইংরেজ সরকার জেলখানায় তাদের কাছে প্রস্তাব পাঠালো যে, সরকারের বিরোধিতা করবে না এ মর্মে মুচলেকা দিলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। এ কথা যখন তাদের মা বি আন্নি বেগমের কানে গেল তিনি চলে গেলেন কারাগারে। ছেলেদের সাথে দেখা করে বললেন, আমি যা শুনেছি এরকম কোনো মুচলেকা দিয়ে যদি তোমরা ইংরেজদের সাথে আপস কর তাহলে আমি তোমাদের মা বি আন্নি বেগম বলছি, আমি নিজ হাতে তোমাদের গলা টিপে হত্যা করবো।

এখন আপনি আবেগবশত ২৮ বছরের ছেলেকে—যে কি না ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে গেছে—তাকে মারতে যাবেন, আর ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আপনার মার খাবে তা-তো হবে না। তাকে ছোটবেলা থেকেই শাসন করতে হতো। কিন্তু শাসন কখন করবেন, কতটা করবেন সেটাও প্রজ্ঞার সাথে ঠিক করতে হবে। সেখানে যদি ভুল করেন সন্তান আপনার কথা শুনবে না। কারণ এখনকার

সন্তানদের আমাদের জমানার সন্তানদের মতো আউটলুক নেই। অতএব আপনাকেও বুঝে শুনে চলতে হবে। সবসময় এটা মনে রাখবেন যে, আপনাকে বলতে হবে—যতটা শোনার জন্যে আপনার ছেলে প্রস্তুত আছে ততটা। আর গাছ যদি একবার শক্ত হয়ে যায়, ডাল যদি একবার শক্ত হয়ে যায় সেটাকে বাঁকানো যায় না। অতএব, সন্তানকে যা শাসন করার করবেন, সেটা ছোট থেকে। ছোটবেলায় আল্লাদ দেবেন আর বড় হওয়ার পর শাসন করবেন। সেটা হবে না। আদর এবং শাসন দুটোই করতে হবে ছোটবেলা থেকে, তাহলেই সন্তান মানুষ হবে।

প্রশ্ন : কাউকে দেখলেই না কি রাগ ধরে? এটা কী ধরনের ক্রোধ? রাগ সচেতন হতে গিয়ে পারফরমেন্স কনশাস হয়ে গেলে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : কেউ কেউ এরকম করতে পারেন। যে অমুককে দেখলেই রাগ হয়। অমুককে দেখলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এটা এক ধরনের নেগেটিভ কম্বিশনিং। তিনি হয়তো তার ব্রেনে এক ধরনের ভুল প্রোগ্রাম দিয়ে রেখেছেন। এটা তারই প্রতিফলন। আপনি সদাচরণ করুন। তাহলে এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। পারফরমেন্স কনশাস হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন : অতিরিক্ত রাগ হলে কী করবো?

উত্তর : অতিরিক্ত রাগ যদি হয়, সাথে সাথে বাথরুমে চলে যাবেন। গিয়ে হয় গোসল করে ফেলবেন, না হয় নিজের গালে আচ্ছামতো কয়েকটা চড় দেবেন। দেখবেন যে, রাগ চলে গেছে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনার ভেতরে যদি শত্রু কেউ থাকে, তা হলো রাগ। আর রাগকে কখনো আপনার ওপরে জয়ী হতে দেবেন না।

রাগকে দমন করার জন্যে যা যা করা দরকার করবেন। একবার হজরত ইবনে উমার নবীজী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে আমার কল্যাণ হবে? নবীজী (স) বললেন, রাগ দমন কর। রাগ দমন করার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। তিন বার তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং একই উত্তর দিলেন নবীজী (স)। তার মানে আপনি যদি রাগ দমন করতে না পারেন, আপনি যদি ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে না পারেন, আপনি যদি রেগে গিয়ে পশুর মতো আচরণ করেন তাহলে আপনি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করলেন।

প্রশ্ন : আমি রাগ কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারি না। ‘রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন’ অটোসাজেশন, কোয়ান্টা ভঙ্গি কিছুই কাজে দেয় না। রেগে গেলে হাত-পা কাটি। কী করবো?

উত্তর : ‘রেগে গেলে হাত-পা কাটি’-এটা হচ্ছে রোগের পর্যায়, এটা মানসিক রোগ। এর জন্যে মানসিক ডাক্তার বা কাউন্সেলিংয়ের শরণাপন্ন হতে হবে।

প্রশ্ন : আগে আমি খুব রেগে যেতাম এবং অনেক বিরক্তির কাজ করেছি কিন্তু এখন আমি কারো সাথে যদিও রাগি না, তবুও এরকম ভাব আসলে তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেই। এতে খুব উপকার পেয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি রি-একটিভ কাজ না প্রো-একটিভ?

উত্তর : আপনি প্রো-একটিভ না হলেও প্রো-একটিভ হওয়ার আগের পর্যায়ে আছেন। অর্থাৎ আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখছেন। আর এর ফলে আপনি যে উপকারও পাচ্ছেন তার কারণও পরিষ্কার। কারণ শুধু মনে মনে রেগে গেলে সমস্যা হয় না। সমস্যা হয় রাগটাকে প্রকাশ করে ফেললে। এ অবস্থাটা বজায় রাখতে পারলে আপনি দেখবেন যে, এরপর আর আপনার কথা বন্ধ করারও প্রয়োজন হচ্ছে না।

প্রশ্ন : আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কিন্তু বিরক্তি দূর করতে কী করতে পারি? আমার ব্যক্তিগত জিনিস কেউ ব্যবহার করলে ভীষণ বিরক্ত লাগে।

উত্তর : কিছু ব্যক্তিগত জিনিস থাকতে পারে যা আরেকজনের ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন, টুথব্রাশ বা টাওয়েল বা চিরুনি ইত্যাদি অন্য কেউ ব্যবহার করলে বিরক্ত লাগা স্বাভাবিক। তা যদি এমনকি স্বামী-স্ত্রী হয় তারপরও।

আবার কিছু কিছু জিনিসের ব্যাপারে আমরা বেশি সেনসেটিভ হয়ে যাই। হয়তো সেটা আরেকজন ব্যবহার করে ফেলেছে। ভুলে হতে পারে, খেয়াল করতে না পেরে হতে পারে বা হয়তো সে বুঝতেই পারে নি যে, এটাকে আপনি পছন্দ করবেন না। এসব ক্ষেত্রে তাকে সুন্দরভাবে বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

কারণ আপনি যদি না বলেন, তাহলে সে বুঝবে কীভাবে যে, আপনি এটাতে বিরক্ত হচ্ছেন। আপনার পছন্দ-অপছন্দের কথা আরেকজনকে বলতে হবে কিন্তু এমনভাবে বলবেন যাতে সে মনে কষ্ট না পায়। কারণ ব্যক্তিগত

জিনিস ব্যবহার করা মানে হচ্ছে তার সাথে আপনার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাজেই তাকে বলে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে সময়-সুযোগমতো। তাহলেই আপনি এ বিরক্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

প্রশ্ন : রাগ প্রশমিত করার জন্যে কোন মেডিটেশন নিয়মিত করে যেতে হবে—রাগের মেডিটেশন না শিখিলায়ন?

উত্তর : শিখিলায়ন নিয়মিত করবেন। রাগের মেডিটেশনও মাঝে মাঝে করবেন।

প্রশ্ন : সংসারে বিশৃঙ্খলা এড়াতে বা কোনো দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে একটু রাগের প্রয়োজন হয়। সবসময় ধৈর্য ধরা বা চুপ থাকাটাকে দুর্বলতা মনে করা হয়। সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করতে হয়, তখন কী করবো?

উত্তর : রাগ করে দোষত্রুটি ধরিয়ে দিলেই যে শোধরাবে তা না-ও হতে পারে। শোধরানোর জন্যে আপনাকে সময়-সুযোগ এবং তার মানসিকতা বুঝে তারপর বলতে হবে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো আপনি রাগ নয়, রাগের ভান করতে পারেন। আর প্রতিবাদ হচ্ছে দুর্বলের অস্ত্র। দুর্বল প্রতিবাদ করে। কিন্তু সবল করে প্রতিকার। অতএব সবদিক থেকে সবল হোন।

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা গেল কেউ কোনো বাজে কमेंট করলো বা আমাকে কষ্ট দিয়ে কথা বললো তখন তা আমার মাথার মধ্যে সারাদিন থাকে। মন খারাপ হয়, কোনো কাজ, পড়াশোনা, কিছুই করতে পারি না। প্রতিকার চাই।

উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে যদি আপনি অপরপক্ষের দৃষ্টিকোণটাকে বুঝতে পারেন তাহলে এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। একজন আপনাকে খোঁচা দিলো। কেন দিলো? অনেক সময় খোঁচাটা আবার সরাসরি না হয়ে একটু ঘুরিয়ে হয়। আপাতত নিরীহ একটা মন্তব্যই করলো, কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন আপনাকে উদ্দেশ্য করে করা।

যেমন হতে পারে সে আপনার ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত। আপনি তাহলে কী করবেন? তার প্রশংসা করুন। তার রূপের প্রশংসা করুন, গুণের প্রশংসা করুন। একটা সময় দেখবেন, আপনার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। সে আর আপনাকে বিদ্বেষের চোখে দেখছে না।

প্রশ্ন : আমার চারপাশের পরিবেশ এত বেশি নেগেটিভ যে, আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। খুব রাগ করি। মারধর করি। এবং তার প্রভাব আমার ছেলে-মেয়ের ওপর পড়ে। এখন আমার করণীয় সম্পর্কে বলবেন।

উত্তর : পরিবেশ যতই নেগেটিভ হোক, রাগ করে তো আপনি নিজের ক্ষতি করছেন। কারণ, রাগের মাথায় ক্রোধের মাথায় গামা লেভেলে যে কাজ করা হয় সেটা কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না। তখন ব্রেন কাজ করে না, প্রবৃত্তি কাজ করে। যেমন, একটা বাঘ শক্তি দিয়ে কাবু করতে চায়। কিন্তু দৈহিক শক্তির চেয়ে আসল শক্তিটা হচ্ছে বুদ্ধির শক্তি। বাঘ নিঃসন্দেহে খুব শক্তিমান প্রাণী। সে যেকোনো মানুষকে খেয়ে ফেলতে পারে।

কিন্তু মানুষ বাঘকে পরাজিত করলো কীভাবে? বুদ্ধি দিয়ে, ব্রেনটাকে প্রয়োগ করে। রাগ এই ব্রেনকে কাজে লাগাবার ক্ষেত্রেই অন্তরায় সৃষ্টি করে। অতএব চারপাশের নেতিবাচক প্রভাব আপনাকে জয় করতে হবে ঠান্ডা মাথায় ইতিবাচক কাজ করে।

প্রশ্ন : পেশাগত ক্ষেত্রে যোগ্যতা বা কাজের স্বীকৃতি যদি না পাই তাহলে কী করণীয়? তখনকার ক্ষোভ-কষ্টকে কীভাবে সামলাবো?

উত্তর : এরকম হতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখবেন প্রকৃতির নিয়ম খুব যুক্তিসঙ্গত। আপনি যদি কাজ করেন, কাজ আপনার দক্ষতাকে বাড়াবে। যার কাছ থেকে স্বীকৃতি চাচ্ছেন সে যদি স্বীকৃতি না-ও দেয় প্রকৃতি আপনাকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়ে আপনি যদি কাজ কমিয়ে দেন, যদি ভাবেন—এত কষ্ট করলাম আর প্রমোশন আমার না হয়ে অমুকের হলো বা ইনক্রিমেন্ট হলো না, অমুক ট্যুরে আমাকে পাঠানো হলো না। তাহলেই আপনি পিছিয়ে গেলেন। আর আপনি যদি আন্তরিকভাবে কাজ করেন, ঐ প্রতিষ্ঠান যদি স্বীকৃতি না-ও দেয় অন্য প্রতিষ্ঠান আপনাকে নিয়ে যাবে স্বীকৃতি দিয়ে।

প্রশ্ন : নিজের সঠিক ও সত্য সিদ্ধান্তকে কেউ যদি ভুল কিংবা সঠিক নয় বলে উপস্থাপন করে এবং কোনো প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমার রাগ চরমে উঠে যায়। অবশ্য এটা শুধু পরিবারেই হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় বলে দিবেন।

উত্তর : এক্ষেত্রে আপনি দায়িত্বটা নিজে নিন। আসলে আপনার কথাটা যতই সঠিক, সত্য বা যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন আপনি আসলে তিনি যে ভাষায় বোঝেন সে ভাষায় বোঝাতে পারছেন না। অতএব দোষটা তার না, দোষটা আপনার। কাজেই সেভাবে বোঝাবার চেষ্টা করুন, যেভাবে তিনি বুঝবেন। একদিক থেকে না বুঝলে অন্যদিক থেকে বোঝান।

আর এসব ক্ষেত্রে আপনি যত ঠান্ডা থাকবেন, তত বোঝাতে পারবেন। যত রেগে যাবেন, উত্তেজিত হবেন, তত ব্রেনকে ব্যবহার করা থেকে আপনি দূরে থাকবেন। আর কাউকে প্রস্তাব দিলে মনে রাখবেন প্রস্তাব দেয়ার অধিকার যেরকম আপনার আছে, তেমনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও তার আছে। অতএব যখন কাউকে প্রস্তাব দেবেন, সাথে সাথে তার প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকেও সহজভাবে গ্রহণ করবেন।

প্রশ্ন : আমরা অনেক সময় শুনি অমুক অলি বা পীর খুব জালালি ছিলেন, রাগী ছিলেন। তারা যদি রাগী হন তাহলে আমাদের রাগ দমনের প্রয়োজন কেন?

উত্তর : অনেক অলি-বুজুর্গ বা মুনি-ঋষিদের রাগ ছিলো, তারা খুব মেজাজী ছিলেন—এই বক্তব্যের কোনো সত্যতা নেই। কারণ রাগ এবং অলিত্ব এক সাথে হয় না। মহামানবরা পৃথিবীতে আসেন মানুষের কল্যাণের জন্যে, তাকে অভিশাপ দেয়ার জন্যে নয় বা ভস্ম করার জন্যে নয়। নিজেরা রাগ করা তো দূরের কথা, তাদের সাথে দুর্ব্যবহার, অন্যায় এমনকি শারীরিক নির্যাতন হলেও তারা রাগ করেন নি। উল্টো ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তায়েফে যখন রসুলুল্লাহ (স) এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেই রক্তাক্ত অবস্থায়ও যখন জিব্রাইল (আ) এসে বললেন যে, হে আল্লাহর রসুল, আপনি বলুন, পুরো তায়েফকে ধ্বংস করে দেবেন আল্লাহ তায়ালা। তখন নবীজী বলেছিলেন, যদি এ জনপদ ধ্বংস হয়ে যায় তো আমি আমার সত্যের বাণী, আমার দ্বীনের কথা কার কাছে প্রচার করবো?

হযরত মালিক দিনারকে একবার এক মহিলা ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, তুমি একটা ভন্ড। মালিক দিনার একটুও উত্তেজিত না হয়ে হেসে বললেন, হাঁ, তুমিই হচ্ছেো একমাত্র ভাগ্যবতী যে এতদিনে আমাকে চিনেছো।

আসলে রাগ-ক্রোধকে সব ধর্মেই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ধর্মের বাণীই ছিলো সবসময় শান্তি, ক্ষমা, উদারতা আর মহত্ত্ব। যেমন, নবীজী (স) বলেছেন, ক্রুদ্ধ হয়ো না, যে ব্যক্তি ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে সে-ই

প্রকৃত বীর। আবার ধম্পপদে মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, রণক্ষেত্রে সহস্রযোদ্ধার ওপর বিজয়ীর চেয়ে রাগ-ক্রোধ বিজয়ী বা আত্মজয়ী বীরই বীরশ্রেষ্ঠ। বাইবেলে যীশু বলেছেন, কেউ গালি দিলে পাল্টা গালি দিও না। বরং তাকে আশীর্বাদ কর। তাহলেই তোমরা আশীর্বাদ পাবে।

প্রশ্ন : আমি রাগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে রিকশাওয়ালা বা সিএনজিওয়ালারা যখন অতিরিক্ত ভাড়া চায় তখন খুব রাগ হয়।

উত্তর : এটা ঠিক যে, অনেক সময় তারা অযৌক্তিক ভাড়া দাবি করে। কিন্তু একজন রিকশাওয়ালার সাথে যদি আপনি রাগারাগিতে লিপ্ত হন আপনার আর রিকশাওয়ালার মধ্যে পার্থক্য কী হলো? আপনি তো তার স্তরেই নিজেকে নামিয়ে আনলেন। আর আপনি যদি একজন রিকশাওয়ালার মনস্তত্ত্বটা বোঝার চেষ্টা করেন, আপনি বুঝবেন কেন সে এরকম।

একজন রিকশাওয়ালা কখন রিকশাওয়ালা হয়? নদীভাঙনে অথবা মহাজনের পাল্লায় পড়ে যখন গ্রামে তার ভিটামাটি সবকিছুকে হারিয়ে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। সে শোষিত, বঞ্চিত। লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় নি। এ সব কারণে তার অবচেতনে থাকে ‘সবাই আমাকে শোষণ করছে’। যেমন আপনি যদি ভাড়া ঠিক না করে রিকশায় ওঠেন তাহলে ন্যায্য ভাড়া দিলেও সে ভাববে আমাকে ঠকিয়েছে। এজন্যে সবসময় ভাড়া ঠিক করে রিকশায় উঠবেন।

তারপরও যদি দেখেন রিকশাওয়ালা চ্যাচামেচি করতে পারে তাহলে দুটাকা বেশি দিয়ে হলেও আপনার দিক থেকে কর্তব্য হলো পরিস্থিতিকে শান্ত করা। কারণ চ্যাচামেচি করে রিকশাওয়ালা ভুলে যাবে পরক্ষণেই। কিন্তু আপনার ভুলতে সময় লাগবে। দেখা যাবে সারাদিনই হয়তো আপনি মানসিক উত্তেজনায় আছেন। যা আপনার কাজের ক্ষতি করবে। তাই ভাড়া আগেই ঠিক করে রিকশায় উঠবেন, দেখবেন রিকশাওয়ালার সাথে আপনার সমস্যা অর্ধেক কমে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক (রহ)-এর একটি ঘটনা আছে। তিনি একদিন বাসায় ফেরার পথে দেখেন তার একজন সহযোগী মজুরি ঠিক না করে দুইজন শ্রমিক নিযুক্ত করছে। ইমাম তাকে বললেন, মজুরি ঠিক না করে শ্রমিক নিয়োগ করা তোমার উচিত হয় নি।

আসলে রাগ বা ক্ষোভ এমন বিষয় যা প্রকাশ করে ফেললে আপনাকে

দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। কাজেই যোজন্যে সরি বলতে হয়, ক্ষমা চাইতে হয় সেটা না করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর মনে রাখবেন, যে আচরণ আপনি একবার করে ফেললেন, যে কথা বলে ফেললেন, সে কথার প্রভাব কিন্তু পড়বেই তা যতই দুঃখ প্রকাশ করা হোক না কেন।

প্রশ্ন : আমার পরিবারের সদস্যদের ওপর আমার অনেক অভিমান। তারা আমাকে বোঝে না। সবসময় আমার ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায়। কী করবো?

উত্তর : আসলে পরিবারের সদস্য-যাদেরকে আমরা প্রিয়জন মনে করি, তাদের ওপরই আমাদের অভিমান সবচেয়ে বেশি হয়। যেমন সন্তান হলে মা-বাবার বিরুদ্ধে, স্ত্রী হলে স্বামীর বিরুদ্ধে, স্বামী হলে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। আমরা ভাবি, সে কেন সবসময় আমার ওপর চাপিয়ে দেয়? কেন আমাকে বোঝে না?

এখন আমরা যদি দেখি-আসলে সমস্যাটা হচ্ছে আপনি বুঝলেন না। আপনি বোঝাতে পারলেন না। মানে সমস্যাটা তিনি নন, সমস্যা আপনি। কারণ আমরা কখনো নিজের ভুল নিজে স্বীকার করতে চাই না। সবসময় দোষটা অন্যের ওপর চাপাতে চাই যে, আমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে। অন্যায়টা যে আমিও করছি এটা বুঝি না। যদি ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, যদি বোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, আমি কিন্তু তাকে বোঝাতে চাই। কিন্তু তাকে বুঝতে চাই না। সে কী বলতে চাচ্ছে সেটা বুঝতে চাই না। যেমন, বকা আমাকে দিয়েছে ঠিক আছে কিন্তু কেন সে আমাকে বকাটা দিলো এটা বুঝতে চেষ্টা করি না। এটাই হচ্ছে আমাদের অভিমান সৃষ্টির কারণ।

অতএব সমস্যাটাকে আপনি পাল্টে দিন। আপনার ভাইকে তো বদলাতে পারছেন না। কারণ আপনার ভাই বদলাবেন কি না এটা তার ওপর নির্ভর করছে। কিন্তু আপনি বদলাবেন কি না, এটা আপনার ওপর নির্ভর করছে। অতএব যেটা আপনি পারেন সেটা যদি আপনি করেন তাহলে সমস্যা অনেক অনেক সহজ হয়ে যায়।

আসলে আবেগ যখনই আসবে, তখন আপনি আর নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে পারবেন না। আপনার চিন্তাটা তখন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আপনার সিদ্ধান্ত ভুল হবে। এজন্যে আপনাকে আবেগের উর্ধ্বে উঠতে হবে। আর এটা তখনই পারবেন যখন যে কারণে আপনার আবেগ সৃষ্টি হলো অর্থাৎ যা আপনার মধ্যে অভিমান সৃষ্টি করেছে, ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে সেই বিষয়টাকে

নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারবেন। অর্থাৎ যার বিরুদ্ধেই আপনার অভিমান হোক না কেন, তিনি সহকর্মী হতে পারেন, ভাই হতে পারেন, বোন হতে পারেন, আত্মীয় হতে পারেন, রক্তীয় হতে পারেন—আপনি যদি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনাকে দেখতে পারেন, বিশ্লেষণ করতে পারেন—আপনি দেখবেন যে, আপনি ভুল করছেন না।

ভয়

প্রশ্ন : ভয় কী? ভয়কে জয় করার উপায় কী? ভবিষ্যতের অহেতুক ভয় হয়। আমিও জানি, যা ভয় করছি তা হবে না কিন্তু এই ভয় আমার বর্তমানকে নষ্ট করছে। কী করবো?

উত্তর : নেতিবাচক চিন্তার জননী হচ্ছে ভয়। ভয় এক অদৃশ্য ভূত। অনেকের জীবনেই ভয় তাড়া করে বেড়ায় ছায়ার মতো। এই ভয়ই হচ্ছে আমাদের ব্রেনকে বেশি বেশি কাজে লাগানোর পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। ভয় যে কত ধরনের হতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। রোগ ভয়, লোক ভয়, বার্ধক্যের ভয়, প্রিয়জন বিচ্ছেদের ভয়, নিরাপত্তার ভয়, ব্যর্থতার ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, পোকা মাকড়ের ভয়, ভূতের ভয়, মৃত্যুভয় ইত্যাদি।

তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভয়ের অবস্থান হচ্ছে আমাদের সচেতন মনে। আপনি যদি এই ভয়গুলো কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ করে ফেলেন, তাহলে এগুলোকে যথাযথভাবে শনাক্ত করতে পারবেন। পারবেন এগুলোর উৎস খুঁজে বের করতে। একবার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারলে এগুলোর আকৃতি হবে লিখিত অক্ষরের সমান। তখন আপনি এ ভয়গুলোর বিরুদ্ধে সহজে পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

আমরা যদি আমাদের সচেতনতার সমুদ্রের গভীরে এই ভয়গুলোকে বিচরণ করতে দেই তাহলে আমাদের অজান্তেই এগুলো লালিতপালিত হয়ে নাদুস-নুদুস হয়ে উঠবে। এগুলোর হাত থেকে আমরা কখনো রেহাই পাবো না। গভীর সমুদ্রে অনেক বিশাল বিশাল প্রাণী বাস করে। এগুলোকে যদি কোনোভাবে সমুদ্রের তীরে নিয়ে আসা যায়, তাহলেই এদের মৃত্যু ঘটে। ভয়কেও একইভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

ভয় কখনো গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের আলো সহ্য করতে পারে না।

ভয় হচ্ছে অন্ধকারের কীট। আলোয় এলেই তা মুখ খুবড়ে পড়ে যায়। আমাদের জীবনের সবচেয়ে বেশি সমস্যার কারণ হচ্ছে অনির্দিষ্ট ভয়।

‘যদি এমন হয় তবে কি হবে’ এই আতঙ্কই আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। তাই আপনার আশঙ্কাকে কাগজে স্পষ্ট করে লিখে ফেলুন। লেখার পর জিজ্ঞেস করুন, এরপর কী হবে? সবচেয়ে খারাপটাই লিখুন। কাগজে বড় করে লিখুন। যাতে করে আপনি দেখতে পারেন।

ভয়ের হাত থেকে বাঁচার সহজ পথ একটাই। তা হচ্ছে, ভয়ের কথা কাগজে লিখে তা পুড়িয়ে ফেলা। এভাবে আপনি পর্বতপ্রমাণ ভয়কেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন। কারণ অজানা বিষয় যখনই জানা হয়ে যায়, তখনই ভয় তার রহস্য ও শক্তি দুই-ই হারিয়ে ফেলে।

যেমন, অন্ধকারে কাকতাড়ুয়া দেখেও আপনি ভূত ভেবে ভয় পেতে পারেন। কিন্তু একবার টর্চের আলো ফেলুন। ব্যস! সব শেষ। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ভয়ের উৎস সামান্য খড়কুটো, বাঁশ আর একটা হাড়ি ও একটা ছেঁড়া-ফাটা জামা মাত্র।

তাই ভয়কে মনের গহীনে বাস করতে দেবেন না, তাকে চোখের সামনে তুলে আনুন। কাগজে লিখে ফেলুন। অদৃশ্য দৈত্যকে দৃশ্যমান অক্ষরে পরিণত করুন। আর পুড়িয়ে ফেলুন অক্ষরগুলোকে।

ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া বা ভয়কে কাবু করার আরেকটা পথ হচ্ছে ভয়কে নিয়ে ঠাট্টা করা। ভয়কে জয় করার জন্যে অবজ্ঞা ও অবহেলার চেয়ে সফল অস্ত্র আর কী হতে পারে! আপনি ক্ষমতা না দিলে আপনার ওপর ভয়ের কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে না।

যে কাজকে ভয় পান সাহস করে তা করে ফেলুন। ভয় সম্পর্কে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, কেউই ভয় থেকে মুক্ত নন। ভয় পান নি পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই। তবে যারা সফল, যারা বীর তারা ভয়কে মোকাবেলা করেছেন, ভয়কে নিয়ে উপহাস করেছেন, ভয়কে অতিক্রম করেছেন। তারা কখনো ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি।

আপনার জীবনেও অনেক পরিস্থিতি আসবে, যার মুখোমুখি হতে আপনি ভয় পান। হয়তো আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডকে ভয় পান, নতুন লোকের সাথে আলাপ করতে ভয় পান, দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পান, ইনজেকশন নিতে ভয় পান, বিমানে চড়তে ভয় পান। ঠিক আছে। আপনার এ ভয় নিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনি শুধু একে মোকাবেলা করুন। ভয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন।

যে কাজকে ভয় পাচ্ছেন, সাহস করে কাজটা করে ফেলুন। বিশ্বাস করুন! আপনি সরাসরি ভয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ভয় পালাবার পথ পাবে না। আবার এমনও হতে পারে—আপনি যে কাজকে ভয় পাচ্ছেন সাহস করে করার পর সে কাজেই আপনার আনন্দ লাভ করতে পারেন।

যেমন আপনি বিমান ভ্রমণে ভয় পান। বিমানে কোনোদিন ওঠেন নি। সাহস করে উঠে পড়ুন বিমানে। যখন নিচের দিকে তাকাবেন, পৃথিবীকে যখন আকাশ থেকে দেখবেন তখনকার নতুন দৃষ্টি আপনাকে, আপনার উপলব্ধির ভাষারকে সমৃদ্ধ করবে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে সাহস করে প্রথমই চলে যান। হয়তো তিনি আপনার দাঁত ফেলে না দিয়ে রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হতে পারেন। সাহস করে ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হোন। আপনার চাকরি বা পদোন্নতির দরজা খোলার এটাই তো পথ।

ব্যর্থতার ভয় আপনাকে পেয়ে বসেছে! এটা আপনাকে কাটাতে হবে। তা না হলে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন না। সাধারণত দেখা গেছে, ব্যর্থ লোকরাই ব্যর্থতাকে ভয় পায়। কারণ তারা শুরু করতেই সাহস পায় না। আপনি সফল হবেন না বলে বিশ্বাস করলে আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন না। আর কাজ শুরু না করা এক গুরুতর অপরাধ। মনকে বলুন, সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ব্যর্থতা অতিক্রমের মাধ্যমেই আসে সাফল্য।

কাজ শুরু করুন। লক্ষ্য উঁচু রাখুন। কথায় বলে, সূর্যের দিকে তীর মারলে তা অন্তত বড় গাছের মগডালে গিয়ে লাগবে। তাছাড়া ব্যর্থতার চিন্তাকেও আপনি ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, একটি উদ্যোগে যদি আশাব্যঞ্জক ফল না পাওয়া যায় তাহলে এর বিকল্প কী পদক্ষেপ নেয়া যায় আগে থেকেই তা ঠিক করে রাখুন। তখন ভয় আপনার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

ভয়কে জয় করার আরেকটি বড় অস্ত্র হচ্ছে ভান করা। ভান করুন, এমনভাবে অভিনয় করুন, যেন আপনার জীবনে ভয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট অকপটে স্বীকার করেছেন—‘আমার জীবনে বহু কিছু ছিলো যা নিয়ে আমি প্রথমে ভয় পেতাম। কিন্তু সে কাজগুলো করতে গিয়ে আমি সবসময়ই ভান করতাম যে, আমি আদৌ ভীত নই। ভান করতে করতেই আমার ভয় কমে যেতে লাগলো। আমার এখন কোনো কিছু নিয়েই ভয় নেই। ইচ্ছে করলে বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে’।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের জীবনে যেটা সত্যি আপনার জীবনেও তা সত্যি হতে পারে। ভয়কে জয় করার জন্যে আপনি একই পন্থা অবলম্বন করুন। জোর করে ভান করুন যে, আপনি ভয় পান নি। আপনি বোঝার আগেই দেখবেন যে, ভানটাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

আসলে আমাদের অধিকাংশের জীবনে ভয় হচ্ছে ভবিষ্যতের কাল্পনিক বিপদ নিয়ে। ভবিষ্যতে কী বিপদ হতে পারে, কী ঝামেলা হতে পারে ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে আপনি আপনার বর্তমানের সুন্দর সময়গুলোকে নষ্ট করছেন। আপনি আগামীকালকে যত বেশি ভয় পাবেন, ততই আপনি আজকের দিনটিকে কাজে লাগাতে ও উপভোগ করতে ব্যর্থ হবেন। বর্তমানকে পুরোপুরি কাজে লাগান, বর্তমান নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকুন, ভবিষ্যৎ নিজেই নিজের যত্ন নেবে। জীবনকে, জীবনের গতিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বর্তমানকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান, উপভোগ করুন। কারণ আপনার জীবনে বর্তমান আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না।

প্রশ্ন : আমি সবসময় ভয় এবং আতঙ্কে থাকি। মনে হয় এখনই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবো। কী করবো—দয়া করে বলবেন?

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন করলে এ অবস্থা হওয়ার কথা নয়। হয়তো আপনার মেডিটেশনই ঠিকমতো হচ্ছে না। আপনি হয়তো মেডিটেশনে ঝিমাচ্ছেন বা ঘুমাচ্ছেন। আর নিঃশ্বাস তো একদিন বন্ধ হবেই।

এখন থেকে যখনই মনে হবে যে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখনই বলবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ, আমি মারা যাচ্ছি। আরো বেশিদিন বেঁচে থাকলে পাপের পরিমাণ আরো বেশি হতো!

অর্থাৎ যে জিনিসটাকে ভয় পাচ্ছেন সেটাকেই ওয়েলকাম করবেন। সরাসরি সে অবস্থাকে মোকাবেলা করবেন। দেখবেন আর ভয় পাচ্ছেন না। আসলে যখন আপনার মৃত্যুর সময় হবে, তখনই আপনি মারা যাবেন। আর সময় যদি না হয়, তাহলে ক্রসফায়ার করার পরও দেখা যাবে যে, গুলি মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে কিংবা প্লেন ক্রাশ করে সবাই মারা যাবার পরও আপনি বেঁচে গেছেন।

কাজেই মারা যাওয়াটা এত সহজ ব্যাপার নয়, যদি আয়ু শেষ না হয়। তাই খামোখা—মারা যাচ্ছি, কী হবে এখন—এসব ভেবে অস্থির হয়ে লাভ নেই। এরপর থেকে এরকম মনে হলে মাটির ব্যাংকে দান করবেন। যতবার

মনে হবে ততবারই দান করবেন। সবসময় মনে রাখবেন—সময়ের আগে আপনি মারা যাবেন না। সময় হয়ে গেলে আপনি বাঁচবেন না।

প্রশ্ন : প্রতিটি স্বাভাবিক কাজ করতে গেলে লোকভয়ে আক্রান্ত হই। মনে হয় তারা আমাকে পছন্দ করছে না। তাছাড়া রক্ত দেখলে ভয় পাই, কী করবো?

উত্তর : খুব সহজ সমাধান। বয়স এবং ওজন ঠিক থাকলে প্রতি চার মাস পর পর রক্ত দেবেন। আর রক্ত দেয়ার কিছুক্ষণ পর পানি খেয়ে ফ্রেশ হয়ে, রক্তের ব্যাগটা দেখবেন, আর বলতে থাকবেন, ‘বাহ! কী সুন্দর রক্ত! আমি কত সাহসী যে, আমি রক্ত দিয়েছি’।

আর লোকভয় থেকে বাঁচার সহজ উপায় হচ্ছে—কোনো কাজের ব্যাপারে চারপাশের লোকেরা কী বললো না বললো সেটা না ভেবে এ ব্যাপারে আপনার বিবেক কী বলে—সেটাতে মনোযোগী হওয়া। কাজটি যদি সঠিক হয়, নিজের এবং অন্যের কল্যাণার্থে হয়—তাহলে লোককে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ সাধারণ মানুষ আর ভেড়ার পালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষ আজকে আপনার নিন্দা করছে। আপনি বড় কিছু করে ফেলুন, কালই তারা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।

কাজেই লোকভয়ে ভীত হওয়ার চেয়ে বোকামি আর কিছু নেই। লোকভয়কে পান্ডা দিয়ে কেউই মহামানব, স্মরণীয় বা বরণীয় হতে পারেন নি। নবীজী (স) যখন সত্যের বাণী প্রচার করেছেন, তখন তিনি যদি মনে করতেন, কেউ কেউ তো অপছন্দ করছে, অতএব থাক, পিছিয়ে আসি, তাহলে তাঁর লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারতেন না।

কোয়ান্টামেও একই ব্যাপার। ১৯ বছর আগে যারা কোর্স করেছেন তাদের অধিকাংশকেই পাগল সম্বোধন শুনতে হতো। অথচ যারা সেদিন পাগল বলেছেন তাদের অনেকেই আজ কোর্স করার জন্যে আসছেন। কেন? কারণ লোকভয়কে আমরা জয় করতে পেরেছি।

প্রশ্ন : ঘর অন্ধকার থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়, খুব কষ্ট হয়। আর দরজা তালাবন্ধ থাকলে আমার খুব অস্থির-অস্বাভাবিক লাগে। কী করবো?

উত্তর : অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে গেলে চোখ বন্ধ করবেন। চোখ বন্ধ করলেই দেখবেন আলোয় আলোকময় জগৎ। তখন সুন্দর কল্পনায় ডুবে যান, মনছবি দেখুন এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ুন।

প্রশ্ন : আমি জ্বিন-ভূতকে ভয় পাই। পরিবারে ভূত বিশ্বাসের প্রচলন আছে। অভিভাবকরা দোয়া-তবিজে বিশ্বাস করেন। তা সত্ত্বেও ভয় কাটে না। দিনে-দুপুরে একা নামাজ পড়তে ভয় পাই। কী করলে এ ভয় দূর হবে?

উত্তর : ভূতকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ ভূত বলে কিছু নেই। তবে জ্বিন সম্পর্কে কোরআন শরীফে বলা আছে। জ্বিনের ভয় এলে মনে করবেন, জ্বিন আপনাকে ধরবে না বরং আপনি জ্বিনকে ধরবেন। দেখবেন, ভয় পালিয়ে গেছে। আর তাছাড়া কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনারা সমস্ত অশরীরী সবকিছু থেকে নিরাপদ। আপনাদের কাছে এরা ঘেঁষতে পারবে না।

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে খুব অসুস্থ ছিলাম। বর্তমানে সুস্থ আছি। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। রোগভীতি কাজ করছে আমার মধ্যে। সারাক্ষণ ভয়ে আর টেনশনে অস্থির থাকি। এদিকে বাস্তবেও তো দেখি কিছুদিন পর পর একেকটা মহামারীর আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

উত্তর : আসলে ভয় দেখানো বা ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা-এটা ব্যবসায়ীদের একটা চাল। মানুষকে ভয়গ্রস্ত করা হলো শোষকদের একটা হাতিয়ার। তাহলে ভয় রোধ করার কিছু উপকরণ সে বিক্রি করতে পারবে। রোগভয়ও তেমনি।

সাধারণ মানুষকে যত রোগ-ব্যাদি-মৃত্যুর ভয় দেখানো যাবে তত তারা কিনবে ওষুধ, ভ্যাকসিন এবং নানারকম রোগপ্রতিরোধকারী উপকরণ বা যন্ত্রপাতি। আর উচ্চমূল্যের এসব জিনিস বিক্রি করে মাল্টিন্যাশনাল ওষুধ কোম্পানি এবং তাদের সহযোগী চিকিৎসা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী লাভবান হবে।

কয়েক বছর আগে ডেঙ্গুরোগ নিয়ে আমাদের দেশে যে তুলকালাম হলো তার মূলেও ছিলো চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট এই ম্যাস হিস্টিরিয়া। আর রোগভয়ের জুজুকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কাজে লাগাবার জঘন্য প্রচেষ্টার একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো তথাকথিত সোয়াইন ফ্লু প্যানডেমিক।

২০১০ সালে প্রকাশিত হয় সোয়াইন ফ্লু-র ওপর ইউরোপের ৪৭টি দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের এক তদন্ত প্রতিবেদন। এতে বলা হয়, ২০০৯ সালে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঁতাতে ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানিগুলোর সৃষ্ট মিথ্যা গুজব ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটা তারা করেছে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে।

কমিটির প্রধান উলফগ্যাং ওডাগ বলছিলেন, সেসময় ওষুধ কোম্পানি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোকে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন উচ্চমূল্যের তথাকথিত এসব ভ্যাকসিন কিনতে, যার কোনো বৈজ্ঞানিক বা বাস্তব ভিত্তি ছিলো না। এ যাবৎ যত ধরনের ফ্লুর জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে এটি হলো সবচেয়ে দুর্বল গোছের একটি। তারপরও এটাকে এমন ভয়াবহরূপে তারা উপস্থাপন করলো যে, মহামারীর সংজ্ঞাটাই তারা বদলে ফেললো। আমরা এখনো জানি না যে, আসলে কী ঘটেছিলো। শুধু এটা জানি যে, এসবকিছুর মধ্য দিয়ে কিছু ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানি হাতিয়ে নিয়েছিলো বিপুল অংকের মুনাফা।

আমরা আসলে রোগ-জীবাণু সাথে নিয়েই বেঁচে থাকি। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই আমাদেরকে সুস্থ রাখে। কিন্তু ভয়টা যখন মনের মধ্যে ঢুকে যায়, তখন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ বাস্তবে আমরা যে সিম্পটমগুলো দেখি এগুলো আমাদের কল্পনারই প্রকাশ। এবং যে কারণে ডাক্তাররা যখন রোগাক্রান্ত হন, তখন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তার মধ্যে বেশি হয় কারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য তার মাথার মধ্যে রয়েছে।

অতএব ভয়ভীতিকে দূর করে ফেলুন এবং রোগকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শিখুন। আপনি রোগভয় থেকে বেঁচে যাবেন। আর সবসময় অটোসাজেশন দেবেন, প্রতিদিন আমার স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে, প্রাণশক্তি বাড়ছে। আমি নতুন নতুন কর্মে, নতুন নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হচ্ছি।

প্রশ্ন : রাতে আমি যখন ঘুমানোর জন্যে আগে লাইট অফ করি অথবা কোনো কারণে যদি অন্ধকার অবস্থায় ঘুম ভাঙে। তখন এক অজানা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে। আমার মনে হয় কে যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরছে। এতে আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। এ ভয় থেকে কীভাবে আমি পরিত্রাণ পেতে পারি, দয়া করে পরামর্শ দেবেন কি?

উত্তর : যখনই মনে হবে কেউ পেছন থেকে টেনে ধরছে, আপনি তাকে টেনে ধরেন, ‘কোথায় যাচ্ছিস? আমাকে তুই কী ধরবি? আমি তোকে ধরবো’। দেখবেন যে, আর আসছে না। যখনই মনে হবে এরকম করবেন। প্রতিদিন শোয়ার আগে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি উচ্চারণ করবেন এবং মনে মনে ভাববেন যে, আমাকে রক্ষা করার মালিক হচ্ছেন আমার প্রভু, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন : আমি ১৯২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। কোর্স করার পর পর নিয়মিত মেডিটেশন করলেও মাঝখানে অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আবার নিয়মিত হয়েছি। আমি মাঝে মাঝে রাতে ঘুমাতে গেলে যখনই ঘুমটা গভীর হয়, মনে হয় আমার পাশে কেউ যেন গভীরভাবে শ্বাস ফেলছে। আর মনে হয় কাছাকাছি কেউ আছে। এমন হয় কেন?

উত্তর : আপনি বলছেন ঘুম গভীর হচ্ছে। কিন্তু আসলে হয়তো হচ্ছে না। আর যখন একজন মানুষ আধো-ঘুম, আধো-জাগ্রত অবস্থায় থাকে তখন নিজের নিঃশ্বাসটাকেই অন্যের নিঃশ্বাস মনে করে। মনে হয় এটা নিজের না, কাছাকাছি কেউ নিঃশ্বাস ছাড়ছে। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করবেন, ঘুম গভীর হবে এবং এ ধরনের শব্দ আর শুনবেন না।

প্রশ্ন : একটা শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্ম নেয় সুতরাং ভয়হীনভাবে জন্ম নেয়। কিন্তু দেখা যায় শিশুও ভয় পায়। কেন?

উত্তর : মাতৃগর্ভের আরাম, উষ্ণতা আর নিরাপত্তা ছেড়ে শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কান্নাই হয় তার সহজাত প্রকাশ। সে বুঝতে পারে এতদিনের একটা অভ্যস্ত পরিবেশ ছেড়ে সে বেরিয়ে আসছে। এটা ঠিক ভয় নয়, পরিবর্তিত পরিবেশের প্রেক্ষিতে একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া।

প্রশ্ন : ভয় পায় বলেই তো মানুষ সাবধানে চলাফেরা করে। ভয় না থাকলে তো মানুষ যত্রতত্র চলাফেরা করতো, গাড়ির তলায় পড়ে মারা যেত।

উত্তর : ভয়কে বিশ্লেষণ করলে আমরা প্রধানত দুধরনের ভয় পাই। একটার প্রভাব ইতিবাচক। অন্যটির প্রভাব নেতিবাচক। ইতিবাচক ভয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। তা যুক্তিসঙ্গত ও সার্বজনীন।

যেমন আগুন লাগার ভয়। যদি আগুনের ব্যাপারে আপনার কোনো ভয় না থাকে তবে আপনি এমন বেপরোয়া হয়ে যাবেন যে, আজ হোক বা কাল আপনি হয়তো আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আপনার যদি রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কোনো ভয় না থাকে তাহলে আপনি আজ হোক বা কাল দুর্ঘটনা ঘটাবেনই। আগুন ও দুর্ঘটনার ভয় আপনাকে সতর্ক ও সজাগ রাখে, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

ভয় অনেক সময় সৃজনশীল শক্তিতে পরিণত হতে পারে। যেমন অজ্ঞানতার ভয়। এ ভয়ই স্কুল ও শিক্ষায়তনের জন্ম দিয়েছে। পচা-বাসি

খাবারের ভয়ই পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতার জন্য দিয়েছে। আপনি যা বলছেন তা ভয়ের ইতিবাচক প্রভাবেরই উদাহরণ।

আর ক্ষতিকারক বলে আমরা যে ভয়ের কথা বলছি সেটা হচ্ছে অযৌক্তিক। এখন একটা গাড়ি আসছে। আপনি সেটার সামনে টারজানের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। গাড়ির ধাক্কায় আহত বা নিহত হলেন। এটা তো আহাম্মকি। এই আহাম্মকি করার তো কোনো প্রশ্নই আসে না।

একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, সাবধান হওয়া আর ভয় পাওয়া দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস। সাবধানতা হচ্ছে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আর ভয় হচ্ছে একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যখন সাবধান হচ্ছেন তখন আপনি প্রো-একটিভ হচ্ছেন। আর যখন আপনি ভয় পাচ্ছেন তখন আপনি রি-একটিভ হচ্ছেন।

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করছি এবং প্রতিদিন ব্যায়াম করছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। কিন্তু একটি সমস্যা এখনো পুরোপুরি দূর করতে পারি নি। তা হলো বিশেষ মুহূর্তে নার্ভাস হয়ে যাওয়া। যেমন : বসের সামনে, সবার সামনে বক্তৃতা দেয়া ইত্যাদি। নার্ভাসনেস আমি পুরোপুরি কীভাবে দূর করতে পারবো, দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : ভয় আসলে বেশির ভাগ মানুষের মধ্যেই কাজ করে। কারো বেশি, কারো কম। কেউ এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, আর কারোটা প্রকাশিত হয়ে যায়। একবার দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা প্লেনে যাচ্ছেন। তখন তিনি প্রেসিডেন্ট। তার সাথে ছিলেন একজন সাংবাদিক যিনি তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন। হঠাৎ বিমানের একটা ইঞ্জিনে গন্ডগোল দেখা দিলো। সেকেন্ড পাইলট এসে জানাতেই তিনি বললেন, ঠিক আছে। বলে আবার কথা বলতে লাগলেন।

এদিকে অন্য যাত্রীরা তো আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। প্লেনে তখন ভীষণ বাম্পিং হচ্ছিলো। যা-ই হোক, শেষমেশ বিমান ঠিকভাবেই গন্তব্যে নামলো। সাংবাদিক তখন ম্যান্ডেলার সাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ম্যান্ডেলা বললেন, সত্যি বলতে কি আমার ভেতরটাও তখন ভয়ে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমাকে ভয় পেতে দেখলে তো বাকিরা আরো বেশি নার্ভাস হয়ে যেত। তাই আমি তখন শুধু ঈশ্বরকে স্মরণ করছিলাম যাতে আমার চেহারায়ে কোনো ভয় ফুটে না ওঠে। অর্থাৎ কোনো কোনো সময় ভয়

পেলেও সাহসের ভান করতে হয়। যেমনটি করেছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এত ঝানু সাংবাদিকও তা ধরতে পারে নি।

কাজেই বিশেষ মুহূর্তে প্রাথমিকভাবে নার্ভাস হয় না, এমন মানুষ খুব কম। বসের সামনে নার্ভাস হন না এমন মানুষ কম। বক্তৃতা দিতে গিয়ে নার্ভাস হন না এমন মানুষ কম। কিন্তু যারা সফল তারা মুহূর্তেই এটিকে কাটিয়ে ওঠেন, ভয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

আপনি সাহস করে বলেছেন। অধিকাংশ মানুষই সাহস করে বলে না। অতএব এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যখনই বসের সামনে যাবেন বা মনে হচ্ছে আপনি নার্ভাস হয়ে যাচ্ছেন, মনে মনে তিনবার কোয়ান্টা ধ্বনি করবেন, দেখবেন যে, আপনি নার্ভাসনেস কাটিয়ে উঠছেন।

প্রশ্ন : ইন্টারভিউ বোর্ডে গেলে নার্ভাস হয়ে যাই। জানা বিষয়ও ভুলে যাই। এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : নিয়মিত মেডিটেশন করলে ভাইভা বোর্ডের সামনে কেউ নার্ভাস হবে না। নিয়মিত দুবেলা মেডিটেশন করুন। প্রত্যেক শুক্রবার সেন্টার/ শাখা/ সেলের সাদাকায়ন প্রোগ্রামে যান এবং ফাউন্ডেশনে যে সৎকর্ম আছে— এগুলোতে যতদূর সম্ভব অংশ নেয়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন, আপনার ভাইভা আর তারা কী নেবে? আপনি তাদের ভাইভা নেবেন। কারণ একজন সফল ইন্টারভিউয়ি তিনি যিনি ইন্টারভিউয়ারকে তার চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত করেন। আপনার উত্তরটাই পরবর্তী প্রশ্নকে নির্ধারিত করবে। আসলে ইম্প্রেশনটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একজন আত্মপ্রত্যয়ী সৎকর্মশীল মানুষ হোন, আপনার ইম্প্রেশন এমনিতেই আকর্ষণ করবে। নিয়মিত মেডিটেশন করলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আপনার চেহারা য থাকবে আত্মপ্রত্যয়। আর সেইসাথে সাহসী-আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের জন্যে নিয়মিত অটোসাজেশন দিতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি সবকিছুতেই ভয় পাই। ভোরবেলা লাইট জেলে নামাজ পড়তে ভয় পাই। গাড়ি বা লঞ্চে উঠতে এমনকি সব রকমের যানবাহনেই ভয় পাই। রাতে জানালা-দরজা লাগিয়ে ঘুমাই। তা-ও ভয় পাই। বাঁচার উপায় কী?

উত্তর : আপনার ভয়গুলো অমূলক। একবার বাসে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। পূর্ব পরিচিত বলে জানতাম যে, তিনি বাংলাদেশ বিমানের বড় অফিসার। স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে থাকে চট্টগ্রামে, কিন্তু তার

পোস্টিং ঢাকায়। সপ্তাহান্তে তাই তিনি বাড়িতে যান। কিন্তু তাকে বাসে যেতে দেখে অবাক হলাম। কারণ বিমানে তার যে পদমর্যাদা তাতে ঢাকা-চিটাগাং ফ্লাইটে তার ফ্রি যাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক সপ্তাহে এত কষ্ট করে কেন তিনি বাসে যান?

জবাবে তিনি যা বললেন তা শুনে তো আমি থ। তিনি বিমানে চড়েন না কারণ তার বিমানভীতি আছে এবং এজন্যে বিদেশের আকর্ষণীয় পোস্টিং পর্যন্ত তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার ভয় হলো, যদি মাঝপথে বিমানটা বিগড়ে যায়, পড়ে যায়। তখন কী হবে? আমি বললাম, বিমান পড়ে যেতেই পারে। যেকোনো কিছুই পড়তে পারে। কিন্তু কয়টা বিমান পড়েছে? যত যানবাহন আছে তার মধ্যে বিমান সবচেয়ে নিরাপদ। ওটা পড়ার চান্স থাকলে তো পাইলটই ওটা নিয়ে উড়বে না। আমার-আপনার এত চিন্তা করার দরকার কি। ভদ্রলোক তারপরও বলে চলেছেন যে, না, আমারটাই যদি পড়ে!

এমনকি কোর্স করতে গিয়েও কত ধরনের ভয় দেখেছি। একবার মতিঝিলের বিসিআইসি ভবনের ১৯ তলার সেমিনার হলে আমাদের কোর্স হচ্ছে। কোর্সের ২য় বা ৩য় দিন ১৯ তলায় ওঠার জন্যে লিফটে ঢুকছি। দেখি কোর্সের একজন অংশগ্রহণকারী মাঝবয়সী কেতাদুরস্ত একজন ভদ্রলোক সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছেন। আমি বললাম, আসেন একসাথে লিফটে যাই। উনি বললেন, আমি একটু সিঁড়ি দিয়ে আসছি। আমি তখন ভাবলাম ওপরের কোনো তলায় বোধ হয় কোনো কাজ আছে। লিফট দিয়ে উঠে করিডোরে দাঁড়িয়ে কয়েকজনের সাথে কথা বলছিলাম। এর মধ্যে পেরিয়ে গেল ৮/১০ মিনিট। এমনসময় দেখি যে, ভদ্রলোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত। ১৯ তলা বেয়ে উঠলে সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে দেখে কিছুটা লজ্জা পেলেন। আমি বললাম, এভাবে লিফট রেখে ১৯ তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন?

তিনি বললেন, আমার লিফটকে খুব ভয়। ‘যদি দড়ি ছিঁড়ে যায় তাহলে তো আর বাঁচার উপায় নেই’। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি ঢাকা শহরে কত বছর ধরে আছেন? বললেন ঢাকা শহরে আমার জন্ম। তাকে বললাম যে, আপনি এই এতদিনের মধ্যে কোনোদিন কি কোনো খবরের কাগজে দেখেছেন যে লিফট-এর দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। বললেন যে, না, তা দেখি নি, শুনি নি। তাহলে? তিনি বললেন, ‘কিন্তু ছিঁড়তে কতক্ষণ?’

এটাই হচ্ছে অমূলক ভয়। যে ভয়ের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, কিন্তু কুরে কুরে খায় আপনার জীবনের সম্ভাবনাকে। নিয়মিত কয়েক দিন ভয় দূর করার মেডিটেশন করুন। আর সাহসের অটোসাজেশন দিন।

প্রশ্ন : ভয় দূর করার মেডিটেশন একমাস বা ১৫ দিনে কয়বার করা দরকার?

উত্তর : ভয় দূর-এর মেডিটেশন প্রতিমাসে করার দরকার নেই। প্রথমদিকে পর পর কয়েকদিন করাই যথেষ্ট। আর সেইসাথে ভয় দূরের জন্যে কার্যকর হলো অটোসাজেশন। ভয় দূরের জন্যে অনেক ধরনের অটোসাজেশন আছে ‘জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ বই অথবা ‘আত্মজাগরণ’ বা ‘হাজারো অটোসাজেশন’ সিডিতে। এগুলোর মধ্য থেকে যেকোনোটি অনুশীলন করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি যখন মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে থাকি তখন হঠাৎ কোনো শব্দ শুনলে আঁতকে উঠি এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁপতে থাকি। আমার এই সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

উত্তর : এটা অনেক সময় হতে পারে। হয়তো কেউ ঘুমিয়ে আছে। এসময় হঠাৎ যদি কেউ তাকে ডেকে ফেলে, সে কেঁপে উঠতে পারে। বা আপনার ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে, গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। এসময় কোনো শব্দ হলে বা কেউ ডেকে ফেললে আপনি আঁতকে উঠছেন। এজন্যে অটোসাজেশন দেবেন যে, আমি যখন মনোযোগ দিয়ে কাজ করবো তখন যেকোনো শব্দ আমাকে আরো আনন্দিত করবে। আমি সেই শব্দটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবো।

প্রশ্ন : প্রতিদিন সংবাদপত্রে, মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে ছোট ছোট ভূমিকম্প থেকেই বাংলাদেশে তীব্র ভূমিকম্প বা সুনামি হতে পারে। এতে না কি প্রচুর জানমালের ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় কোয়ান্টাম সদস্য হিসেবে আমরা কী করতে পারি? ভূমিকম্প বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : ভূমিকম্প বিষয়ে একজন গ্রাজুয়েটের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই হওয়া উচিত যে, ভূমিকম্পের সময় যদি একতলায় থাকেন তাহলে যত দ্রুত পারেন ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দৌড় দেবেন। ভূমিকম্প দেখার জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আর উনিশ তলায় থাকলে শুয়ে থাকবেন। কারণ যা হওয়ার আপনি উনিশ তলা থেকে নামার আগেই হয়ে যাবে। অতএব দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই।

ওখানে বসেই মেডিটেশনে মগ্ন হয়ে যাবেন যে, আল্লাহ তুমি মারতেও পারো আবার বাঁচাতেও পারো। অতএব যদি বাঁচাও তাহলে আমাকে নিয়ে

কাউকে যেন টানাটানি করতে না হয়। কষ্ট করতে না হয়। যদি রাখো সুস্থ শরীরে রাখো। যাতে আমি আরেকজনের জন্যে কাজ করতে পারি। আরেকজনের সেবা করতে পারি।

আর সবসময় বিশ্বাস রাখবেন যে, আপনার আয়ু যতক্ষণ পর্যন্ত আছে, ভূমিকম্পসহ যত বড় বিপদই আসুক না কেন আপনি বাঁচবেন। এমন হয়েছে—ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে ১২/১৫ দিন পরও জীবিত শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিমান বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেছে, মা-সহ সবাই মারা গেছে, কিন্তু বাচ্চাটি বেঁচে আছে। কাজেই সবসময় মনে রাখবেন যে, হায়াত-মউত এটা আল্লাহর হাতে।

প্রশ্ন : আমার সবসময় মনে হয় আমি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবো। আমি কোনোভাবেই এটা ভুলতে পারছি না। এ দুশ্চিন্তা থেকে আমি কীভাবে মুক্তি পাবো?

উত্তর : এটা তো সত্য যে, আপনি মারা যাবেন। রোগকে ভয় পান আর না পান, আপনি মারা যাবেনই। যেহেতু আপনি মারা যাবেনই, তো আপনার ভয় পাওয়ার দরকারটা কী? মৃত্যুভয়ের চেয়ে অলীক ভয় আর কিছু নেই। আমরা সবসময় আতঙ্কিত থাকি, যদি মারা যাই! ভাবখানা এমন যে, আমার আগে কেউ মারা যায় নি। আমিই প্রথম মারা যাবো।

অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে আসার পর আপনার জীবনে যদি একটি মাত্র সত্য থাকে তবে তা হচ্ছে মৃত্যু। আপনি যত ভালো কাজ করেন না কেন আপনি মারা যাবেন। যেমন নবী-রসুল, দরবেশ, মুনি-ঋষি, ধর্মবেত্তা সবারই দৈহিক মৃত্যু হয়েছে। আবার সবচেয়ে খারাপ কাজ যারা করেছে, জুলুম করেছে, অত্যাচার করেছে, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করেছে, তারাও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় নি। লৌহ যবনিকার মাঝেই স্টালিন মারা গেছেন। সিআইএ বা এফবিআই কেনেডিকে বাঁচাতে পারে নি। হিটলার এটম বোমাগ্রন্থ বাংকারে আত্মহত্যা করে ভবলীলা সাজ করেছেন। আসলে মৃত্যু জীবনের অবধারিত সত্য। তাই মৃত্যুকে ভয় পাওয়া বোকামি মাত্র।

মৃত্যুভয় নিয়ে সুন্দরবনের বিখ্যাত বাঘ শিকারী পচান্দি গাজীর চমৎকার এক গল্প রয়েছে। ৫৭টি বাঘ শিকারকারী পচান্দি গাজীর বাবা ও দাদাও ছিলেন বাঘ শিকারী। পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক বাঘ শিকারকারী পচান্দি

গাজীর এক বন্ধু একদিন বললো, পচা, তোর বাঘকে ভয় করে না। জবাবে পচাদি বললেন, না। বন্ধু আবার বললো, তোর বাবাকে তো বাঘে খেয়েছে! তারপরও তোর বাঘকে ভয় করে না? পচাদির জবাব, না। বন্ধু আবার বললো, তোর দাদাকেও তো বাঘে খেয়েছে। তারপরও তোর বাঘকে ভয় করে না? পচাদির সেই একই জবাব, না।

এবার পচাদির পালা। পচাদি তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কীভাবে মারা গেছে? বন্ধুর জবাব, রাতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সকালবেলা সবাই দেখলো তিনি মারা গেছেন। তোর দাদা? পচাদি জানতে চাইলেন। দাদাও রাতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। সকালবেলা সবাই দেখলো তিনি মারা গেছেন, বন্ধু জানালো। এরপর মুচকি হেসে পচাদি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি এখনও রাতে বিছানায় ঘুমাস! বিছানাকে তোর ভয় করে না?

অর্থাৎ বাঘের হাতে মৃত্যু আসুক বা বিছানায় শুয়ে, মারা আপনি যাবেনই। মৃত্যু জীবনের অবধারিত সত্য। তবে যদি আপনি মৃত্যুকে ভয় পান তবে প্রতিদিন আপনি নব নবভাবে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবেন। আর মৃত্যুকে ভয় না পেলে আপনি শুধু একবারই মারা যাবেন। সেই জন্যেই বলা হয়, বীরের মৃত্যু একবার আর ভীরু মরে হাজার বার।

নেতিচিন্তা

প্রশ্ন : আমার তো মনে হয় অধিকাংশ সময়ই নেতিবাচক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকি। কীভাবে এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

উত্তর : অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আমাদের অধিকাংশের চিন্তাজগতের শতকরা ৭০-৮০ ভাগই দখল করে রাখে রাগ ক্ষোভ ঘৃণা দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনা কুচিন্তা দুশ্চিন্তা বিষণ্ণতা হতাশা ও নেতিবাচক চিন্তারূপী আত্মবিনাশী প্রোথাম।

যেমন, সারাদিনে ভালো ঘটনা হয়তো ৫টা ঘটেছে। খারাপ ঘটনা, ঝগড়া হয়তো একটা হয়েছে। আপনি কিন্তু সারাদিনের ভালো ঘটনাগুলো মনে রাখছেন না। ঝগড়ার ঘটনাটাই ঘুরেফিরে ভাবছেন। এইভাবে বললো কেন? আচ্ছা আমি যদি এইভাবে বলতাম তাহলে কী হতো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা আমাদের জাতীয় জীবনেও সত্য। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের ক্রিকেট টিম অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে। আমাদের দেশে এর হেডিং হলো,

‘ক্রিকেটের অঘটন’। আমি কিছুটা অবাক হয়ে ভাবলাম, হারালাম আমরা আর হেডিং হলো ক্রিকেটের অঘটন! খেলাতে তো যে কেউ হারতে পারে, জিততে পারে। আমরা হারালে এটা অঘটন হবে কেন? অর্থাৎ আমরা যে ভালোভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবো, সেটাও পারি না।

আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ নেতিবাচকতা নিয়ে আমরা মাতামাতি করি বেশি। সংবাদপত্রের সে খবরগুলোই মানুষ বেশি পড়ে যা নেতিবাচক। যে কারণে তারা ছাপায়ও তা। একটা ভালো খবর প্রচার পেতে সময় লাগে। কিন্তু খারাপ খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে যায়। যেমন, কোথাও হয়তো আগুন লেগেছে বা ভাঙচুর হচ্ছে। টিভি বা পত্রিকা খুললে আপনার মনে হবে সারা রাস্তা সব আগুন জ্বলছে। কারণ ক্যামেরার ফোকাস রাস্তায় না হয়ে হয়েছে ঐ আগুনটার ওপর। টিভির ক্যানভাস পুরোটাই জুড়েই শুধু আগুন।

আসলে এই আত্মবিনাশী প্রোথাম অধিকাংশ মানুষের জীবনকেই ধীরে ধীরে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। বার বার যখন একজন মানুষ নেতিবাচক কথা বলে, তখন সেটাই নেতিবাচক প্রত্যাশায় রূপান্তরিত হয়। মস্তিষ্ক তখন সেটাকেই বাস্তবায়িত করার জন্যে লেগে যায়।

আমাদের জীবনে এত দুঃখ কেন? কারণ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় গান হচ্ছে দুঃখের গান। ‘মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না’। আরে আপনি বাইতে না পারলে আপনার বৈঠা কে নেবে? আর যদি কেউ নেয়ও, সে প্রথম কী করবে? আপনাকে নৌকা থেকে ফেলে দেবে। তারপরে সে বৈঠা নিয়ে চলে যাবে। কারণ কেউ বোঝা বহন করতে চায় না।

আমরা যদি এই প্রক্রিয়াকে উল্টে দিতে পারি অর্থাৎ ৭০-৮০ ভাগ চিন্তাকেই আত্মবিকাশী ইতিবাচক চিন্তায় পরিণত করতে পারি, তাহলেই আমরা মনের শক্তিকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে পারবো। ইতিবাচক চিন্তাকে একবার ৭০ ভাগে উন্নীত করতে পারলে নেতিবাচক চিন্তা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাবে। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তার প্রভাব এতই হ্রাস পাবে যে, ইতিবাচক চিন্তার প্রাধান্যের কারণে আপনার জন্যে তা ক্ষতিকর কিছু করতে পারবে না।

আত্মবিনাশী চিন্তার বিনাশ সাধন প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এমনকি নেতিবাচক ও ইতিবাচক চিন্তার অনুপাত ৫০:৫০ করাও মনে হতে পারে দুঃসাধ্য। কারণ আমরা নেতিবাচক চিন্তায় এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এটা আমাদের চরিত্রের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। তবুও একটু সচেতন প্রচেষ্টা চালালে ধাপে ধাপে আপনি এই নেতিবাচক চিন্তাকে নির্মূল করতে পারবেন।

একবার এ প্রক্রিয়া শুরু করলে আপনার কাছে তা এত সুন্দর ও মজার মনে হবে যে, আপনি তাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন। আপনার মধ্যে এমন একটা তৃপ্তি আসবে, যা আপনি ইতঃপূর্বে অনুভব করেন নি। নেতিবাচকতা থেকে মুক্তির জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন ও অটোসাজেশন দিতে হবে।

প্রশ্ন : নেতিবাচকতা দূর করার কার্যকরী উপায় কী? নেতিবাচক চিন্তার প্রকাশ কি এটা দূর করার কার্যকরী পন্থা?

উত্তর : নেতিবাচক চিন্তা ও অনুভূতি—যেমন রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি পথ হচ্ছে তা প্রকাশ করা। সাধারণত আমরা আমাদের নেতিবাচক চিন্তা বা কুচিন্তার শতকরা ৯০ ভাগ কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কারণ একটাই ‘লোকে শুনলে কী বলবে’!

অথচ চিন্তার প্রকাশ মনকে হালকা করে। প্রকাশ যত তীব্র হয়, মন তত দ্রুত হালকা হয়ে ওঠে। শিকারীর হাতে সঙ্গী বা শাবক নিহত হলে পশুর যে হৃদয় নিংড়ানো চিৎকার তা যে কাউকে ব্যথিত করবে। কিন্তু সেই চিৎকারের পরই দ্রুত সব ভুলে গিয়ে সে জীবনকে নতুন করে গড়ার উদ্যোগ নেয়। কোনো দুঃখ পেলে কেউ যদি আতঁচিৎকার দিয়ে কাঁদতে পারেন, তাহলে তিনি সহজে সে দুঃখ কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আর যিনি কাঁদতে পারেন না, তিনি সহজে দুঃখ ভুলতে পারেন না।

মনের বিষ ঝেড়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চমৎকার একটি গল্প আছে। এক গ্রামে এক সাপ বাস করতো। ছেলে-মেয়েরা খেলতে বেরলেই সাপ তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতো। গ্রামের মুরব্বীরা সাপের সাথে দেখা করে অনুরোধ করলেন—সে যেন ছেলে-মেয়েদের না কামড়ায়। সাপ তাদের অনুরোধ রক্ষা করলো এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ সবকিছু ঠিকঠাক চললো। ছেলে-মেয়েরা মাঠে খেলাধুলা শেষে প্রতি সন্ধ্যায়ই খুশি মনে বাসায় ফিরে আসতে লাগলো।

মুরব্বীরা এতে খুশি হয়ে সাপকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন যে, সাপ বিধ্বস্ত-অসুস্থ হয়ে নিজে নিজেই গিঁট পাকিয়ে পড়ে আছে। তারা সাপকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? কী হয়েছে তোমার? সাপ বিরস কণ্ঠে জবাব দিলো, ‘তোমরাই তো আমাকে ছেলে-মেয়েদের কামড়াতে মানা করেছ’। মুরব্বীরা জবাব দিলেন, ‘তা ঠিক! আমরা কামড়াতে না

করেছি, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করতে তো না করি নি’।

সাপের এ গল্প থেকে ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ এগুলো মন থেকে প্রকাশ করে ফেলা যে কত জরুরি তা আমরা বুঝতে পারি। বিশিষ্ট মার্কিন শল্য চিকিৎসক ও রোগ নিরাময়ে মনোশক্তি ব্যবহারের প্রবক্তা ডা. বার্নি সীজেল খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘অপ্রীতিকর অনুভূতিসহ আপনার অনুভূতিগুলো পুরোপুরি প্রকাশ করে ফেলা উচিত। প্রকাশিত হলেই আপনার ওপর এগুলোর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো তখন আপনার মনে জট সৃষ্টি করতে পারে না’।

কিন্তু সচেতন মনের অনুশাসন সবসময়ই আমাদের চিন্তা প্রকাশের অন্তরায়। অন্যরা খারাপ মনে করবে, এজন্যে আমাদের অধিকাংশ নেতিবাচক চিন্তা অপ্রকাশ্য থেকে যায়। অধিকাংশ সময়ই রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা মনের ভেতরেই গুমরাতে থাকে। এর ফলে মনে সৃষ্টি হয় এক নেতিবাচক অবস্থা। নোংরা আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থে মনের কক্ষ পূর্ণ হয়ে ওঠে। ভালো জিনিস ঢোকার জায়গাই পায় না তখন।

আমরা যেমন ঘরবাড়ি আসবাব নিয়মিত সাফ করি, তেমনি মনের এই বর্জ্যগুলোও নিয়মিত সাফ করা প্রয়োজন। এই সাফ করার পদ্ধতি হচ্ছে লেখা, প্রকাশ করে ফেলা। যখনই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তওবা তওবা বা বাতিল বাতিল বলা। আর নেতিবাচক চিন্তার একটি বিশেষ মেডিটেশন নিয়মিত অনুশীলন করেও কিছুদিনের মধ্যে আপনি ঝেড়ে ফেলতে পারবেন আপনার সমস্ত নেতিবাচকতাকে।

প্রশ্ন : ইতিবাচক কথা বলতে চাইলেও মাঝে মাঝে নেতিবাচক কথা মনে চলে আসে। সাথে সাথে বাতিল বাতিল বলে ইতিবাচক কথা বলি। কিন্তু ভয় লাগে যদি নেতিবাচক কথাটি ফলে যায়। ভাবতে ভাবতে একসময় মাথা ভারী হয়ে যায়। কী করলে মুক্তি পাওয়া যাবে?

উত্তর : বাতিল বাতিল বা তওবা তওবা বলবেন। এটি খুব শক্তিশালী একটি এন্টিভাইরাস। কম্পিউটার ভাইরাসের প্রতিরোধ যেমন এন্টিভাইরাস দিয়ে করা হয়, নেতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রেও তেমনি বাতিল বাতিল বলে এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়। এটি ইতিবাচক চিন্তার গুণগুলোকে অক্ষুণ্ণ রেখে শুধু নেতিবাচক চিন্তাকেই বিনাশ করে।

প্রশ্ন : নেতিচিন্তা এখনো পুরোপুরি যাচ্ছে না। নেতিচিন্তা, ভয় এখনো মনের মধ্যে আছে।

উত্তর : নিয়মিত অটোসাজেশন দিতে থাকুন-নেতিচিন্তাগুলো চলে যাবে।

প্রশ্ন : ছোট ছোট ব্যাপারগুলো নিয়ে আমার খুব মন খারাপ হয়। বিশেষ করে অন্যদের কোনো আচরণের ফলে আমি প্রভাবিত হই খুব দ্রুত। নিজে নিজেই টেনশন করি, বিষণ্ণ হই। পরে দেখি আসলে যা নিয়ে মন খারাপ হয়েছিলো তা হয়তো তেমন কিছুই না। কীভাবে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো?

উত্তর : আমাদের অনেকেরই এ সমস্যা রয়েছে। যেমন, খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ। কোনো একদিন আপনি অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখলেন যে, আপনার স্ত্রী অন্যদিন যেরকম হাসিমুখে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতো, আজকে ঠিক সেরকমভাবে আপনাকে অভ্যর্থনা জানালো না। কেমন যেন একটু বিষণ্ণ, গম্ভীর। কিংবা মনে হচ্ছে রেগে আছে। আর তা দেখেই আপনি খুব চিন্তা শুরু করে দিলেন। কী হয়েছে, কী ব্যাপার। কেন আজকে এরকম? আমি যে অমুকের সাথে টেলিফোনে কথা বলি এটা জেনে গেছে কি না। বা কেউ কিছু বলেছে কি না। কিংবা বাড়ি থেকে কোনো দুঃসংবাদ এসেছে কি না ইত্যাদি বহু কিছু চিন্তা করে ফেললেন।

আপনিও খুব সতর্ক হয়ে গেলেন, গম্ভীর হয়ে গেলেন বা মনে মনে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমাতে লাগলেন। কিন্তু আসলে হয়তো ঘটনাটি ছিলো আপনার স্ত্রীর মাথাব্যথা করছে। মাথাব্যথা করলে তো আর হাসা যায় না। অথচ আপনার আধঘণ্টা সময় চলে গেল অস্থিরতায়।

আবার অফিসে হয়তো আপনার এক সহকর্মী তার কোনো অধস্তনের সাথে কোনো কারণে উত্তেজিত। এসময় আপনি ওদিক দিয়ে গেলেন। কিন্তু আপনার সহকর্মী আপনার দিকে অন্য সময় যেরকম হাসিমুখে তাকায় আজ তা করলো না। কারণ তিনি যে মুড়ে তাতে তার হাসার কথা নয়।

কিন্তু আপনি ভাবলেন কী জানি! এ বোধ হয় আমার ওপরে ক্ষেপে আছে। কেন ক্ষেপে থাকতে পারে? এ ব্যাটা তো এমনিতেও আমাকে দেখতে পারে না। আবার কী মতলব করছে-ইত্যাদি নানান ভাবনা।

এই সহজ জিনিসটাকে আমরা আসলে বুঝি না। অর্থাৎ একটা সহজ সরল ঘটনাকে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে নিই। কবিগুরু যেমন কবিতা আছে-তোমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এই কল্পনার রং যত কম চড়ান তত ভালো। সহজ সত্যকে বোঝার চেষ্টা করুন।

যেমন, দুপুরবেলা আপনার বাসায় এসে স্ত্রীর সাথে খাওয়ার কথা। কিন্তু আপনি এলেন দেরি করে। আপনার ক্ষুধার্ত-ক্লান্ত স্ত্রী যদি আপনাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা না জানায়, সেটা কি খুব অস্বাভাবিক হবে? হবে না।

বরং তিনি যদি রেগে জিজ্ঞেস করেন, ‘এ্যাই এত দেরি করলে কেন’?, তো সেটাই স্বাভাবিক। এখন এরকম সময়ে আপনিও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, রাগে চিৎকার করতে শুরু করলেন, জটিলতাটা কিন্তু শুরু হয় এখান থেকেই।

আপনার দরকারটা কী তার কথার উত্তর দেয়ার? কিছু বলারই দরকার নেই। ক্ষুধা লেগেছে আগে খেয়ে নিন। স্ত্রীকে খেতে সাহায্য করুন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে দেখবেন যে, স্ত্রী দেরি করার কথা আর জিজ্ঞেসই করছে না। তখন স্ত্রীও খাওয়া হয়েছে, আপনিও খাওয়া-দাওয়া করেছেন। অতএব সমস্যাটা দূর হয়ে গেছে।

দুঃখ ও হতাশা

প্রশ্ন : হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা নয়। এমনিতেই হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে যায়। আমি চাই না আমার মন খারাপ হয়ে যাক। মন খারাপ হলে আমার কষ্ট হয়। কাজের গতি কমে যায়। দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : মন খারাপ লাগলে আনন্দের মেডিটেশন করবেন, অটোসাজেশন দিতে থাকবেন। মেডিটেশন হয়তো সবসময় করতে পারছেন না। কিন্তু সবসময় অটোসাজেশন দিতে থাকবেন। দেখবেন যে মন ভালো হয়ে গেছে।

আসলে ধ্যান যে মানুষকে প্রশান্ত করে, সুখী করে তা আমাদের মুনি-ঋষি-দরবেশরা হাজার হাজার বছর ধরে বলে আসছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ব এখন রীতিমতো ল্যাবরেটরি গবেষণার মাধ্যমে তার প্রমাণ পাচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে প্রচার করছে নিউজ মিডিয়াগুলোতে।

এমনি এক কেস স্টাডি হলেন ৬৪ বছর বয়স্ক ম্যাথু রিকার্ড—একসময় যিনি মাইক্রোবায়োলজিস্ট ছিলেন, এখন একজন ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ভিক্ষু। ধ্যান করছেন ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে।

রিডার্স ডাইজেস্টের জানুয়ারি, ২০১১ সংখ্যায় ম্যাথু রিকার্ডকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘দ্যা হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অফ দি ওয়ার্ল্ড’—বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসেবে।

তবে যাচাই বাছাই না করে তাকে এ খেতাব দেয়া হয় নি। ল্যাবরেটরিতে নিয়ে রিকার্ডের পুরো মাথাটাকে মুড়িয়ে ফেলা হয় ২৫৬টি ইলেকট্রোড দিয়ে। দীর্ঘসময় নিয়ে চালানো হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সবশেষে জানা যায়, রিকার্ডের ব্রেনের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ যা তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে আনন্দপূর্ণ জীবনের এক অভাবনীয় ক্ষমতা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের তৃপ্তি, সুখ আর আনন্দের মতো ইতিবাচক আবেগগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রেনের এ অংশটি থেকেই।

২০০৭ সালে ম্যাথু রিকার্ড একটি বই লেখেন-‘এ গাইড টু ডেভেলপিং লাইফ’স মোস্ট ইম্পারটেন্ট স্কিল’। বেস্ট সেলার এ বইটিতে রিকার্ড বলেছেন সুখ নিয়ে তার নানা উপলব্ধির কথা। তিনি বলেন, সুস্থ সুন্দর মন থেকে উৎসারিত এক গভীর অনুভূতিই হলো সুখ। আর স্থায়ী ও অনন্ত সুখের মূল উপাদান হলো মেডিটেশন। মেডিটেশনের ফলেই তিনি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে।

রিকার্ড বলেন, পৃথিবীর সবকিছুকে আমি কখনোই নিজের ইচ্ছেমতো বদলে ফেলতে পারবো না। কিন্তু আমার মনটাকে তো আমি বদলাতে পারি। আর যে নিজে বদলাতে পারে, সে বদলাতে পারে পৃথিবীকেও। রিকার্ড আরো বলেন, দিনে আধঘণ্টা মেডিটেশন আপনাকে পৌঁছে দেবে এক আশ্চর্য সুখানুভূতির রাজ্যে। তাই নিয়মিত মেডিটেশন করলে আপনিও মুক্তি পাবেন এই হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ হওয়া রোগ থেকে। রিকার্ডের মতো সেরা সুখী মানুষও হয়ে যেতে পারেন আপনি।

প্রশ্ন : একমাত্র সন্তান হারানোর কষ্ট মেডিটেশন করেও ভুলতে পারছি না। যতই বলি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ততই কান্না পায়, ভালো থাকতে পারছি না কেন?

উত্তর : দুঃখটা মানবীয়। মহামানবরাও দুঃখ পেয়েছেন। যেমন, নবীজী (স) এর দুই পুত্র ছোটবেলায়ই মারা গিয়েছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পর রসুলুল্লাহ (স)-এর চোখে পানি দেখে কয়েকজন সাহাবী খুব বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি তো আল্লাহর রসুল। আপনার চোখে পানি? তখন রসুলুল্লাহ (স) বললেন যে, আমিও তো মানুষ। আমিও তো আমার সন্তানকে ভালবাসি। সন্তানের জন্যে আমিও দুঃখ পাই। কিন্তু দুঃখটাকে তিনি খুব সহজে আবার কাটিয়ে উঠেছেন। খুব সহজে দুঃখটাকে শক্তিতে

রূপান্তরিত করেছেন।

এটা কীভাবে করবেন? দুঃখের মেডিটেশন করে করতে পারেন। সব দুঃখকে জড়ো করে তারপর আপনি দুঃখটাকে বের করে দিতে পারেন—তা অশ্রুর আকারে হতে পারে, লিখে হতে পারে। দেখবেন—আপনি হালকা বোধ করছেন। কারণ ভেতরের এই দুঃখ-কষ্টগুলোকে বের করে দিলেই আপনি নতুন সম্ভাবনার সন্ধান পাবেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ২২ বছর। কোনো কিছুতেই আমি উৎসাহ পাই না। এমনকি মেডিটেশন করতেও না। মনে হয় আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমার কিছু পাওয়ার নেই। কিছু করার নেই। মনের অশান্তির কারণে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। এখন আমি কী করবো?

উত্তর : আত্মহত্যা করতে চাওয়াটা একটা রোগ এবং নেতিবাচকতা যখন মনের মধ্যে গভীরভাবে বাসা বাঁধে তখন এরকম চিন্তা-ভাবনা আসে। যদিও আত্মহত্যা করা অধিকাংশ মানুষের জন্যেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর মৃত্যু লেখা না থাকলে আত্মহত্যা করতে চাইলেও মরা যায় না। আমার এস্ট্রলজি জীবনের একটা অভিজ্ঞতা বলি।

এক মেয়ে খুব জেদি। একদিন এসে বললো আমি আত্মহত্যা করবো। আমি বললাম, কিন্তু আমি তো মৃত্যু দেখছি না। মেয়েটি বললো, আমি এক্সুগি বেরাচ্ছি। আত্মহত্যা করবো এবং প্রমাণ করবো যে, আপনার দেখা ঠিক না।

চলে গেল সে। অনেকদিন আর কোনো খোঁজ-খবর নেই। আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম, তাহলে কি সত্যি সত্যিই সে আত্মহত্যা করেছে! অনেকদিন পর একদিন দেখি আমার সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের স্লিপে তার নাম। সাথে সাথে ডাকলাম। জুতো পরেই ঢুকলো আমার রুমে (কার্পেট বিছানো রুমে সবাই জুতো খুলে ঢুকতো)।

আমাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে সে ইশারা করলো তার পায়ের দিকে। দেখি-গোড়ালি থেকে ওর দু'পা কাটা এবং সেখানে কাঠের পা লাগানো। এরপর থেকে সে-ই ছিলো আমার একমাত্র ক্লায়েন্ট যে জুতো পরে আমার রুমে ঢুকতো। তার এই শারীরিক সীমাবদ্ধতাকে ঢেকে রাখার চেষ্টার প্রতি আমি সবসময় ছিলাম সহানুভূতিশীল।

শুনলাম তার কাহিনী। আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সেদিনই আত্মহত্যার জন্যে সে বেছে নিলো এমন এক পদ্ধতি যা তার ধারণায় ছিলো অব্যর্থ।

অর্থাৎ মৃত্যু হবেই। ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো সে।

কিন্তু বিধি বাম! যেই না ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে গেছে, সেখানে উপস্থিত হলো এক লোক। লোকটি মনে করলো পার হতে গিয়ে বোধ হয় এর পা হড়কে গেছে।

মেয়েটির মাথায় ছিলো খুব লম্বা আর ঘন চুল। সেই চুল ধরে লোকটা দিলো হ্যাঁচকা টান। আর তাতে শরীরটা বেরিয়ে এলেও পা দুটো কাটা পড়লো ট্রেনে। বেশ কয়েক মাস হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলো সে। সেই থেকে কাঠের পা। এরপরে চাকরি নিলো, বিয়ে করলো। খুব কর্তৃত্বপরায়ণ স্ত্রী ছিলো সে। তারও অনেক বছর পরে স্বাভাবিকভাবেই মারা গিয়েছিলো সে। মেয়েটি সেদিন স্বীকার করেছিলো, আপনি আসলে ঠিকই বলেছেন, মরতে চাইলেই মরা যায় না, যদি নিয়তিতে না থাকে।

এটা তো গেল একদিক। আর আসলে আত্মহত্যা করবো, মারা যাবো—এ জাতীয় নেতিবাচকতা একজন মানুষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। তার দ্বারা বড় কোনোকিছু করা সম্ভব হয় না। যার ফলে সে একধরনের ব্যর্থ জীবন যাপন করে।

অতএব নিয়মিত মেডিটেশন করুন, সজ্ঞের সাথে যুক্ত থাকুন, সৎকর্মের সাথে একাত্ম হোন। যখন আপনি দেখবেন সবকিছুই খারাপ না, ভালোও আছে এবং আপনার দ্বারাও অনেককিছু করা সম্ভব তখন আপনি আপনার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবেন। জীবনের প্রতি আগ্রহ বাড়বে।

প্রশ্ন : আজকাল প্রায়ই আমি বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হই। হঠাৎ হঠাৎ কিছুই ভালো লাগে না। মনে হয় সবকিছুই অর্থহীন আর নিরানন্দময়। কাজে উদ্যম পাই না। নিজের অজান্তেই ডুবে যাই বিষণ্ণ ভাবনায়। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : আপনার এই বিষণ্ণতা, হতাশা, আর উদ্যমহীনতার মূল কারণ হলো আপনার জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই। ফলে লক্ষ্য অর্জনের জন্যে একের পর এক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আনন্দও আপনি উপভোগ করতে পারেন না। জীবনটা আপনার কাছে পরিণত হয়েছে অর্থহীন এক ক্লান্তিকর বোঝায়। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রথমেই আপনাকে জীবনের জন্যে একটি সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

আর সে লক্ষ্য শুধু আত্মকেন্দ্রিকতা বা আমারটা আগে—এ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে চলবে না। সে লক্ষ্য হতে হবে নিজের কল্যাণে ও মানবতার কল্যাণে

নিবেদিত। তখনই খুঁজে পাবেন জীবনের অর্থ। প্রতিদিন নতুন নতুন কাজের তাড়না অনুভব করবেন। হতাশা, ভালো না লাগা দূর হয়ে আনন্দ আর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে আপনার জীবন।

আর এই যে কিছু ভালো লাগে না, এটা আসলে যাদের কিছুই করার নেই তাদের অবস্থা। যারা কিছু করে না, তারাই এই ভালো না লাগায় আক্রান্ত হয় বেশি। যাদের কাজ আছে তাদের কিছু ভালো না লাগার কোনো সুযোগ থাকে না। অতএব মন যাতে খারাপ না হয়, সেজন্যে কাজের মাঝে ডুবে যেতে হবে। আর সবসময় অটোসাজেশন দেবেন ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’।

প্রশ্ন : মাঝে মধ্যে খুব খারাপ লাগে। হতাশ হয়ে পড়ি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : খুব খারাপ লাগাটাও খুচরা শয়তানের কাজ। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আছে। আমরা যদি মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (স)-কে দেখি, তার জীবনেও দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা বাধা অপমানের কমতি ছিলো না। একজন মানুষ জীবনে যত ধরনের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা পেতে পারে, তিনি তার সবই পেয়েছিলেন। তারপরও কি তিনি হতাশ হয়েছেন?

প্রিয়জন বলতে যাদের বোঝায় তাদের সবার মৃত্যুশোক তাকে সহ্য করতে হয়েছে। বাবা মা দাদা চাচা স্ত্রী সন্তান-সবাই মারা গেছেন একে একে। যাদের উপকার করতে চেয়েছেন তাদের কাছ থেকেই পেয়েছেন লাঞ্ছনা, অপমান আর নির্যাতন। তারপরও কি তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন?

তিনি যে কষ্ট বঞ্চনা পেয়েছেন, পৃথিবীর আর কোনো মানুষই তা পায় নি। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি কষ্ট নেই। তাই যখনই খারাপ লাগবে, চিন্তা করবেন যে, আমি কি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী? আমার চেয়ে কষ্টে কি আর কেউ নেই? দেখবেন যে, এমন অনেকের কথা ভাবতে পারছেন যারা আপনার চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। আর তখন আপনার খারাপ লাগাও কেটে যাবে। আর খুব বেশি খারাপ লাগলে নিয়মিত আনন্দের মেডিটেশন করুন। খারাপ লাগা দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আলস্যের অনেক কারণের মধ্যে মন খারাপও একটি কারণ। কিন্তু যখন সত্যিই মন খারাপ করার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং মন খারাপ হয়ে যায় তখন এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : যার কাজ আছে তার কখনো মন খারাপ হয় না। কাজের মধ্যে যিনি থাকেন তার মন খারাপ করার মতো অবস্থা-ই হবে না। অতএব আপনার মন খারাপ হওয়ার মানেই হচ্ছে আপনার হাতে কাজ নেই। আর তারপরও যদি মন খারাপ হয় তাহলে ভালো কাজগুলোর মধ্যে ডুবে যেতে হবে। যার মন সবসময় সদানন্দ থাকে তার কাছে যেতে হবে।

মন খারাপ দূর করার আরো উপায় আছে। লিখে ফেলতে হবে, কেন মনটা খারাপ লাগছে, কোন ঘটনা মনটাকে বিষণ্ণ করেছে। লেখা শেষ করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। দেখবেন, মন ভালো হয়ে গেছে।

আর এই মন খারাপ হওয়া নিয়ে কনফুসিয়াসের একটা খুব চমৎকার বাক্য আছে, ‘মন খারাপ হতেই পারে কিন্তু মন যেন খারাপ না থাকে’। যেমন, মাথা যখন আছে, চুল যখন আছে, মাথার ওপর দিয়ে পাখি একটা উড়ে যেতেই পারে, কিন্তু পাখি যেন চুলে বাসা না বাঁধে। অর্থাৎ পাখি যেমন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় মন খারাপ করাটাও যেন মাথা থেকে উড়ে চলে যায়। এটা যেন মাথায় বাসা না বাঁধে।

প্রশ্ন : জীবনের এক অংশ আমি দুঃখ-কষ্ট ও হতাশার মধ্যে কাটিয়েছি। আমার বলতে গেলে পুরো শৈশব এবং কৈশোরটাই মানসিক অশান্তির ভেতর দিয়ে পার করেছি। বধিগত হয়েছি অনেক কিছু থেকে। আমার সহপাঠীরা সমবয়সীরা যা পেয়েছে তা আমি পাই নি। এর কারণটা হয়তো আমি উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই ইনট্রোভার্ট টাইপের ছেলে। অতএব এ সমস্যা থেকে পরিব্রাজ লাভ করতে আমার কোন মেডিটেশন করা উচিত?

উত্তর : জীবনের কষ্ট-দুঃখ নিয়ে মজার গল্প আছে এস্ট্রলজিতে। একবার এক লোক এস্ট্রলজারের কাছে গিয়ে জানতে চাইলো-তার ভবিষ্যৎ কেমন? এস্ট্রলজার গণনা করে বললেন, আগামী পাঁচ বছর আপনার খুব কষ্ট যাবে।

লোকটি মন খারাপ করলেও আবার নড়েচড়ে বসলো। তার মানে পরের পাঁচ বছর ভালো যাবে? এস্ট্রলজার বললেন, না, তখন সয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রথম পাঁচ বছর দুঃখ-কষ্ট সহিতে সহিতে পরে দুঃখ-কষ্ট অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

আসলে ছোটবেলায় কষ্ট পাওয়াটা ভালো। ছোটবেলায় কষ্ট না পেলে বড় বয়সে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। কারণ ছোটবেলায় যারা দুঃখ এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় হওয়ার পর তাদের

কীর্তি, অর্জন অনেক বেশি হয়েছে। বরং বলা যেতে পারে ছোটবেলায় যারা খুব আদরে মানুষ হয়েছে বড় হওয়ার পর তাদের কষ্টটা বেড়েছে। কারণ কষ্ট কোনো না কোনো পর্যায়ে একজন মানুষকে পেতেই হয়। অতএব এজন্যে শোকরগোজার হবেন যে, যা কিছু দুঃখ-কষ্ট শৈশব এবং কৈশোরে চলে গেছে। এখন প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যে আনন্দময় জীবনের মনছবি দেখবেন।

প্রশ্ন : এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত যার সাথে অথবা যার কথা ভাবলে ভালো লাগতো সে আজ আর পৃথিবীতে নেই। কোনো মানুষের হাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাই আজ কোনো আনন্দই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না। আমার প্রশ্ন হলো, কীভাবে নিজেকে আনন্দময় ও সুখকর মনে করবো? আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত। আমি সবার মতো করে আনন্দ পাই না কোনো কিছুতেই।

উত্তর : জীবন আসলে কখনও থেমে থাকে না, আর যা থেমে যায় তা জীবন নয়। আর আমরা যারা অনন্ত যাত্রায় বিশ্বাস করি, তাদের কাছে জীবন থেকে কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

খুব কাছের মানুষ, আপন মানুষ মারা গেলে দুঃখ লাগা স্বাভাবিক কিন্তু সেই দুঃখটাকে বয়ে বেড়ানোটা স্বাভাবিক নয়। তবে এটিকে আবার জোর করে দূর করা যাবে না। এজন্যে এমন কিছু কাজের মধ্যে নিজেকে নিবেদিত করতে হবে, যে কাজে অন্যের উপকার হয়। যখনই অন্য মানুষ উপকৃত হবে সেই উপকারের প্রতিদান হিসেবে দেখা যাবে যে, মনের বোঝা, দুঃখের বোঝা অনেক অনেক হালকা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমার মুড ভালো থাকলে আমি অনেক কাজ ও ডিজাইন করতে পারি। কিন্তু মুড ভালো না থাকলে মাথায় কিছু আসে না। আবার আশেপাশে কেউ থাকলেও কাজে মন বসাতে পারি না। আমার এই মেজাজ-নির্ভর আচরণ একটি প্রতিকূলতা।

উত্তর : যে কাজটা আর্থিক লাভের জন্যে বা পার্থিব লাভালাভের জন্যে করা হয় সেটাই মুডনির্ভর। কারণ সেটা জীবনের লক্ষ্য নয়, মিশন নয়। কাজটা করছি, আমার কিছু লাভ হচ্ছে, খ্যাতি হচ্ছে ব্যস। সেটা সৃজনশীল কাজ হতে পারে বা হতে পারে রুটিন ওয়ার্ক।

আসলে যে কাজ মুডের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, সেই কাজে আনন্দ বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। আর কাজটা কেন করছেন এটা যদি আপনার

কাছে পরিষ্কার থাকে তাহলে আপনি কখনো মুড দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। যেমন, মহামানবরা কখনো মুড দ্বারা প্রভাবিত হন নি। কিন্তু খ্যাতিমান যারা শিল্পী-সাহিত্যিক-অনেকেই ছিলেন যারা হতাশায় ভুগতেন। যেমন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের ‘ওল্ড ম্যান এন্ড দা সি’ আশাবাদের কত চমৎকার এক উপন্যাস। কিন্তু সেই হেমিংওয়েই আত্মহত্যা করেছেন। লেবাননের বিখ্যাত লেখক কাহিলিল জিবরান ডিপ্রেসনের রোগী ছিলেন। তারা সৃজনশীল ছিলেন। কিন্তু নিজের মনের ওপর, মুডের ওপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ আনা যায় তা তাদের জানা ছিলো না। কাজেই ‘মুড ভালো না থাকলে মাথায় কিছু আসে না বা কাজে মন বসে না-এ জাতীয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন। নিয়মিত সুখী জীবন মেডিটেশন করুন, আত্মজাগরণের অটোসাজেশনগুলো গুনুন। মুড ভালো হয়ে যাবে।

হীনম্মন্যতা

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত মেডিটেশন করেও হীনম্মন্যতায় ভুগি। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তর : মেডিটেশন এবং হীনম্মন্যতা একসাথে থাকতে পারে না। যদি নিয়মিত মেডিটেশন করা হয় তাহলে হীনম্মন্যতা থাকবে না। আর তারপরও যদি থাকে তবে বুঝতে হবে আপনি অশুভ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। এজন্যে কোয়ান্টায়ন করতে হবে। আত্মপর্যালোচনা করে নিয়মিত অটোসাজেশন দিয়ে আত্মশক্তি জাগ্রত করে অশুভ বৃত্ত ভাঙতে হবে।

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। আমার এসএসসি এবং এইচএসসি দুটো পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ আছে। মাস্টার্সের রেজাল্টও বেশ ভালো। কিন্তু অনার্সে আমি দুর্ভাগ্যবশত মাত্র তিন নম্বরের জন্যে তৃতীয় শ্রেণী পাই। যার কারণে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পেতে বেশ কষ্ট হয়। এখন চাকরির পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা থাকলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৃতীয় শ্রেণীকে নেতিবাচক মন্তব্য করে, যা প্রায়ই আমাকে পীড়া দেয়। আমি কীভাবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবো?

উত্তর : তৃতীয় বিভাগ যেহেতু হয়ে গেছে এটা নিয়ে আফসোস করে এখন আর লাভ নেই। এখন আপনার প্রয়োজন হলো দক্ষতা। আপনি আপনার জ্ঞানকে বাড়াতে চেষ্টা করুন। যে পেশায় আছেন, সে পেশায় যত দক্ষতা

অর্জন সম্ভব সেগুলোকে অর্জন করুন, দেখবেন-ফাস্টক্লাসধারীর ওপরও আপনি কর্তৃত্ব করছেন। কারণ ভালো রেজাল্ট সামনে এগুনোর একটা উপাদান, কিন্তু এটাই সব নয়। পরীক্ষার রেজাল্ট সবসময় সহায়ক কিন্তু শুধু পরীক্ষার রেজাল্ট দিয়ে জীবনে প্রথম হওয়া যায় না।

কাজেই যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে, আপনি ফাস্ট ক্লাসের চেয়েও বেশি দক্ষ, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা আপনাকে নেবে ফাস্টক্লাসধারীকে বাদ দিয়ে। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি এ প্রতিষ্ঠানের জন্যে অনিবার্য। কারণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের চেয়েও যোগ্যতা এবং দক্ষতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : আমি একজন প্রকৌশলী। বয়স ৪০ বছর। একটি নামি কোম্পানিতে কর্মরত। যদি ভুল হয়, অন্যরা কী বলবে, ইত্যাদি নানারকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জড়তা আর লজ্জার জন্যে ইংরেজিতে পিছিয়ে আছি। ইংরেজিতে দক্ষতা থাকলে আমি কর্মক্ষেত্রে আরো উচ্চতর অবস্থানে যেতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগও পাচ্ছি না। কারণ সারাদিন আমাকে অনেক ব্যস্ততার মাঝে কাটাতে হয়। কীভাবে আমি ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবো?

উত্তর : সাধারণভাবে স্কুল-কলেজে আমরা যে ইংরেজি শিখি তা কাজ চালাবার মতো ইংরেজি বলার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু ইংরেজি নিয়ে এক অহেতুক ভয়-সংকোচের কারণে আমরা ইংরেজি বলি না বা মনে করি বলতে পারবো না। আমরা ভাবি, যদি ভুল হয়। অথচ এটা বুঝি না যে, বলতে বলতেই এই ভুল ঠিক হবে। না বললে কোনোদিন তা শুদ্ধ হবে না।

আর আমাদের ভুলটা কোথায়? আমরা ইংরেজিতেও ব্যাকরণ অনুসরণ করতে চাই। অথচ এর কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা দুজন বাঙালি যখন বাংলা বলি, আমরা কি ব্যাকরণ অনুসরণ করে বলি? তাহলে ইংরেজি কেন ব্যাকরণ অনুসরণ করে বলবো? অতএব ইংরেজি বললেই হলো। শুধু বলার চর্চা করতে হবে এবং এজন্যে মনের বাড়ির দরবার কক্ষে গিয়ে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে, মনছবিও ইংরেজিতে দেখতে হবে। ছয় মাস এভাবে চর্চা করুন। যেকোনো ভাষা শেখার জন্য ছয় মাসই যথেষ্ট।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুজিওমুরির ইংরেজি জ্ঞান নিয়ে খুব বিখ্যাত গল্প আছে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন জাপানে গিয়েছিলেন তার আগে প্রধানমন্ত্রীর

সহযোগীরা তাকে দুয়েকটা ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা করছিলেন। সুবিধা করতে না পেয়ে তারা শেষ পর্যন্ত দুটি বাক্য শেখালেন। যার একটা হলো ‘হাউ আর ইউ’। সহযোগীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই ক্লিনটন এর জবাবে বলবেন, ‘আই এম ফাইন’। তখন ফুজিওমুরি বলবেন, ‘মি টু’!

নির্দিষ্ট দিনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যখন এলেন তখন ফুজিওমুরি এত হৈ চৈ আর ডামাডোলের মধ্যে ভুলেই গেলেন তাকে শেখানো বুলির কথা। তিনি হাউ আর ইউ এর জায়গায় বলে ফেললেন—হু আর ইউ!

এদিকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তো খুব রসিক। তিনি বললেন, আই এম দি হাজবেন্ড অফ মিসেস হিলারি ক্লিনটন।

ফুজিওমুরির দ্বিতীয় বাক্যটি মনে ছিলো। তিনি একটু হেসে বললেন, ‘মি টু’! বুঝুন অবস্থা!

এরকম ইংরেজি জেনেও যদি জাপানের মতো ইকনমিক সুপার পাওয়ারের প্রধানমন্ত্রীর হীনম্মন্যতা না থাকে তাহলে আমাদেরও কোনো হীনম্মন্যতার প্রয়োজন নেই।

ইংরেজি নিয়ে আমার নিজেরও গল্প আছে। একবার আমি জাপানে গেছি। সেখানে আমাদের যিনি দাওয়াত করেছিলেন তিনি একজন ধনাঢ্য জাপানী মহিলা। যেদিন ফিরে আসবো তার আগের দিন তিনি আমাদের একটা বড় জেমস স্টোরে নিয়ে গেলেন।

চমৎকার সব অলঙ্কার এবং রত্ন পাথর দিয়ে সাজানো। হঠাৎ মহিলা একটা খুব সুন্দর ব্রোচ এনে আমাকে দেখালেন। ইঙ্গিতে বোঝালেন এটা কেমন। আমি বললাম, খুব সুন্দর। কারণ কোনো মহিলা যদি পছন্দ করে কোনো জিনিস এনে দেখায় তখন সেটাকে ভালো না বলার চেয়ে বোকামি আর কিছু নেই।

দেখলাম উনি চলে গেলেন। সেলসগার্লকে বললেন, খুব সুন্দর করে র‍্যাপ করে দিতে। এবং কিছুক্ষণ পরে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ‘গিফটো মাই ওয়াইফো’। আমি কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু তিনি আরো কয়েকবার একই কথা বললেন।

তারপর আমি ভেঙে ভেঙে বুঝলাম, গিফটো মানে হলো গিফট, আর মাই ওয়াইফো মানে আমার ওয়াইফ। কিন্তু মহিলার তো আর ওয়াইফ হতে পারে না। তার মানে এটা আমার ওয়াইফের জন্যে তার পক্ষ থেকে দেয়া গিফট।

তার মতো একজন ধনাঢ্য মহিলারও যদি এরকম ইংরেজি নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতা না থাকে তাহলে আমরা কেন হীনম্মন্যতায় ভুগবো? আর

ইংরেজির ব্যাপারে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, এ ভাষায় আমাদের দক্ষ হতে হবে। পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে। আর আপনার সামান্য একটু চেষ্টাতেই তা সম্ভব।

প্রশ্ন : আমি দেখতে খুবই কুৎসিত। সুন্দর কাউকে দেখলে মনে হয় আমি তার মতো হলাম না কেন? আমাকে আল্লাহ কেন সুন্দর করে সৃষ্টি করেন নি! এই অনুভূতি নিজ থেকে কীভাবে দূর করবো?

উত্তর : এই অনুভূতি তো আপনাকে নিজ থেকেই দূর করতে হবে। নইলে আপনার এই অশান্তি কখনো ফুরাবে না। আসলে এই যে না-শুকরিয়া অর্থাৎ আমার কী নেই সেটা নিয়ে চিন্তা থেকেই আমাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় অশান্তি, অস্থিরতা।

আপনি যদি আপনার কী নেই সেটা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন তাহলে দেখবেন আপনার ‘নেই’ এর কোনো শেষ নেই। কারণ বিশাল এই পৃথিবীর কতটুকুই বা আপনি অর্জন করতে পারছেন? একটা পাওয়ার পর মনে হবে আরো অনেককিছুই তো পাওয়ার বাকি থেকে গেল এবং আপনি হীনম্মন্যতার এক অনন্ত চক্রে আবর্তিত হবেন।

যদি ‘বেশ ভালো আছি’ বলতে পারেন, যত বলতে পারবেন, হীনম্মন্যতা তত কাটতে থাকবে। হীনম্মন্যতা কাটানোর উপায়ই হচ্ছে—সবসময় ‘শৌকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ থ্যাংকস গড/ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ! বেশ ভালো আছি’ বলা। কারণ বেশ ভালো যখন আপনি থাকবেন আপনার কোনো হীনম্মন্যতা থাকবে না। আপনি যে বেশ তৃপ্ত, এই তৃপ্তি আপনার জন্যে আরো প্রাপ্তির দ্বার খুলে দেবে।

আসলে যত তৃপ্ত হবেন তত আপনি পাবেন। এজন্যে নিজের রূপের দিকে না তাকিয়ে নিজের গুণের দিকে তাকান। গুণগুলোকে বিকশিত করুন। যখন আপনার গুণগুলো সমাদৃত হতে থাকবে আপনার তৃপ্তি বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : অন্যদের কাছ থেকে যথাযথ মূল্যায়ন না পেলে, প্রাপ্য মর্যাদা বা সম্মান না পেলে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : আপনি হীনম্মন্যতাবোধে ভুগছেন। কারণ হীনম্মন্যতায় ভুগলেই একজন মানুষ অন্যের মূল্যায়ন নিয়ে মাথা ঘামায় বেশি এবং ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করে। তাকে ঠিকমতো সম্মান করে কথা বললো কি না, যত্ন

করে খেতে দিলো কি না, তাকানোর মধ্যে কোনো তাচ্ছিল্য ছিলো কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি যথোপযুক্ত মর্যাদা পেলেন কি না। তাদের হীনম্মন্যতার প্রকাশ ঘটে দুর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

খুব তুচ্ছ তুচ্ছ ব্যাপারে যদি আপনার মনোযোগ চলে যায়, যদি আপনাকে এটা বিভ্রান্ত করে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার রোগটা আসলে হীনম্মন্যতার, তার ব্যবহার নয়। যে জিনিসগুলোকে খুব সহজেই ওভারলুক করা যায়, একজন মানুষ যখন হীনম্মন্যতায় ভোগে তখন আর সে এত সহজে পারে না।

যারাই হীনম্মন্যতায় ভোগেন তারা সবসময় মর্যাদা সচেতন থাকেন যে, আমাকে কতটুকু মর্যাদা দেয়া হলো কতটুকু অমর্যাদা করা হলো, আমাকে খাটো করা হলো না বড় করা হলো, আমাকে কি হয়ে করা হলো, আমার প্রতি ঠিক যতটা হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত ছিলো ততটা হাত বাড়িয়ে দিলো কি না, সে দরজা থেকে আমাকে রিসিভ করে নিয়ে গেছে না মাঝপথ থেকে রিসিভ করলো! যার হীনম্মন্যতা নেই তিনি এগুলোতে কিছুই মনে করবেন না। রিসিভ করলে খুব ভালো, না করলে আরো ভালো।

আর অন্যের মতামতের মুখাপেক্ষী হলে আপনি কখনো আপনার জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না এবং প্রশান্তিতে থাকতে পারবেন না। যেমন, আপনি হয়তো আপনার পছন্দমতো একটা সালোয়ার কামিজ কিনে বাসায় এসে কয়েকজনকে দেখালেন।

দেখে একেকজন একেকরকম মন্তব্য করলো। কেউ বললো ভালো হয়েছে, কেউ বললো মোটামুটি, আবার কেউ বললো একটুও ভালো হয় নি। তোমাকে তো একদম মানাবে না। কেউ আবার কোনো মন্তব্য না করে গম্ভীর হয়ে রইলো। এত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। এত পছন্দ করে দাম দিয়ে কেনা কাপড় আর এখন ভালো লাগছে না।

মতামত কখনো একরকম হবে না। দেখবেন বাজারে সবধরনের জিনিসই পাওয়া যায়। আপনার কাছে যেটাকে খুব বাজে বলে মনে হয়, সেটাকেই দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে আরেকজন। আবার আপনার যেটা পছন্দ সেটা দেখেই আরেকজন নাক সিঁটকাচ্ছে। কারণ হয়তো আপনাকে একটু অস্থিরতায় ফেলে সে একধরনের আনন্দ পেতে চাইছে।

এসমস্ত ক্ষেত্রে খুব সরাসরি বলবেন, দেখুন ভাই বা আপা, আমি তো পছন্দ করে কিনতে পারি না। এরপর থেকে বাজারে গিয়ে আমার জন্যে আপনার যেটা পছন্দ সেটাই কিনে আনবেন। দেখবেন, আপনার পছন্দের পোশাক পরে আমি খুব সুন্দরভাবে আপনার সামনে আসবো। তখন

আপনারও কত ভালো লাগবে! এভাবে যখনই বলবেন, দেখবেন সে আর আপনাকে বলতে আসছে না। কারণ বলতে এলেই তো তাকে আপনার জন্যে কিনে দিতে হবে।

অর্থাৎ অমুকে কী বলবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজটা নৈতিক কি না, সেই কাজটা আপনার জন্যে কল্যাণকর কি না, সেই কাজটা মানুষের জন্যে কল্যাণকর কি না। ব্যস। আর কিছু আপনার দেখার দরকার নেই।

আপনি কারোটা খানও না, কারোটা পরেনও না। অতএব কারো অনুমোদনের ওপর আপনার নির্ভর করার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনে এই ‘পাছে লোকে কিছু বলে’-শোনা থেকে আপনি যত বিরত থাকতে পারবেন তত আপনি সফল হবেন, তত আপনি এই শেকল থেকে নিজেকে ছিন্ন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার সালাম নেবেন, আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। কোর্স করার পর নিয়মিত মেডিটেশন করে কিছু উন্নতি হলো, পুরোপুরি নার্ভাসনেস মুক্ত হতে পারি নি। যেমন বসের সামনে, ইন্টারভিউ বোর্ডে এবং মেয়েদের সামনে প্রচুর নার্ভাস বোধ করি।

উত্তর : বস, ইন্টারভিউ বোর্ড এবং মেয়ে অর্থাৎ নার্ভাসনেসের বিষয় যা-ই হোক না কেন, কারণ একটাই যে, আপনি নিজেকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আপনি ভাবেন আপনাকে বোধ হয় তারা পছন্দ করছে না, যোগ্য মনে করছে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে দিন। ভাবুন যে, কে আপনাকে গ্রহণ করলো না করলো তা নিয়ে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনি তা-ই করবেন যা আপনার বিবেক, মূল্যবোধ, নৈতিকতা আপনাকে সমর্থন করে। সেইসাথে নিয়মিত মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম করবেন।

প্রশ্ন : রঙ কালো হলে কীভাবে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্ত হবো?

উত্তর : শুধু ফর্সা হলেই সুন্দর হয় না। ফর্সা মানুষ যেমন সুন্দর হতে পারে তেমনি শ্যামলা বা কালো রঙের মানুষও সুন্দর হতে পারে। অনেক শ্যামলা বা কৃষ্ণবর্ণের মানুষ রয়েছে যাদের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো কঠিন হয়।

সৌন্দর্যের মাপকাঠি হচ্ছে চেহারার কমনীয়তা। এটা হচ্ছে বাহ্যিক। আর আপনার ভেতরে যদি সৌন্দর্য থাকে, আপনার চেহারা যা-ই হোক অন্যরা

আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। যেভাবে মহামানবরা অন্যদের আকৃষ্ট করেছেন। অর্থাৎ আপনি যদি আপনার সংসত্তাকে জাগ্রত করতে পারেন, আপনার গায়ের রঙ যা-ই হোক এটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। আর এখন তো ফর্সাকে ইউরোপে বা আমেরিকায় সৌন্দর্য বলে মনে করা হয় না। যে কারণে তারা আবার সমুদ্রতীরে গিয়ে ট্যানড্ হয়।

এটা হচ্ছে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। আর অন্যরা যদি বলে তাহলে ভাববেন তারা আসলে আপনার মনোবলটাকে নষ্ট করার জন্যেই বলছে। অতএব আপনি গুণকে বিকশিত করুন। মানুষ আপনার কাছেই যাবে। যেমন, শেখ সাদী দেখতে মোটেই সুন্দর ছিলেন না। লতা মুঙ্গেশকরের চেহারাও সুন্দর নয়। কিন্তু তাতে তাদের ভক্ত-অনুরক্তের কোনো অভাব হয় নি।

প্রশ্ন : যখন আমি আমার চিন্তা-ভাবনা গুছিয়ে কাউকে বলতে পারি না বা যখন আমি খুব উৎসাহ নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই কিন্তু কেউ শুনতে চায় না, তখন নিজেকে বেশ গুরুত্বহীন ও অসহায় মনে হয়, এ ধরনের মনোভাব থেকে বের হয়ে আসার উপায় কী?

উত্তর : আপনি ভালো শ্রোতা হয়ে যান। ৯০% সময়ে আপনি শুনবেন। আর ১০% ক্ষেত্রে আপনি বলবেন। অর্থাৎ আপনি খুব কম কথা বলেন এবং ভালো কথা বলেন। দেখবেন আপনার প্রতি সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ, বলে সবাই। শোনার লোকই কম। সেজন্যেই ভালো শ্রোতাকে সবাই পছন্দ করে। অতএব আপনি শ্রোতার দলে চলে যান। বলা নিয়ে চিন্তা করবেন না। তাহলে আপনি প্রভাবিত করতে পারবেন।

আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা

প্রশ্ন : আমি মোটামুটি নিয়মিত মেডিটেশন করছি। অলসতা আগের তুলনায় অনেকটা ত্যাগ করতে পেরেছি। কীভাবে আরো তৎপর হতে পারবো?

উত্তর : আমাদের সহজাত একটি প্রবণতা হলো আলস্য। কোনো কাজ না করে সময় কাটানো যায় কীভাবে। সময়ানুবর্তী হয়ে সুপরিকল্পিতভাবে সুনির্দিষ্ট কল্যাণকর ফলপ্রসূ কাজ না করার নামই আলস্য। কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ কাজ না করে যে সময়টা আমরা কাটাচ্ছি তাই হচ্ছে আলস্য। এটাই হচ্ছে আমাদের আত্মবিনাশী শৃঙ্খল নম্বর এক। যে জাতি এই আলস্য ভোগ

বিলাসের মাঝে ডুবে গেছে সে জাতি পতিত হয়েছে। একটা জাতির উত্থান হয় কর্মের মধ্য দিয়ে, পতন হয় আলস্যের মধ্য দিয়ে।

আপনারা দেখুন, রোমানরা একটা সময় তদানীন্তন সমস্ত ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতো। রোম যখন পুড়ছিলো, নীরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। রোমকে রক্ষা করার জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার সে প্রস্তুতি তার ছিলো না কারণ তার আলস্য ও বিকৃত বিলাসিতা। ঠিক আছে, পুড়ছে, পুড়ুক। দেখা যাক তারপরে কী হয়! ঐ যে দুই আলস্যের গল্প আছে না! একজনের পিঠে আগুন লেগেছে, পিঠ পুড়ছে। সে পিঠ পোড়ে না বলে সংক্ষেপে ‘পি পো’ বললো। আরেকজন এত অলস যে, পালাতে যে বলবে তা বললো না কারণ পালাতে হলে তো দৌড়াতে হবে। সে বললো ‘ঘু শো’ মানে ঘুরে শোও। তবুও উঠবে না। এত অলস!

সিপাহী বিপ্লবের সময় সারা ভারত যখন জ্বলছিলো অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ তখন কী করছিলেন সত্যজিৎ রায় সে চিত্র খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছিলেন তার সতরঞ্জ কা খিলাড়ি ছবিতে। সতরঞ্জ মানে হচ্ছে দাবা। অযোধ্যা পুড়ছে আর তিনি দাবা খেলছেন। বৃটিশরা যখন উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল এক এক করে দখল করে নিচ্ছিলো তখন আমাদের নবাব, রাজা, বাদশারা কী করছিলেন। ভোগ বিলাস এবং আলস্যে গা ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে ইংরেজরা এ উপমহাদেশ শাসন করে গেছে শুধু আমাদের আলস্যের কারণে।

আমাদেরও কিন্তু কোনো কিছুই অভাব নেই শুধু পরিশ্রমের অভাব ছাড়া। এখনো আমাদের জনপ্রিয় গান হচ্ছে ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই’। কফি হাউজের আড্ডা দিয়ে কী হবে? কফি হাউজের আড্ডা মানে তো গীবত ছাড়া আর কিছু না।

কফি হাউজের আড্ডাটা ভেঙে গেল, মানে অলস সময় কাটাতে পারলাম না। এজন্যে দুঃখ। জীবনানন্দ দাশের কবিতা, ‘আমায় জাগিও না আমায় ঘুমাতে দাও’, এবং পরে শোনা গেছে উনি ট্রাম মানে ঠেলাগাড়ির নিচে পড়ে মারা গেছেন। ট্রাম যখন আসছিলো তখনো হয়তো উনি বলছিলেন, ‘আমাকে মারিও না আমাকে ঘুমাতে দাও’।

আলস্য হচ্ছে ডেসটিনেশন হেল। জাহান্নামে যাওয়ার রাজপথ। আলস্য আমাদের জীবনকে বঞ্চিত করেছে। কারণ সময় + কাজ = জীবন। সময় + অকাজ/ কুকাজ = জীবননাশ। জীবননাশ মানে জীবনের সম্ভাবনা নাশ এবং এই আলস্য হচ্ছে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

তাই সবসময়ই অটোসাজেশন দিতে হবে—‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’। এবং মনছবি দেখতে হবে যে, আমি খুব দ্রুত, খুব সুন্দরভাবে, সময় অনুসারে কাজ করছি। আর প্রতিদিন সকালে মেডিটেশনে গিয়ে সারাদিনের কী কী কাজ আপনি করবেন, কীভাবে করবেন, কতটা সময় নিয়ে করবেন এটাকে ভিজুয়ালাইজ করুন, মনছবি তৈরি করুন। দেখবেন কাজের গতি বেড়ে গেছে। ভেতর থেকে একটা তাড়না আসবে। কারণ ব্রেনে প্রোগ্রাম ফিল্ড করে দিলে ব্রেন কাজ করে।

রাতে আবার মেডিটেশনে গিয়ে দেখতে হবে যে, কাজটা আমি সঠিক সময়ের মধ্যে কি করেছিলাম? যদি করে থাকেন নিজেকে ধন্যবাদ দিন। কল্পনায় মনের বাড়িতে আম জাম ফলমূল যা কিছু আছে—খান। অর্থাৎ মন, তুই আমার কাজটা ঠিকমতো করে দিয়েছিস, এজন্যে এই পুরস্কার। আর যদি দেখা যায় যে, কাজ হয় নি বা ছোটখাটো অল্প কিছু হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে আজকে মাফ করে দিলাম। কালকে করিস ঠিকমতো। তা না হলে নিজেকে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তম শাস্তি হচ্ছে মাটির ব্যাংকে দান।

আসলে জীবনে এই আলস্য হচ্ছে অগ্রগতির পথে একটি প্রধান বাধা। এক নম্বর শত্রু হচ্ছে রাগ আর আলস্যকে শত্রু না বলে চোরাবালি বলা ভালো। কারণ আলস্যকে দেখা যায় না। কিন্তু একবার যদি আপনি ভোবেন আপনি ক্রমশ নিচের দিকে নামতে থাকবেন। অলস মানুষ কখনো বড় কাজ করতে পারে না।

প্রশ্ন : মেডিটেশনের মাঝখানে আমার খুব ঘুম পায় এবং মেডিটেশন শেষে হাই তুলতে থাকি। মেডিটেশন শেষ হওয়ার পর মনে হয় একটু ঘুমিয়ে নিই। আমার মেডিটেশন হয় কি হয় না?

উত্তর : আপনার শিখিলান হয় না। আপনার ঘুমায়ন হয়। ঘুমকাতরতার পরিণাম নিয়ে সুফিদের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। গল্পটা হচ্ছে—একজন খুব ভালো মানুষ। জীবনে কোনো খারাপ কাজ করে নি ভালো কাজ ছাড়া। তার সমস্যা একটাই ছিলো আর তা হলো ঘুম। নামাজে ঘুম, জিকিরে ঘুম এমনকি বসে থাকলেও ঘুম।

লোকটি মারা গেল। বিচারের সময় দেখা গেল তার জীবনে কোনো অপরাধ নেই, অন্যের প্রতি কোনো জুলুম নেই, প্রতারণা, জুরাচুরি নেই। শুধু এই ঘুমকাতরতা ছাড়া আর সবকিছুই তার ভালো। সাব্যস্ত হলো যে, সে

বেহেশতে যাবে। কিন্তু তাকে যেতে হবে হেঁটে। সে হাঁটা শুরু করলো। বেহেশতের দরজায় এসে যখন ধাক্কা দিলো, ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খোলা হবে। তুমি তৈরি থাকো।

সে ভাবলো যে, এতটা হেঁটে এসেছি, একটু গড়িয়ে নিই। দরজা খুললে তো টের পাবোই। এই ভেবে একটু গড়াগড়ি যেতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে। ঘুম তো ঘুম, মহা ঘুম।

ঘুম ভাঙলো তার এক প্রচণ্ড আওয়াজে। আর সেই আওয়াজ ছিলো দরজা বন্ধ হওয়ার। সে লাফ দিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। ভেতর থেকে তখন জবাব এলো—বেহেশতের দরজা খোলা হয়েছিলো, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি অপেক্ষা কর, আবারও তা খোলা হবে ৫০০ বছর পর। অর্থাৎ এত যদি ঘুম পায় দেখা যাবে যে, বেহেশতের দরজায় গিয়েও আপনি বেহেশতে ঢুকতে পারছেন না।

মেডিটেশনে ঘুমানো কিন্তু অনেকটা সেরকমই। ঘুমিয়ে পড়লে আপনি মেডিটেশনের আনন্দ থেকে, প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকছেন। আর এই ঘুমকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে আপনাকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে মেডিটেশন করুন এবং সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পদ্মাসনে মেডিটেশন। পদ্মাসনে মেডিটেশন করলে ঘুম পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

প্রশ্ন : আলস্যের কারণ কী? আলস্য কাটাতে কোন মেডিটেশন করবো?

উত্তর : আলস্যের মূল কারণ অন্তর্গত হতাশা। হতাশা যখন অবচেতন স্তরে চলে যায়, তখন এর প্রকাশ হয় আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রিতার মধ্য দিয়ে। হতাশাকে জয় করতে পারলে, আনন্দকে আপনার অস্তিত্বের সাথে একাকার করতে পারলে, কোনো ক্লান্তি থাকবে না, আলস্য থাকবে না, দীর্ঘসূত্রিতা থাকবে না। অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাস এবং আনন্দকে একত্রিত করার জন্যই আনন্দের মেডিটেশন।

এই মেডিটেশনে আনন্দকে আমরা কন্ডিশনিং করি যাতে মুহূর্তে যেকোনো প্রতিকূলতা, সমস্যা বা বাধার মুখে নিজের ভেতর থেকে আনন্দকে নিয়ে আসতে পারি। আমাদের মুনি-ঋষি বা অলি-বুজুগরা ঠিক একইভাবে আনন্দকে নিয়ে আসতেন। এছাড়া অটোসাজেশন বইয়ে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতাকে জয় করার জন্যে অনেকগুলি অটোসাজেশন রয়েছে। এগুলোর চর্চা করেও আপনি আলস্যকে দূর করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমার সচ্ছলতার পেছনে প্রধান অন্তরায় অলসতা, জড়তা ও পাছে লোকে কিছু বলে ভাবা। কীভাবে মুক্তি পাবো?

উত্তর : আপনি তো শনাক্ত করেছেন। অলসতার জন্য নিজেকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করুন। প্রতিদিনের রুটিন করুন। সহজ রুটিন করবেন যা আপনার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব। কারণ রুটিন করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন কঠোর রুটিন করে ফেলি যা বাস্তবে অনুসরণ করা হয়তো সম্ভব নয়। এজন্যে এমন একটা রুটিন করবেন যা আপনি অনুসরণ করতে পারবেন।

এবার প্রতিদিন একটু একটু করে চেষ্টা করুন রুটিনের মধ্যে থাকতে। ঠিকমতো পালন করতে পারলে নিজেকে ধন্যবাদ দিন, পুরস্কৃত করুন। আর যেদিন রুটিন পালন করতে পারলেন না—নিজের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

আর পাছে লোকে কিছু বলে—এটা হচ্ছে সংকোচ, জড়তা। সংকোচ, জড়তার যে মেডিটেশন [৯নং সিডি সাইড-বি] নিয়মিত করুন। নিয়মিত সাহসের মেডিটেশন [২নং সিডি সাইড-বি] করুন। দেখুন—ভয়গুলোকে লিখে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আপনি সাহসী হয়ে কাজ করছেন।

প্রশ্ন : গান করা বা খেলাধুলা করা কি অলসতার মধ্যে পড়ে? অবসর সময় ও অলস সময় কাটানোর পার্থক্যটা কোথায়?

উত্তর : না, খেলাধুলা আলস্যের মধ্যে পড়ে না। ফুটবল খেলায় আলস্য থাকে না। দৌড় দৌড় দৌড় ওখানে। হাঁপাতে হাঁপাতে আপনার আলস্য থাকবে না। খেলাধুলা আলস্যের মধ্যে পড়ে না। আর গান যদি নিজে করেন সেটাও একটা চর্চা, একটা সাধনা। গান গাওয়া, আবৃত্তি করা এটা একটা কলা, এটা একটা আর্ট। যেকোনো আর্টের চর্চা করতে পারেন।

আসলে ব্যস্ততাই জীবন। যে জীবনে কাজ নেই সেটা কোনো জীবন নয়। একটাই জীবন। এখানে অবসরের কোনো সুযোগ থাকাই উচিত নয়। একজন মানুষ সবসময় কাজ করবেন, হয় নিজের কল্যাণে, না হয় অন্যের কল্যাণে। তাহলেই তিনি ভালো থাকবেন। সুখে থাকবেন। আর অলস সময় থাকলে তার মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা হয়ে অশান্তিই বাড়াবে।

প্রশ্ন : ঘুম কি এক ধরনের আলস্য? আমি সকাল ছয়টা থেকে বিকেল চারটা/পাঁচটা পর্যন্ত কলেজ, স্যারের বাসা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। বাসায় এসে

ঘুম পায় কিন্তু আমি মোটামুটি পড়া শেষ না করে ঘুমাই না। যখন ঘুমিয়ে পড়ি, মা-বাবা বকাবকি করে। এটা কি কোনো অলসতা?

উত্তর : আসলে ঘুম কতক্ষণ হওয়া উচিত? একজন মানুষ যদি একঘণ্টা মেডিটেশন করে তাহলে তার ঘুম পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। এর চেয়ে বেশি ঘুম এলেই সেটা আলস্য।

প্রশ্ন : টিভি দেখা কি আলস্য হতে পারে?

উত্তর : হতে পারে। বরং বলা যেতে পারে যে, এখন আমরা আকাশকুসুম কল্পনা করি না, আকাশকুসুম কল্পনা দেখি। কারণ আকাশকুসুম কল্পনা করার জন্যেও যে শ্রম দরকার, যে চিন্তা দরকার সেটাও আমরা করতে চাই না। যেমন, আকাশকুসুম কল্পনা করতে হলে আমাকে ভাবতে হবে যে, পরীর সাথে উড়ে বেড়িলাম, পরীর রাজ্যে চলে গেলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমরা সে কল্পনাটুকু করার কষ্টও করি না। আমরা অলস সময় কাটাই এবং এর জন্যে আমাদের আবার যুক্তির কোনো অভাব হয় না।

আমরা অনেকে বলি—কাজ করে কী হবে, আমি তো চাকরি পাবো না। তার চেয়ে ঘুরে বেড়াই, বাবার হোটেলে খাই। বকা দিলেও দিনের শেষে খাবার তো দেবেই। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিটি কাজ অসম্ভব সেই ব্যক্তির কাছে যে কখনো কাজ করার উদ্যোগ নেয় নি। এটা আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রের একটা অংশ যে, আমরা অনেকেই অন্যের ওপরে যদি চলতে পারি, নিজে আর কাজ করতে চাই না।

এই আলস্য আগে ছিলো আকাশকুসুম কল্পনা। পরে ফালতু আড্ডা এবং এখন এই জায়গা দখল করে নিয়েছে আহাম্মকের বাস্তব—টিভি।

মোবাইল/ গেমস/ ইন্টারনেট

প্রশ্ন : আমি এক ছেলের সাথে ফোনে কথা বলি। জানি এতে আমার সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অভ্যাসবশত অনেকদিন যাবৎ বলছি। আমি আজ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফোনে আর কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলবো না। গুরুজী, আপনার উপদেশ পেলে খুশি হবো।

উত্তর : যাদের জীবনে কাজ থাকে, তারা অনেকসময় প্রয়োজনীয় কথা বলারও সুযোগ পায় না। আর অপ্রয়োজনীয় কথা বলার তো প্রশ্নই আসে না।

আসলে আমরা যদি জীবনকে দেখি তাহলে দেখবো, সময় এবং কাজ—এ দুটোর যোগফলই জীবন। সময় যদি না থাকতো তাহলে কাজ করা যেত না। আর কাজ যদি না করি সময়টা কোনো উপকারে আসতো না। জীবন কখনো ফলপ্রসূ হতো না। কিছুই যদি না থাকতো—খাওয়া, পড়ালেখাসহ অন্য কোনো কাজই যদি না থাকতো তাহলে জীবন কী নিয়ে হতো এর জবাব দার্শনিকরা দিতে পারবেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ, সময় + কাজ = জীবন। সময় আছে, কাজ নেই তার মানে জীবন নেই।

ফোনে আর কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলার যে সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনার এ সিদ্ধান্তকে কবুল করুন।

প্রশ্ন : কম্পিউটারে গেম খেলে, ঘুমিয়ে আমার অনেক সময় অপব্যয় হয়। এ সময় অপব্যয় থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়?

উত্তর : জীবনের জন্যে কোনো বড় লক্ষ্য ঠিক করুন। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। ব্যস্ততা বাড়লে কম্পিউটার গেম খেলার সময় পাবেন না।

প্রশ্ন : ফোনে কথা বলা, ইন্টারনেটে চ্যাট করা এবং বাজে চিন্তা থেকে কীভাবে মুক্ত থাকা যায়?

উত্তর : আসলে জীবনের একটা লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে যে, আমি জীবন থেকে কী চাই। জীবনের এই মনছবিটা যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে এসব সময়খাদকের ফাঁদে আপনি কখনো পড়বেন না।

আর লক্ষ্য না থাকলেই দেখা যাবে এসব আপনাকে গ্রাস করছে। আপনাকে শোষণ করা খুব সহজ হবে। যারা শোষণ করছে তাদের প্রতি আপনি কখনো চ্যালেঞ্জ হতে পারবেন না। কারণ, আপনি আপনার মেধাকে বিকশিত করতে পারবেন না।

আর মেধার বিকাশ করা ছাড়া আপনি কখনো বড় হতে পারবেন না। মেধার বিকাশ করা ছাড়া কখনো জয়ী হওয়া যায় না। পৃথিবীতে যে জাতি বা যে ব্যক্তি বিকশিত হয়েছে কেউ অলস ছিলেন না। আলস্যকে প্রশ্রয় দেন নি। তারা সবসময় আলস্যকে জয় করেছিলেন।

প্রশ্ন : ডাব উৎপাদন গত পাঁচ বছরে কমেছে। এটা নাকি মোবাইল ফোন ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশনের জন্যে। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : শুধু ডাব উৎপাদনই নয়, প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সাথে সাথে আধুনিক মানুষের জীবনে যে বিপর্যয়টি ভয়াবহভাবে ধেয়ে আসছে তা হলো এই ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন সৃষ্ট তড়িৎদূষণ বা ইলেক্ট্রোপলিউশন। এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক বিপরীত স্রোত পত্রিকার ডিসেম্বর, ২০১১ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞার একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ ছাপা হয়েছিলো।

তাতে বলা হয়, আধুনিক প্রযুক্তির তড়িৎ কৌশলসমূহ—যেমন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হেয়ার ড্রায়ার, টোস্টারসহ এখনকার কোটি কোটি মানুষের নিত্যব্যবহার্য মোবাইল ফোনের কারণে গত দুই দশক আগের তুলনায় মানবসমাজ আজ কোটি গুণ বেশি ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দূষণে আক্রান্ত। সেইসাথে আবাসিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল এলাকায় অহরহ বিল্ডিংয়ের ছাদে গড়ে তোলা বেইজ স্টেশন বা টাওয়ার এন্টেনার রেডিয়েশন তো আছেই।

গবেষণায় দেখা গেছে—মোবাইলে ফোনে কথা বলার সময় কান ও ব্রেনের কোমল টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা পরবর্তীতে ব্রেন টিউমার, ব্রেন ক্যান্সার ও অটিজমের ঝুঁকি বাড়ায়। ২০০৩ সালে সুইডেনের একদল বিজ্ঞানী দেখান যে, দিনে গড়ে একঘণ্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে ব্রেন ক্যান্সার বা টিউমার হওয়ার ঝুঁকি ৩০% বেড়ে যায়। কোনো শিশু মোবাইলে মাত্র দুই মিনিট কথা বললেও তার ব্রেনে এতটাই প্রভাব ফেলে যে, পরবর্তী এক ঘণ্টায়ও তা স্বাভাবিক হয় না। ১৯৭০ সালে প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে মাত্র একজনকে পাওয়া যেত অটিস্টিক। ২০০৩ সালে এ সংখ্যা হয় ১৬৬ জন! আর ২০০৮ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, আমেরিকায় প্রতি ৮৮ জন শিশুর একজন অটিস্টিক!

এটা তো গেল মোবাইল সেটের ক্ষতি। কিন্তু যারা বেইজ স্টেশন বা টাওয়ার এলাকায় থাকেন, তারা তো ২৪ ঘণ্টাই আছেন উচ্চ ক্ষমতার এই বিকিরণের ভেতরে! সামান্য একটু উঁচু জায়গা পেলেই আমাদের দেশে যেভাবে ব্যাণ্ডের ছাতার মতো এসব টাওয়ার দাঁড়িয়ে যায়, তা দেখেই বোঝা যায় বিষয়টা নিয়ে আমাদের কোনো সচেতনতাই নেই। অথচ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে জনবসতি এলাকায় তো দূরের কথা, একটা টাওয়ার স্থাপনের

জন্যে মানতে হয় অনেক বিধি-নিষেধ। অনেক উঁচুতে নির্মাণ করতে হবে, নির্ধারিত মাত্রার বেশি বিকিরণ করা যাবে না ইত্যাদি।

যা-ই হোক, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এসব যখন হবে তখন হবে। কিন্তু তার আগে একজন সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবে মোবাইলের ক্ষতি থেকে কিছুটা হলেও বেঁচে থাকার জন্যে আপনি যা করতে পারেন তা হলো—মোবাইল ফোন যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করা। শুধু প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলেই ফোন রেখে দিন। অন অবস্থায় সেটটাকে দেহ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবেন। ঘুমের সময় মাথার কাছে না রেখে পাঁচ/ ছয় ফুট দূরে রাখুন। আর চেষ্টা করুন কথা বলার সময় এয়ারফোন ব্যবহার করতে। আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলো শিশুদেরকে মোবাইল থেকে দূরে রাখা।

আসলে আধুনিক প্রযুক্তির উপকরণগুলো আমাদের যেমন ব্যবহার করতে হবে, পাশাপাশি চেষ্টা করতে হবে এগুলোর ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার।

প্রশ্ন : মোবাইল ফোন ব্যবহার করার নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আপনি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তারা কি আর ফোন ব্যবহার করবেন না? আর যদি ব্যবহার করেন তাহলে ব্যবহারটা কী রকম হবে?

উত্তর : প্রয়োজনে। যদি মোবাইল ফোন আপনার আসলেই প্রয়োজন থাকে তাহলে ব্যবহার করবেন। যখন কারো সাথে আপনার কথা বলার প্রয়োজন থাকে তখনই মোবাইল অন করবেন। বাকি সময় অফ করে রাখুন। নির্দিষ্ট বিরতিতে মোবাইল ফোন অন করবেন। এতে আপনার সময় অনেক বেঁচে যাবে। তারপর রাতের বেলা মোবাইল ফোন অফ রাখবেন। যেমন, কোয়ান্টামে আমরা যারা অগ্রসর সদস্য আছি, আমরা রাত ১১টার পর মোবাইল ফোন অফ করে রাখি। বলবেন যে, এ সময় যদি জরুরি কোনো খবর আসে। খবর যদি আসেই তাহলে আপনি কী করবেন? আপনাকে তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে হবে। ফলে আমরা দেখেছি, অনেক অশান্তি, অস্থিরতা থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারছি।

প্রশ্ন : গুরুজী, এখন হঠাৎ করে মোবাইলের কল, এসএমএস করা কমিয়ে দিলে বা একেবারেই বন্ধ করে দিলে বন্ধ বা বান্ধবীরা মাইন্ড করবে। সেক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে।

উত্তর : এই যে বন্ধু ও বান্ধবী—এরা আসলে কেউ বন্ধুও না, বান্ধবীও না । এরা সহপাঠী এবং এদের কোনো কাজ নেই । এদের যদি কাজ থাকতো, তাহলে এরা অপেক্ষা করতো না আপনার এসএমএস বা মোবাইলের জন্যে । যখন এদের কাজ থাকবে তখন আপনি মোবাইল করে এদেরকে পাবেন না । এরকম বন্ধু বা বান্ধবী যত কম হয় তত ভালো । আর অপ্রয়োজনীয় মেসেজের জবাব দিয়ে সময় নষ্ট করলে আপনার মেধার বিকাশই বিলম্বিত হবে ।

প্রশ্ন : কারো জন্মদিনে কি এসএমএস করে শুভেচ্ছা জানানো যাবে?

উত্তর : আসলে যেকোনো উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে একটি চিঠিই যথেষ্ট । তবে এখন যেহেতু এসএমএস, ই-মেইলের যুগ, আপনি এসএমএস বা ই-মেইল করেও শুভেচ্ছা জানাতে পারেন ।

প্রশ্ন : যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তাদের অনেকেই ফেসবুক নিয়ে মেতে থাকেন । ফেসবুক বা ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কি?

উত্তর : আসলে এই ফেসবুক হচ্ছে একটা ফেসলেস বুক । এবং এটাতে যদি বেশি মেতে থাকেন তো আপনার ফেস বলে আর কিছু থাকবে না । মানে এর চেয়ে সময়ের অপচয় আর কিছু নেই । আসলে ফেসবুক নিয়ে সম্প্রতি সমাজবিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গবেষণা পরিচালনা করছেন । তারা দেখছেন—আধুনিক মানুষের অস্থিরতার একটা বড় কারণ হলো ফেসবুক বা সামাজিক যোগাযোগের নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট—এগুলোর তৎপরতা ।

ফেসবুকসহ আরো যেসব সোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট আছে—টুইটার, গুগল প্লাস, লিংকড-ইন—সবগুলোরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো—আসক্তি । ধরুন আপনি ফেসবুকে অন্তর্ভুক্ত হলেন । আপনি কী করবেন? প্রতিদিন নিয়ম করে আপনার বন্ধুদের আপডেটেড স্ট্যাটাস পড়তে শুরু করবেন । তারপর আপনি দেখবেন এখানে স্কুল-কলেজের পুরনো বন্ধু-বান্ধবীদের অনেককেই পেয়ে গেছেন । তাদের ছবি দেখছেন । আপনি তখন আপনার ছবিও দিতে চাইবেন—আপনার নিজের ছবি, বাড়ির ছবি, পোষা কুকুরের ছবি—সবকিছুই ।

এখানেই শেষ নয় । আপনি চাইবেন এ ছবিগুলোতে আপনার বন্ধুরা প্রতিদিন কमेंট পাঠাক । আপনিও তাদের সবকিছুতে কमेंট পাঠাতে থাকবেন । আর ফেসবুকের সবচেয়ে আসক্তিকর দিক হলো এর গেমসগুলো । কাজ বাদ দিয়ে বা পরিবারের সাথে সময় না কাটিয়ে গেমসে ঘন্টার পর ঘন্টা

যেভাবে আমরা সময় নষ্ট করি তাতে এটাকে আসক্তি বললেও কম বলা হয়।

আর ফেসবুকের আরেকটি ক্ষতিকর প্রবণতা হলো—এখানে আপনার সবকিছুই উন্মুক্ত। একবার আপনি যখন ফেসবুকে সাইন আপ করছেন, আপনি পৃথিবীর কাছে নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরছেন। আপনার সম্পর্কে যে কেউ যেকোনো ধরনের তথ্য জানতে চাইলে সে তা পেয়ে যাবে ফেসবুকে। আর এটা ব্যবহার করে আপনাকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে আপনাকে যেকোনো স্বার্থের জন্যে ব্যবহার—সবকিছুই সে করতে পারবে।

ফেসবুকে ইউজাররা নিজেদের সম্পর্কে এত ব্যাপক তথ্যাদি দেন যে, চাইলে যেকোনো ব্যক্তি এই তথ্যগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাকে হেনস্থা করতে পারে। যেমন, আপনি হয়তো কোনো চাকরির জন্যে আবেদন করেছেন। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যদি চায় তাহলে আপনার এমন অনেক তথ্য ফেসবুক থেকে নিতে পারে যা আপনি তাদের জানাতে পছন্দ করতেন না বা জানানোটা আপনার ঐ প্রতিষ্ঠানে ঢোকান ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে সাধারণ ইউজাররা কিন্তু নিজের অজান্তেই তুলে দিচ্ছেন নিজের সম্পর্কে এসব তথ্য যা ব্যবহৃত হচ্ছে তার নিজেরই বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে নিউজউইকের জুন, ৭ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ‘দি হাই প্রাইস অফ ফেসবুক’ নামে, যাতে বলা হয়েছে—পাশ্চাত্যে আধুনিক ‘টেকি জেনারেশন’-এর একটা গ্রুপ এখন ফেসবুককে বর্জনের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন যাকে তারা বলছেন মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ভঙ্গের এক জঘন্য আক্রমণ।

ফেসবুক নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিলো দৈনিক ইন্ডিয়াকের ৯ জুন, ২০১০ সংখ্যায়। পাঠকের সুবিধার্থে সে প্রতিবেদনের সংক্ষেপিত অংশটি এখানে দেয়া হলো—

ফেসবুক : সময় অপচয়ের নতুন ফাঁদ

বিশ্বের ৪০ কোটিরও বেশি লোক ফেসবুকে একাউন্ট খুলেছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ২০ কোটি প্রতিদিন ফেসবুকে ঢোকে। এদের প্রত্যেকের গড়ে ১৩০ জন করে ‘বন্ধু’ আছে। মাসে ফেসবুকের সব ব্যবহারকারী মিলে এর পেছনে ৫০ হাজার কোটি মিনিট সময় ব্যয় করে—এ কথাগুলো বহুল আলোচিত সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট ‘ফেসবুক’ নিজেই সদর্পে লিখে রেখেছে তার পরিসংখ্যান পাতায়।

এই বিপুল সময়কে ঘণ্টা দিন বছর-এভাবে হিসেব করলে হয় নয় লাখ ৫১ হাজার ২৯৩ বছর। অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠীর এক মাসের মোট সময় থেকে সাড়ে নয় লাখ বছর নিজের পেছনে খরচ করাতে পারা ফেসবুকের কাছে দারুণ গর্বের বিষয়। কিন্তু যারা সেই সময়টা ফেসবুককে ‘উৎসর্গ’ করেছে তারা কী পাচ্ছে সেটা জানার জন্যে ‘ফেসবুক’ আসলে কী সে সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা দরকার। আর মা-বাবাদের জানা উচিত তাদের সন্তানরা ফেসবুকে বঁদ হয়ে আসলেই কতটা ‘সামাজিক’ হয়ে বেড়ে উঠছে।

পৃথিবীর কোটি কোটি ওয়েবসাইটের একটি হচ্ছে এই ফেসবুক ডটকম। ফেসবুকে একাউন্ট খুলে সেখানে আপনার পরিচয় লিখতে পারেন, ব্যক্তিগত ছবি রাখতে পারেন। আপনার বর্তমান অবস্থা, অবস্থান ইত্যাদি লিখে রাখতে পারেন। অন্যরা আপনাকে ‘বন্ধু’ হিসেবে তাদের একাউন্টে যোগ করলে আপনার একাউন্টে যা লিখে রেখেছেন কিংবা যেসব ছবি সেখানে দিয়ে রেখেছেন সেগুলো সবাই দেখতে পাবে।

আপনি অন্যদের প্রোফাইলে ঢুকে তারা যে মন্তব্য লিখে রেখেছেন কিংবা যেসব ছবি দিয়ে রেখেছেন তার প্রেক্ষিতে মন্তব্য লিখতে পারেন। এভাবে মন্তব্য কিংবা পাল্টা-মন্তব্য চালিয়ে যেতে পারেন। মোটামুটি এই হলো ফেসবুক এবং এর ‘সামাজিক যোগাযোগ’।

তরুণ প্রজন্ম ফেসবুকের মাধ্যমে কী ধরনের সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করছে সেটা পর্যবেক্ষণের জন্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এমন ১০ জন তরুণের প্রোফাইল বেছে নিয়ে তা ফলো করা হয়। কमेंট লেখার সময় বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত ১১টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত এ ওয়েবসাইটের পেছনে সময় ব্যয় করেছে!

তাদের ‘একটিভিটি’ লিস্ট থেকে দেখা যায়, সবাই এ সময়টুকু বিভিন্ন মেয়ের প্রোফাইলে মন্তব্য লিখে সময় কাটিয়েছে। আবার কেউ কেউ অন্যের ছবির এলবামে ঢুকে সেখানে অশ্লীল মন্তব্য লিখেছে! এভাবে দিনের কিংবা রাতের মূল্যবান সময় খরচ করে ‘সামাজিক যোগাযোগ’ রক্ষা করেছে তরুণ প্রজন্ম!

আমাদের দেশে ফেসবুকে একাউন্ট খুলেছে প্রায় আট লাখ ৭৬ হাজার জন। এর মধ্যে পুরুষ ছয় লাখ ৪৩ হাজার আর মহিলা দুই লাখ ৩৩ হাজার। এদের মধ্যে ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ আট হাজার। অর্থাৎ মোট ব্যবহারকারীর অধিকাংশই এমন বয়সের, যে বয়সের মূল ব্রত হওয়া উচিত শিক্ষালাভ কিংবা ক্যারিয়ার গঠনে মনোনিবেশ।

আর তারাই রাত জেগে এই ‘সামাজিক যোগাযোগ’ রক্ষা করে চলেছে!

যারা পড়াশোনা শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছেন বলে ধরে নেয়া যায় (২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী) তাদের মধ্যে ফেসবুকে একাউন্ট খুলেছেন মাত্র ৫৩ হাজার। ৩৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সীদের মধ্যে ফেসবুক ব্যবহারকারী আছেন সাত হাজারের মতো। অর্থাৎ, যে বয়সী লোকদের প্রচুর অবসর, যাদের পুরনো বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার কথা, ফেসবুকের প্রতি তাদের আগ্রহ সামান্যই। ফেসবুক টিকে আছে অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান সময় গলাধঃকরণ করে।

ফেসবুকে একজন পুরুষের গড়ে আড়াইশ ‘বন্ধু’ আছে। আর একটি মেয়ের গড়ে এক হাজার ‘বন্ধু’! কোনো কোনো মেয়ের ‘বন্ধু’সংখ্যা পাঁচ হাজার! পুরুষের বন্ধু তালিকায় যারা থাকে তার অল্প কয়েকজন তার চেনাজানা পুরুষ বা নারী বন্ধু আর বাকিরা হয় অপরিচিত নারী বা নারীর ছদ্মবেশী পুরুষ। তরুণরা ফেসবুকে ঢুকে বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে নারী ব্যবহারকারীদের মনোযোগ আকর্ষণে।

বাসা কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে অনেক ছাত্রছাত্রী ও অফিসে বসে অনেক কর্মচারী ফেসবুকে সময় ব্যয় করেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন জার্মানি ইটালিসহ উন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ নামকরা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেসবুক ব্লক করা।

যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ করপোরেট অফিসে ফেসবুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ হার ব্রিটেনে প্রায় ৭০ শতাংশ এবং অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৫৫ শতাংশ। ফ্রান্স স্পেন ইটালি জার্মানি জাপানসহ বহু দেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে ফেসবুক বন্ধ করে রাখা হয়। অনেক অফিসে এর ব্যবহার ‘চাকরি ছাঁটাইযোগ্য অপরাধ’ হিসেবে নিয়োগপত্রে শর্ত থাকে।

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা বসে বসে বন্ধু খোঁজা এবং প্রোফাইলে মন্তব্য লেখাকে সামাজিকতা মনে করেন। আর এভাবে আপনি যত বেশি ‘সামাজিক’ হবেন ফেসবুকের ব্যাংক একাউন্টে তত টাকা জমা হবে। ফেসবুক ওয়েবসাইটে ঢুকে যতবার যেকোনো লিংকে ক্লিক করবেন ততবার নতুন করে বিজ্ঞাপন লোড হবে। একবার লোড হলে তাকে এক ইম্প্রেশন বলে। প্রতি এক হাজার ইম্প্রেশনের জন্য ওই বিজ্ঞাপনদাতা থেকে ফেসবুক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেয়ে থাকে।

এই ব্যবসায় মূলধন হচ্ছে ফেসবুক ব্যবহারকারীদের মতো ‘সামাজিক’ মানুষের অপচয় করা সময়। যারা ঘুণাঙ্করেও বুঝতে পারছেন না তাদের

ব্যবহার করে কীভাবে কোটি কোটি ডলার আয় করছে ফেসবুকের কর্তৃধারেরা। ২০০৯ সালে ফেসবুকের আয় ছিলো ৫৫০ মিলিয়ন ডলার। আর ২০১০ সালে এর আয় এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছে তারা। একজন ব্যবহারকারীর মাধ্যমে সিপিএম এ্যাড থেকে দুই ডলার আয়ের টার্গেট থাকে ফেসবুকের।

প্রতিটি প্রযুক্তির প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ নির্ভর করে এর ব্যবহারকারীর ওপর। তেমনি ফেসবুকও। এখানে একটি মন্তব্য লিখে আপনি সবাইকে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার অবস্থা কিংবা অবস্থান। সেলিব্রেটিরা তাদের ভক্তদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেন। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ রাখতে পারে ক্লায়েন্টদের সাথে। গ্রুপ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে পরস্পরের সাথে। নিজের অনুভূতি বিনিময় করতে পারেন বন্ধুদের সাথে।

ফেসবুক ব্যবহারকারীদের অজুহাত—এখানে ছেলেবেলার বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যায়। তা-ই যদি হয় তাহলে স্কুল বা কলেজে যাদের সঙ্গে পড়েছেন তাদের খুঁজে বের করা কি জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত?

পড়াশোনা ও ক্যারিয়ারের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি ডেকে এনে দিনের পর দিন চলছে এ সামাজিক যোগাযোগ। একজন মানুষ দৈনিক তিন/ চার ঘণ্টা এই যোগাযোগে ব্যয় করছে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খুঁজতে। সবার প্রোফাইলে ঢুকে ‘কমেন্ট’ লেখার এ সামাজিকতায় নিজের অলক্ষ্যে জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অতি মূল্যবান সময়।

প্রশ্ন : কম্পিউটার গেমসে আসক্তি থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : কোয়ান্টায়ন করুন। কম্পিউটার গেমসে সময় নষ্ট করার কারণে আপনার কী কী ক্ষতি হয়েছে সেগুলোকে তালিকাভুক্ত করুন। নিজের জন্যে রুটিন তৈরি করুন। পেশা ও বাসার সময় বাদ দিয়ে বাকি সময়টা ফাউন্ডেশনে আত্ম উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে ব্যয় করুন। দেখবেন কম্পিউটার গেমসের আসক্তি দূর হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমার চুপচাপ থাকতে অনেক ভালো লাগে। সময় পেলেই চুপচাপ শান্তভাবে বসে থাকি। একধরনের প্রশান্তি কাজ করে মনে। আর সবধরনের কোলাহল থেকে দূরে থাকি। এজন্যে অনেক বকা শুনতে হয়। এই চুপচাপ থাকা কি খারাপ?

উত্তর : আসলে চুপচাপ থেকে আমি কী করছি—এটাও গুরুত্বপূর্ণ। চুপচাপ অলস ভাবনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলাম, এটাও সময়ের অপচয় হলো, এটাও অলস্য। শুধু চুপচাপ থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন : কাজের সুবিন্যাসায়ন কী? কীভাবে? কাজ করতে গিয়ে আমি যে সমস্যায় পড়ি তা হলো—ক) যেদিন গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম থাকে সেদিন কাজ বেড়ে যায়; খ) তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, নয়তো প্রোগ্রামে যাওয়া হয় না; গ) পরিশ্রম বেশি কিন্তু সফলতা কম। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কাজের চাপে হয় না। রাতে শোবার আগে মন খারাপ হয় যে, সব কাজই ঠিকমতো হয়েছে কিন্তু পড়াশোনাটা হয় নি। জ্ঞান অর্জনে সারা জীবনই বাধার সম্মুখীন হচ্ছি।

উত্তর : আপনার সবগুলো সমস্যাই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। যেমন, প্রথম দুটো ক্ষেত্রে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামের দিন কাজ বেড়ে যাওয়া বা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটা এবং প্রোগ্রামে যেতে না পারা—দুটি ক্ষেত্রেই আপনি হয়তো অবচেতনভাবেই চাচ্ছিলেন না প্রোগ্রামে যেতে। তাই বাস্তবেও কোনো না কোনো অজুহাত এসে বাধাধস্ত করছে আপনাকে। হয়তো অসুস্থ বোধ করলেন বা এমন একটা কারণ হলো যে, আপনার আর যাওয়া হলো না।

যেমন, অনেক ছাত্রছাত্রীই আছে—দিব্যি সুস্থ। কিন্তু পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসতেই সে অসুস্থ। কারণ পরীক্ষাকে সে ভয় পাচ্ছে, কোনোভাবে এড়াতে চাচ্ছে, সেজন্যেই এ অসুস্থতা। আবার যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে হয়তো টাইফয়েড নিয়েও পরীক্ষা দিচ্ছে। অন্যজন হয়তো সামান্য পেট ব্যথার সামনেই কাবু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মূল ব্যাপারটি হচ্ছে অবচেতন মনে ইচ্ছার তীব্রতা। অবচেতন মন না চাইলে বাস্তবেও বাধা-বিপত্তি এসে হাজির হয়। তখন মনে হয়—হয়তো নিয়তি বা ভাগ্য এটা করেছে। কিন্তু আসল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ঐ ব্যক্তির হাতেই।

অতএব কোনো পরিস্থিতির দোহাই দেবেন না। যা আপনি করতে চান, সেভাবে অগ্রাধিকার ঠিক করে ফেলুন। বিশ্বাস করুন যে, কাজটি ঠিকমতো করতে পারবেন। এবং কাজটি করার জন্যে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হোন। তাহলেই দেখবেন—অজুহাত না দিয়ে আপনি কাজটি করতে পারছেন।

আর পড়াশোনার বাধার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এখানেও আপনার দৃঢ়তার অভাব। যদি পড়াশোনাকে প্রায়োরিটি দিতেন তাহলে যত বাধাই আসুক সেটা করতে পারতেন। কারণ আপনি তো ঐ সময়ে কোনো না কোনো কাজ

করছেন। অন্য কাজ করার জন্যে আপনি সময় পাচ্ছেন। কিন্তু পড়াশোনার জন্যে পাচ্ছেন না। কেন? কারণ আপনি এটাকে প্রায়োরিটি দিতে পারেন নি।

তাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন যে, আপনি এ কাজটি করবেন। কারণ কাজ না করার হাজারটা অজুহাত দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কাজ করার জন্যে একটা কারণই যথেষ্ট যে, আমি কাজটি করবো।

ঈর্ষা/ হিংসা/ ঘৃণা

প্রশ্ন : আমি ঢাকায় পড়াশোনা করি বলে মা আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বেশ চিন্তিত থাকেন। এটা নিয়ে আমার বোন মার সাথে সবসময় বগড়া করে। আবার আমি কখনো নিজেরটা চেয়ে নিই না বলে মা আমার কথা বেশি চিন্তা করেন আর সে নিজেরটা নিজে বেছে নিলেও আমার প্রতি ঈর্ষা করে। আমি ওকে খুব ভালবাসি। কিন্তু কীভাবে ওকে ঈর্ষা থেকে বাঁচাতে পারি?

উত্তর : আসলে আমাদের অধিকাংশ মা-বাবা এই জায়গায় ভুল করেন। দৃশ্যমানভাবে একজনকে আদর বেশি করেন এবং তা প্রকাশও করেন। উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে, শপিংয়ের ক্ষেত্রে এই ভুলটি বেশি করেন। কখনো সচেতনভাবে, কখনো অবচেতনভাবে। কেনাকাটা করতে গিয়ে সবচেয়ে স্নেহাস্পদ ছেলে বা মেয়ের কথা মনে পড়লো। আচ্ছা, ওর জন্যে এটা নিয়ে যাই। আরেকজনের কথা হয়তো ভুলেই গেলেন। এখান থেকেই সন্তানদের মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয় এবং একসময় তা অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়।

বার্ট্রান্ড রাসেল তার এক বইয়ে একটি ঘটনার বর্ণনা করছিলেন। লুসি নামের একটি মেয়ে, তাকে তার নিজের কথা লেখার জন্যে কাগজ দেয়া হয়েছে। লুসি অনুসন্ধান করছে তার কী কী পাপ, তার মধ্যে কীভাবে এগুলো জন্ম নিলো। অনুসন্ধান করতে করতে তার মনে পড়লো প্রথম ঘটনা—কীভাবে তার মধ্যে ঈর্ষা জন্ম নিলো। সে বলছিলো, একদিন সকালবেলা নাস্তার সময় নাস্তার টেবিলে বসে আছি। বাবা দুটো জিনিস আনলেন। আমার বোনকে একটি ক্যাসেট দিলেন আর আমার ভাইকে একটি বল দিলেন। দুটো জিনিসই দুই জনকে দিলেন, আমাকে কিছু দিলেন না এবং আমাকে কিছু বললেনও না। সেই মুহূর্তে আমার ভেতর ঈর্ষার জন্ম নিলো।

অর্থাৎ এভাবেই ঈর্ষার জন্ম হয় ভাই-বোন বা বোন-বোন বা ভাই-ভাইয়ে। এবং যা পরিবার শুধু নয়, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রের বিপর্যয়েরও কারণ হতে

পারে। মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের উত্তরসূরি কে হবে তা নিয়ে তার সন্তানদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী বিরোধ হয়েছিলো এবং তার করুণ পরিণতির পেছনেও রয়েছে এই ঈর্ষা। বড় ছেলে দারাশিকোর প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণই তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবকে হয়তো ঠেলে দিয়েছিলো ভাইদের প্রতি তার নিষ্ঠুরতার দিকে যার পরিণতিতে সে পর পর হত্যা করেছিলো আপন ভাই সুজা, মুরাদ এবং দারাশিকো-কে।

প্রশ্ন : আমার মাঝে ঈর্ষা রয়েছে। ফাউন্ডেশনে কেউ আমার চেয়ে বেশি সময় দিলে ঈর্ষা বোধ হয়। কীভাবে এটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো?

উত্তর : ঈর্ষা থেকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে শোকর এবং সবর ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই। শোকর অর্থাৎ যা পেয়েছেন সেটার জন্যে সবসময় শোকর করতে হবে এবং সবর-যা পান নি সেটার জন্যে নিরলসভাবে পরিশ্রম করতে হবে। যত শোকর বাড়বে তত আপনার ঈর্ষা কমতে থাকবে।

সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কিন্তু কোনো ঈর্ষা নয়। আরেকজন একটা ভালো জিনিস পেয়েছে, সেই ভালো জিনিসটা পাওয়ার জন্যে আপনি চেষ্টা করছেন এর নাম ঈর্ষা নয়। ঈর্ষা হচ্ছে, সে কেন পেলো? আমি কেন পেলাম না?—এটা হচ্ছে ঈর্ষা, আমি পাবো সে পাবে না—এটা হচ্ছে ঈর্ষা।

আসলে ঈর্ষা এত মারাত্মক একটি দোষ যার সূক্ষ্ম উপস্থিতিও অনেক বড় ক্ষতি সাধন করতে পারে। ঈর্ষার একটি বিখ্যাত গল্প আছে।

একটা হাসপাতাল। তারই একটা কেবিনে দুজন রোগী পাশাপাশি। অনেকদিন ধরেই হাসপাতালে আছে। দুজনই খুব অসুস্থ। বিছানা থেকে নামতে পারে না। কোনোরকমে হয়তো হাঁটুতে একটু ভর করে বিছানায় বসতে পারে। এর বাইরে হাঁটাহাঁটি করা বা এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায় যাওয়া এসব কিছুই পারে না।

আত্মীয়-স্বজন তেমন একটা কেউ আসে না। হাসপাতালের নার্স বা ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে চেক-আপ করে যায়। তাদের যে অসুখ সেটাও ভালো হওয়ার না। এখন শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা।

স্বাভাবিকভাবেই দুজন যেহেতু একই অবস্থার শিকার, থাকেও একটা ঘরে, ভাব হয়ে গেল তাদের। যতক্ষণ ঘুমায় তো ঘুমায়। জেগে থাকলে, শরীরটা ভালো লাগলে একজন আরেকজনের সাথে নানান রকম গল্প করে। এর মধ্যে একজনের বিছানা জানালার পাশে, আরেকজনের দেয়ালের পাশে।

বিকেল হলেই দু'বন্ধু বিছানায় উঠে বসতো। আর গুটুর গুটুর করে গল্প করতো একজন আরেকজনের সঙ্গে।

একদিন বিকেলবেলা দেয়ালের পাশে যে আছে সে জানালার পাশের জনকে ডেকে তুললো। বললো, 'বন্ধু! তুমি তো বিছানায় বসলে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে পাও। বল না কী দেখা যাচ্ছে বাইরে? কতদিন আকাশ দেখি না, সবুজ ঘাস দেখি না। ঘাস-পাখি, মানুষ, শিশুদের কলকাকলি শুনি না! শুনে তার বন্ধুটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর সাথে সাথেই বিছানায় উঠে বসলো। আর জানালার দিকে তাকিয়ে একের পর এক দৃশ্য বর্ণনা করে যেতে লাগলো।

বললো, 'ঐ-তো দেখা যাচ্ছে বিশাল এক লেক। ওহ বন্ধু! তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, সেই লেকের পানি যে কী নীল! আরে, ওটা কি! মাছরাঙা না! আরে আরে, এ যে দেখছি একঝাঁক রাজহাঁস। কী সুন্দর করেই না জলে ঝাঁপাঝাঁপি করছে।'

শুনতে শুনতে দেয়ালের পাশের বন্ধুর চেহারাটা আনন্দে চকচক করে উঠলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, দেখ না বন্ধু, কোনো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখা যায় কি না। সেখানে কি কোনো শিশু খেলছে? বয়স কত শিশুগুলোর?

খেলছে মানে? এক ঝাঁক ফুটফুটে শিশু খেলছে লেকের পাশে বিশাল এক মাঠে। বয়স... হাঁ, শিশুগুলো তো তোমার নাতিটার বয়সীই হবে। জানো, শিশুদের মায়েরা না মাঠের পাশে বসে বসে গল্প করছে আর তাদের ছেলেদের খেলা দেখছে। কী যে সুন্দর দৃশ্য!

এইভাবে প্রতিদিন বিকেল হলেই শুরু হতো দুই বন্ধুর গল্প।

একেক দিন দেখা যেত একেক দৃশ্য। একদিন পয়লা বৈশাখে শহরের সবচেয়ে বড় র্যালিটা গেল সে রাস্তা দিয়ে। কত রঙবেরঙের পোশাক পরে নারী-শিশু-পুরুষরা গেল। খুব সুন্দর করে এই দৃশ্যের বর্ণনা শোনালো জানালার বন্ধু তার পাশের জনকে।

এই ভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। খুব আনন্দে দিন কাটছে দুটো মানুষের। মাঝে মাঝে তারা ভুলেই যেত যে, বছরের পর বছর ধরে তারা বন্দি হয়ে আছে এই ইট-কাঠের নিরস হাসপাতালের বিছানায়।

কিন্তু দিন সবসময় একরকম থাকে না। একসময় ঈর্ষা ঢুকে গেল দেয়ালের দিকে যে আছে তার মধ্যে। সে ভাবতে লাগলো, যে জানালার পাশে আছে সে কেন এত ভাগ্যবান হলো। সে যদি জানালার পাশে থাকতো তাহলে কতই না ভালো হতো। ব্যস, এরপর থেকেই আর গল্পে কোনো মজা

পেত না সে। একসময় বজাও বুঝলো তার সঙ্গী আর আগের মতো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সে-ও দমে গেল। আন্তে আন্তে তাদের মধ্যে কথাবার্তা কমে যেতে লাগলো।

এদিকে যে গল্প বলতো তার শরীর খারাপ হতে লাগলো। একরাতে তার খুব শ্বাসকষ্ট দেখা দিলো। আশেপাশে কোনো নার্স ছিলো না। কাউকে যে ডাকবে সে অবস্থাও তার ছিলো না। পাশের জন দেখলো, কিন্তু কোনো সহযোগিতা করলো না। না নার্সকে ডাকলো, না তাকে কোনো সাহায্য করলো। অবচেতনে হয়তো তার এ চাওয়াই কাজ করছিলো যে, এ যদি মারা যায় তাহলে ঐ বিছানায় সে যেতে পারবে এবং জানালা দিয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখতে পাবে। তা-ই হলো। ছটফট করতে করতে একসময় মারা গেল সে।

সকালবেলা মৃতদেহটাকে সরিয়ে নার্স যখন নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানাটাকে আরেক রোগীর জন্যে তৈরি করছে, লোভাতুর চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবছিলো কতক্ষণে যাবে ওখানে। নার্সকে বলতেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। উঠে বসলো জানালায়। কিন্তু এ কি ! এ যে স্নেহ সাদা একটা দেয়াল। তার মানে! এতদিন তার সঙ্গী তাকে যে গল্প শুনিয়েছে তা আসলে বানানো! হায়! ঈর্ষা করে সে এ কি সর্বনাশ করলো তার প্রিয় সঙ্গীর!

তার মানে কী? সাদা দেয়াল-দেয়ালটা আগেও ছিলো, পরেও ছিলো, জানালার ধারে যিনি ছিলেন, তিনি কিন্তু তার গল্পে এমনভাবে সব জিনিস ফুটিয়ে তুলছিলেন, যে জানালার পাশে যিনি ছিলেন না তিনিও প্রত্যেকটা জিনিসই অনুভব করতে পারছিলেন। অপরজনকে আনন্দ দেয়ার জন্যেই তিনি কথাগুলো বলছেন। এবং দুইজনই সমভাবে আনন্দ পেয়েছেন।

কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত ঈর্ষা দ্বিতীয় জনকে স্পর্শ করে নি। যখনই ঈর্ষা স্পর্শ করলো, আনন্দ উবে গেল। পরিণতিতে তাকে পেতে হলো সঙ্গীহীন মমতাহীন এক কষ্টের জীবন। আসলে ঈর্ষাও এমন একটি বিষ যা আমরা নিজেরা পান করি। আর প্রত্যাশা করি অপর পক্ষ মারা যাবে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে, পেশাগত ক্ষেত্রে, সঙ্ঘের এবং সব ক্ষেত্রেই যখন ঈর্ষা আসবে-আপনার মেধার সমাপ্তি ঐখানে। বরকত শেষ হয়ে যায় ঐখানেই।

প্রশ্ন : আমি সবসময় হিংসা থেকে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু এরপরও অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিংসা করা হয়ে যায়। আর এই হিংসাত্মক অবস্থায় আমার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব নেমে এসেছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ খুব অশান্তি অনুভব হয়। প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও

তাত্ক্ষণিকভাবে এই হিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। এ অবস্থায় কী করবো? দয়া করে জানান।

উত্তর : খুব ভালো। এটা কিন্তু খুব সহজ, যখন এরকম হবে তখন কী করবেন? যেমন, কখনো কখনো রাগ এসে যায়। নবীজীরও যে রাগ হয় নি তা নয়। কিন্তু উনি রাগের কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটান নি। রাগ এলে দমন করে ফেলেছেন। রাগকে দমন করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। যখনই হিংসা চলে আসবে, সাথে সাথে বুঝবেন যে, শয়তান চলে এসেছে। তওবা পড়বেন। যার ওপর হিংসা হচ্ছে তার জন্যে দোয়া করবে যে, আল্লাহ তুমি তাকে আরো দাও, আরো দাও, তাকে আরো ভালো কর। যখনই তার জন্যে দোয়া করতে থাকবেন, দেখবেন আপনার হিংসা চলে গেছে। কারণ দোয়া এবং হিংসা একসাথে করা যায় না।

প্রশ্ন : আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে হিংসা করে। আমি সফলতা লাভ করি তা তারা চায় না। এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : ঈর্ষা আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে আসতে পারে, আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও আসতে পারে। ঈর্ষা যে-ই করুক, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে উত্তেজিত করা, আপনি যাতে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে না পারেন, আপনি যাতে মেধাকে বিকশিত করতে না পারেন সে চেষ্টা করা। কাজেই তাদের আচরণে প্রভাবিত না হয়ে আপনি তা-ই করুন যা আপনি করতে চান বা করবেন বলে ঠিক করেছেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন হিংসুক লোকের কাজেই তার শাস্তির জন্যে যথেষ্ট। আমার কিছু প্রতিবেশী অনেক বছর ধরে আমার পরিবারকে হয়রানি করছে। আমার বাসায় ভাড়াটিয়া এলে কি এক জাদুর বলে তাদেরকে আমার শত্রু বানিয়ে দেয়। আমি আমার ভাড়াটিয়াদের সাথে অত্যন্ত প্রো-একটিভ আচরণ করি, তারা বাইরের ঐ গ্রুপের দ্বারা প্রভাবিত। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?

উত্তর : আসলে নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো মানুষ সব জায়গায়ই ছিলো। এ নিয়ে দুই প্রতিবেশীর গল্প আছে। এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে দেখতে পারে না। ‘ক’ ‘খ’-কে দেখতে পারে না। ‘ক’ শুনলো ‘খ’ একটা গুঁড় কাজে যাত্রা করছে।

তখনকার দিনে সংস্কার ছিলো যে, যাত্রার সময় নাক কাটা লোক দেখলে তার যাত্রা নষ্ট হয়ে যাবে, যাত্রা অশুভ হবে। তো ‘ক’ দেখলো ‘খ’ যাবেই এবং গেলে সেখানে তার অনেক মঙ্গল হবে। কীভাবে তার যাত্রা নষ্ট করা যায়? যখন আর কোনো উপায় খুঁজে পেলো না, তখন নাপিতকে বললো, আমার নাকটা কেটে দে। কাটা নাক নিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, তাহলে সে আর যাত্রার শুভ ফল পাবে না।

আসলে মনে রাখবেন, ঈর্ষা যারা করে তাদের কাজই তাদের পরিণতি ডেকে আনে। ঈর্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যে কীভাবে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনে সুফিদের অনেক গল্প আছে। ইমাম বাকেরের এই গল্পটি তার একটি।

এক রাজার দরবারে এক জ্ঞানী লোক ছিলো। রাজা তাকে খুব পছন্দ করতেন। দরবারে তাকে নিজের পাশে বসাতেন। রাখতেন সবসময় সাথে সাথে।

এসব আবার দরবারের আরেক সভাসদ—তার কাছে খুব খারাপ লাগতো। হিংসায় তার মনটা জ্বলে-পুড়ে যেত। সারাক্ষণ খালি ভাবতো, কীভাবে এই ব্যাটাকে একটা আচ্ছা শাস্তি দেয়া যায়। ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি পেয়েও গেল। এমন এক ফন্দি আঁটলো যে, তার শত্রু চিরতরে তার পথ থেকে সরে যাবে।

পরিকল্পনামতো ঐ সভাসদ পর দিন এসে রাজাকে বললো, জাঁহাপনা, আপনার এত পছন্দের সভাসদ অমুক তো সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে, আপনার মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ। গন্ধের চোটে কেউ আপনার কাছে আসতে পারে না। আর এলেও তাকে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আসতে হয়।

রাজা তো শুনেই খেপে গেলেন—কী বললে? বিশ্বাস করি না। অমুক এরকম কথা বলতেই পারে না।

হিংসুটে লোকটি বললো, জাঁহাপনা, তাকে একটু ডাকুন। তাহলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

রাজা বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও। এটা নিয়ে তোমার সাথে পরে কথা বলবো।

এদিকে হিংসুটে লোকটি বাড়িতে গিয়ে সেই রাতেই দাওয়াত দিলো রাজার সেই প্রিয় সভাসদকে। আর বাবুর্চিকে ডেকে বললো, শোনো, আজ রাতে মেহমানকে যে খাবারগুলো দেবে তাতে প্রচুর রসুন দিয়ে রান্না করবে।

রাতে রাজার প্রিয় সভাসদ দাওয়াত খেতে এলো। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প টল্ল করলো। হিংসুটে লোকটি মনে মনে বলতে লাগলো, ব্যাটা আজই তো

জীবনের শেষ দিন ।

খাওয়া-দাওয়া শেষে অনেক রাতে বাড়ি ফিরে সভাসদটি শুনলো যে, আগামীকাল সকালে জরুরি ভিত্তিতে রাজা তাকে ডেকেছেন ।

সকালে উঠে সে তৈরি হয়ে বেরোতে যাবে । হঠাৎ খেয়াল করলো তার মুখে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ । বুঝলো, গতরাতে যে খাবারগুলো খেয়েছে তাতে প্রচুর রসুন ছিলো । তাই এই অবস্থা ।

যা-ই হোক, এখন আর কী করবে? কিছুক্ষণ দাঁত মাজামাজি করলো, গরম পানি দিয়ে কুলি করলো । কিন্তু তারপরও গন্ধ যায় না । এদিকে রাজার কাছে যাওয়ার জন্যে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে ।

শেষমেশ বাধ্য হয়ে ঐ অবস্থাতেই বের হয়ে গেল । দরবারে রাজা তাকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে লাগলেন । বললেন, কেমন আছো? আজ এত দূরে কেন? তুমি তো সবসময় আমার কাছে কাছেই থাকতে ।

বললো, জাঁহাপনা, সবসময় তো আমিই থাকি । আজ একটু অন্যদের সুযোগ করে দিতে চাই ।

এই-তো রাজার মনে সন্দেহ ঢুকে গেল । ‘তাহলে তো ঠিকই বলেছে ।’ তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, ‘না, তুমি আসো আমার কাছে । আমার পাশের এই চেয়ারটায় বস ।’

অন্যসময় হলে এরকম সুযোগ পেলে সভাসদটি যারপরনাই খুশি হতো । কিন্তু আজ তার আত্মাটা যেন কেঁপে উঠলো । ভয়ে ভয়ে সে রাজার কাছে গেল । আর মাথার পাগড়িটা দিয়ে ভালো করে মুখটা বেঁধে নিলো ।

রাজা এবার নিঃসন্দেহ হলেন, তাহলে তো ঠিকই আছে । মুখে কাপড় বেঁধে এসেছে । তার মানে আমার মুখে গন্ধ আছে মনে করেই সে এটা করেছে । কাজেই ও যে বললো যে, সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে আমার মুখে গন্ধ আছে একথা ঠিক ।

রাজা ভীষণ রেগে গেলেন । তবে রাগটা প্রকাশ করলেন না । শুধু একটা চিরকুটে কিছু লিখে তাকে দিয়ে বললেন, এই চিরকুটটা নিয়ে অমুকের কাছে যাবে । সে তোমাকে তখন যা করতে বলবে, তুমি তা-ই করবে ।

এদিকে এই রাজার একটা অভ্যাস ছিলো যে, তিনি যখন কাউকে কোনো উপহার, কোনো ক্ষমতা, জায়গীরদার ইত্যাদি দান করতেন, তখন তা চিরকুটে লিখে দিতেন । উপস্থিত সবাই এবারও তা-ই মনে করলো ।

চিরকুট হাতে নিয়ে প্রিয় সভাসদটি যখন বেরোতে যাবে তখন হিংসুটে লোকটি তাকে পাকড়াও করলো । সে-তো ভাবছে, কোথায় আমি এতকিছু

করলাম তাকে রাজার কাছে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার ব্যবস্থা করতে, আর এখন কি না সে উপহারের চিরকুট নিয়ে যাচ্ছে!

সে বললো, দেখ, এই চিরকুটটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি যাবো চিরকুট নিয়ে। প্রিয় সভাসদ বললো, ঠিক আছে বন্ধু, তুমিই যাবে। এটা তোমাকেই দিয়ে দিচ্ছি।

চিরকুটটা নিয়ে সে যখন রাজার লোকের কাছে গেল, তখন রাজার লোকটি চিরকুট পড়ে বললো, তুমি কি জানো এই চিরকুটে কী লেখা আছে? এই চিরকুটে লেখা আছে, পত্রবাহকটি পৌঁছামাত্র তার মাথা কেটে ফেলবে এবং তার চামড়া ছিলে তাতে খড়্‌ ভরে আমার কাছে পাঠাবে।

শুনে তো হিংসুটে লোকটির মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, শোনো, শোনো এই মানুষটি আমি নই। এটা অন্য একজনের কথা বলা হয়েছে। দয়া করে আমাকে কতল করো না। আমার কথা রাজা বলেন নি।

রাজার লোক এটা শুনে বললো, দেখ, এখানে তুমি না অন্য কে সেটা তো আমার দেখার বিষয় না। রাজা লিখেছেন পত্রবাহকের কথা। এখন এই পত্রবাহক তো তুমি ছাড়া আর কেউ নও। তুমিই তো পত্রটা নিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছো। কাজেই তোমাকেই আমার কতল করতে হবে—এই বলে সে তার মাথাটা কেটে চামড়া ছিলে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলো।

এদিকে প্রিয় সভাসদটি যখন দরবারে ফিরে এলো, রাজা তো অবাক। কি হলো, তুমি যাও নি চিরকুট নিয়ে? সে বললো, জাঁহাপনা, আপনি আমাকে উপহার দিয়েছেন শুনে আমার এক বন্ধু সেটা চাইলো। আর আমিও দিয়ে দিলাম।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কে সে বন্ধু? নাম শুনে রাজা তো বুঝলেন এ-ই তো সে যে তার কাছে এর নামে অভিযোগ করেছিলো। ব্যাপারটা তার কাছে একটু অন্যরকম মনে হলো। সব খুলে বলতে বললেন রাজা তাকে।

সব শুনে তিনি বুঝলেন, সবকিছু আসলে হিংসুটে লোকটির কারণেই হয়েছে। আর তার হিংসার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হলো। অন্যের জন্যে যে গর্ত সে খুঁড়েছিলো সেই গর্তে সে নিজেই পড়লো।

প্রশ্ন : হিটলার একজন দক্ষ বুদ্ধিমান সাহসী ও অত্যন্ত উন্নতমানের সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন জীবনের সার্বিক বিচারে শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ হলো? নিষ্ঠুরতাই কি একমাত্র কারণ?

উত্তর : আসলে হিটলারের ছিলো দ্রান্ত জীবনদৃষ্টি। হিটলার বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানরা আর্য জাতি এবং পৃথিবীকে শাসন করার জন্যেই তারা। মানুষের যে সমানাধিকার, সমগ্র সৃষ্টি যে এক পরিবার এটা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

এই যে অহংকার, অন্যের অধিকারকে শ্রদ্ধা না করা এবং অন্যকে শাসন করতে যাওয়ার অপচেষ্টা—এটাই তার পতনের কারণ। নিজের ক্ষমতাকে সংহত করার জন্যে এমন কোনো নিষ্ঠুরতা নেই যা তিনি করেন নি। এবং নিষ্ঠুরতার প্রতিফল, প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি পেয়েছেন।

সুস্থ জীবনদৃষ্টি ছাড়া কেউ কখনো প্রশান্তি পায় নি। সৃষ্টির গুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোনো অন্যায়কারী, জালেম কখনোই সুখী জীবনের অধিকারী হতে পারেন নি। যে অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে সে কখনো প্রশান্তি পায় নি।

হিটলার নিজের জীবনে শান্তি পায় নি, পৃথিবীর একটি মানুষকেও শান্তি দিতে পারে নি। তার পরিণতিও ছিলো খুব করুণ। হিটলারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো ঘৃণার। জার্মান জাতির দুর্দশার জন্যে ইহুদি-ফরাসি-ইংরেজদেরকে দায়ী করতো সে। তাই তাদেরকে ধ্বংস করার মানসিকতা তার হয়েছিলো। ফলে মমতার শক্তিকে জাগ্রত করতে না পেরে ধ্বংসের শক্তি জাগ্রত করলো। কিন্তু ঘৃণা দিয়ে কেউ কখনো বড় কিছু করতে পারে নি। হিটলারও বিফল হলো।

ঘৃণাবশত কোনো ভালো কাজ করেও আপনি কখনো শান্তি পাবেন না। কেউ হয়তো মসজিদ বানিয়েছে, আপনিও আরেকটি মসজিদ বানিয়ে ভাবলেন আপনার মসজিদেই বেশি লোক নামাজ পড়বে—তাহলে আপনি কখনো শান্তি পাবেন না। আপনার মসজিদও টিকে থাকবে না। কারণ ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে গড়া কোনো জিনিস টিকে থাকে না।

ঘৃণা এমন একটি আগুন যা অন্যের পাশাপাশি নিজেকেও পোড়ায়। একজন সন্ত্রাসীর জীবনদৃষ্টিও ঘৃণার—অমুককে খুন করে দশ শীর্ষ সন্ত্রাসীর এক হবে। একজন সন্ত্রাসী সন্ত্রাস করে হয়তো কমিশনার হতে পারে। তারপর হয়তো এমপি হতে পারে। তারপর মন্ত্রী বা আরো বড় পদে যেতে পারে, কিন্তু শান্তি পাবে না কোথাও। পরিণতি কিন্তু একই হবে। হিটলারের পরিণতিও একই হয়েছিলো। নিজের বাংকারে আত্মহত্যা করেছিলো। হয় আপনি কারো গুলিতে নিহত হবেন, নয়তো আত্মহত্যা করবেন।

আপনি হয়তো বলবেন—মারা তো সবাইকেই যেতে হয়। তারাও মারা গেছে। সেটা ঠিক। কিন্তু এদের মৃত্যুটা সবসময়ই কষ্টের। এমনকি অনেক সময় লাশ নেয়ার মতো কেউও থাকে না।

প্রশংসার লোভ/ অহংকার

প্রশ্ন : প্রতিটি ভালো কাজে যেমন আগ্রহ থাকে, তেমনি মনের ভেতরে একটা প্রশংসা পাওয়ার লোভও থাকে। কীভাবে এই লোভটাকে দমন করবো?

উত্তর : প্রশংসার এই আকাঙ্ক্ষাটা অস্বাভাবিক নয়। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই এটা থাকে। কিন্তু অনন্য মানুষ এটাকে জয় করেন। আর সাধারণ মানুষ এই প্রশংসার ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়। কারণ প্রশংসা পাওয়ার লোভ মানেই হলো আপনার ভালো কাজ নিয়ে আপনার মধ্যে গর্ব আছে, অহংকার আছে। আর সৎকর্মের অহংকার হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক। ইবলিসের পতন হয়েছিলো এই অহংকার থেকেই।

ইবলিস ছিলো জ্বিনদের মধ্যে উচ্চমর্যাদার একজন আবেদ। ইবাদতের একাগ্রতা এবং নিষ্ঠার কারণে ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকার সুযোগ সে পেয়েছিলো। আল্লাহ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন শুধু তার আনুগত্যের জন্যে। পাপ করার বা আল্লাহর অবাধ্যতা করার কোনো সুযোগ তাদের নেই।

এদিকে আল্লাহ তায়াল্লা তো সবই জানতেন। একদিন তিনি তাদের বললেন, অচিরেই তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে একজন তার অবাধ্য হবে। শুনে ফেরেশতারা ইবলিসের কাছে গিয়ে মিনতি করলো যাতে সে সবার জন্যে আল্লাহর কাছে এই দুর্ভাগ্য থেকে পানাহ চেয়ে দোয়া করে। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত উচ্চ মর্যাদার কারণে ইবলিসের যেকোনো প্রার্থনা সাথে সাথেই মঞ্জুর হয়ে যেত। সে তখন সবার জন্যেই প্রার্থনা করলো শুধু তার নিজের জন্যে ছাড়া। কারণ সে মনে করেছিলো এত ইবাদত বন্দেগি সে করেছে যে, এমন দুর্ভাগ্য তার হবে না।

পরবর্তী ঘটনার বিবরণ পবিত্র কোরআনের সূরা আল আরাফে আছে। আল্লাহ তায়াল্লা হজরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা আখ্যা দিয়ে সকলকে বললেন, তাকে সিজদা করতে। কিন্তু ইবলিস অস্বীকৃতি জানালো। তার যুক্তি ছিলো, সে আগুনের তৈরি। কিন্তু আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি থেকে। অতএব আদম তার চেয়ে বড় হতে পারে না। এ অবাধ্যতার জন্যে আল্লাহ তাকে অভিশপ্ত করলেন এবং অনন্তকালের জন্যে জাহান্নামী ঘোষণা করে তাকে বেহেশত থেকে বহিস্কার করলেন।

কাজেই অহংকার থেকে দূরে থাকবেন। যেকোনো ভালো কাজ করলে বা এর জন্যে অন্য কেউ প্রশংসা করলে সাথে সাথে শোকর আলহামদুলিল্লাহ

বা থ্যাংকস গড বা প্রভু ধন্যবাদ বলবেন। তাহলেই দেখবেন আপনি অহংকারমুক্ত থাকতে পারছেন। আর আসলে সবকিছুই তো আল্লাহর। বান্দার কি অহংকার করার কিছু আছে?

এ নিয়ে হজরত মুসা (আ)-এর একটি ঘটনা আছে।

একবার তিনি এক উষর পার্বত্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক গুহার ভেতরে একজন মানুষকে দেখলেন গভীর ইবাদতে মগ্ন। কৌতূহল নিয়ে তার কাছে যেতেই অনেকটা তাচ্ছিল্যের সাথে লোকটি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? মুসা (আ) নিজের পরিচয় দিলেন। সে বললো, আল্লাহকে বল আমার ইচ্ছা পূরণ করতে।

মুসা (আ) বললেন, কী তোমার ইচ্ছা? লোকটি তখন বললো, ‘গত ১০০ বছর ধরে আমি এখানেই অবস্থান করছি। এসময়ে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য আর কিছুই আমি করি নি। এই একনিষ্ঠ ইবাদতের কী প্রতিদান তিনি আমায় দেবেন তা আল্লাহকে জিজ্ঞেস কর’।

মুসা (আ) বললেন, ঠিক আছে, আমি আল্লাহর কাছে তোমার এ আর্জি পেশ করবো। সাথে সাথেই তিনি চলে গেলেন পাহাড়ের ওপরে। আল্লাহর কাছে জানতে চাইতেই গায়েব থেকে ভেসে এলো, হে মুসা! ঐ ব্যক্তিকে বল আগামীকালই সে তা জানতে পারবে।

সাধককে এসে জানাতেই সে বললো, ঠিক আছে। আগামীকালের তো আর খুব বেশি দেরি নেই।

এ সাধকের অভ্যাস ছিলো প্রতিদিন সকালবেলা কাছের এক ঝর্ণায় সে গোসল করতে যেত। তারপর সাথে পানির পাত্রে কিছু পানি নিয়ে গুহায় ফিরতো। পরদিনও সে যথারীতি ঝর্ণার উদ্দেশ্যে বেরোলো। কিন্তু পথ আর সে খুঁজে পাচ্ছে না। সারাদিন এ পথ ও পথ করে শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে এক পাথরখন্ডের ওপর বসে পড়লো। তেষ্ঠায় তার ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম।

জনবসতিহীন এ উপত্যকায় বসে সে যখন আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবছে তখনি এক লোককে দেখলো সামনের পথ ধরে যাচ্ছে। চিৎকার করে ডাকতেই কাছে এলো সে।

সাধক কোনোরকমে বললো, দয়া করে কি আমাকে একটু পানি খাওয়াতে পারো? লোকটি বললো, ‘এখানে আমি পানি পাবো কোথা থেকে? তবে আমার নিজের জন্যে সামান্য কিছু পানি আছে। সেটা দিতে পারি। কিন্তু তার আগে বল এর বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে?’ সাধক বললো, দেখ, আমার তো দেয়ার মতো কিছু নেই। গত ১০০ বছর ধরে আমি একনিষ্ঠভাবে

শুধু আল্লাহর সাধনাই করেছি।

লোকটি কিছুক্ষণ ভেবে বললো, ঠিক আছে। তুমি যদি এ ইবাদতের পুরো সওয়াব আমাকে দিতে রাজি থাকো তাহলে আমি আমার পানিটুকু তোমাকে দেবো। বলো তুমি কি রাজি?

সাধক ভেবে দেখলো বেঁচে থাকলে আবার সে আল্লাহর সাধনা করতে পারবে। কাজেই এখন পানি খেতে পারাটাই তার জন্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে রাজি হয়ে গেল। এদিকে হজরত মুসা (আ)-কে পুরো ঘটনা জানিয়ে আল্লাহ তায়াল্লা ওহী পাঠালেন এবং তার কাছে যেতে বললেন।

মুসা (আ) তা-ই করলেন।

দূর থেকে তাকে দেখেই সাধক বলে উঠলো, হে মুসা! আমি তো আমার সব পুণ্য আরেকজনকে দিয়ে দিয়েছি। মুসা (আ) বললেন, আমি জানি। আল্লাহ আমাকে বলেছেন এবং আল্লাহ জানতে চেয়েছেন, মাত্র একঘটি পানির মূল্য যদি ১০০ বছরের ইবাদত হয়, তাহলে গত ১০০ বছর ধরে তিনি তোমাকে যত পানি পান করিয়েছেন তার মূল্য কী হবে?

শুনেই সাধকের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সে বলতে লাগলো, ‘হে রসুল, দয়া করে আল্লাহর কাছে আমার জন্যে সুপারিশ করুন যেন তিনি আমায় ক্ষমা করে দেন। তিনি তো পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল’। সাথে সাথে মুসার ওপর ওহী নাজিল হলো। হে মুসা, তাকে বল-এ মুহূর্তে তার যে অনুশোচনা, আমার কাছে তা তার ১০০ বছরের ইবাদতের চেয়েও বেশি পছন্দনীয় হয়েছে। এর বিনিময়ে তাকে আমি হাজার বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব প্রদান করলাম।

প্রশ্ন : অনেক সময় মনে হয় কাজের চেয়ে প্রচারগাটা বেশি হয়। এটা কি ক্ষতিকর নয়?

উত্তর : ক্ষতিকর তো বটেই। কাজের প্রচার যখন হবে তখন সে প্রচারের পেছনে আত্মপ্রচারটা বেশি হবে। অর্থাৎ কাজের চেয়ে যে কাজ করছে সে ব্যক্তির প্রচার বেশি হবে। সে ব্যক্তি তখন ফুলেফেঁপে যায়। সে মনে করে, এখন সবকিছু আমার। তখন ঐ কাজে স্বভাবতই ধস নামে।

সেই ব্যক্তি তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। মাটিতে তার পা পড়তে চায় না। সে মনে করে আমিই বোধহয় সবকিছু। যেমন, ‘রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী’।

আসলে যখন মানুষ বিজয় দেখে তখন কী করে? রেসলিংয়ে একজন অন্যজনকে পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করার পর কী করে? এইদিকে হাত তুলে চিৎকার করে, ঐদিকে হাত তুলে চিৎকার করে যে, দেখ! একটা মুরগিও যখন ডিম পাড়ে তখন কক কক করে, মনে হয় যে দুনিয়া জয় করে ফেলেছে। আনন্দে এতই আত্মহারা হয় যে, পারার পেছনের আর সব কার্যকারণ ভুলে যায়। মনে করে যে, সম্পূর্ণ কৃতিত্বটা তার।

আমাদের নেতারা যখন বক্তব্য রাখেন কর্মীদের কথা কখনো কখনো বলেন, ওটা কর্মীদের হাত করার জন্যে। কিন্তু উনি কি কোনো কর্মীকে আগে বাড়িয়ে দেন? না ওনার ছবি যাতে ঠিকভাবে ওঠে সেটার ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হন? তিনি আগে নিজের ছবি নিশ্চিত করতে চান অর্থাৎ পত্রিকাতে যদি ছাপা হয় তার ছবিটা যাতে ছাপায়, এজন্যে যেখানে যেভাবে থাকা দরকার, সেভাবেই তিনি থাকেন।

মিছিলেও যদি অন্য কেউ এগিয়ে যেতে চায়, তাদেরকে আবার নেতা তার পেছনে নিয়ে আসেন বা তার যারা লোকজন আছে তারা ওকে ধরে পেছনে নিয়ে আসে। যাতে নেতার ছবিটা ঠিকভাবে ছাপা হয়। অর্থাৎ আমাদের স্বভাব হচ্ছে সবসময় কৃতিত্বটা নিজে নেয়া। কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় শিক্ষা, নবীজীর শিক্ষা হচ্ছে যে, কৃতিত্ব নিজে নিতে গেলেই অহম আসবে এবং অহম এলেই পতনের সূচনা হবে।

প্রশ্ন : আমি কয়েকদিন আগে চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে রাস্তায় পড়ে যাই। সেখানে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আমার অন্য কিছু হয় নি। শুধু হাত-পা ছড়ে যায়। আমি ঠিক করেছিলাম না কি ভুল? এক মঙ্গলবার আলোকায়ন শেষে বাসায় ফেরার পথে আমার মোবাইল হারিয়ে যায়। আমি দুঃখ পেয়ে ভাবি আলোকায়ন করতে এসে এটা হলো। গুরুজী, এটা কি বদদোয়া হলো? আমি কনফিউজড।

উত্তর : আসলে একটা জিনিস হচ্ছে যে, আপনি যেহেতু পড়ে গেছেন ওখানে তো আর করার কিছু নেই। ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলে যত তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেয়া যায়। দুই নম্বর যেটা হচ্ছে যে, যদি মোবাইল হারিয়ে যায় তার কারণ হলো আপনার অসতর্কতা। আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ছিনতাই হয় নি। তার মানে আপনি খুবই অসতর্ক।

অর্থাৎ চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে যদি পড়ে যেতে পারেন তার মানে

আপনি কত বেখেয়াল। এখানে তো দোয়া-বদদোয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা হচ্ছে আপনার বেখেয়ালীপনা। তাই সবসময় সতর্ক থাকবেন। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (স)-এর হাদীস কিন্তু খুব পরিষ্কার। আল্লাহর ওপরে তাওয়াক্কুল কর, কিন্তু উটটা আগে ভালো করে রশি দিয়ে বাঁধো। এর পরে মোবাইল ফোন চেইন দিয়ে ভালো করে আটকিয়ে রাখবেন যাতে নেয়ার সময় আপনি অন্তত টের পান যে, আমার মোবাইল কেউ নিয়ে যাচ্ছে।

অনুশোচনা/ উত্তর

প্রশ্ন : পারিপার্শ্বিক পরিবেশের তুলনায় বেশ ভালো আছি। কিন্তু অতীত জীবনে আবেগের বশে সীমালঙ্ঘন করে গুরুতর পাপ করে ফেলেছিলাম। এ অনুশোচনা, এ পাপবোধ সারাক্ষণ এমনভাবে তাড়া করে বেড়ায় যে, বর্তমান জীবনে কোনো কাজে ব্যর্থ হলেই মনে হয় যেন ঐ পাপেরই পরিণাম এটা। মনে হয়, আমার দ্বারা সফল হওয়া সম্ভব নয়। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : অনুশোচনা একটি উপকারী অভ্যাস হলেও কখনো কখনো অনুশোচনার তীব্রতা নেতিবাচকভাবেও প্রভাব ফেলে মানুষের ওপর। অর্থাৎ কেউ যখন অতি-অনুশোচনা বোধে আক্রান্ত হয়ে সবকিছু সম্পর্কে হতাশ হয়ে যায় তখন এ অনুশোচনা তার কোনো কল্যাণে আসে না।

অনেক সময় গুরুতর অন্যায় হয়ে যেতে পারে, বড় রকমের স্বলনও হতে পারে; হয়তো আবেগের বশে, ঝাঁকের মাথায় বা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। কিন্তু পাপ যত গুরুতরই হোক, কেউ যখন আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করে এবং সে ভুলের পুনরাবৃত্তি আর না করে, স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করে দেন, তাকে ফিরে আসার সুযোগ দেন। ক্ষমাশীলতা স্রষ্টার অন্যতম গুণ।

কাজেই ব্যর্থতাকে পাপের ফল মনে করার কোনো কারণ নেই। ব্যর্থতা হলো কাজের ফল। অর্থাৎ হয়তো ইতিবাচক বিশ্বাসের অভাব ছিলো বা কাজের প্রক্রিয়ার কোনো অসম্পূর্ণতা ছিলো। অতএব আপনাকে এই ক্ষতিকর অনুশোচনা বা পাপবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে, অতীত পাপের কারণে আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। নিয়মিত কোয়ান্টায়ন করুন। নিজেকে বোঝান যে, আপনি অনুশোচনা করেছেন এবং স্রষ্টা অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন।

আসলে সাফল্যের সাথে পাপ-পুণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। খারাপ কাজে সন্তোষীরা, অন্যায়কারীরা সফল হচ্ছে কীভাবে? সাফল্য নিজেই একটা গতি।

সাফল্য নির্ভর করে কাজটা বৈষয়িকভাবে কতটা যুক্তিযুক্তভাবে করা হচ্ছে তার ওপর। পরিণতি হয়তো আলাদা আলাদা হতে পারে। যেমন, একজন অবৈধভাবে উপার্জন করতে পারে। এর খারাপ পরিণতি তাকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু উপার্জন তার ঠিকই হয়েছিলো।

তাই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করবেন। স্রষ্টার কাছে অন্যায় করে থাকলে তার কাছে ক্ষমা চান। তিনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে ভালবাসেন।

আর যদি অন্যের কাছে অন্যায় করে থাকেন, তাহলে তার কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিন যে, ভাই, আমি অন্যায় করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দাও। আর সে যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে আপনি যে ভালো কাজ করবেন তার সব সওয়াব তাকে দিয়ে দিন। কারণ বেঁচে থাকা অবস্থায়ই অনুশোচনার মূল্য আছে, মৃত্যুর পরে অনুশোচনা কোনো কাজে আসবে না। তবে এরপর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঁপিয়ে পড়বেন যাতে কাজে সফল হতে পারেন।

প্রশ্ন : আমার মেয়ের বয়স চার বছর। যৌবনে আমার চারিত্রিক দোষ ছিলো। মেডিটেশন কোর্স করার পর আমি ভুল বুঝতে পেরে তওবা করেছি ও আল্লাহর রহমতে সেসব থেকে মুক্ত হয়েছি। আমার মেয়ের রাশি ও হাতের রেখার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভবিষ্যতে তারও এই সমস্যা হবে। এ ব্যাপারে কী সাবধানতা নেয়া যায় যাতে সে সংযমী জীবন যাপন করে?

উত্তর : আসলে আপনি এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগছেন। যৌবনে আপনি যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত বোধ হয় আপনার মেয়েকে দিয়ে হবে। আল্লাহ সবসময় তওবা কবুলকারী। যেহেতু আপনি অনুশোচনা করেছেন এবং নিজেকে গুধরে নিয়েছেন, তাই সবসময় এই প্রার্থনাই করবেন যে, আপনার মেয়ের জীবন যেন কলুষমুক্ত হয়।

আর রাশি বা হাতের রেখার বিশ্লেষণ বহুমুখী হতে পারে। একই রেখাকে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং একই রেখা একেকজনের হাতে একেক অর্থ বহন করে। অতএব আপনার মেয়েকে নিয়ে দৃষ্টিস্তার কিছু নেই। তাছাড়া আপনি যেহেতু মেডিটেশন জানেন, তাই কমান্ড সেন্টারে মেয়ের জন্যে সবসময় দোয়া করবেন। সে সৎ মানুষ হবে।

প্রশ্ন : আড়াই বছর আগে স্বামীর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়। কারণ ছিলো ছয়/ সাত বছর আগে করা আমার একটি অন্যায়। নিজেকে অনেক

শুধরে নিয়েও আমি আমার সংসার টেকাতে পারি নি। ভীষণ সংকটময় সেই সময়ে কোয়ান্টাম আমাকে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। কঠোর সংগ্রাম করে আমি এখন মর্যাদাপূর্ণ একটি জীবনের দিকে এগুচ্ছি। ছয়/ সাত মাস পর পিএইচডি শুরু করবো। এমনি সময়ে আমার অতীত জীবনের কালো অধ্যায়গুলো আবার আমার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে চাইছে। ভয় হয় যদি তা আবারও আমার জীবনে ঝড় তোলে, আমাকে মা-বাবা, পরিবার-পরিজন হারাতে হয়। তখন আমি কীভাবে বেঁচে থাকবো? আমার পরিবার যে আমার শেষ আশ্রয়স্থল। আমি কেমন করে অতীত ঘটনাগুলো থেকে মুক্তি পাবো? আমি ভুলতে চাইলেও সমাজ আমাকে ভুলতে দেয় না কেন?

উত্তর : যে কারো জীবনে ভুল হতেই পারে। যখন কেউ সত্যিকারভাবে অনুশোচনা করে, তখন স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে স্রষ্টার ক্ষমা পাওয়া গেলেও অনেক সময় মানুষের ক্ষমা অত সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সেটা নিয়ে আফসোসের কিছু নেই। কারণ কেউ ভুল করার পর সেটা নিয়ে অনুশোচনা করলে এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করলে, সেটাই আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

কারণ অতীত নিয়ে নয়, বাঁচতে হয় ভবিষ্যৎ নিয়ে। আর তাতে যদি বাবা-মা, পরিবার-পরিজনকে সমব্যথী হিসেবে পাওয়া যায়, তারা যদি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে সহযোগী হতে পারেন তাহলে ভালো। অন্যথায় বাঁচতে হবে নিজের পরিচয়েই। যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে মেধাকে সেবায় রূপান্তরিত করতে হবে।

কারণ মা-বাবাকে সবসময় বোঝানো না-ও যেতে পারে। এটা হতে পারে তাদের অবিদ্যার কারণে, ভ্রান্ত ধারণা বা তারাও দুর্দশার বৃত্তে আবদ্ধ-সেই কারণে। আর মা-বাবা না থাকলে বড় কিছু করা যাবে না এ ধারণাও ভ্রান্ত। কারণ মা-বাবা থেকে অনেক দূরে গিয়েও মানুষ বড় কিছু করেছে।

যেমন মাদার তেরেসা। আলবেনিয়ার এক ছিন্নপল্লী থেকে তিনি ছুটে এসেছিলেন ভারতে, ‘মিশনারিজ অফ চ্যারিটি’র মাধ্যমে দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, স্মরণীয়-বরণীয় হয়েছেন। তার মা-বাবা কি তার সঙ্গে ছিলেন?

আসলে পরিবার নয়, বংশ পরিচয় নয়, সমাজের সবার আপাত প্রশংসা বা স্বীকৃতি নয়, মহান কাজই মানুষকে অমর করে, শ্রদ্ধেয় করে।

অতএব অতীত নয়, আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভবিষ্যৎ যা নির্ধারিত

হবে আপনি মেধাকে কতটা বিশ্বাসের সাথে সৃষ্টির সম্ভাব্যতার জন্যে সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করলেন। আর তখনই আপনার সমস্ত দুঃখ-গ্লানি ভেসে যাবে।

প্রশ্ন : শুনেছি, অন্যায় করলে তার ফল পেতেই হবে, শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু অনুশোচনা করলেও কি ফল পেতে হবে?

উত্তর : সব অনুশোচনাই অন্যায়ের প্রতিফল পাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না, আপনি যদি কারো অধিকার লংঘন করে থাকেন তাহলে অনুশোচনার পাশাপাশি আপনাকে প্রতিকারও করতে হবে।

আন্তরিক অনুশোচনা ও যথাযথ প্রতিকার করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতেও পারেন। আর প্রকৃত অনুশোচনা হচ্ছে ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা।

আসলে শয়তান এবং মানুষের মধ্যে তফাত হচ্ছে শয়তান অনুশোচনা করতে পারে না, শয়তানের কখনো অনুশোচনা হয় না। আর মানুষের একটা সহজাত গুণ হচ্ছে যে, সে ভুল বুঝতে পারে, অনুশোচনা করতে পারে এবং তওবা করতে পারে। তাই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। বিরত থাকুন ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে। তারপর আল্লাহর ক্ষমার অপেক্ষা করতে থাকুন।

প্রশ্ন : অজ্ঞতাবশত যে বাচ্চা নষ্ট করেছে তার জন্যে কোনো পাপ হয়েছে কি? পাপ হয়ে থাকলে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

উত্তর : অজ্ঞতাবশত যে বাচ্চা নষ্ট করেছেন সেটা তো ভুল করেছেন। এখন আর সেটাকে ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। এখন যা করার আছে তা হলো এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা। আর তার উপায় হলো লামার শিশুকাননের একটি শিশুর আত্মিক মা বা আত্মিক বাবা হওয়া। আপনার কিছু অর্থের অবদানে শিশুটি যে আলোকিত হবে সেটাই আপনার পাপমোচন করে দেবে।

সাধারণত অনুশোচনা বলতে আমরা অনেকে বুঝি যে, সারাক্ষণ বোধ হয় শুধু আহাজারি আর আফসোস করা। আসলে তা নয়। একজন মানুষ ভুল করতেই পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ ভুলের পুনরাবৃত্তি করে না। সত্যিকার অনুশোচনা এটাই। আর সেইসাথে এখন যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে অন্য কোনোভাবে তার ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্ত করা।

প্রশ্ন : আমি খুব ছোটখাটো ব্যাপারেই অপরাধবোধে ভুগি। একসময় তা এক ধরনের মানসিক সমস্যা পরিণত হয়। কীভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারি?

উত্তর : আসলে এমন মানুষ নেই যে ভুল করে নি। জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে মানুষ ভুল করে, অন্যের অনুভূতিকে আহত করে, অন্যের প্রতি অবিচার করে। অন্যায় বা ভুলের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় পাপবোধ বা অনুশোচনা। এই পাপবোধ বা অনুশোচনাকে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে না পারলে মারাত্মক মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

পাপবোধ আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে, আত্মসম্মানবোধকে ধ্বংস করে, জীবনের আনন্দকে মাটি করে দিতে পারে। পাপবোধ সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে শুরু করে জটিল রোগ-এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টিরও কারণ হতে পারে। অথচ একটু চেষ্টা করলেই পাপবোধ বা অনুশোচনাকে আপনি ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন।

কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আপনি অনায়াসে পাপবোধকে ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন। আপনার পাপবোধ বা অনুশোচনাই হয়ে উঠতে পারে আপনার আত্মনির্মাণের হাতিয়ার।

প্রথমত, পাপবোধকে সতর্ক সংকেত হিসেবে বিবেচনা করুন। যেকোনো পাপবোধ মনে করিয়ে দেয় যে, কিছু একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। যখনই পাপবোধ আপনাকে পেছনে ফিরে তাকাতে, নিজের কাজ পর্যালোচনা করতে, নিজের আচরণ পরিবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করে তখন অনুশোচনা আপনার এক নম্বর মিত্রে পরিণত হয়।

প্রখ্যাত মার্কিন গায়ক নেইল ডায়মন্ড-এর কথা ধরুন। ১৯৭২ সাল-নেইল ডায়মন্ড যখন খ্যাতির শীর্ষে তখন তিনি সংগীত জগৎ থেকে চার বছরের বিরতি নিয়ে নিলেন। কারণ ছিলো বিবেকের দংশন।

তিনি নিজেকে বললেন, প্রথম বিয়ে তালাক হয়েছে। দ্বিতীয় বিয়েও ভেঙে যাক এটা আমি চাই না। তিনি পুরো ৪৮ মাস কাটালেন নিজেকে নিয়ে, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে। নেইল ডায়মন্ড এই বিরতির মাধ্যমে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করলেন। চার বছর পর তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন প্রশান্ত ও সুখী মানুষ হিসেবে। মঞ্চে তিনি পেলেন আগের চেয়ে অনেক সহজ সাবলীলতা। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি হলেন আগের চেয়ে অমায়িক ভালো মানুষ।

দ্বিতীয়ত, পাপবোধের গুরুত্ব অনুভব করুন। পাপবোধ বা অনুশোচনায় সাড়া দিয়ে একজন মানুষ যখন নিজের ভুল ক্ষতিকর আক্রমণাত্মক বিদ্বেষাত্মক ও ধ্বংসাত্মক আচরণকে সংশোধন করে তখন এই পাপবোধই আত্ম উন্নয়নের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাই নিজের প্রতি বা

মানুষের প্রতি কোনো ভুল বা অন্যায় করলে অবশ্যই অনুশোচনা করা উচিত। অনুশোচনাই মন্দকে ভালোয় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা রাখে।

তৃতীয়ত, পাপবোধকে বিশ্লেষণ করুন। সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে পাপবোধকে কমানো বা সংশোধন করা যেতে পারে। এমনকি তা পুরোপুরি দূর করা যেতে পারে। কর্মজীবী মহিলা নাসরীন মেয়ে অসুস্থ হলেই পাপবোধে ভুগতেন। তিনি চাকরি করেন। মেয়ের যত্ন ঠিকভাবে নিতে পারেন না, তাই মেয়ে অসুস্থ হয়। এই ছিলো তার ধারণা।

তিনি এ সমস্যার কথা জানালে আমি পুরো বিষয়টিকেই বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে বললাম। তিনি দেখলেন চাকরি ছেড়ে দিলে মেয়েকে নিয়ে জীবন ধারণ করার বিকল্প কোনো আয়ের উৎস তার নেই। তাই চাকরি ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু এটা সম্ভব নয়, তাই এ নিয়ে পাপবোধ ও অনুশোচনা করারও কোনো যুক্তি নেই। নাসরীন যেহেতু পাপবোধকে বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এটি তার ইচ্ছাকৃত কোনো অপরাধ নয়, তাই এই পাপবোধ তার বা তার মেয়ের জীবনে আর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে নি।

চতুর্থত, যুক্তিসঙ্গত কাজ করুন। নিজের পাপবোধ বিশ্লেষণ করে সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কিছু করতে পারেন নি বা কোনো ভুল করে ফেলেছেন—এই অপরাধবোধ দূর করার জন্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। প্রয়োজনে ক্ষমা চান, ভুল শোধরানোর সুযোগ থাকলে ভুল সংশোধন করে নিন। অপরাধবোধ যেন আপনাকে এমন কিছু না করায় যা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়।

আমেরিকার ঘটনা এটি। এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তার মৃত ভাইয়ের সমাধিস্তম্ভ বানিয়েছিলো, পাথরের তৈরি প্রমাণ সাইজ মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ির মডেল দিয়ে। দেখলে মনে হবে একটি মার্সিডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কর একটি মাত্র পাথরের খণ্ড থেকে এক বছর পরিশ্রম করে গাড়ির মডেল তৈরি করেন। খরচ পড়ে আমাদের টাকায় ৮০ লক্ষ টাকা। এটি তৈরির কারণ হচ্ছে ভদ্রলোকের ভাই গাড়ির জন্যে আবদার করেছিলেন। ব্যস্ততার কারণে আজ দিই কাল দিই করে কেনা হয় নি। এর মধ্যেই দুর্ঘটনায় ভাই মারা যায়। ভদ্রলোক অনুশোচনায় পড়ে যান। তাই নিজের অপরাধবোধের মাশুল হিসেবে ভাইয়ের কবরের ওপর পাথরের মোটরগাড়ি বসিয়ে দেন।

এটা এক ধরনের চরম ব্যবস্থা। একে পাগলামিও বলা যায়। এসব না

করে তিনি যদি টাকাটা আত্মবতীর সেবায় দান করতেন, তাহলে মানুষের উপকার হতো আর তার ভাইয়ের আত্মাও শান্তি পেত। আপনার বেলায় কখনো এমন ঘটনা ঘটলে আত্মবতীর কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করুন। মৃতের আত্মা শান্তি পাবে।

পঞ্চমত, কেউ ভুলের উদ্দেশ্য নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে ভুল করে নি। তাই কখনো ভুল করে ফেললে ভুল স্বীকার করুন। ক্ষমা চেয়ে নিন। নিজেকে ক্ষমা করে দিন। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি ভুলের উদ্দেশ্য নন। আপনি ভুল করতে পারেন। তাই ভুল নিয়ে অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় অনুশোচনা করবেন না। ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে সবকিছু শুরু করুন।

ষষ্ঠত, ভুল থেকে শিক্ষা নিন। একই ভুলের পুনরাবৃত্তি শুধু নির্বোধরাই করে থাকে। বুদ্ধিমানরা সবসময় নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নেয়। ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকে। তাই একই ভুল বা একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

সপ্তমত, তওবা করুন। কোনো অপরাধ বা পাপ করে ফেললে আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করুন। আপনার পাপ মোচনের জন্যে করুণাময়ের সাহায্য নিন। আপনি জানেন স্রষ্টা ক্ষমাশীল। ক্ষমা হচ্ছে স্রষ্টার সবচেয়ে বড় গুণ। আপনার যেকোনো পাপকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাই আন্তরিকভাবে অনুশোচনা করুন। তওবা আপনাকে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ ও সম্ভাবনাময় করে তুলবে।

অষ্টমত, সব ভুলে যান। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতে যাত্রা করুন : ভুল সংশোধন ও আচরণ পরিবর্তন করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর পাপবোধ বা অপরাধবোধ মন থেকে নির্বাসিত করুন। ভুলে যান অতীত ভুলকে। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে যান। এই ভুলে যেতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধবোধকে মন থেকে পুরোপুরি বিদায় করতে পারলেই আপনি কল্যাণময় নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন।

অপরাধবোধ বা পাপবোধ থেকে নিজের উত্তরণ ঘটানোর জন্যে ওপরে উল্লিখিত কৌশল বা পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকরী। আপনি অনায়াসে এই কৌশল অনুসরণ করে নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করে এক প্রশান্ত ও মহিমান্বিত জীবনের অধিকারী হতে পারেন।

জানাকে মানায় রূপান্তর

প্রশ্ন : জানি কিন্তু মানি না, জানাকে কীভাবে মানায় রূপান্তর করতে পারবো?

উত্তর : আসলে যে জানা, যে জ্ঞান মানায় রূপান্তরিত হয় না সেটা কোনো জানা নয়, সেটা কোনো জ্ঞান নয়। তিনি কখনো জ্ঞানী হতে পারেন না। জ্ঞানী, শিক্ষিত বা আলেম তিনিই যিনি জানেন এবং মানেন। নিজের কল্যাণে এবং অন্যের কল্যাণে যিনি জ্ঞানকে প্রয়োগ করেন।

যেমন আপনি মধু সম্পর্কে অনেক জানেন, কিন্তু কখনো মধু খান নি, আপনাকে কি জ্ঞানী বলা যাবে? আবার আপনি সিগারেটের অপকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য দিলেন। কিন্তু তারপর মঞ্চ থেকে নেমেই ধরালেন একটা সিগারেট। আপনার জানা মানায় রূপান্তরিত হলো না।

একবার এক নেতা মঞ্চে খুব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে। দর্শকদের মধ্যে তার স্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু বাসায় এসে স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি স্ত্রীর গায়ে হাত তুললেন। কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী বললেন—মঞ্চে যে কথাগুলো বললে সেগুলো কী? স্বামী বললেন, ওগুলো অন্য নারীদের জন্যে, তোমার জন্যে নয়।

আমরা এই প্রবণতা থেকে বেরোতে চাই। শাস্ত্র সত্যের যে কথাগুলো আমরা জানি, তা আমরা মানতেও চাই। কারণ এটাই আলোকিত হওয়ার পথ। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করতে হবে। কারণ আত্মমগ্ন হওয়া ছাড়া নিজের প্রবৃত্তিকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আর সেইসাথে অটোসাজেশন দিতে হবে। জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন বইয়ে রয়েছে হাজারেরও বেশি অটোসাজেশন। আছে এর অডিও সিডি-সেট। আর আত্মজাগরণ সিডিতে আছে বাছাই করা একশ অটোসাজেশনের একটা সংকলন। এগুলো থেকে বেছে নিতে পারেন প্রয়োজনীয় অটোসাজেশনগুলো। তারপর নিয়মিত দিতে থাকুন। জানাকে মানায় রূপান্তরের চেষ্টায় আপনি সফল হবেন।

এছাড়া ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থাকার চেষ্টা করুন। নিয়মিত ‘আলোকায়ন’, ‘সাদাকায়ন’, কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হলে ‘প্রজ্ঞা জালালি’ আর কোয়ান্টাম মাস্টার হলে ‘সজ্ঞা জালালি’তে আসুন। চেতনার কথা অন্যদের জানানোর জন্যেও কাজ করুন। পেশা-বাসার পরে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে যতটা সম্ভব সময় দেয়ার চেষ্টা করুন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার জানাগুলো একটা একটা করে প্রতিফলিত হচ্ছে আপনার জীবনে।

অনন্য মানুষ

প্রশ্ন : অনেক ভুল করার পরেও কি আলোকিত বা অনন্য মানুষ হওয়া সম্ভব?

উত্তর : মানুষ আসলে ভালো হয়েই জন্মগ্রহণ করে। নবীজী (স) স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘প্রত্যেক মানব শিশুই ভালো হয়ে জন্মে’। মা-বাবা বা পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা হয় সে ভালোভাবে বিকশিত হয়, নয় তো খারাপভাবে বিকশিত হয়। কিন্তু যদি তার ভালো প্রবৃত্তিগুলোকে তুলে ধরা যায়, ভালো প্রবণতাকে বের করে আনা যায় তাহলে নিঃসন্দেহে জীবনের যেকোনো স্তর থেকে সে ভালো হতে পারে।

একজন মানুষ চাইলে যে কত নিচু অবস্থা থেকেও মহৎ জীবনে উন্নীত হতে পারে তার এক আদর্শ উদাহরণ হজরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (র)।

আজ থেকে প্রায় ১২০০ বছর আগে সময়খন্ডে তার জন্ম। এখন যেটা উজবেকিস্তানে পড়েছে। যুবক বয়সে ফোজায়েল ছিলেন একজন পথদস্যু। মানে পথের ডাকাত। যে রাস্তা দিয়ে তখনকার মানুষ এক শহর থেকে বা এক গ্রাম থেকে আরেক শহরে বা আরেক গ্রামে যেত, ফোজায়েল সেখানে ওঁত পেতে থাকতেন। কোনো মালদার পথিক দেখলেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাদের ওপর এবং অর্থ-কড়ি সোনা-দানা বা মূল্যবান যা কিছু পেতেন সব ছিনিয়ে নিতেন। কেউ যদি কখনো বাধা দিতো তাকে মার খেতে হতো। এভাবেই চলছিলো ফোজায়েলের জীবন।

একবার এক সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েন তিনি। একদিন মেয়েটির সাথে দেখা করার জন্যে উঁচু একটা দেয়ালের ওপরে উঠেছেন। এমন সময় শুনলেন কেউ একজন কোরআন তেলাওয়াত করছে। কোরআনের বাণীগুলো তার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। সেখান থেকে চলে গেলেন তিনি।

সেদিন রাতে আর ডাকাতি করতে বেরোলেন না। আশ্রয় নিলেন একটা পরিত্যক্ত প্রাসাদে। হঠাৎ দেখেন সেখানে কয়েকজন পথিক বসে আছে। তাদের একজন বলছে, চল আমরা বের হই। আরেকজন বললো, না, না এই রাতে বেরোলে ডাকু ফোজায়েল আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে। তারচেয়ে ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করাই ভালো।

শুনে ফোজায়েল খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এভাবে তিনি মানুষের মনে দ্রাস সৃষ্টি করেছেন! এত আতঙ্কে থাকে মানুষ তাকে নিয়ে!

সাথে সাথে তিনি তাদের সামনে গিয়ে বললেন, শোনো ভাইয়েরা

আমার! তোমাদের কোনো ভয় নেই। আজ থেকে ফোজায়েলের আতঙ্ক থেকে তোমরা মুক্ত।

পথিকরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ কে? কোথা থেকে এসেছে? আর বলছেই বা কী? যা-ই হোক শেষ পর্যন্ত তারা বের হলো এবং নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছলো।

এরপর থেকে ফোজায়েল হয়ে গেলেন এক অন্য মানুষ। ডাকাতি ছেড়ে পানি টানাকে পেশা হিসেবে নিলেন। মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানি ভরে দিয়ে আসতেন এবং এ থেকে যে উপার্জন হতো তা দিয়ে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করতেন।

ফোজায়েল অতীতের পাপের জন্যে গভীরভাবে অনুশোচনা করলেন। আগের জীবনে তার একটা অভ্যাস ছিলো যে, যার কাছ থেকে যা কিছু ডাকাতি করতেন তার সব হিসেব রাখতেন। এই হিসেবটা এখন তার খুব কাজে লাগলো। তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটি মানুষকে তিনি পাই পাই করে ক্ষতিপূরণ করলেন। যতক্ষণ না সে খুশি হচ্ছে। এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

তার ডাকাতির শিকার হয়েছিলো এক ইহুদি। ইহুদির দাবি ছিলো তার কাছ থেকে ফোজায়েল যে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেটা ভর্তি ছিলো সোনা। এই সোনা না দেয়া পর্যন্ত সে ক্ষমা করবে না। এখন ফোজায়েল যতই তাকে বোঝাতে যান, ততই সে অনড়। কত কাকুতি-মিনতি, কত অনুনয়-বিনয় কিছুতেই কিছু হলো না।

শেষ পর্যন্ত একদিন ইহুদি বললো, দেখ আমি আসলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যতক্ষণ না তুমি এক ব্যাগ সোনা আমার হাতে তুলে দিচ্ছো ততক্ষণ আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। যাহোক তুমি এক কাজ কর। আমার ঘরে অমুক জায়গায় এক ব্যাগ সোনা আছে। সেটা তুমি আমার হাতে এনে দাও। অন্তত আমার প্রতিজ্ঞার কথাটা ঠিক থাকুক।

ফোজায়েল তা-ই করলেন। ইহুদির হাতে ব্যাগটা তুলে দেয়ার পর সে ব্যাগটা যখন খুললো, তার তো চোখ ছানাবড়া। এ কী! সত্যি সত্যিই দেখি ব্যাগের ভেতর চকচক করছে সুন্দর সুন্দর সব সোনার মোহর। সে-তো এই ব্যাগের ভেতর রাস্তা থেকে ময়লা, নোংরা সব নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে ভরে রেখেছিলো। ফোজায়েলকে সে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলো যে, তার তওবা আসলে কতটা আন্তরিক। কারণ তাওরাতে (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) সে পড়েছে যে একজন মানুষ যখন আন্তরিকভাবে তওবা করে তখন তার হাতের স্পর্শে

এমনকি বালুও সোনায পরিণত হয়। সে পরীক্ষায় ফোজায়েল যে এত ভালোভাবে পাশ করে যাবে তা সে কল্পনাও করে নি। এবং এটা যে সত্যি সত্যি ঘটলো সেটা বিশ্বাস করতেও তার কিছুটা সময় লাগলো। তবে বিশ্বাস যখন করলো তখন পুরোপুরি বিশ্বাস করলো। ইসলাম গ্রহণ করলো সে। আর ফোজায়েল যে সত্যিই একজন অলিতে রূপান্তরিত হয়েছেন সে সাক্ষ্য দিলো।

অর্থাৎ ভালো হওয়ার সুযোগ, সৎ প্রবৃত্তি, সৎ স্বভাব এটা মানুষের মাঝে চাপা পড়তে পারে কিন্তু সৎ প্রবৃত্তিকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। যেকোনো সময়েই সৎ প্রবৃত্তিকে বের করে আনা যায়। সৎ হওয়া যায়। অনন্য মানুষ হওয়া যায়।

প্রশ্ন : মানুষের জীবনের চূড়ান্ত সফলতা বা সার্থকতা কোথায় এবং কিসে নিহিত?

উত্তর : আপনার চারপাশের মানুষ যদি আপনার জীবনের শেষে অর্থাৎ যখন আপনি এই জীবন থেকে অন্য জীবনে পাড়ি দেবেন তখন অন্তর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনার জীবন সার্থক হয়েছে। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনার জীবন ব্যর্থ হয়েছে এই কালে এবং ওই কালেও। আজকাল তো মরা বাড়িতে যাওয়াটাও একটা রাজনীতি হয়ে গেছে যে, ওখানে গেলে টিভি ক্যামেরা আসবে, ছবি উঠবে ইত্যাদি। সেটা না, যদি আপনার চারপাশের মানুষের অন্তর কান্নায় ভেঙে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনার জীবন সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন : আলোকিত বা অনন্য মানুষের গুণ কী ?

উত্তর : অনন্য মানুষ হচ্ছে সে-যে দুঃখকে আনন্দে, রোগকে সুস্থতায়, হতাশাকে প্রশান্তিতে এবং অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করতে পারে। সে শুধু নিজেই মুক্ত হয় না, হাজারো মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়।

সাধারণ মানুষ সবসময় হিসেব করে কী পেলাম। তার চিন্তাটাই হচ্ছে আমি কী পাবো, আমার কী লাভ হবে, আমি কী পাচ্ছি। চাওয়া-পাওয়াটাকে সে সবসময় বস্তুর অঙ্কে দেখে। অমুক কাজটা করলে আমার কী হবে এ চিন্তা সে করে এবং সেটা পাওয়ার জন্যে কোনোকিছু করতেই তার বাধা নেই। সেটা করতে গিয়ে যদি লাখো মানুষের ক্ষতি হয়, যদি হাজারো মানুষের অকল্যাণ হয় তাতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি।

আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে কী দিলাম। আমি কী দিতে পারলাম। এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই হচ্ছে অনন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। সে সবসময় কী দিতে পারলো, কতটুকু দিতে পারলো, কতটুকু সেবা করতে পারলো তা নিয়ে ভাবে। যেখানে সাধারণ মানুষ ভাবে কতটুকু পেলাম।

এটা ছোটখাটো যেকোনো বিষয় দিয়ে শুরু হতে পারে। মা-কে দিয়েও শুরু হতে পারে। মা আমার জন্যে কী করলো? আজকে শীতের সকালে পিঠা বানিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মা দিলো না। এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। আর অনন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আজকে সকালে মা-কে আমি কী দিতে পারি।

অহিংসা ও ক্ষমায় সে বিশ্বাস করে। সে হিংসার পথে কখনো যায় না। তারও আবেগ ও প্রবৃত্তি রয়েছে। কিন্তু এটা সে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অন্যের দ্বারা নয়, লালসার দ্বারা নয়, সে নিয়ন্ত্রিত হয় সত্য দ্বারা।

সে মৃত্যুকে ভয় পায় না, মৃত্যুকে নতুন জীবনের সূচনা মনে করে। সে কখনো দাস হয় না। মুক্তির অন্বেষণে আত্মদানকে অনেক শ্রেয় মনে করে। অন্যের কাছে আশ্রয় চায় না, হাজার মানুষের আত্মিক আশ্রয়ে পরিণত হয়।

সে শুধু নিজে প্রাচুর্য পায় না, হাজার মানুষ তার কাছে এসে প্রাচুর্যের সন্ধান পায়। সে কখনো শোষক হয় না, সে হয় শোষিতের বন্ধু এবং শোষিতের মুক্তির পথ-প্রদর্শক। সে জানে সে কসমিক ট্রাভেলার, এই জীবন শেষ করে সে নতুন জীবনে প্রবেশ করবে এবং তার প্রস্তুতি সে নেয়।

প্রশ্ন : সাধারণভাবে বলা হয়, একটু বয়স বাড়ুক। তারপর ধর্ম, নৈতিকতা এসব নিয়ে ভাবা যাবে। আসলে কি তাই?

উত্তর : এটা একটা খুবই ভুল ধারণা। কারণ আপনি এখন বেঁচে আছেন। এক মুহূর্ত পরে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন কি না আপনি জানেন না।

একবার এক কৃপণ অনেক ধন-সম্পদ জমাচ্ছে। জমাচ্ছে তো জমাচ্ছেই। কোনো দান-খয়রাত করে না পাছে কমে যায় এ ভয়ে। ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর জন্যে খরচ করে না। এমনকি নিজের জন্যেও না। একটা ভালো স্যাভেল পরতে পারে না। যদি বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়। মুচির কাছ থেকে সেলাই করাতে করাতে স্যাভেলের দশা শেষ। তার বাড়ির কাজের লোকের স্যাভেলও এর চেয়ে ভালো।

তার কেবল একটাই চিন্তা-ভবিষ্যতে একসময় এসব টাকাপয়সা কাজে

লাগবে। তখন নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ যে কবে তা সে নিজেও জানে না।

এর মধ্যেই তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেল। ফেরেশতা জান কবচ করার জন্যে রেডি। সে-তো ফেরেশতাকে দেখে প্রথমে ধমকা-ধমকি, তারপর কাকুতি-মিনতি শুরু করলো। আমাকে নিয়ে যাবেন না। এত কষ্ট করে টাকা-পয়সা জমালাম, বেঁচেই যদি না থাকি তাহলে কী লাভ! আমার সম্পদের অর্ধেকই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। মাত্র তিনটি দিন বেঁচে থাকতে দিন।

ফেরেশতা তার কথা শুনে হাসলো। অনেক সময় অবুঝ বাচ্চার কথা শুনে আমরা বড়রা যেরকম হাসি। বোঝাতে চেষ্টা করলো, দেখ আমাকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি এসব কিছুর উর্ধ্বে। আর তোমার মৃত্যুর সময় এখনই। এটাকে পেছানোর কোনো সুযোগ নেই। কেউই তা পারে না।

শেষ চেষ্টা হিসেবে সে আবারও বললো, ঠিক আছে, তাহলে একটা দিন অন্তত দিন। আমার সব সম্পদই আমি দিয়ে দিচ্ছি। ফেরেশতাকে অনড় দেখে একসময় কৃপণ লোকটি সত্যি সত্যিই বুঝলো যে, তাকে মরতেই হবে। এখন আর কিছু করার নেই।

তখন সে বললো, আমি কি তাহলে মাত্র একটা মিনিট পেতে পারি একটা ছোট নোট লেখার জন্যে? ফেরেশতা বললো, হ্যাঁ, তা হতে পারে।

তখন কৃপণ লোকটি যা লিখেছিলো তা যারা বেঁচে আছি তাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথা কয়টি হলো—প্রিয় পাঠক, এ নোটটি আপনি পড়ছেন, তার মানে আপনি এখনো বেঁচে আছেন। আপনি ভাগ্যবান। জীবনের বাকি সময়গুলো এমন কিছু যোগাড়ের জন্যে খরচ করে ফেলবেন না, যা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না। এমন কিছুই করুন যা আপনি নিয়ে যেতে পারবেন।

আমরা মনে করি বয়স হোক, তারপর অনন্য মানুষ হওয়া যাবে। একটা ডাল যদি শুরু থেকে বাঁকা হয়ে যায় তাহলে গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে তা সোজা হয় না, বাঁকাই থাকে। কাজেই যারা ভাবে এখন বয়স কম, এখন ধর্ম, নৈতিকতা, অনন্য মানুষ ইত্যাদি নিয়ে ভাবার দরকার কী? সৎ কাজ, ভালো কাজ বুড়ো হয়ে করবো। এখন দৌড়াদৌড়ি করি, আনন্দ-ফুটি করি—যারা এরকম প্ল্যান করেছে তাদের কারো দ্বারাই জীবনে ভালো কাজ হয় নি।

যারা ভালো কাজ করেছে তারা কৈশোর থেকে, যৌবন থেকে শুরু করেছে। যে কারণে কোয়ান্টামে আমরা বলি, এখন যৌবন যার, অনন্য মানুষ হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার।

প্রশ্ন : একজন অনন্য মানুষ কি তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে না? তার কি বৈষয়িক প্রয়োজন হবে না?

উত্তর : অবশ্যই হবে। অনন্য মানুষেরা অভাবী ছিলেন না। প্রয়োজন পুরোপুরি পূরণ না করে কেউ জৈবিক অস্তিত্ব ত্যাগ করেন নি। একজন অনন্য মানুষেরও জৈবিক ও বৈষয়িক প্রয়োজন মেটাবার ব্যাপার আছে। কিন্তু সে কখনো এগুলোর জন্যে অভাববোধে ভুগবে না।

আসলে প্রয়োজন ও অভাব এক নয়। পার্থিব জিনিসের প্রয়োজন আছে তবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ছাড়া অতিরিক্তটা দরকার নেই। আর অভাব হলো তুচ্ছ ও বৈষয়িক বিষয়ের সাথে জড়িয়ে যাওয়া। মুরগি যেমন পানিতে ভিজলে জড়িয়ে যায়-হাঁসের মতো উঠে আসতে পারে না। হাঁস পানিতে মুরগির চেয়ে বেশি ডুব দেয় সাঁতার কাটে তবুও পানি তাকে স্পর্শ করে না।

অভাবী হলে তাই আপনি অনন্য মানুষ হতে পারবেন না। যখন আমরা অনুভব করতে পারবো আমাদের হারানোর কিছু নেই তখন আমরা দেখবো যে, চারপাশে পওয়ার রয়েছে অনেক কিছু।

সম্রাট হতে হলে পায়ে কী কী লক্ষণ থাকতে হবে-এ ব্যাপারে এক জ্যোতিষী বেশ পারদর্শী ছিলেন। একদিন পথে যেতে যেতে পায়ে ছাপ দেখে তিনি বুঝলেন এটি একজন সম্রাটের পায়ে ছাপ। তিনি কৌতূহলবশত পায়ে ছাপ দেখে এগিয়ে গেলেন ও তার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি অবাক হলেন। সন্ন্যাসীর পায়ে সম্রাটের ছাপ দেখে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তার হাত দেখে তিনি আরো বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন-এ তো সম্রাটের হাত।

তার বিব্রত অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বিব্রত কেন? তিনি বললেন, আমার সারাজীবনের জ্ঞান, সাধনা বৃথা হলো। আপনার তো সম্রাট হওয়ার কথা। আমার গণনা তা-ই বলে। কিন্তু আপনি তো সম্রাট নন। আমার জ্ঞান কি তাহলে বৃথা গেল?

সন্ন্যাসী জানতে চাইলেন, সম্রাট কাকে বলে-যে গ্রহণ করে, না যে দিতে পারে? জ্যোতিষী বললেন, যে দিতে পারে।

সন্ন্যাসী বললেন, তাহলে আমিই সম্রাট, কারণ যা কিছু আমার ছিলো সব কিছু আমি দিতে পেরেছি। আমার হারানোর কিছু নেই।

জ্যোতিষী তার পরিচয় জানতে চাইলেন।

সন্ন্যাসী জানালেন-তিনি সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ।

গুরুজী/ মহাজাতক/ এস্ট্রলজি

প্রশ্ন : আপনার নামের সাথে যে মহাজাতক শব্দটি আছে—এটা কি ইসলামসম্মত? ইসলামে জাতক, জাতিস্মর ইত্যাদিতে বিশ্বাস তো কুফরি।

উত্তর : আসলে মহাজাতক নামে আমি দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় যে রাশিফল লিখতাম তা থেকেই অনেকে মনে করতে লাগলেন যে, জাতক শব্দের অর্থ বোধ হয় জ্যোতিষ। আর মহাজাতক মানে মহাজ্যোতিষ। আসলে জাতক শব্দের অর্থ—যে জন্মগ্রহণ করেছে। সে হিসেবে প্রতিটি মানুষ হলো জাতক। যেমন, নবজাত শিশুকে বলা হয় নবজাতক।

আর ‘মহাজাতক’ মানে মহান যে জাতক। এটা একটা ছদ্মনাম। যেমন বনফুল, শংকর বা যাযাবর। কিছুদিন আগে আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ইত্তেকাল করেছেন—সমুদ্র গুপ্ত। কিন্তু এটি ছিলো তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম হলো আবদুল মান্নান। যেমন কাজী আনোয়ার হোসেনের লেখক নাম হচ্ছে বিদ্যুৎ মিত্র। এমনকি রবীন্দ্রনাথও ‘ভানুসিংহ’ ছদ্মনামে তার প্রথম রচনা প্রকাশ করেছিলেন। সে রকম মহাজাতকও একটি পেন নেম বা ছদ্মনাম বা লেখক নাম। এখানে কুফরি বা ইসলামসম্মত হওয়া না হওয়ার কোনো বিষয় নেই।

প্রশ্ন : গুরুজী আপনি দাড়ি রাখেন না। আপনার বড় গৌফ রয়েছে। এটা ইসলামবিরুদ্ধ—এই বলে আমার এক বন্ধু প্রায়ই আমাকে বিরক্ত করে। আমি লজ্জিত হই। উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু আমি তাকে কোয়ান্টামে আনতে চাই। এ ব্যাপারে পরিস্কারভাবে কিছু বললে খুশি হবো।

উত্তর : দাড়ির সাথে ইসলামের সম্পর্কটা কতটুকু তা আমাদের বুঝতে হবে। দাড়ি নবীজী (স) এর একটি সুন্নত। কিন্তু ফরজ নয় বা ঈমানের অংশ নয়।

কাজেই দাড়ি দিয়ে কেউ যদি কারো ঈমান বিচার করতে যান তিনি ভুল করবেন। দাড়ি রাখেন না—শুধু এ যুক্তিতেই কাউকে ইসলামবিরুদ্ধ বলা—এটাও হবে একটা ভ্রান্ত কাজ। তবে দাড়ি রাখা সুন্নত এবং যিনি তা পালন করবেন, তিনি সওয়াব পাবেন। কিন্তু দাড়ি ফরজ বা ঈমানের অঙ্গ বা দাড়ি না রাখলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না—এমন কোনো বক্তব্য কোরআন-হাদীসে কোথাও নেই। আর গৌফের ব্যাপারে বিষয়টি আরো সহজ। গৌফ বড়

রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ খেতে গিয়ে গৌঁফে পানি লাগলে, পানি মাকরুহ হয়ে যায়। আল্লাহর শোকর। আমি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন।

পোশাক-আশাক, দাড়ি-গৌঁফের মতো ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে কারোই লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। এর ভালো-মন্দ সবটুকুই ব্যক্তিগত। আপনি তাকে কোয়ান্টামে আনতে চাচ্ছেন তার কল্যাণের জন্যে। তার রোগমুক্তি, সাফল্য, প্রাচুর্য ও প্রশান্তির জন্যে। আমরা যখন কোনো সেবার জন্যে বা শিক্ষার জন্যে কারো কাছে যাই তখন কি তার পোশাক-আশাক দাড়ি গৌঁফ দেখি, না সে বিষয়ে তার জ্ঞান পান্ডিত্য ও দক্ষতা দেখি? স্বাভাবিকভাবেই বহিরাবরণের চেয়ে যোগ্যতা-দক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দেই। ইসলাম যে ঈমানের কথা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের কথা বলে, সেরকম মজবুত ঈমানদার হওয়ার জন্যে, শোকরগোজার হওয়ার জন্যে, রোগমুক্ত সুস্থ জীবনের জন্যে, নামাজে মনোযোগ বাড়িয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে কোয়ান্টাম মেথড এই যুগের বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত প্রমাণিত প্রক্রিয়া। লাখো মানুষ উপকৃত হয়েছেন। আপনার বন্ধু এলে তিনিও উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে কি জ্যোতিষশাস্ত্র হারাম? হাত দেখা, কোষ্ঠি করা, ঠিকুজি করা কি নিষিদ্ধ? এজন্যেই কি আপনি ছেড়ে দিয়েছেন? আমি রত্ন পরি এবং বিশ্বাস করি কোনো সমস্যা হবে না।

উত্তর : জ্যোতিষবিজ্ঞান বা এস্ট্রলজি একটি সায়েন্স। এটি হলো সায়েন্স অফ প্রোবাবিলিটিস বা পসিবিলিটিস। অর্থাৎ কী হতে পারে তা নিয়ে অভিমত, ব্যাখ্যা, পর্যালোচনা বা অনুমান-এটাই হলো জ্যোতিষবিজ্ঞান। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিশিষ্ট আলেমদের অভিমত আমরা গ্রহণ করেছি। আল্লামা হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল্লামা আলাউদ্দিন আল আজহারী, আল্লামা হাফেজ মুহম্মদ হাবীবুর রহমান প্রমুখ দেশবরেণ্য আলেমদের সাথে আমি এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছি।

তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহই পারেন ‘নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু ঘটবে’ এটা বলতে, কোনো মানুষ তা পারে না। কিন্তু কেউ যখন কোনো সম্ভাবনার কথা বলে, বলে এটা হতে পারে, সেটা ঘটতে পারে, তখন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। এবং এস্ট্রলজির আলোকে কেউ যদি এই সম্ভাবনার কথা বলে তাহলে তা ইসলামের বৈধতার সীমার মধ্যেই থাকে।

পবিত্র কোরআনের সূরা জ্বীনের ২৬-২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা

বলেছেন, ‘গায়েব বা ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র তিনিই জানেন, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসুলদের জানিয়েছেন।’ অর্থাৎ জানার পথ খোলা আছে। তিনি যে কাউকে ইচ্ছা ভবিষ্যৎ জানাতে পারেন, যে কাউকে ইচ্ছা গায়েব জানাতে পারেন, এটা ওনার এখতিয়ারে। আর এটা আল্লাহর একটি আশ্বাসই যে, যে যা জানতে চায়, আল্লাহ সেই বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করেন।

আসলে জ্যোতিষী নিয়ে আমাদের সমাজে অনেকের মধ্যে যে বিরূপ মনোভাব তার মূলে আছে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ আমাদের এখানে অতীতে জ্যোতিষচর্চা করতেন মূলত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা। অতএব জ্যোতিষ-বিজ্ঞান চর্চা করলে সে মুসলমান থাকবে না। সেইসাথে কোরআন-হাদীসের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে কটরপন্থী একশ্রেণীর আলেম এ বিষয়টিকে ধর্মীয় নিষেধের বেড়াজালে বন্দি করে ফেলেন। তারা গণকের ভাগ্য গণনার সাথে জ্যোতিষ বিজ্ঞানকে একাকার করে ফেলেন।

অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগে যত বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন—আল বেরুণী, ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল বাত্তানী, আল কিন্দি, আল আন্দালাসী, আল জারকালি, ইবনে বাজ্জা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে আরাবী, ইব্রাহীম আল ফাযারি, আল ফারগানি, আল খারেজমি, আল তারাবি, ওমর খৈয়াম, ইবনে ইউনুস, উলুগ বেগ, নাসিরুদ্দিন আল তুসী প্রমুখ মুসলিম মনীষীগণ জ্যোতিষ বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন।

কারণ তাদের অনুপ্রেরণা ছিলো পবিত্র কোরআনের বাণী—‘নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন-রাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা দাঁড়িয়ে, বসে বা শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয় এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি কর নি’ (সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১)। পবিত্র কোরআনের ৮৫ নং সূরাটির নাম ‘বুরূজ’ যার মানে রাশিচক্র। আরবি ভাষায় রাশিকে বুরূজ বলা হয়।

বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা তখন ছিলো বিশ্বের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার পাঠ্যতালিকায় ছিলো এই ইলমে আল নাজ্জুমী যা একইসাথে এস্ট্রলজি এবং এস্ট্রনমি—দুটোকেই বোঝাতো। এমন কোনো মুসলিম পণ্ডিত ছিলেন না যিনি এস্ট্রলজিতে দক্ষ ছিলেন না। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বেয়ার’স স্টার চার্ট বা বেয়ারের তারাতালিকা ব্যবহারের আগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো ‘জিজ-ই-উলুগ বেগ’ বা উলুগ বেগের তারাতালিকা যা প্রণয়ন করেন মধ্যযুগের সবচেয়ে খ্যাতনামা মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী উলুগ বেগ।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে যত নক্ষত্রের নাম রয়েছে এর তিন ভাগের এক ভাগই হচ্ছে আরবি নাম।

পন্ডিত আল বেরুনী ছিলেন সুলতান মাহমুদের রাজ জ্যোতিষ। তিনি যখন সুলতান মাহমুদের দরবারে আসেন সুলতান তার জ্যোতিষ বিজ্ঞানে দক্ষতা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আল বেরুনীকে বললেন, আগামীকাল আমি কোন দরজা দিয়ে সিংহাসনে প্রবেশ করবো, তা বলতে হবে।

সিদ্ধান্ত হলো—আল বেরুনী সব হিসেব-নিকেশ করে তার সিদ্ধান্ত লিখে একটা খামে সিলগালা করে সুলতানকে দেবেন। সুলতান খামটি সিংহাসনে রেখে যাবেন। পরদিন সুলতান দরবারে এসে সবার সামনে তা খুলবেন। যথানিয়মে আল বেরুনী তার ছক কষে হিসেব করে তার ভবিষ্যদ্বাণী লিখে খাম সিলগালা করে সুলতানের হাতে দিলেন। সুলতান তা সিংহাসনে রেখে দরবার শেষ করে বেরিয়ে এলেন। এসেই হুকুম করলেন—দেয়াল ভেঙে রাতের মধ্যেই নতুন একটি দরজা নির্মাণ করতে হবে।

যথারীতি দরজা নির্মিত হলো। পর দিন সুলতান মাহমুদ নতুন দরজা দিয়ে হাসতে হাসতে দরবারে প্রবেশ করলেন। ভাবখানা এই যে, আল বেরুনীকে আজ ভালভাবেই জব্দ করা যাবে। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান তিনটি দরজার যেকোনো একটির কথাই কাগজে লেখা থাকবে।

সুলতান সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেলেন। খামটি তুললেন। মন্ত্রী হাতে দিলেন। খুলে পড়তে বললেন। মন্ত্রী খাম খুললেন। কাগজে লেখা আছে—সুলতান আজ নতুন একটি দরজা দিয়ে দরবারে প্রবেশ করবেন।

দরবারসুদ্ধ সভাসদরা বিস্ময়ে হা হয়ে গেলেন।

কবি হিসেবে বিখ্যাত হলেও ওমর খৈয়াম ছিলেন খোরাসানের রাজ জ্যোতিষ। তিনি ‘তারিখ ই জালালি’ নামে নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করেন। খ্রৈগরী ক্যালেন্ডারের সাথে তুলনা করলেই খৈয়ামের গণনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত খ্রৈগরী ক্যালেন্ডার অনুসারে ৩৩৩০ বছরের গণনায় একদিনের পার্থক্য দেখা দেবে। অপরদিকে ওমরের ক্যালেন্ডার হিসেবে গণনা করলে ৫০০০ বছরে একদিনের তারতম্য দেখা দেবে।

ওমর খৈয়ামের জ্যোতিষ-জ্ঞান এত নির্ভুল ছিলো যে, নিজের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো। ঐতিহাসিক শাহজুরির বর্ণনা অনুসারে—‘মৃত্যুর দিন খৈয়াম রোজা রেখেছিলেন। মাগরিবের সময় হলে তিনি নামাজে দাঁড়ান। সেজদায় গিয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলেন—আল্লাহ! যথাসাধ্য তোমাকেই চেয়েছি। আজ আমার মিনতি—তোমার করুণা ও ক্ষমা

থেকে যেন বঞ্চিত না হই’। সেজদা থেকে তিনি আর ওঠেন নি।

আমি যখন এস্ট্রলজি চর্চা করেছি তখন ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই আমার সামনে পরিষ্কার ছিলো। যদিও সেসময়ও এসব নিয়ে মাঝে মাঝে হাস্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো।

যেমন, একবার এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছি। অতিথিদের সাথে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তখন সেখানে উপস্থিত একজন বিশিষ্ট মওলানা আমার পরিচয় পেয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সবার সামনেই সরাসরি আক্রমণ করে বলে উঠলেন, আপনি তো জ্যোতিষ, মহাজাতক। আপনি হাবিয়া দোজখে যাবেন।

আমি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম—কেন হুজুর!

তিনি রক্ষ স্বরে বললেন, আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

আমি দেখলাম যে, এখন যদি এ কথার কোনো জবাব না দিই তাহলে উপস্থিতদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আমি হেসে বললাম, হুজুর, আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ সেখানে আপনার মতো আলেমের কাছাকাছিই আমি থাকবো।

এ কথা শুনে তিনি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কারণ আমার মতো একজন জ্যোতিষ তাকে এরকম মন্তব্য করবে এটা তিনি ভাবতেই পারেন নি। আমি বললাম, হুজুর, রাগ করার আগে আমাকে তো একটু জিজ্ঞেস করবেন যে, কেন আমি এ কথা বলেছি।

আমার কথা শুনে উপস্থিত অতিথিরা বললেন, ঠিক কথা। বলেন।

আমি তখন বললাম, হুজুর দেখেন, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করি এক বছর, দুই বছর, ১০ বছর, ২০ বছর—বড়জোর ৫০ বছরের জন্যে। আর আপনি—আমি মারা যাবো, আপনি মারা যাবেন। কুল মাখলুকাত ধ্বংস হবে। কেয়ামত হবে, তারপর হাশর হবে, তারপর নির্ধারিত হবে কে কোথায় যাবে না যাবে। অর্থাৎ হাজার বা লক্ষ বছর পর কী ঘটবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী আপনি করলেন আমার ব্যাপারে। যদি ৫০ বছর পরের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে আমাকে হাবিয়া দোজখে যেতে হয়, তাহলে লক্ষ বছর পরের ভবিষ্যদ্বাণী করে আপনাকেও হাবিয়া দোজখে যেতে হবে। কারণ এর চেয়ে নিকৃষ্ট দোজখ তো আর নেই। সেই জন্যে বলেছি—হুজুর, আপনার কথা যদি ঠিক হয় তবে দোজখে আপনার কাছাকাছিই আমি থাকবো। শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

এখন আসি আপনার প্রশ্নে যে, কেন আমি জ্যোতিষ চর্চা করছি না। আমি আমার জীবনে যখন যা করেছি তা করেছি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। ফলে

কোয়ান্টাম মেথডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পর এস্ট্রলজির মতো ব্যাপক একটি বিষয়ে মনোযোগ দেয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ তাহলে তা হতো আমার ক্লায়েন্টদের বঞ্চিত করা। আর সেইসাথে আমি বিশ্বাস করি এখন আমি যা করছি তা এস্ট্রলজির চেয়ে মানুষের অনেক বেশি কল্যাণ করছে। কারণ আগে বলতে পারতাম যে, আপনার এই রোগ হতে পারে, এই অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু এখন বলতে পারি, এই রোগ হতে পারে কিন্তু আপনি যদি মেডিটেশন করেন, এই করণীয়গুলো অনুসরণ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি এ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে রত্ন পরে আপনি যদি মনে করেন যে, এটা আপনাকে প্রোটেকশন দেবে, তাহলে আপনি ভুল করবেন। রত্ন পরে সমস্যার সমাধান করা যায় না। রত্ন পরে কোটিপতি হওয়া যায় না। একবার একজন এসে আমাকে খুব করে ধরলো তাকে এমন একটা পাথর যোগাড় করে দিতে হবে যা পরলে ছয় মাসে সে কোটিপতি হয়ে যাবে। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আমি কী দোষ করেছি? যদি এরকম কোনো পাথর থাকতোই যা পরে কোটিপতি হওয়া যায় তাহলে তো সেটা আমি প্রথম পরতাম। আপনাদের পরামর্শ দিয়ে ফি পাবো বলে এখানে বসে থাকতাম না।

আসলে রত্ন-পাথর কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের জন্যে, শারীরিক-মানসিক সুস্থতার জন্যে উপকারি। অনেকটা ওষুধের মতো। এটা আপনার ভাগ্যকে বদলাতে পারবে না, বা পারবে না আপনাকে প্রটেকশন দিতে।

প্রশ্ন : বিয়ের আগেই আমি কোয়ান্টাম কোর্স করেছি। প্রোগ্রামগুলোতে তখন নিয়মিত যেতাম। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির আপত্তির কারণে এখন আর যেতে পারি না। বিশেষ করে আমার শাশুড়ির বড় আপত্তি হলো ‘গুরুজী’ নামটি নিয়ে। তিনি বলেন, গুরুজী তো হয় হিন্দু হলে। তোমাদের গুরুজী কি হিন্দু? বুঝি, তার কথা অযৌক্তিক। কিন্তু তাকে বোঝাবো কেমন করে?

উত্তর : আসলে ‘গুরুজী’ আমার নাম নয়। পদবীও নয়। আমার ক্লাসে অংশ নিয়ে কোয়ান্টাম মেথড দ্বারা উপকৃত হয়ে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে কেউ আমাকে গুরুজী, কেউ ওস্তাদজী, কেউ হুজুর, কেউ স্যার বলে সম্বোধন করেন। আমরা আমাদের শিক্ষককে ভালবেসেই সম্বোধনের একটি শব্দ ঠিক করে নেই। এই সম্বোধনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একজন শিক্ষক। আপনার শ্বশুরবাড়িতে যে সম্বোধনে ডাকলে তারা খুশি হবেন সে

সম্বোধনেই ডাকবেন। তাতে যদি কোয়ান্টামের প্রোথ্রামে আসার বাধা কেটে যায় তবে আমিই বেশি আনন্দিত হবো।

প্রশ্ন : আমরা কি গুরুজী অথবা মা-জী হতে পারবো? আমরা কি সে রকম মনছবি দেখতে পারি?

উত্তর : প্রশ্ন করেছেন-গুরুজী বা মা-জী হতে পারবেন কি না। তার মানে আমাদের সম্পর্কে আপনার মনে একটা সুন্দর ধারণা রয়েছে। মনে করছেন যে, গুরুজী বা মা-জী হতে পারা ভালো। এবং আমাদের আনন্দটা এইখানে যে, একজন তরুণ বা একজন তরুণী আমাদের মতো হতে চান। এর চেয়ে বড় আনন্দ তো আর কিছু নাই।

আমাদের চেয়ে অনেক বড় হওয়ার সুযোগ আপনাদের আছে। কারণ আমরা যেখানে শেষ করবো আপনারা সেখান থেকে শুরু করবেন। আমরা তো ক্ষেত্র প্রস্তুত করছি। এবং একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় আনন্দ কী? যদি তার ছাত্র তাকে অতিক্রম করে যায়, তার চেয়েও বড় হয়। আমাদের তো দোয়া থাকবে যে, আপনারা আমাদের চেয়েও অনেক অনেক বড় হবেন। এবং আপনাদের পরিচয়ে যেন আমরা পরিচিত হতে পারি-যে, হাঁ, অমুকের গুরু ছিলো অমুক। অমুকের মা ছিলো অমুক। এখানেই আমাদের আনন্দ।

প্রশ্ন : আমরা জানি আপনি একসময় সাংবাদিকতা করতেন। তারপর এস্ট্রলজি করেছেন। সেসব ছেড়ে আপনি কেন কোয়ান্টামে এলেন?

উত্তর : আমি কেন কোয়ান্টামে? হাঁ, এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন এবং এর উত্তরও আমার কাছে সুস্পষ্ট। তবে উত্তর দেয়ার আগে একটু প্রেক্ষাপট বলা দরকার।

প্রথমে বলি, সাংবাদিকতায় কীভাবে এলাম? তারুণ্যে যখন মানুষের দুঃখ কষ্ট অভাব বঞ্চনা দেখেছি, মনে হয়েছিলো-এ দুঃখের কথা, কষ্টের কথা যদি লেখা যায় তাহলে কিছু একটা হবে। শুরু করলাম রিপোর্টারের কাজ। আর আমার একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো-আমি সবসময় যা করেছি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করেছি। ভালবেসে করেছি। ফলে কাজের প্রতিদানও আমি সেভাবে পেয়েছি।

সাংবাদিকতা পেশায় এত অল্প সময়ে আমি বার্তা সম্পাদক পদে উন্নীত হলাম যে, তখনো আমার অনেক সহকর্মী রিপোর্টার হিসেবেই কাজ করছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বুঝলাম-বাইরে থেকে যা-ই মনে হোক, একজন সাংবাদিকের স্বাধীনতা আসলে খুব সীমিত। তাকে লিখতে হয়

পত্রিকার মালিকের ইচ্ছানুসারে। সত্য জানাতে চাইলেও জানানো যায় না। সিদ্ধান্ত নিলাম, সাংবাদিকতা ছেড়ে দেবো। শুনে আমার শুভানুধ্যায়ীরা আফসোস করলেন। অনেকে বললেন, একটা নক্ষত্রের পতন হলো।

এস্ট্রলজির প্রতি আগ্রহ ছিলো। এই শখকেই পেশা হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ মনে হলো, একজন মানুষকে যদি ভালো পরামর্শ দেয়া যায়, একটা গাইড লাইন দেয়া যায় তাহলে তার দুঃখটাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন বা তাকে যদি সতর্ক করে দেয়া যায় তাহলে দুঃখ থেকে তিনি হয়তো দূরে থাকতে পারবেন।

তবে সন্দেহ নেই যে, বার্তা সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিয়ে এস্ট্রলজির মতো একটি অপ্রচলিত পেশায় আসার সিদ্ধান্তটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। কিন্তু এ ঝুঁকি নিতে পেরেছিলাম, কারণ আমি সবসময় মনে করেছি—জীবন আমার। আমার জীবনের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। আর যেহেতু আমি কাজটাকে ভালবাসি অতএব এখানে আমার মেধাকে কাজে লাগাতে পারবো।

তা-ই হলো। এস্ট্রলজার হিসেবে আমাদের দেশে একজন মানুষের পক্ষে খ্যাতিসহ যা যা পাওয়া সম্ভব তার সবই আমি পেয়েছি। যে সময় আমাদের দেশের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ২০০ টাকা ফিস নিতেন তখন আমি ফিস নিতাম ৫০০ টাকা।

এস্ট্রলজার হিসেবে আমার মূল চিন্তা ছিলো—মানুষকে হতাশা থেকে মুক্ত করে কীভাবে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা যায়। কারণ আমি জানতাম সাধারণত একজন মানুষ এস্ট্রলজারের কাছে আসে বিপন্ন অবস্থায়, সবশেষে। প্রথমে সে নিজে চেষ্টা করে। নিজে যখন পারে না—ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার যখন পারে না তখন সে পীর সাহেবের কাছে যায়। পীর সাহেবও যখন পারলেন না তখন শেষ জায়গা হচ্ছে এস্ট্রলজার—যে, ভাগ্যে কী আছে, দেখি!

আমি চেষ্টা করতাম—এ মানুষগুলোকে কীভাবে সৎ পরামর্শ, ভালো পরামর্শ দেয়া যায়। সেসময় মানুষের দুঃখ-কষ্টকে এত কাছ থেকে দেখেছি যে, অন্য কোনোভাবে এটা সম্ভব হতো না। কারণ এস্ট্রলজারের ব্যাপারে একজন মানুষ মনেই করে যে, উনি অনেক জানেন। অতএব ওনার কাছে লুকানোর কিছু নাই। তারা হৃদয় উজাড় করে বলতো। আর আমি শুনতাম। বরং বলার চেয়ে আমি শুনতামই বেশি। বলতাম খুব কম।

তবে কথা এবং তথ্যের আমানতদারি আমি রক্ষা করতাম খুব সচেতনভাবে। আর ভিজিটর এলে আমাকে স্লিপ পাঠাতে হতো। এমনও হয়েছে, হাজবেন্ড যে আমার কাছে আসেন ওয়াইফ জানেন না। ওয়াইফও যে

আসেন তা হাজবেন্ড জানেন না। তাদের কাউকে কোনোদিন বুঝতে দিই নি যে, তার হাজবেন্ড বা ওয়াইফ আমার কাছে আসেন। এজন্যে আমার দুটো তিনটে রুম ছিলো—যাতে আলাদা আলাদা কথা বলা যায়—পরস্পরের সাথে দেখাদেখি না হয়। এরকম হয়েছে যে, ওয়াইফ ভেতরে কথা বলছেন—হাজবেন্ড চলে এসেছেন। আমি তখন হাজবেন্ডকে নিয়ে আরেক রুমে গেলাম। কথাবার্তা বলে তিনি বিদায় নিলেন। তারপরে ফিরে এলাম ওয়াইফ যে রুমে আছেন সে রুমে। তার সাথে কথা বললাম।

তবে একজন এস্ট্রলজার হিসেবে আমার সীমাবদ্ধতা ছিলো যে, এখানে হয়তো খুব অনায়াসে একজনকে বলতে পারছি—আপনার মাইগ্রেন হতে পারে বা অমুক রোগটি হতে পারে। কিন্তু মাইগ্রেন থেকে কীভাবে আপনি রক্ষা পেতে পারেন বা ব্যাকপেইন থেকে কীভাবে রেহাই পেতে পারেন এটা তাকে বলতে পারছি না। দুঃখ বলতে পারছি, কিন্তু দুঃখের কোনো সমাধান দিতে পারছি না। প্রতিকার করতে পারছি না। এই অতৃপ্তি ছিলো, দুঃখবোধ ছিলো।

আর যেহেতু ধ্যান-মেডিটেশনের সাথে তারুণ্যেই পরিচয় ছিলো, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ রোগগুলো মনের কষ্ট থেকেই আসছে। মনের জট খুলে গেলে তার কষ্টগুলো দূর হয়ে যাবে। বুঝতে পারলাম—মেডিটেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তার ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে বিপন্ন অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করা সম্ভব। বুঝলাম—তার ভেতরের শক্তির জাগরণ ঘটিয়েই তার দুঃখকে আনন্দে রোগকে সুস্থতায় ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করা যাবে।

যখন বুঝলাম তখন আর সময় নিই নি। যেভাবে সাংবাদিকতা ছেড়েছিলাম, তেমনি এস্ট্রলজি ছেড়ে কোয়ান্টামে নিজেকে সঁপে দিলাম। ঝুঁকি ছিলো। উপহাস পরিহাস আর প্রতিকূলতা কম ছিলো না। কিন্তু বিশ্বাসে অটল ছিলাম। তাই কোয়ান্টাম আজ সকল স্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছি এখন। আমি ভালো আছি। আপনিও আসুন আমার সাথে। আপনিও ভালো থাকবেন।

...

প্রিয় পাঠক,

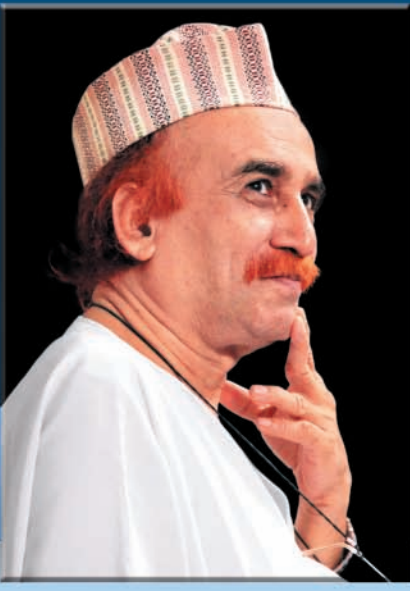
এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে
নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক

যোগ ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

E-mail : info@quantummethod.org.bd



হাজারো প্রশ্নের জবাব

১ ॥ মেডিটেশন

মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন চর্চার পথিকৃৎ। জাগতিক ও মানবিক সমস্যা সমাধানের জন্যে জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথড এর উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ২০ বছর ধরে তিনি একনাগাড়ে দেশের সর্বত্র কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। আর মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে ৩৫০টি কোর্স সম্পন্ন করা বিশ্বে এই প্রথম।

দুই যুগ ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ‘কোয়ান্টাম মেথড’ ছাড়াও তার রচিত ‘আত্মনির্মাণ’, ‘চেতনা অতিচেতনা নিরাময় ও প্রশান্তি’, ‘জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন’ ও এর ইংরেজি সংস্করণ ‘1001 Autosuggestions to change your life’ এবং ‘আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা’ পাঠকের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

কোয়ান্টাম

কোয়ান্টাম আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের বিজ্ঞান। সঠিক জীবনদৃষ্টি প্রয়োগ করে মেধা ও প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করাই এর লক্ষ্য। স্ব-উদ্যোগ, স্ব-পরিকল্পনা ও স্ব-অর্থায়নে সৃষ্টির সেবায় সম্ভবত্বভাবে কাজ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাতিতে রূপান্তরিত করাই এর মনছবি। কোয়ান্টাম মেথড অনুশীলন করে সমাজের সর্বস্তরের লাখো মানুষ অশান্তিকে প্রশান্তিতে, রোগকে সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, অভাবকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। কোয়ান্টাম চর্চার মাধ্যমে আপনিও বদলে দিতে পারেন আপনার জীবন।



www.quantummethord.org.bd